বঙ্গীয়

মুসলমান সাহিত্য সমিতির

মুখপত্র

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চম বর্ষ—১৩২৯

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বি-এ

সম্পাদিত

কার্য্যালয়—

৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

P 30253

৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য সমিতি কর্তৃক
প্রকাশিত

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ

বিষয় সূচী—১৩২৯

(বর্ণমালা অনুসারে)

অচিন ডাকলী (পদ্য) ২৭২
মোঃ মনেরুদ্দীন বিএল

এক নিমন্ত্রণ (পদ্য) ... ২১৪
মোঃ গোলাম মোস্তফা বি এ, বি টি

*এবিন আলাম ও স্বর্গের দূত (পদ্য) ... ৩৪
শ্রীযুত চণ্ডি চরণ মিত্র

এহল লতিফ (সংক্ষিপ্ত জীবনী) ... ১৭৯
এ, মোহানী

এশী ছন্দের ঝঙ্কার ... ৩১৫
কাজী নজরুল ইস্লাম

ঐতিহ্য গৌরব (ইতিবৃত্ত) ৮১, ১১৩, ২৯৬
শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত এম-এ

ওমর কাহিনী (ছেকেন্দর) ... ৯১
খাজা -

ওমর ও রবীন্দ্রনাথ ... ৩০৩
মোঃ গোলাম মোস্তফা বি, এ, বি, টি

কবি-বন্দনা ও কবিতা এবং তাঁহার বাঙ্গালা অনুবাদ ১১৭
মোঃ মোঃ শহীদুল্লাহ, এম-এ, বি এল,

কবি (পদ্য) ... ২৭৭
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

কবির জীবনী (পিতৃ-মাতৃ ভক্তি) ... ৫৪
মোঃ মোঃ লুৎফর রহমান

কাত (পদ্য) ... ২৭৬
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র

একখানি মুখের স্মৃতি (পদ্য) ... ১৬৮
শ্রীযুত গোপেন্দ্রনাথ সরকার

ওয়ারেসী সম্পত্তি ... ১৫৪
শ্রীযুত যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়

কবি সংবর্দ্ধনা ... ৩৭
মোঃ এম, খানসাহী

কবিবর নেজামী ... ২৫৭
মোঃ কাজী নবরোজ খোন্দা

কাব্য সাহিত্যে
রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ... ৩২৭
শ্রীযুত অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

কেরামত শাহ (গল্প) ... ১৬৫
মোঃ ওয়াহেজুদ্দিন আহ্‌মদ

কোরআন ও নারী ... ১৩১
ডাক্তার লুৎফর রহমান

কুরবেল ফুলশা ২০৭ ২৩৮
মোঃ আব্বাস হোসেন এম-এ বি এল

খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ... ১৪৫
শ্রীযুত হরেশ চন্দ্র মিত্র

খেলাফৎ বিবরণ ... ১৯১
স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মিত্র

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ... ৭
মোঃ আবদুল্লা আল আমান

গান্ধী জয় (গল্প) ... ৫৩
শ্রীযুক্ত নীলেন্দ্র কুমার মল্লিক

গ্রাহকগণের প্রতি
সম্পাদক ... ৩৩৬

ছাই (পদ্য) ... ১২৫
খাজা

জাতীয় উৎসব (পদ্য) ... ২৫৬
শ্রীমতী সরযূ বালা বসু

ডাকাত (গল্প) ... ৬৮
শ্রীযুক্ত শৈলবালা মুখোপাধ্যায়

তৃপ্তি (পদ্য) ... ৩১২
শ্রীযুত চণ্ডিচরণ মিত্র

দুঃখ ও সুখ (পদ্য) ... ১৪৮
এ, মোহানী

নদী (পদ্য) ... ২৬৩
শ্রীযুত চণ্ডীচরণ মিত্র

দুনিয়ার সেরা সুন্দরী ... ৩২৯
খাজা

দোহুল ছন্দ (মোতা কারিব ছন্দ)
কাজী নজরুল ইসলাম ৩১৮

নকাব ... ২৬১
শ্রীযুত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

নৌকাপথে (ভ্রমণ) ... ১১২
শ্রীমতী বিরজা সুন্দরী দেবী

পথের আলো (পদ্য) ... ১৯
শ্রীযুত প্রমদ রঞ্জন মল্লিক বি-এ

পর্বতলে (পদ্য) ... ৭১
শ্রীযুত গোপেন্দ্র নাথ সরকার

পরিত্যক্ত (পদ্য) ... ৮৫
স্বর্গীয় জীবেন্দ্র কুমার দত্ত

পল্লিসমাজের খানিকটা ... ২
শ্রীযুত সুধীর কুমার সেন বি-এ

পুস্তক পরিচয় ৯০, ২৪৩, ৩১

পূর্ণিমার গান (গল্প) ... ২৫
শ্রীযুত চণ্ডিচরণ মিত্র

প্রাচ্য মনীষী মহর্ষি ... ১
খাজা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (পদ্য) ... ২৮
শ্রীযুত চণ্ডিচরণ মিত্র

প্রেম ও প্রীতি কবিতা ... ৩
শ্রীযুত শশাঙ্ক মোহন সেন বি-এল

প্রেমিক (পদ্য) ... ১২
শ্রীযুত চণ্ডীচরণ মিত্র

প্রেমহীন প্রাণ (পদ্য) ... ২৫
শ্রীযুত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়

প্রেমের প্রতীতা সরৎপাদ ... ২৬

ফুল (পদ্য) ... ১৫
শ্রীযুত চণ্ডীচরণ মিত্র

বঙ্গে আফগান পরিবার ... ২৮
মৌঃ নওশের আলী খাঁ ইউসফজায়ী

ব্যথিতের নিবেদন (পদ্য) ... ৭
মৌঃ গোলাম মোস্তফা বি, এ, বি, টি

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ... ২৭
মোসাম্মত লতিফা খাতুন বি, এ

বিদায় গ্রহণ (গল্প) ... ২১
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া

বৈশাখী (পদ্য) ...
স্বর্গীয় জীবেন্দ্র কুমার দত্ত

বোগদাদ নগরীর ধ্বংস সাধন ... ৩৩
মৌঃ মোহাঃ সানাউল্লাহ এম-এ

ভারতে মোস্লেম নৌ-শক্তি ... ২৫
মোঃ গোলাম মোস্তাফা বি-এ, বি-টি

মুসলমান সমাজের শিক্ষা ... ১৮৮
মৌঃ আবদুল করিম, বি-এল
মোবারক আলীর উদ্ধার কাহিনী
স্নেহ ত্যাগ ... ২৬১
মৌঃ মোঃ যবরুলাহ, এম-এ, বি-এল
যৌবন (গল্প) ... ১৩৯
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র কুমার মল্লিক বি, এ
যাচনা ... ১৭৭
শ্রীযুক্ত
লর্ড মেকলে ... ১৮১
স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মিত্র
শহীদ (গল্প) ... ২১৩
মৌঃ মীর কছিরুদ্দীন আলী, বি-এ
শিশুর শিক্ষা ... ১৬
মৌঃ সোলায়মান মোহাম্মদ বি-এ ; বি-টি
সতেজ স্মৃতি (গল্প) ... ১৪৭
মৌঃ সোলায়মান মোহাম্মদ বি-এ ; বি-টি
সহোদর ভাগ্নে (গল্প) ... ১৭৮
মৌঃ মোঃ শরীয়তুল্লাহ এম-এ ; বি-এল
সমিতি সংবাদ ২৫, ২৭৫
সাধীর পাইবে কীনা ... ১২
শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ গুপ্ত
সাহিত্য ... ১৭৫
মৌঃ জয়েদুল হোসেন
সাহিত্যের কথা ... ৩৭৬
শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সেন বি এ
স্নেহের বন্ধন (গল্প) ... ১৭৫
শ্রীযুক্ত নলিত মোহন মুখোপাধ্যায়
হক বিচার (উপন্যাস) ... ১৩৩
খাজা
হজরত মোহাম্মদের শক্তিমত্তা ও
মানবের অক্ষমতা ... ১১
মৌঃ মোঃ আবদুল কাদের চৌধুরী
হজরত মোহাম্মদের জীবনের প্রধান
ঘটনাবলি ... ২৩৬
মৌঃ মোঃ আবদুল কাদির চৌধুরী
হাজার বছরের হাসি (রহস্যকাব্য) ১৮৭
শ্রীযুক্ত নিশি কান্ত সেন
হাসিরা (গল্প) ... ২৩৩
শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ এম-এ

Printed by The Oriental Printers and Publishers, Ltd.
10, Mirchu Bazar Street, Calcutta.
Published by Dr. Lutfur Rahman, 37, College Street, Calcutta.

গ্রাহকগণের প্রতি

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী-পরিচালিত [illegible] সাহিত্য পত্রিকার [illegible] বর্ষ শেষ হইল। এই কয় বৎসর যে সমস্ত গ্রাহক বন্ধু-গ্রাহিকাবৃন্দ ও পৃষ্ঠপোষক কর্তৃপক্ষ দরিদ্র সমিতিকে [illegible] সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের ধন্যবাদ।

দরিদ্র সমাজের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কেবল আমাদের চেষ্টায় এ সকল দিক রক্ষিত হইবে, এমন ভরসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজ হিতৈষী সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণ যদি ইহাকে স্থায়ী করিতে চাহেন তবে ইহার উন্নতি অনিবার্য্য। সহৃদয় গ্রাহক বন্ধুবান্ধব নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে পূর্ব্বের ন্যায় আগামী বৎসরের জন্য পত্রিকার গ্রাহক থাকিয়া ও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইহার বিশিষ্টরূপ রক্ষা করিতে সাহায্য করেন।

যাঁহারা নিতান্তই গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ২৫শে বৈশাখের মধ্যে গ্রাহক নম্বর সহ আমাদিগকে কার্ড লিখিয়া তাহা জানাইবেন। নচেৎ গ্রাহক থাকিতে ও ভিপি গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন জানিয়া ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম (বৈশাখ) সংখ্যা ভিপি করিব। ভিপি ফেরৎ যাওয়ায় দরিদ্র সমিতির পক্ষে যে ক্ষতির কারণ হয় তাহা বলিবার নহে। আরও একটী কথা, যাহারা পত্রিকার গ্রাহক থাকিবেন, তাঁহারা যদি পত্রিকা ভিপিতে না লইয়া বুকপোষ্টে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই বিশেষ সুবিধা। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা ও সদস্যগণ সাধ্য চাঁদা ৩৲ তিন টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিলেই আমরা পত্রিকা বুকপোষ্টে পাঠাইতে পারিব।

সমিতির একটী বৃহৎ পুস্তক বিভাগ খোলা হইয়াছে। যাহারা পুস্তকাদি ক্রয় করেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের পুস্তক বিভাগে অর্ডার দিলে যথাসাধ্য সমিতি ও পত্রিকার বিশেষ সাহায্য করা হইবে।

হাতবক্সে আমরা কয়েক খানি মূল্যবান পুস্তকের সমালোচনা পাইয়াছি। কিন্তু সমিতির অর্থাভাব নিবন্ধন সেগুলি প্রকাশিত হইতেছে না। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আমরা সেগুলির একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিব।

আমাদের বক্তব্য এই যে নিবেদনের কার্য্য মনে করিয়া এই বাঙ্গালীর কাগজ পাইবার গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য সকল সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি যদি অল্পবিস্তর পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে শুধু সমিতি বা পত্রিকা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য ও উন্নতি হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২৯ | ১ম সংখ্যা

বৈশাখী

প্রবল বৈশাখী ঝড় কালিকে গম্ভীর
বহিয়া যাইবে ধরা উত্তরের তীর
পড়িবে এ পথ, জ্যোতি আঁধার
তোর পেছে অলক্ষিতে, সাহিত্য ধমনী
পড়ে আছে, নিগৃহীতা ক্রন্দসী রমণী
মলাটের ঘরে যেন। শত অত্যাচার
চিহ্ন জাগে চারিদিকে, লুণ্ঠিত ধূলায়
ছত্রপাখা, লাঞ্ছ বীণ, ভীরু গ্রন্থগুলি
ছিঁড়ি' শত মায়া-ডোর, ইঙ্গিতে কামার
এসেছে আজো বুঝি লেখক আকুলি'।
আজি হাসে রাহু-রবি, গ্রসে ভাঙল
বল বিশ্ব, আমি আমি একান্তে কেবল
মহাপ্রলয়ের গান জীবনে আমার
এমনি শাস্তির দিন আসিবে কি আর।

শ্রীঅরবিন্দকুমার দত্ত

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জীবিত পুরুষ; শুধু সেখানকার, যেখানে নব, অবরীবনের ধারা বহিছে। তাঁদের কথা শেষ হয় নাই, বোঝা শেষ হয় নাই, বলাও শেষ হয় নাই। তাহাই আমাদের থেকে তাঁদের কোন কথা ঠেলে ঘরে ফেলার অধিকার আমরা হারাই। তাঁদের কাছে আমরা তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, সে কেবল এই বিশ্বাস হৃদয়ে নে তাঁরা আমাদের মুক্ত চিত্তের চিন্তা-ধারা, উৎসাহ-আবেগের তরঙ্গ দোলিয়ে সামনে চলেছেন। সে সব বাক্-বৈচিত্র্য আমাদের মনে কেমন করে এসে লাগছে, কি কথা কি আভাস ইঙ্গিত বহিয়ে উঁহে আমাদের শিরায় শিরায়, এ পর্যন্ত তাহা আমুপূর্বিক তাঁর আমাদের সামনে ধরেছেন তাহে কাকে আমাদের কেমন করে মনে হচ্ছে—এ সমস্তের নিশ্চয়ই একটা সহজ ও মূল্য আছে।

গান্ধীর Indian Home Rule বইখানা পড়ে প্রথম মনে হয়েছিল—এযুগের কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বেশ বড় অমিল হচ্ছে। যার Indian Home Rule বইখানার কথাগুলো অনেক জায়গায় কোমল ধরণের নয়ই বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর কথাগুলো যে কি ভাবে গ্রহণ করতে হবে, তিনি কি ভের অইটেন্স দিতে চেয়ে বলছেন না বর্তমানেই কারো মানিয়ে এগিয়ে গেলে আমরা তাঁর কথার সত্যতা ধরতে পারব, তা তেমন পরিষ্কার করে উঠতে পারছিলাম না।

তারপর এলেন কবি, অর্থাৎ তাঁরই সেই কথাগুলো দেশের চিত্তে জীবন্ত করে তুলবার কালে তিনি কবি হলেন। তাঁর যে কবিত্ব তাহাও প্রথমে খুব পরিষ্কার করে আমাদের চোখে লাগে নাই, কেননা তিনি যে আদর্শ থেকে তাঁর কথা বলছিলেন আমাদের চিন্তা ভাবনার গতি ঠিক সে পথের কাছ দিয়েও যাওয়া করে নি। তাছাড়া বুঝি এই যে তিনি এক এক সময়ে, তাঁর কথার প্রয়োজন হত, তাঁর কথা বলছিলেন; তাঁর যে গোড়ার কথা কি তা আগে ধরতে পারা যাচ্ছিল না।

তার—কয়দিনের মধ্যেই তাঁর কথা কথা এগিয়ে গেল, কথাও বেড়ে গেল, সঙ্গে তাঁর থেকে তাঁর ভাবের রোহাবাও বলবান করে উঠল।

কি সে ভাব?

সে ভাব অবশ্যই রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু আছে, ভারতে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কিছু আছে, কিন্তু আসলে সেটি হচ্ছে স্বাধীনতার ভাব—যার ঢেউ আজকালকার দুনিয়ার সভ্যতাপথার লোকের মন চঞ্চল করে উঠেছে, যার আগমনী অনেকদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের ভাবের ভাবে রবির রশ্মিতে ফিরছে, যার অবতরণের পাদপীঠ যেন বলা অধিকার

শক্তিধর রোমাঁ রাঁ। তাঁর বিশাল বক্ষ বিস্তৃত করে দাঁড়িয়েছেন।

অথচ রোমাঁ রাঁ। যার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর কোন মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা বড় কথাতে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু ফলিয়ে বলেন—"মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান করছে; যা তার চারিদিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই—যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আনছে। পাথর আছে তার সামনে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; লোহা আছে মাটির নীচে, সেখানে গিয়ে সে খোঁজ দেয়; পাথরকে ঘষে মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে তাকে যন্ত্রাস্ত্র করে না নত হয়ে তাকে আপনার মত করে নিলে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্মই হচ্ছে এই, আমাদিকে পরিষ্কার "কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দও যে কেবলি উপাদিত্সা থেকে গভীর তাগিদে টেনে চায়, এ তাকে থেকে থেকেছে, সহজ থেকে কঠিনে, পরানন্দি থেকে আত্ম-অর্জনে, পূর্ণতির তাড়না থেকে নিত্যের ব্যবহারে। এমনি করে সে কী হয়েছে।" এবং উদাহরণ দিয়ে বলেন—"I doubt if the steel axe is an advance upon the flint axe. I am indifferent."

এই সমস্ত কথার যে বিশ্লেষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সেটি যে শুধু গান্ধীতে আছে রবীন্দ্রনাথে বিশ্লেষ তাতে না, এখানে আধুনিক শিক্ষিত জগতের সঙ্গে গান্ধীর মত বিরোধ বলতে পারা যায়। কেননা বৈজ্ঞানিক যুগের জ্ঞান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার, জড়-জগতের উপর মানুষের প্রভুত্ব—এ সমস্তের ভিতর দিয়ে মানুষেরই শক্তির প্রকাশ বুঝতে পারা যায়, আর বিজ্ঞানের জ্ঞানের এই সহায়তায়, মানুষের পূর্ণতার জন্য তাকে স্বরাজ মন্ত্রের জন্য যে চাই-চাই, এই বিশ্বাসই কি আমাদের শিক্ষিত জগতের চিন্তা ভাবনার ভিত্তি নয়? সমস্ত শিক্ষিত জগতের সামনে দাঁড়িয়ে গান্ধী একা বলছেন—"মানুষের হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছলে তার প্রকৃত উন্নতি হয় কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।" অথচ সমস্ত শিক্ষিত জগতের মত তিনি ill solution of this issue is বলেন। তিনি নিজেও সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিষয়ে তিনি নন। যা হচ্ছে আর যেসব লোকের স্বাধীনতা তাদের বর্তমান ভাবে এমন আচ্ছন্ন করে তুলেছে তিনি।

এই রকমের অনেক প্রশ্নই মনে জেগে, অনেক কথাই মনে আসে। কেবলি মনে তোলপাড় করে যায়—গোটা মানুষের উপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন যাই হোক না কেন, নিজ বিশ্বাসের জোর ছিল। আপনার কাছে কখনো হেরে তিনি তাঁদের অনেক যোক্তিকে মেনে নেন নি।

২

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"সত্যের ভাক শোনবার নয়, সত্যের ডাক দেখবার। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত পরিচয় দাখিল করবে বলেই সে আপনাকে বিশ্বের কাছে উদ্ঘাটিত করতে চায়।" আমার মনে হয়েছে তাঁরও কাজের মধ্যেই তুলছে বলেছেন, তাই এই বোঝাই একদিকে মানুষ

স্বরাজের আরতি হবে না, তার জন্যে দেশের সব শক্তির আত্মপ্রকাশ চাই। সেই শক্তির জাগরণে জাতীয় প্রচেষ্টায় স্বরাজ লাভের যোগ্যতা আমাদের ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের একথা অতি মূল্যবান। ইংরেজের হাত থেকে আমাদের হাতে হাতিয়ার শাসনতন্ত্র এলেই যে আমরা প্রকৃত স্বরাজ পাব না সে জ্ঞান আমাদের অনেকেরই নাই। আমাদের অন্তঃকরণের জড়ত্ব মোহ ইত্যাদি অনেক কিছু দূর করে দিলে তবে আমরা প্রকৃত স্বরাজের সন্ধান পাব যে স্বরাজ বাইরের প্রভুত্বে নয়, আত্ম কর্তৃত্বে।

এখানে গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রকৃত মত ভেদ নাই বলাই বাহুল্য। তবু রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই স্বরাজ শুধু চরকা কেটে পাওয়া যাবে না, তাঁর বিবেচনায় চরকা কাটা আর দশটা ছোট খাটো কাজেরই এক কাজ, সবার উপরে স্থান দিয়ে করতে হবে; আর গান্ধী চরকা কাটাকেই স্বরাজ লাভের প্রধান উপায় জ্ঞান করে কবি রবীন্দ্রনাথকেও চরকা কাটতে আহ্বান করছেন। কেন? তিনি কি জানেন না যে সমাজে সবাই এক কাজ করে না বা করলে তাতে সমাজ বাঁচে না? কবির বীণা চিরকালই সমাজে বাজছে, অবশ্য নানা মূর্ছনায় নানা সুরে। বাস্তবিকই যদি সে সুর থেমে যায় তবে সমাজ দেহের রক্তের চলাচলই যে থেমে যাবে! সে যে মৃত্যুরই পূর্ব লক্ষণ!

এ সম্বন্ধে গান্ধী তাঁর নিজের একথা একটু খুলে বলেছেন,—"..... A plea for the spinning wheel is a plea for the dignity of labour. ..... There are certain things which all must do in all climes. There are certain things which all must do in certain climes. The spinning wheel is the thing which all must turn in the Indian clime for the transition stage at any rate and the vast majority for all time. .....

...God created man to work for his bread and said that those who ate without work were thieves. .... Why should I, who have no need to work for food, spin?' may be the question asked. Because I am eating what does not belong to me. I am leaving on the spoliation of my countrymen. Trace the course of every pice that finds its way into your pocket and you will realise the truth of what I write."

গান্ধীর লেখা থেকে এই কথাগুলো আমরা স্তরে স্তরে সাজালাম। আমাদের উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাস্তবিক Dignity of labour সম্বন্ধে তিনি যে আমাদের নতুন করে ইতিহাস হতে বলেছেন, মনে হয়, এইখানেই তাঁর তত্ত্বের গোড়া পাওয়া যাবে।

৫

বর্তমান জগতে বুদ্ধির পথে আমরা অনেকটা এগিয়েছি সন্দেহ নাই। কিন্তু কুসংস্কার বলতে যা বুঝায়, গান্ধীর কথা থেকে বিশেষ করে মনে হচ্ছে, সে সব একেবারে লোপ না পেয়ে নাম ভাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে লেগে চলেছে। আধুনিক সমাজে কর্মবিভাগ বিশেষ করে ইয়োরোপের অনুকরণে আধুনিক

ভারতে কর্ম্মবিভাগ, যে ভাবে চলেছে তার সবটাই ডাহা গোঁজামিল। শুধু তাই নয়; মানুষ সম্বন্ধে যে সব বড় বড় সত্যের কথা আমরা অহরহ শুনি বা লিখি তারও অধিকাংশ অর্থ-শূন্য, কেননা সে সমস্ত আমাদের ধার করা কথা নিজেদের অন্তরে তার জন্মলাভ হয় নাই। বাংলা দেশের যে কোনো লেখকের লেখার উপর চোখ বুলিয়ে যাও, দেখতে পাবে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সত্যবোধ বিশ্ব মানব বিশ্ব ভাব ইত্যাদির ছড়াছড়ি হয়েছে; অথচ একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর, দেখবে, পৌনে ষোল আনা লেখকের বেলায় এ সব আস্ত ফাঁকি, তারা নিজেরাই এসবের মাথা মুণ্ড কিছু বোঝে নাই। কথায় কথায় আমরা যেমন আল্লা হরি ভগবান রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করি অথচ এসবের সঙ্গে আমাদের কার যে কি সম্বন্ধ তার বিন্দু বিসর্গও বুঝি না, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদের দোহাইও তেমনি আহাম্মকের মত দিই, এই সব বড় কথাও আমরা সেই ভাবেই ব্যবহার করে থাকি। এও এক ফ্যাশান, অথবা সত্য কথা বলতে গেলে—কুসংস্কার।

আমাদের বুদ্ধির এই মোহ শুধু এই খানেই থেমে যায় নাই। আজকালকার জগতের বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দিনেও অনেক বড় বড় ব্যাপারে এই মোহ দেখতে পাওয়া যাবে। আধুনিক রাজনীতি অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সমাজ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা একটু মনোযোগ দিলেই দেখতে পাবেন কি ভাবে এ সবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভড়ং থাকলেও আসলে এ সব দুনিয়ার সবজায়গার মানুষ সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য নয়; এমন কি ইয়োরোপের মানুষ সম্বন্ধেও পুরো সত্য নয়, শুধু বিশেষ বিশেষ যুগের গোটাকয়েক সুসংবদ্ধ কথা। অবশ্য এ সবের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, অথবা অবুঝের মত একথাও বলতে চাই না যে এসব কিছুই নয়। এরও যথেষ্ট মূল্য আছে সত্য, কিন্তু যত বেশী মূল্য আছে বলে এদের দাবী তা আদৌ এ সমস্তে নাই। এই সব অবিজ্ঞানের জুলুম যাতে তেমন জবরদস্ত হতে না পারে সে জন্য পশ্চিমেও চেষ্টা চলেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই পশ্চিমের সেই অর্দ্ধ সত্যকেই বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এর একটা ছোটখাট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিছু দিন আগে English man-এ যে Indian ভদ্রলোক দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করছিলেন তাঁর লেখায়। ভদ্রলোকের পড়া শুনো বেশ আছে, বুদ্ধিও ভোতা নয়, কিন্তু এমন কতকগুলো বাঁধি গৎ তাঁকে পেয়ে বসেছে যে যতই কেন বিদ্যা ফলানো হোক না সে বাঁধা বুলির ঘোরাও থেকে তিনি আর বাইরে বেরিয়ে সত্যকে সামনা সামনি দেখতে পারছেন না। বাস্তবিক যেখানে মানুষকে দেখে তার তত্ত্বের সন্ধান করতে না গিয়ে তত্ত্বের কাঠগোড়ায় ফেলে মানুষকে বিচার করা হয় সেখানে সত্যের সাক্ষাৎ যে কিছুতেই মিলিতে পারে না, সে জ্ঞান এই বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের দিনেও আমাদের অনেকেরই নাই। আর তাতেই এই পাণ্ডিত্যের দিনেও আমরা অনেকে এমন পণ্ডিত মূর্খ।

আমাদের এই অবস্থায় গান্ধীর আশ্চর্য্য

অধ্যাত্মশক্তি আমাদের কতকগুলো সাধের সংস্কারের গোড়ায় যে কি গলদ রয়েছে তাই দেখিয়ে দিয়েছে। কর্ম্মবিভাগ সমাজে আছে, থাকাও উচিত; কিন্তু সে বিভাগ কতদূর পর্য্যন্ত হলে আমাদের মঙ্গল হতে পারে আর কতদূর হলে আমাদের অমঙ্গল হতে পারে সে চিন্তা আমরা তেমন করি কি? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা যখন পড়ি তখন তার মূলতত্ত্ব যে সব দেশে সব জিনিষ ভাল হয় না তাই বিভিন্ন দেশের জিনিষ বিভিন্ন দেশে আমদানি রপ্তানি হয়, আর এই-ই ভাল সেটা আপাততঃ ভাল বলে মনে হলেও পরক্ষণেই চিন্তা হয়—কোন্ দেশে কি হতে পারে তার সব চেষ্টা হয়েছে কি? ইতিহাস ত শেষ হয়ে যায় নাই; আজ পর্য্যন্ত যা হয়েছে শুধু তাই-ই যে আমাদের মাপকাঠি হবে তাই কি সত্য? মানুষের প্রয়োজনে তার চেষ্টায় অনেক কিছুই ত অনেক জায়গায় হচ্ছে যা আগে খুব জোরাল কল্পনায় ও ঠাওরাণ যেত না।

তাই মনে হয় মানব সভ্যতার এই বর্ত্তমান অবস্থায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের এই মোহাচ্ছন্নতার দিনে প্রকৃত কল্যাণকে পেতে হলে শুধু "কথার সাথে মিলিয়ে কথা কেবল মাত্র পুঁথি বাড়ানোর" খেয়াল কিছু ছেড়ে দিয়ে মানুষ যাতে জ্ঞান বিজ্ঞানকে ধারণ করবার উপযুক্ত আধার হতে পারে তারই চেষ্টা করতে হবে। শুধু সেই ধরণের চেষ্টায় মানুষের ভিতরের শক্তি ভাল করে জাগাতে পারলে, তাকে নিজেই সাচ্চা মানুষ হওয়ার পথে অন্ততঃ খানিকটা এগিয়ে নিতে পারলে, তবেই প্রকৃত স্বাধীনতার দ্যুতি তার বুকে জ্বলে ওঠা সহজ হবে।

৪

বর্ত্তমানে কর্ম্ম বিভাগ খুব বেড়ে গেছে, আর বড় বড় যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে লোকের সুখ সুবিধাও অনেক বেড়ে গেছে বলে আমরা বিশ্বাস করে থাকি; কেননা চোখের সামনেই ত দেখছি, আগে যে সব জিনিষ শুধু বড় লোকের ঘরেরই শোভা বৃদ্ধি করত আজকাল তা প্রায় যেখানে সেখানে পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিন্তু শুধু এই দেখাটুকুতেই চলবে না। আরো একটু বেশী করে চেয়ে দেখে আমাদের মীমাংসা করতে হবে, এতে করে বাস্তবিকই কি মানুষের সুখ সুবিধা বেড়ে গেছে, না সব শুধু চোখের ধাঁধাঁ দেখতে যেমন কাজে তা আদৌ নয়।

এর জন্য বেশীদূর যেতে হবে না। আমাদের দেশের পাটের ব্যবসায়ের কথা ভাবলেই ব্যাপারটা কিছু বোঝা যাবে। পাটের জন্য যত টাকা আমাদের দেশে এসেছে কৃষক অবশ্য তার অতি সামান্য অংশই পেয়েছে; তবু যা সে পেয়েছে টাকার হিসাবে তা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু কি হ'য়েছে সেই টাকায়? যেখানে যেখানে বেশী পাট হত সেই সব জায়গায় শুধু সাদা সাদা টিনের ঘর কৃষকের এক সময়ের স্বচ্ছল অবস্থার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র; অনেক জায়গায় তাও আছে শুধু ক্রেতার অভাবে। তবে কেউ হয়ত বলতে পারেন যে পাটের ব্যবসায়ে নানা গোলমাল এসে পড়েছে বলে কৃষকের এই দুর্দ্দশা, পাট যদি চলত তা হলে তার অবস্থা এমন ধারা হত না। কিন্তু এ সত্য কথা নয়। গ্রামের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন পাটের দরুণ যথেষ্ট টাকা

পাওয়া সত্ত্বেও যে বৎসরের পাটের টাকা সেই বৎসরেই খরচ হয়ে যেত; উপরন্তু সময় সময় কৃষকের বেশী কর্জ্জ হয়ে দাঁড়াত; কেন না ধান চাল তাকে কিছু চড়া দামে কিনে খেতে হত; এর উপর কাপড় ইত্যাদি কেনাও আছে; তাতে হঠাৎ দুটো নগদ টাকা হওয়ার ফলে তার মামলা মোকদ্দমার বহরও বেড়ে যেত, গাঁয়ের পঞ্চায়েতের বিচারে আর কুলোত না; এর উপর টিনের ঘর তৈরীর ছেলে মেয়ে অথবা নিজের বিয়ে নিকে ইত্যাদিতে বাজে খরচের ধাক্কা তার সব পুঁজি পাটা উজোড় করে তাকে ঋণ গ্রস্ত করাত। ব্যায়াম ইত্যাদির কথা আর ধরলাম না কেন না সেটা কতকটা পাটেরই বিশেষত্ব। কিন্তু পাট সম্বন্ধে মোটা মুটি এই সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে পাট কেন, জীবন রক্ষার জন্য খাওয়া আর নগ্নতা বা শীত বাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরা, নিশ্বাস বায়ুর মত এই দুই অপরিহার্য্য বস্তুর উৎপাদন উপেক্ষা করে, অথবা লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সবের উৎপাদন যাতে বাড়তে পারে বা এসব যাতে জল বায়ুর মতনই প্রায় বিনামূল্যে অথবা অল্পায়াসে পাওয়া যেতে পারে তার কোনো ব্যবস্থা না করে আর যে কোন বস্তুর উৎপাদনের দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া যাক না কেন তাতে অনিশ্চয়তা পরমুখাপেক্ষিতা এক কথায় প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের অযোগ্যতা বেড়ে যাবেই, কোনো খোজামিল কোন জোড়া-তাড়া তা রোধ করতে পারবে না। স্বদেশী যদি ভারত মিশর প্রভৃতি দেশে পুরাদমে চলে অথবা যতটা অনায়াসে চলতে পারে তাই-ই যদি চলে তবে শুধু বড় বড় কল-কারখানার আগার ইংলণ্ডের দশা কি হবে সে বিষয়ে একটু চিন্তা করলেই এসব কথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার বোধ হবে।

অবশ্য আমাদের এই সব কথা থেকে কেও যেন মনে না করেন যে আমরা কর্ম্ম বিভাগের পক্ষপাতী নই। সেটা অসম্ভব। কর্ম্মবিভাগ চিরকালই আছে চিরকালই থাকবে। প্রত্যেক লোককে যদি তার দরকারী সব জিনিষ শুধু নিজের চেষ্টায়ই তৈরি করে নিতে হয় তবে শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই কর্ম্মের অবিভাগ যেমন মারাত্মক, তেমনি আজ কালকার জগতের কর্ম্মের চুলচেরা বিভাগও মানুষের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক একজন লোক বা এক একটা কল শুধু বিশেষ এক বস্তুর উৎপাদন নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে বলে বড় বড় কলের জিনিষ দেখতে সুন্দর হচ্ছে সস্তা বলেও বোধ হচ্ছে। কিন্তু যা আমার দেহের রক্তের মত বা নিশ্বাস বায়ুর মত সব সময়ে দরকারী তা যদি রেল জাহাজ ইত্যাদি করে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আসে, শুধু তাই নয়, এর উপর ছোট বড় নানা শ্রেণীর দালালের হাত ঘুরে গুদাম ওয়ালার গুদামের ভিতর দিয়ে পাইকারি ও খুচরা দোকানদারদের হিসাব নিকাশের খাতার শুকনো পাতার নানা শোধন সয়ে তবে আমার কাছে এসে পৌছয় তবে অনেক সময়েই যে তা পাওয়ার আশায় থাকতে থাকতে আমার দম আটকে মরবার দশা উপস্থিত হবে, কখনো বা একেবারে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য

হবার কি আছে। বাস্তবিক এ সব ব্যাপারে আমরা সেই আসল কথা ভুলে গেছি—মানুষের জন্যই সব বস্তু, সেই মানুষই যদি খেটে পরে যাহাতে ভবিষ্যতে দিন গুজরান করতে না পারলো, অথবা শেয়াল কুকুরের মত অপরের উচ্ছিষ্ট চেটে কখনো বা তাও না পেয়ে আধ পেটা খেয়ে কখনো বা না খেয়ে দিন কাটালো, তবে বৃথাই এত জাহাজ ভরা গুদামভরা সুন্দর সুন্দর বস্তুর, আর বৃথাই এত কল কারখানার ঘড় ঘড় ঘ আকাশ আলোর শান্তিকে দিন রাত বিষিয়ে তুলছে। তবে তর্ক হতে পারে যে খাওয়া পরার জিনিষও বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে সস্তায় ও অল্প সময়ে বেশী করে তৈরী করা যেতে পারে। আজ কাল মহাজনের টাকায় কল চলে বলে লাভের মোটা অংশটা যায় তার ঘরে. আর কিসে তার বেশী লাভ হবে সেই বিচার থেকেই সে বস্তুর উৎপাদন কখনো বাড়ায় কখনো কমায় বলে কলে সব লোকের উপকার হচ্ছে না; কিন্তু যন্ত্র যদি মহাজন বা মহাজন-বর্গের টাকায় না চলে কোনো গাঁয়ের বা কোনো শ্রেণীর লোকের চাঁদা-করে-উঠোনো টাকায় চলে, আর তাতে সে গাঁয়ের বা সেই শ্রেণীর লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয় তবে তাতে লোকের বর্ত্তমান দুঃখ কষ্টের অনেক লাঘব হবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে 'সমবায়'-এর পদ্ধতি অবলম্বন করলে আজ কালকার বড় বড় এঁক চেটে কারবারের অত্যাচার থেকে মানুষ অনেকটা মুক্তি লাভ করতে পারবে। এই যুক্তির ভিতরে সত্য যথেষ্ট আছে। আর এতে করে যে এই কথা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা চলেছে যে যন্ত্রের নিজের কোনো দোষ নাই যত দোষ তার ব্যবহার পদ্ধতির, সে কথাও সত্য। আর বাস্তবিক বড় বড় যন্ত্রের যখন নিন্দা করা হয় তখন যন্ত্রকেই গালি দেওয়া হয় না, কেন না. সেটা আহা-মুকি—চরকা লাঙ্গল এসবও যন্ত্র—তবে মন্দ বলা হয় বড় বড় যন্ত্র যে অনর্থ সৃষ্টি করছে তাকে। সমবায়ের পদ্ধতি অবলম্বন করলে বস্তুর উৎপাদন চলতে পারে কিনা সেটও বিচার্য্য। সমূহ তান্ত্রিক (Socialistic) রাষ্ট্রে বস্তু উৎপাদনে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ নাই বলে পরিচালনার যে বিঘ্ন ঘটে সমবায়ের উৎপাদনেও কতকটা সেই গোলমাল এসে দাঁড়ায়! তবে এ দুয়ে প্রভেদ যা তাও লক্ষ্য করবার জিনিষ, যাদের সঙ্গে আমাদের সব সময়ের পরিচয় তাদের জন্য কোনো কাজ করতে সব সময় আমরা টাকা পয়সার জন্য লালায়িত হইনে। তাই সমবায়ের উৎপাদন প্রচলিত হলে অনেকদিক দিয়ে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করতে পারা যায়।

কিন্তু সেটি ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানে যন্ত্রের যে অবস্থা আর লোকের যে দশা, বিশেষ করে আমাদের দেশে এ দুয়ের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে সমবায়ের পদ্ধতিতে উৎপাদন এখন অসম্ভব! আমাদের দেশে এসব যন্ত্র তো নাই বিদেশ থেকে যন্ত্র তৈরী করবার কৌশল শিখে আনাতেও যে কত বিঘ্ন তা যে কোনো উদ্যোগী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে। এ অবস্থায়

স্বাধীনতার সত্যকে অবলম্বন করে চলতে হলে সুখ সুবিধা সস্তা ইত্যাদির মুখোস পরে যে সব আবর্জ্জনা আমাদের জীবনের গতিকে হাল্‌কা হতে দিচ্ছে না, সহজ ছন্দে তাকে চলতে দিচ্ছে না, সে সব বিসর্জ্জন দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের মূর্ত্তি-স্বরূপ চরকা অবলম্বন না করে আমাদের আর উপায় কি আছে? ইস্‌লামে এক অসাধারণ ব্যবস্থা আছে—তোমার সব কাপড় যখন অপবিত্র, পরার জন্য আর কিছুও তোমার নাই তখন উলঙ্গ হয়ে নির্জ্জনে নামাজ পড়বে তবু সময় মত নামাজ তুমি ছাড়তে পার না। স্বাধীনতাই মানুষের প্রকৃতি তার আত্মার ধর্ম্ম; তাকেও অব্যাহত রাখবার জন্যে এখন আমাদের ও তেমনি করে বড় বড় যন্ত্রের সব মোহ বিসর্জ্জন দিয়ে চরকাই গ্রহণ করতে হবে, কেন না আর কোনো ছোট যন্ত্র আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নাই যা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে আর কিছু খোরাকের যোগাড়ও করে দিতে পারে। আর একটি কথাও এখানে বলে রাখা দরকার; অল্প দিনের ভিতরে চরকার যে উন্নতি হয়েছে তাতেই কতকটা বুঝতে পারা যাবে কোনো বিষয়ে একবার মানুষের সত্য দৃষ্টি খুলে দিতে পারলে সে নিজেই কেমন করে অসাধ্য সাধন করবার পথে অগ্রসর হয়, কি করে তার সামনে সব রুদ্ধ দ্বার একে একে খুলে যেতে থাকে।

৫

বাস্তবিক যন্ত্রের অসাধারণ কড় কড় ঘড় ঘড় আর তার আশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি মানুষের দৃষ্টির সামনে এমন মোহ রচনা করেছে যে সে মোহ থেকে নিজে মুক্ত হওয়া আর তার সাথে সাথে আর দশজনকে মুক্ত করা যে সে শক্তির সাধ্য নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষকে এই মোহ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে মাত্র। কিন্তু কোনো ইঙ্গিত পাওয়া আর কার্য্যকারী শক্তি লাভ করা এক কথা নয়। তাই বর্ত্তমান সভ্যতার যে ঢের দোষ আছে তা অনেকে বুঝে আর অনেকে না বুঝে বল্‌লেও কোন্ পথে চল্‌লে যে সে দোষের হাত এড়িয়ে চলা যাবে সে সম্বন্ধে তেমন কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ কেউ বড় একটা দিতে পারেন নি। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের এই অসাধারণ পুরুষ, মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, স্বাধীনতাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে যান নি বা বর্ত্তমানসভ্যতার দোষ কীর্ত্তন করে একটা নতুন কিছু করে বাহবা নিতেও যান নি। প্রেমের পথে তিনি জগতের লোকের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন; ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ব্যক্তির মর্য্যাদাকে তিনি ধর্ম্ম সাধনার মতনই কায়-মনঃ-বাক্যে সাধনা করেছেন। সেই অসাধারণ সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ ঘটেছে তাই আজ ব্রহ্মাস্ত্রের মত বর্ত্তমান জগতের বুদ্ধির মোহকে ভস্মীভূত করবার শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই তিনি যে বলেছেন—"The message of.....Swadeshi is a message to the world," একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। উন্নতির পথে এগিয়ে চল, স্বাধীনতার ছাতি তোমার সারা দেহ মনে জলে উঠুক, জগৎ জুড়ে আজ এই চীৎকার শোনা যাচ্ছে। অথচ এই গোড়ার কথাটার দিকে মানুষের দৃষ্টি তেমন করে পড়ে নাই যে, মাটি শক্ত না হলে গাছ শিকড় গেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারবে

না, তার ফলে ফুলে বিকশিত হওয়া ত দূরের কথা ; মানুষেরও তেমনি উন্নত হতে হলে, তার সব শক্তি সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করতে হলে, স্বাধীনতার দীপ্তিতে তার সারা দেহ মনকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে তার পায়ের তলায় সোজা হয়ে দাঁড়াবার যোগ্য শক্ত ঠাঁই চাই। এই গোড়ার কথাটা উপেক্ষা করে বর্ত্তমান উৎপাদন-রীতির চোরা বালির উপর মানুষের উন্নতির গগনস্পর্শী সৌধ নির্ম্মাণ করতে যাওয়া এক বিরাট তামাসা নয় কি ?

বাস্তবিক চরকা কাটার নামে যে অসাধারণ সত্যের দিকে গান্ধী আমাদের চোখ ফিরাতে বলেছেন, কত গড়াপেটার মূল তথ্য যে তার ভিতরে রয়ে গেছে, এখন সেইটিই আমাদের ধ্যান ধারণার বিষয় হওয়া উচিত। সূর্য্যের আলো জগতের সব সৃষ্টির মূলে রস যোগায় তাই সূর্য্যের আলোই হচ্ছে জগতের অনন্ত সৃষ্টির প্রাণ ; চরকা কাটার নামে গান্ধী যে স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিকে তার দেহের রক্তের মতনই তার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর কথা সম্ভব স্বামিত্ব লাভ করতে বলেছেন, এরও অন্তরে মানুষের সব সৃষ্টি-শক্তির মূলে রস যোগাবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে।

আর দশজন পণ্ডিত মূর্খ গান্ধীর অসহযোগে চরকা কাটার শুধু ধ্বংসের চেহারাই দেখতে পারেন ; কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ, আজীবন স্বাধীনতাপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ, সত্যের অনন্ত রূপের পূজারি রবীন্দ্রনাথ যে কেন চরকার এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করলেন না, তাড়াতাড়ি ভেবে নিলেন যে ওটা আর দশটা ছোটখাটো কাজেরই এককাজ, এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে এক বিষম হেঁয়ালির মতই রয়ে গেল। তিনি বলেছেন—"একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্য জ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন, যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথামাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতু আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—জল সকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকলদিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্য দীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনো বিশ্বের কানে বাজে. আজ আমাদের কর্ম্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্ম্ম শক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না, কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ,—এবং সেই সর্ব্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেন না তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এইত ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বল্লেন—কেবল মাত্র সকলে মিলে সুতোকাটো কাপড় বোনো। এই কি সেই 'আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা' ! এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক ?"—রবীন্দ্র-নাথকে সেলাম জানিয়ে আমরা নিবেদন করচি—আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে এই-ই নবযুগের যথার্থ ডাক, যে নবযুগের লক্ষ্য স্বাধীনতা অন্তরে বাহিরে জ্ঞানে কর্ম্মে শক্তিমান নির্ভীক সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা।

আর সেই স্বাধীনতার ছন্দেই তার আত্ম-প্রকাশ।

এ কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মানুষকে চরকা কাটতে বলাতে তাকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে অতীতের সারল্যের দিকেই চোখ ফেরাতে বলা হচ্ছে; কিন্তু এর চেয়ে বড় ভুল আর হতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বাদ যতটুকু মানুষ পেয়েছে তা কি করে সে ভুলে যেতে পারে? সেটি যে তার গোটা জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু জ্ঞানের নামে যে অজ্ঞানতা বিজ্ঞানের নামে যে মোহ তার জীবন স্রোতের সামনে মরুভূমির মত ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সব দূর করে দিলেই কি মানুষের চিরকল্যাণের পথ মুক্ত করা হবে না? তার সৃষ্টির শক্তিকে সার্থকতা লাভের সবচেয়ে বড় সুযোগ দেওয়া হবে না? চরকা যে সারল্যের সন্ধানে ফিরছে তা অজ্ঞানতার সারল্য নয়; সত্যকে গভীর করে উপলব্ধি করলে যে সরলতা আমাদের সব কাজে সব চেষ্টার এক সহজ ছন্দে ফুটে ওঠে এ সেই সারল্য। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এই সত্যে দীক্ষা গ্রহণ করে আজ তাঁরই কথার আলোচনায় আমাদের এসব বলতে হচ্ছে! জানি না বাংলা সাহিত্যের উপরও এ কোন্ অভিসম্পাতের ফল।

আজ কার্লাইলের একটি কথা বারবারই মনে পড়ে যাচ্ছে—He that must toil outwardly for the lowest of man's wants, is also toiling inwardly for the highest. Sublimer in this world know I nothing than a Peasant Saint, could such now anywhere be met with. Such a one will take thee back to Nazareth itself; thou shall see the splendour of Heaven spring forth from the humblest depths of Earth, like a light shining in great darkness.—মানুষের জন্যই বস্তু বস্তুর জন্য মানুষ নয়; স্বাধীনতাই মানুষের প্রকৃতি—পূর্ণাঙ্গ বিপুল আকাশ আলোর মত স্বাধীনতা, জড়ত্ব কুসংস্কার এই সবই মানুষের সর্বস্বাপহারক, সে আচার প্রথার কুসংস্কারই হোক অথবা অর্ধসত্যের কুসংস্কারই হোক—এই সত্য যিনি আজ সূর্যের আলোর মতন দীপ্যমান করে তুলেছেন তাঁর কাজে তাঁর চেষ্টায় খোদার আশিস্ বৃষ্টি হোক।

আবদুল্লাহ্-অল্-আজাদ

সাদীর গার্হস্থ্য-জীবন

শেখ সাদী মহা সৌভাগ্যশালী কবি, তাঁহার অপূর্ব্ব কবিতা রাজি, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য,—সকল দেশের সুধী সমাজে চির-কাল স্তুতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত বেল্‌শফর লিখিয়াছেন, প্রাচ্য দেশ সমূহে সাদী এবং হাফেজের কবিতাবলী এরূপ সমাদৃত যে, যিনি তৎ পাঠ দ্বারা আপনার চরিত্র গঠিত করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ভদ্র সমাজে সম্মান লাভ দুরূহ। জামি এবং ইব্রাহিম নামক প্রখ্যাত পারসীক সমা-লোচকদ্বয় সাদীর কবিতাকে সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকের মতে সাদী পরমেশ্বর কর্তৃক প্রত্যা-দিষ্ট কবি ছিলেন। জামির ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলনা হতিফা লিখিয়াছেন, মহাপুরুষ মোহাম্মদ আপনাকে শেষ পয়গম্বররূপে প্রচার করিয়া-ছেন; কিন্তু তাদৃশ নির্দ্দেশ সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবিকুলে তিন ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম—বীর গাথার কবি ফার্দ্দৌসী, শোক গাথার কবি আন্‌ওয়ারি এবং গীতি গাথার (গজলের) কবি সাদী।

পরমেশ্বর সাদীকে কবিত্ব সম্পদে গরিষ্ঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গার্হস্থ জীবনে তদনুরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, কবিত্ব সুধা তাঁহার সংসারের সকল জ্বালার উপশম করিত; কিন্তু সাধারণ আমরা,—গার্হস্থ জীবনের কথা আলোচনা করিয়া বিপক্ষ ক্লিষ্ট হইয়া থাকি।

আমাদের প্রিয় কবি সিরাজনগরের অধিবাসী ছিলেন, সাদী উপাধি মাত্র, সাদী শব্দের অর্থ আনন্দ, তাঁহার কবিতা পাঠে দেশাধিপতি সাদ-বিন-জঙ্গির হৃদয়ে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইত জন্য তিনি কবিকে সাদী উপাধি দিয়াছিলেন। কবির প্রকৃত নাম মসলিহ্ উদ্দীন। কিন্তু তিনি জনসমাজে শেখ সাদী সিরাজি নামে পরিচিত। প্রাচীন কালে আরব দেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তা শেখ নামে পরিচিত হইতেন; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কেহ মোসলেম সমাজে প্রতিভা এবং সাধুতার জন্য শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলে শেখ উপাধি লাভ করিতেন। ফলতঃ "শেখ সাদী" আমাদের কবির উপযুক্ত উপাধি বটে।

শেখ সাদীর পিতা আব্‌দুল্লাহ্ সিরাজ নগরে একজন রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। সাদির শৈশব কাল সুখের ক্রোড়ে অতি-বাহিত হইয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার অকাল মৃত্যু তাঁহার বাল্যকালের সমস্ত সুখ অপহরণ করিয়াছিল। তিনি একটি গজলে বিলাপ করিয়া লিখিয়াছেন, যদি অনাথ বালক দুঃখে চোখের জল ফেলে, তবে কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? যদি সে বালক অশান্ত হইয়া উঠে, তবে কে তাহার সে খেয়াল সহ্য করিবে? তোমরা অনাথ বালকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন করিও; কারণ অনাথের ক্রন্দনে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠে। এক সময়ে আমি

পিতার বুকে মাথা রাখিতে পারিতাম, সে সময় আমার মস্তক মুকুট শোভিত রাজার মস্তকের ন্যায় উন্নত ছিল। একটি সামান্য মক্ষিকা আমাকে দংশন করিলে সমগ্র পরিবার ভীত হইত, কিন্তু এখন শত্রু আমাকে বন্দী করিলেও উদ্ধার করিবার জন্য বন্ধু কেহ নাই। আমি বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, এজন্য শৈশবে সহায় শূন্য হইলে কি দারুণ কষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি। সাদী স্বীয় কবিতাবলীতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ পিতার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে মাতার স্মৃতিও অতি উজ্জ্বল ছিল, তিনি গোলেস্তোর একটি গজলে লিখিয়াছিলেন, একদিন বালসুলভ চাপল্যবশতঃ আমি মাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, মা আমার, আমার কটুবাক্যে ব্যথিত হইয়া গৃহকোণে বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন, তুমি শৈশব কালের কথা ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আমাকে কটু বাক্য বলিতেছ। একজন বৃদ্ধা তাঁহার পুত্রকে ব্যাঘ্রের মত শক্তিশালী এবং হস্তীর মত অজেয় দেখিয়া ঠিক বলিয়াছিলেন, তোমার কি সেই শৈশবকালের কথা মনে পড়ে, যে সময় অসহায় শিশু তুমি, আমার বুকে মাথা গুজিয়া থাকিতে? এখন আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আর তুমি সিংহের মত বীর হইয়া উঠিয়াছ, আমাকে বর্ব্বরোচিত ক্রোধ সহকারে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে।

সাদী বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া অসহায় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যালাভের ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি বোগ্‌দাদ নগরে চিরখ্যাত নিজামিয়া শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহাকে ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে প্রতিভা বলে নানাশাস্ত্র এবং বিবিধ সুকুমার বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

শেখ সাদীর জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বিদ্যা শিক্ষায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তারপর তিনি ৩০।৪০ বৎসর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং বিদ্যাদানে যাপিত করেন। এই সময় তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার পদব্রজে মক্কাতীর্থ দর্শন করেন। তিনি একবার ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন। শেখ সাদী শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন। এরূপ সুদীর্ঘ জীবন দুর্ল্লভ।

শেখ সাদীর সুদীর্ঘ জীবন দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি পিতামাতাকে হারাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন; যৌবনে তিনি বর্ব্বর বীর হালাকুর হস্তে শিক্ষা, শোভা এবং সম্পদের কেন্দ্রস্থল সমগ্র এসিয়ার ললামভূত এবং নিজের শত কৈশোর স্মৃতি জড়িত প্রাণ প্রিয় বোগ্‌দাদের ধ্বংস দেখিয়া গভীর শোকে অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন; সে অশ্রু জল তাজি নামক শোক গাথায় সমুজ্জ্বল মুক্তা রাশির আকার ধারণ করিয়াছে।

শেখ সাদী বোগ্‌দাদের ধ্বংসের পর জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দাম্পত্য জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম পত্নীর বিবরণ আমরা গোলেস্তান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি দামস্কাস নগরে বাস করিতে

ছিলাম, তথাকার বন্ধুদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পবিত্র তীর্থ জেরুজিলাম গমন করি এবং সেখানে নির্জ্জনবনে বাস করিতে থাকি। ইহার পর ফ্র্যাঙ্কদের হস্তে বন্দী হই। তাহারা আমাকে কতিপয় ইহুদিসহ টিপলিতে মৃত্তিকা খনন কার্য্যে নিযুক্ত করে। এই সময় আলিপোর একজন সামন্তের সহিত আমার দেখা হয়। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, একি! কিরূপে তোমার এ দশা হইল? আমি উত্তর করি, কি বলিব? আমি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে, পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, পরমেশ্বরই আমার ভরসা, আর কোন ভরসা নাই। আমি পশুতুল্য লোকের সহিত একত্র বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমার কি দশা হইবে, তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। অপরিচিত লোকের সঙ্গে উদ্যানভ্রমণ অপেক্ষা সহচরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস সুখকর। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হন এবং দশ দিনার দিয়া ফ্র্যাঙ্কদের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করেন। তারপর আমাকে গৃহে লইয়া যান এবং একশত দিনার যৌতুক সহ তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমি শীঘ্রই এই রমণীকে কলহ-পরায়ণা এবং দুর্ম্মুখী বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহার ক্রূর স্বভাব এবং দূষিত বাক্য ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, তাহাতে আমার সমস্ত গার্হস্থ্য সুখ বিনষ্ট হইয়া গেল। শাস্ত্রে স্ত্রীর লোকের কলহ কারিণী পত্নী ইহলোকেই নরকের সৃষ্টি করে, হে প্রভো! দুর্দ্দান্ত গৃহবাসিনীর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, সাবধান কর। যন্ত্রণা, নরক অথবা অগ্নি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। একদিন এই রমণী যথার্থ ভাবে তিরস্কার করিতে করিতে আমাকে বলিল, আমার পিতা কি তোমাকে ফ্র্যাঙ্কদের হস্ত হইতে দশ দিনার জরিমানা দিয়া মুক্ত করেন নাই? আমি উত্তর করিলাম, তুমি সত্য বলিয়াছ, তিনি আমাকে দশ দিনার দ্বারা বন্দীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার নিকট একশত দিনারের জন্য দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি যে, একবার একজন শ্রদ্ধাভাজন এবং শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যাঘ্রের কবল হইতে একটি মেষ শাবককে উদ্ধার করিয়াছিল। কিন্তু তারপর সেই রাত্রিতে নিজেই তাহার গলায় ছুরি বসাইয়া দিয়াছিল। ইহার পর মেষ শাবকের আত্মা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে, তুমি আমাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তুমি নিজেই আমার সহিত ব্যাঘ্রের মত ব্যবহার করিয়াছ।

শেখসাদী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী সম্বন্ধে স্বীয় কাব্যে কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কবিতাবলীর স্থানে স্থানে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে যেরূপ বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, এই পত্নীও তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, স্ত্রী জাতির পরামর্শ গ্রহণ অসঙ্গত। আর একস্থানে লিখিয়াছেন, পত্নীর পরামর্শ শ্রবণ করিও, তারপর তাহার পরামর্শের বিপরীত কাজ করিও। পুনশ্চ, প্রতি বসন্তকালে অথবা

নববধূ নূতন পত্নী গ্রহণ করিও, কারণ গত বৎসর দুর্ব্বৎসর গিয়াছে

শেখসাদী পত্নী লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। বন্ধু লইয়াও তাঁহার অদৃষ্টে অসুখ ঘটিয়াছে। একবার তিনি বন্ধুবর্গের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া শান্তি লাভের আশায় তীর্থস্থান জেরুজিলাম গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল। তৎকালের প্রায় সমস্ত কবি এবং সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁহাকে সরল ও নিরীহ দেখিয়া ইহারা অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার অন্তরে ব্যথা দিয়াছেন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সিরাজ নগরীতে হাকিম নিজারীর সঙ্গে একবার তাঁহার দেখা হয়। অল্প কালের আলাপেই দুই জনের মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মে। সাদি তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া যান এবং নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত এবং প্রীত করেন। ইহার কিছু দিন পরে নিজারীর বাসস্থান খোরাসানে আবার তাঁহাদের দেখা হয় এবং সাদী নিজারীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সাদির অমিতব্যয়িতার প্রত্যুত্তর স্বরূপ নিজারী তাঁহাকে প্রথম দিন এক পেয়ালা গরম দুধ এবং রুটি, দ্বিতীয় দিন, এক পাত্র মাছের ঝোল এবং তৃতীয় দিন কিঞ্চিৎ মাংস আহার করিতে দেন, তারপর তাঁহাকে বলেন, এইরূপ আহার্য্য দ্বারা আমি দীর্ঘ দিন আতিথ্য সৎকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি আমার আহারের জন্য যে প্রকার আড়ম্বর করিয়াছিলেন, তাহা অল্প দিন রক্ষা করাই কঠিন। কিন্তু নিজারী মন্তপ, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, ও সুখ বিলাসী ছিলেন, আর নিতাচার, সংযম এবং নীতি পরায়ণতা সাদীর চরিত্রের ভূষণ ছিল।

চতুর্দ্দিকের দুর্ব্ব্যবহার এবং অপ্রীতির মধ্যে একবার সাদীর অদৃষ্টে বিদ্যুচ্ছটার মত সুখ লাভ ঘটিয়াছিল, তিনি পুত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দের আস্পদ পুত্রও অকালে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সাদী পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর লিখিয়াছিলেন, যদি এই অন্ধকার বাসে নিরাশা তোমাকে অভিভূত করে, তবে জ্ঞান লাভ কর এবং অধিকতর প্রফুল্লতার জন্য প্রস্তুত হও। গভীর রাত্রে দিবার মত উজ্জ্বল হইবার জন্য প্রার্থনা কর, সৎকার্য্যের দীপ হস্তে সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হও।

ইহার পর সাদী সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার যৌবন কাল; কিন্তু পত্নীর দুর্ব্ব্যবহার, বন্ধুর অপ্রীতি এবং পুত্রের শোক তাঁহাকে সংসারে বীত-স্পৃহ করিয়া তুলিতেছিল, এরূপ সময়ে একজন প্রাণ প্রতিম যুবক বন্ধুর মৃত্যুতে সন্তপ্ত হইয়া তিনি চিরকাল নির্জ্জন বাস এবং জীবনের সমস্ত সুখাভিলাষ দমন করিতে সংকল্প করেন।

এই সময় হইতে সাদী ফকিরের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অথবা দরবেশের মত নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। এই ভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। সাদী সরল প্রাণে লিখিয়া গিয়াছেন, আমার দুরদৃষ্ট নীরবে সহ

করিতেছি, একদা আমি অর্থাভাবে পাদুকা ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, নগ্ন পদে বেড়াইতেছিলাম, এরূপ সময়ে একজন খঞ্জকে দেখিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, পরমেশ্বরকে তাঁহার কৃপার জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলাম।

সংসারের কুটিল ভাব এবং নিজের নির্জ্জনতাপ্রিয় স্বভাব সাদীকে দরবেশ সুলভ নির্জ্জন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করিয়াছিল। কিন্তু উদরান্নের সংস্থান জন্য তাঁহাকে সময় সময় নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করিয়া জন কোলাহল পূর্ণ নগরে আসিতে হইত। তিনি বোস্তানে লিখিয়াছেন, উদরে হাত-কড়ি পরাইয়া দেয়; উদরের দাসত্ব সাধন ভজনে ব্যাঘাত জন্মায়, যদি সাদীর উদর কোন প্রকারে পৃষ্ঠের সদৃশ হইত, অর্থাৎ পৃষ্ঠের ন্যায় ভার বহন করিতে পারিত, তবে আজ আর কেহ তাহার কবিতা সমালোচনা করিত না।

সাদীর শোকদুঃখ, সাদীর প্রতিভা সাদীর সাধুতা, সমস্তই তাঁহার সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাব্যরাজি অমর হইয়া রহিয়াছে; অদ্যাপি সহস্র সহস্র নর নারীকে নির্ম্মল আনন্দ দান করিতেছে, তাঁহাদিগকে চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতেছে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

পথের আলো

১

এ ঘাটেই দেখা হ'ত তার সাথে
দুবেলা যাইতে আসিতে,
সুরভিত হ'ত তরণীর পথ
তরুণীর ফুল রাশিতে।
প্রভাতে সে ছিল উষার সুরভি
বিকালে সে ছিল সাঁঝের পূরবী,
কাঠের এ তরী সোণা হ'ত তার
অধর কোণায় হাসিতে।

২

প্রভাত রবির পুলক আলোকে
হেরিছি তাহারি মাধুরী,
সাঁঝে কালিন্দী উজলি আভায়
দাঁড়ায়ে রহিত আহরী।
আজ শুধু শুনি জল কলকল,
মলিন সাঁজের আঁখি ছল ছল,
আজ সাধ হয়, পাই যদি তারে
ভাল করে ভালবাসিতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি সংবর্দ্ধনা

সিরাজের অধিপতি সাম্‌স্‌উদ্দিন হিন্দীর সাহিত্যের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ ছিল। একদা তিনি বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট চেঙ্গিস খানকে উপহার দিবার জন্য একছত্র কবিতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। নিজে অসমর্থ হইয়া সম্রাট তদীয় বন্ধু সেখ সাদীকে এই অভাবটী পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সাদী সমগ্র পারস্যসাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া যে বয়েৎটী সংগ্রহ করেন তাহার ভাবার্থ এই :—

ঐরে কাহার প্রেমের আহ্বান
সকল সুরের মাঝে
রাত্রি দিবা আশে পাশে,
মোহন সুরে বাজে !
স্বর্গ-ভোজের দাওয়াত আজি,
সবার যেতে হবে ;
মোদের, যাত্রার শোভা দেখ্‌তে
ওরে কেউ পিছে না রবে !"

সাদীর নিকট এই বয়েৎটী উপহার পাইয়া মহামতি সাম্‌স্‌উদ্দিন অতীব প্রীত হন এবং সানন্দে ইহা তদীয় শিক্ষাগুরুকে দেখাইবার জন্য বুখার্জ্জ নগরে পাঠাইয়া দেন। সাম্‌স্‌-উদ্দিনের গুরুদেব এই একটী মাত্র ছত্র পাঠ করিয়া আনন্দে এমনই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রোরুদ্যমান অবস্থায় তিনি বলিলেন, "প্রিয় শিষ্যগণ, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন ! ধন্য সেই মহা-পুরুষ যিনি এই মহাবাণীর রচয়িতা ; ধন্য আত্মা যে এই নৈরাশ্যময় সংসার হইতে রিক্ত-হস্তে বিদায় লইবার পূর্ব্বে এমন অমৃতময় আশার বাণী শুনিতে পাইলাম। কি সুন্দর কথা ! চারিদিকে আকাশ, বাতাস মন্থিত করিয়া সকল সুরের ভিতর এলাহীর প্রেমময় আহ্বান গীতি ধ্বনিত হইতেছে, ইহাই তিনি শুনিতে পাইয়াছেন ! অলোকদৃষ্ট নন্দনে আজ বিশ্ব-বাসীর নিমন্ত্রণ, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার জন্য 'লেখন' আসিয়াছে ; হায় এই শোভাযাত্রা নয়ন ভরিয়া দেখিবে এমন লোকটী যে আর বিশ্বে বাকী থাকিবে না এই দুঃখেই কবি অধীর ! আহা কি আশার বাণী, কি মহিমান্বিত ভাব ! আমার ইচ্ছা হয় আমি এই মুহূর্ত্তে গিয়া সেই মহা কবির,—যিনি এমন গান গাহিতে পারেন, যিনি এমন করিয়া প্রেমের জন্য বিশ্ববাসীকে পাগল করিতে পারেন,—সেই মহা কবির পাদ-মূলে লুটাইয়া পড়িয়া জীবন সার্থক করি। কিন্তু হায় অদৃষ্ট ! দেহ আর পথশ্রম সহিতে পারিবে না, চরণ আর এ দেহকে সেস্থানে পৌঁছাইতে পারিবে না। যদি কেহ সাহসী থাকেন, এই মুহূর্ত্তে গিয়া সেই মহাপুরুষের সন্দর্শন করুন। আমার পক্ষ হইতে আমার নিজ পুত্রকে সেইস্থানে প্রেরণ করিতেছি। আমার হইয়া সে সেই অসামান্য সাধকের সম্বর্দ্ধনা করিবে।" বৃদ্ধের আদেশে সত্যই তদীয় পুত্র কুনিয়ায় গিয়া সেই বিশ্ববিশ্রুত সাধক-কবির সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং পিতার

আশীর্ব্বাদ ও শ্রদ্ধা তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। এই মহা কবির মৌলানা জালালউদ্দিন রুমী।

সাদী উক্ত বয়েৎটী পাঠাইবার সময় শামসুউদ্দিন হিন্দীকে লিখিয়াছিলেন—"আমি আজ আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে আমাদের ভিতর এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কবিকুলে সম্রাট স্বরূপ তাঁর শুভ আগমনে আমরা ধন্য হইয়াছি। তাই আজ আমাদের সবার অগ্রে তাঁরই অমূল্য বয়েৎটী আপনার নিকট উপহারার্থ প্রেরণ করিলাম।"

জালাল উদ্দিন রুমীর যৌবনের রচনা দ্বারা চেঙ্গিস খাঁর সংবর্দ্ধনা হইয়াছিল; কিন্তু এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে চেঙ্গিস বংশীয় সেনাপতি কাগাতু খান যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুনিয়ায় উপনীত হন, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। কাগাতু খানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে কুনিয়ার এ শক্তি ছিল না। নগরবাসীদের জীবন মরণ বিজয়ী মোগলের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছিল। কাগাতু খান প্রত্যূষে বিজয়ীবেশে নগরে প্রবেশ করিবেন এবং কুনিয়ার যাহা-কিছু মূল্যবান তৎসমুদয় লুণ্ঠন করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে; নগরবাসীরা কাগাতুর নিকট, অধীনতা স্বীকার করিয়া ও জীবনভিক্ষা চাহিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছে। কাগাতু সেই সমুদয় বিবেচনা করিতেছেন। এমতাবস্থায় রজনী ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। অবশেষে কাগাতু বিশ্রামার্থ নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু নিদ্রার ভিতর একি ভয়াবহ ব্যাপার! কাগাতু দেখিলেন, এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ রক্ততেজে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। বজ্রের ধ্বনি যত গম্ভীর নয় তত গম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ গর্জ্জিয়া কহিলেন, "দুনিয়ার অধীশ্বর আমি; তুমি এখানে কি চাও বর্ব্বর?" আরও কি তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শ্রোতা তখন কোথায়! কাগাতু ভীতিবিহ্বল মূর্চ্ছিত চিত্তে আড়ষ্টভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, কিন্তু নয়নে দৃষ্টি নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, যেন কাষ্ঠের পুত্তলিকা রঙ্গিন সাজে বসান রহিয়াছে। কতক্ষণ পরে চেতনা হইলে কাগাতু দেখিলেন গৃহে জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, শুধু একটা সুমধুর সুরভি গৃহের আলোক রাশির সহিত মিশিয়া মিশিয়া ফিরিতেছিল। কাগাতুর কুনিয়া লুণ্ঠন পর্ব্বের এইখানেই যবনিকা পতন হইল। পরদিবসই তিনি মহাত্মা জালালের সমাধিতে অর্থ প্রদান করিয়া ও কুনিয়া বাসিদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া পশ্চিম এশিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

জালাল উদ্দিন কবিতাকে সামান্য বাক্য-বিন্যাস মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন কবির প্রাণ বাঁশির স্বরূপ। যে বেণুবনে এই বাঁশরীর উদ্ভব সেইখানেরই শেখা-গান এখানে নানা সুরে ব্যক্ত করে। এ গান কখনও পার্থিব নহে।

কথিত আছে, একদিন হজরত মহম্মদ মহাত্মা আলীকে সুফী ধর্ম্মের নিগূঢ় মাহাত্ম্য ও গুপ্ত রহস্য সমূহ শিক্ষা দিয়া কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া যান। মহাত্মা আলী চল্লিশ দিন উহা গোপনে রাখিয়া পরিশেষে অন্তরে বিশেষ অস্বচ্ছন্দ বোধ

করিতে থাকেন। কিছুতেই তিনি অন্তরের ভাব দূর করিতে না পারিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিলেন এবং এক কূপের ভিতর মুখ প্রবেশ করাইয়া মনের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া আসিলেন। কালে সেই কূপ হইতে হইল এক নলবন আর সেই নলবনের কাটা সকল বেণুরই গান হইল এক অদ্ভুত রকমের। সে গান কেহ বুঝিল না; শুধু তার মাধুর্য্যেতে আরব ভূমি মোহিত হইল; ক্রমে সে সুর মহাপুরুষের কাণে উঠিল। মহাপুরুষ মহম্মদ সকলই বুঝিলেন, আলিকে কত ভৎর্সনা করিলেন; কিন্তু যাহা ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আর গোপন রহিল না। এই গল্পের কথা উল্লেখ করিয়া রুমী শিষ্যগণকে সদাই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, যাহারা কবির সুরের শুধু রসভোগ করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। কবির বাঁশরী যে গান গায় সেই গানের সত্যকে বুঝিতে হইবে তবেই তোমরা সত্যজীবনের ও পরমার্থের গোপন সন্ধান লাভ করিবে।

প্রাচ্য মনীষী মজলিস

হাফেজ, ওমর খৈয়াম, মাওলানা রুমী, নিজামুল মুলক ও হাসান সাবাহ্

(　　)

[বোগ্‌দাদ নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ—উপস্থিত খাজা-হাসান(১), ওমর খৈয়াম ও হাসান সাবাহ্]

খাজা হাসান —আজ কতদিন পরে, ভাই?

হাসান সাবাহ—চৌদ্দ বৎসর—এই দীর্ঘকাল আমাদের একত্র কেটেছে!

খাজা হাসান —হাঁ, আজ চৌদ্দ বৎসর আগে কোন্ বসন্তের প্রভাতে এই তিনটী জীবন মুকুল বোগ্দাদের নিজামিয়া বাগানে একবৃন্তে ফুটে উঠেছিল—আজ মুকুল বিকসিত হয়েছে। এই চৌদ্দ বৎসর একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র অধ্যয়ন—একই শ্রেণীতে, একই ওস্তাদের নিকট; আজ সেই অধ্যয়নের শেষ! আজ বৃন্তচ্যুত হয়ে কোথায় কের ছড়িয়ে পড়ব, ভাই!!

হাসান সাবাহ —কেন, আল্লার এই বিরাট দুনিয়া প'ড়ে রয়েছে?

খাজা হাসান —উঃ! এতদিন যারা মায়ের বুকের স্নেহের নীড়ের মত মাদ্রাসার একটী ক্ষুদ্র সুন্দর উষ্ণ প্রকোষ্ঠে একত্র বাস করেছে, আজ তারা আল্লার বিরাট দুনিয়ার কালস্রোতে কোথায় ভেসে যাবে! হয়ত

(১) খাজা হাসান নিজামুল মুলকের আসল নাম; খাজা হাসান বোগ্দাদের মন্ত্রী হইলে নিজামুল মুলক উপাধি পান।

ইহ জীবনে আর কারো সঙ্গে কারো দেখাই হবে না !!

হাসান সাবাহ—তা হবে, খাজা হাসান, আমাদের হারিয়ে যাওয়া হবে না—এই কালস্রোত উত্তিয়ে আমাদের যেতে হবে। মাদ্রাসায় একত্র পরীক্ষা দিয়েছি, পুরস্কার নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছি; সংসারেও আবার একত্রই পরীক্ষা দিব; আবার দেখা হবে, কি বল ওমর খৈয়াম!

ওমর খৈয়াম—[এতক্ষণ গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিলেন] হাঁ—না—কি বলছ, ভাই সাবাহ্?

হাসান সাবাহ্—এর পরও আমাদের আবার দেখা হবে, কি বল?

ওমর খৈয়াম—তা আমার অন্ততঃ তেমন ভরসা আছে ব'লে মনে হয় না।

হাসান সাবাহ্—কি! ভরসা নাই?

ওমর খৈয়াম—কি করে আর থাকে ভাই? [জানালা দিয়া উপরের দিকে দেখাইয়া] দেখ্‌ছ না, কি বিরাট, অনন্ত?

হাসান সাবাহ্—কি?

ওমর খৈয়াম—আসমানের নীল দরিয়া, ঐখানে হারিয়ে যাচ্ছি; কখন ডুবে যাই, পথ ভুলে কখন এ গ্রহ ছেড়ে অন্য গ্রহে চলে যাই, কে জানে?

খাজা হাসান—এই ওর পাগলামী সুরু হয়েছে। আচ্ছা যখন যাবে যেয়ো ভাই; তবে যতক্ষণ এই গ্রহটাতে আছ, চল ততক্ষণের জন্য আমাদের রক্ত বদলাবদলি করি, একের হাতের ধমনী কেটে সেই রক্ত অন্য দু'জনের ধমনীতে ঢেলে দেই—পরস্পরের রক্ত পরস্পরের ধমনীতে প্রবাহমান থেকে আমাদের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অটুট রাখবে; যদি কেউ কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে অন্য দুই বন্ধুর সাহায্য করবে।

হাসান সাবাহ্—উত্তম।

ওমর খৈয়াম—এই নাও, আমারই হাত আগে দিচ্ছি—যত রক্ত পার নেও; কিন্তু ভাই, এ আগুনের রক্ত, কেবল শিখা বিস্তার ক'রে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে, হজম করতে পারবে ত?

[তিন বন্ধু ছুরী দিয়া নিজ নিজ হাতের শিরা কাটিয়া রক্ত অদল বদল ও পরস্পর আলিঙ্গনান্তে বিদায়]

( )

[মাদ্রেস্তানের পথে—তাঁবু—নিজামুল মুলক ও একজন রক্ষী—কাল, প্রভাত।]

রক্ষী—এই দেখুন হজরত, আবার শয়ন শিয়রে সেই লহ-লাল ছোরা ও ছোরার বাঁটে ঝুলান পত্র—"সাবধান, নিজামুল মুলক, এখনও ফিরে যাও, আর এক মঞ্জিল এগিয়ে এলে তোমার লহুতে সফেদ শয্যা লাল হ'য়ে যাবে।"

নিজামুল মুলক—আজ পাহারা সব ঠিক ছিল?

রক্ষী—হজুর, আজ চল্লিশটী সিপাই লাঙ্গা তলোয়ার হাতে সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছে।

নিজামুল মুলক—তবুও আমার শিয়রে ঘাতকের ছোরা?

রক্ষী—হজুর, আগেই ত বলেছি, ফিরুন; জেনে শুনে এ আজরাইলের ফাঁদে

কে যায়? এই শেখ-উল-জবলের(১) সঙ্গে পাহাড়ের সব জিন পরীর সঙ্গে যোগ আছে, নইলে জাঁহাপানা মালিক সাহের সঙ্গে লক্ষাধিক ফৌজ রাত্রিতে শাহী তাঁবু ঘিরে ছাউনী ফেলে থাকত; তিনি ও যখন প্রথম মঞ্জিলের পথে এসে ছাউনী ফেলেন, ভোরে দেখা গেল, তাঁর শিয়রে লহলাল ছোরা গাড়া রয়েছে, নিকটেই জহরের পিয়ালা, আর ছোরার বাঁটে ঝুলান সেই একই পত্র—"সাবধান, মালিক শাহ্, এখনও ফিরে যাও, নইলে জহর-ছোরায় তোমার জান যাবে। তবে যদি নিতান্ত মৃত্যুই চাও, ব'লে দিও, কোন্ মৃত্যু—জহরের, না ছোরার?" জাঁহাপনা ছোরা দূরে ফেলে দিলেন, জহরের পিয়ালাটী একটা কুকুরকে খাইয়ে দিলেন, মুহূর্তে কুকুর ঢ'লে প'ড়ে গেল। দ্বিতীয় মঞ্জিলের পথে আরও কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হল; সারা রাত লোক লস্করের চোখে ঘুম নাই; কিন্তু ভোরে পুনঃ সেই জহরের পিয়ালা—গায়ে ঝুলান পত্র-খণ্ডে লেখা "মালিক শাহ্, যদি আর এক মঞ্জিল অগ্রসর হও, তবে আর ক্ষমা নাই; এই জহরে তোমার ঐ কুকুরের মত তোমাকে হত্যা করব।" তৃতীয় মঞ্জিলের পথে ভোরে দেখা গেল, শিয়রে পিয়ালা উপুর হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে, পত্র খণ্ডে লেখা, "আজ তওবা ক'রে নেও, মালিক শাহ্? আমি মুসলমান; কাজেই মুসলমানকে তার মৃত্যুর আগে তওবার কথা মনে করে দিচ্ছি।" মালিক শাহ্ সেদিন খাস বাবুর্চিকেও বিশ্বাস না ক'রে বোগদাদ হ'তে আনীত, তাঁর খাস কামরায় নিজ হেফাজতে রক্ষিত লোহার সিন্দুক নিজ কুঞ্জিকায় খুলে সিন্দুক বন্ধ বাদামের শরবত নিজ হাতে তৈরী ক'রে পান করলেন, আর দেরী হ'ল না, মুহূর্তেই সব শেষ হ'য়ে গেল! তীব্র জহরের জ্বালা শাহী হাকিমের সমস্ত ঔষধ আরক পরাস্ত ক'রে বাদশার লাস দুই ঘণ্টার মধ্যে পচিয়ে, গলিয়ে, গলিয়ে নিলো!

[ওমর খৈয়ামের প্রবেশ]

ওমর খৈয়াম—

রাত পোহাল, শুনছ সখি, দীপ্ত উষার
মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে
দিগ্বিদিক?
পুব গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ উজ্জ্বল
কিরণ তীর
পড়ল এসে রাজ প্রাসাদে মীনার যথা
উচ্চ শীর। (২)

কি ভায়া, আবার কি ভেবে মরছ?

নিজামুল মুলক—কে, ওমর খৈয়াম, এস ভাই। ভাবছিলাম, এ বিপুল আব্বাসিয়া সেল জুকিয়া সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি?

ওঃ খৈ—ঐ দোষেইত তুমি মারা

(১) শেখ-উল-জবল—পাহাড়ের বৃদ্ধ (সম্মানিত ব্যক্তি), হাসান সাবাহর উপাধি; তিনি আজেমস্তানের পাহাড়ে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথা হইতে মালিক সাহের রাজ্য আক্রমণ করিতেন; পত্র-মাণ করিতে জহর ও ছোরা ছিল তাহার সহায়।

(২) শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম।" তাহার অনুবাদ এত সুন্দর যে মূল পারসী রুবাইয়াত উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয় না।

গেলে! মাদ্রাসায় পড়তেও কেবল রাজনীতিরই চর্চ্চা করতে; অবশিষ্ট জীবনটাও কাটিয়ে দিলে শুধু শুষ্ক রাজনীতির দাঁতভাঙ্গা মুটভাঙ্গা খেয়েই! যার মাথায় শাহীতাজ, সে বাদশার দিব্বি ঘুম হচ্ছে, ব্যথা কিন্তু যত তোমার; অথচ দুইদিন পরে এই সাম্রাজ্য ধ্বসে খসে ধূলায় মিশে যাবে!

জামশিয়েদের সুরায় পিছল খাস দেয়ালের
খিলানমাঝ,
বাস বেঁধেছে আজকে সেথায় টিকটিকি
আর সিংহরাজ;
রাজার সেরা রাজ শিকারী বারহাম
কোথা ঘুমিয়ে রয়,
আজকে তো তার মাথার' পরে চাট মেরে
যায় ধুলা হয়। (১)

নিঃ মুঃ—না, ওমর খৈয়াম, চা'র ছত্র, কবিতার ফুৎকারে একটা জীবনের সাধনাকে এমন ক'রে উড়িয়ে দিতে ত পার না। এই যে বিশাল সাম্রাজ্য—পূর্ব্বে চীন হ'তে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে জর্জ্জিয়া হতে দক্ষিণে ইমেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত—এর সূক্ষ্ম জটীল শাসন তন্ত্র পুষ্ট করে তুলেছি এই বুকের কক্ষ হ'তে নিজ হাতে ছিন্ন করা কলিজার স্নেহের শোণিত সিঞ্চনে। তুমিত কখনও দূরপল্লীর কৃষক কুটীরে যাও নাই, সেখানে গোপন হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে কত আশা আকাঙ্ক্ষার আকুল আনাগোনা! যদি একবার সে মৌন মধুর তপ্ত বেদনার সে তীব্র আস্বাদ পেতে, তবে উন্মত্ত হৃদয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে, আপনার কলিজা আপন হাতে কেটে দশ জনকে বিলিয়ে দিতে কারণ আজ তোমার কবিচক্ষে প্রস্ফুটিত গোলাপের সে আভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছ, তখন তোমার মনে হত, গোলাপের এ আভা ত মানস-সুন্দরীর প্রণয় বাসনা স্ফুরিত রক্ত-ওষ্ঠ পুটের আভা নয়,—এ যে ব্যথিতা ধরণীর গোপন বক্ষতলের কলিজা ছেঁচা সদ্য রক্তের ছাপ; কে জানে কতদিনে রুদ্ধ ব্যথা বুক ফেটে বেরিয়ে এসেছে, তবু সে ব্যথাকে সবুজ আচ্ছাদনে লুকিয়ে রাখবার কতই না আকুল ব্যর্থ প্রয়াস! ঐ যে প্রতিদিন সন্ধ্যাকাশে মেঘের পাহাড়ে তরল আগুনের খেলা দেখ, ওকি জান? আমার মনে যে হয় জনসংক্ষুব্ধ বিপুল পৃথ্বীর ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত, নিষ্ঠুর বলবানের পদাঘাত পিষ্ট লক্ষবক্ষের দিনান্তের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস প্রস্তরময়ী হয়ে ঐ দুঃখের পাহাড় রচনা করে। দ্বাদশ বার এই সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘু'রে নিজচক্ষে প্রজাপুঞ্জের অবস্থা দেখেছি। উঃ! কি তাদের বুকভরা আশা, কি তাদের করুণ প্রার্থনা, ততোধিক করুণ কি তাদের হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত অনাবিল কৃতজ্ঞতা ধারা!! উঃ। তুচ্ছ, নগণ্য মানুষ, কীটানুকীটেরও অধম, তাকে দয়াময় এত গৌরবে মণ্ডিত করেছেন। তার একটা মুখের কথায় এত কোটী লোকের মানস সরোবরে আশা আকাঙ্খার ঢেউ নেচে উঠে!! তখন কৃতজ্ঞতার ভারে মাথা নুইয়ে পড়ে। বুক ভেঙ্গে যায়, পা কেঁপে উঠে, অলক্ষ্যে অন্তরের অন্তস্থল হ'তে আর্ত্তপ্রার্থনা-ধ্বনি কেঁদে বলে, "উঃ! এত কাছে, প্রভো,

(১) কাজি বাবুর অনুবাদ।

বেহেশ্‌ত্ ছেড়ে এত কাছে এই আমার দীর্ণ প্রতিবেশীর ভাঙ্গাবুকের তলে তোমার সিংহাসন পেতে বসে রয়েছে, আর আমি ঐ দূর বেহেশ্‌তে তোমায় পেতে খেটে মরছি; তখন আর মক্কা মদিনার তীর্থের কথা মনে থাকেনা, বেহেশ্‌ত্ তুচ্ছ বোধ হয়, সমাজের আবর্জ্জনা রাশি দূর করে পঙ্ক মগ্ন দুস্থ মানুষের হৃদয়ে আল্লাকে আবিষ্কার করতে মন পাগল হ'য়ে ছুটে বেড়ায়।

ওঃ খৈঃ—হয়ত বা তা হবে; কারণ আকাশ (১) পাতাল ঘুরে ত হয়রান হয়ে পড়লাম, গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় বেড়িয়েও আর পা উঠেনা, কিন্তু কোথাও শান্তির খোঁজ পেলাম না। এ জীবন মৃত্যুর প্রশ্নের উত্তর আমায় শুধু, কেউ দিল না—

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি
নভগ্রহে মনটা লীন
সপ্ত ঋষি যেথায় বসি
ঘুমিয়ে কাটান রাত্রিদিন
বিস্তাটা মোর উঠলে কেঁপে
কাটল কত ধাঁধাঁর ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন,
ওইখানে গোল রইল মোর! (২)

কিন্তু এখন সে জন্যও আর আফসোস নাই, ভাই, কারণ কেউ কোন দিন ও প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নাই।

পর্দ্দার ওপার কোন্ রূপসী,
কোন্ পিয়াসীর সলাজমুখ:
মর্ত্তমানব কেউ শোনে নাই,
কেউ দেখে নাই তার চিবুক;
পথের শেষ তার এইখানেতেই,
এই দুনিয়ার অন্তরুক,
হায়, এ করুণ কেচ্ছা ভবে
শেষ হলনা, রইল দুঃখ! (৩)

নিঃ মুঃ—তবে যে প্রশ্নের জওয়াব নাই, তার জন্য এত আফসোস কেন?

ওঃ খৈঃ—আফসোস নাই? ওগো, তোমার বাদশাহের এই বিপুল রাজ্যে ক্ষুদ্র একপ্রান্তে শেখুল জবল একটু অশান্তি উৎপাদন করেছে, আর অমনি তুমি তলোয়ার হাতে ছুটে চলেছ, আর আমার ইহজীবনে নিষ্ঠুরতম প্রশ্ন যে বুকের তল মথিত করে উঠে একটা জবাবের খোঁজে মাঠে ঘাটে কেঁদে বেড়াচ্ছে—

কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া
এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ,
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে,
হেথায় বা মোর কিসের কাজ?

---

(১) ওমর খৈয়াম আস্ত্রিকার জগতে কবি বলিয়া পরিচিত: কিন্তু তাঁহার যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

(২) কাজি বাবুর অনুবাদ।

(৩) ঘর পরদারে আদ্‌রার কাসেরা রাহ নিত,
জাঁতাবিয়া জানে হিচ কস আগা নিত;
খুজদর মেলে থাকে তিরা মজেল গাহে নিত
আফসোসকে ইকসনহা কোতাবিত।

কোথায় পুনঃ কেই বা জানে
ফিরতে হবে একটি দিন
উধাও সে কোন্ মরুর' পরে
হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন। (১)

তার জন্যই বুঝি শুধু আফসোস নাই ?

[জাকজমকপূর্ণ মোল্লার পোষাকে উজিরের দর্শন প্রার্থীর পরিচয়ে শেখুল জবলের প্রবেশ]

নিঃ মুঃ—[কুরসী হইতে লাফাইয়া উঠিয়া] কে ? শেখুল জবল—হাসান সাবাহ !

শেখুল জবলঃ—এ হাসান সাবাহ এসেছে, খাজাহাসান, শেখুলজবল নিরস্ত্র অবস্থায় নিজামুলমুলকের শিবিরে আসে না : কারণ তাদের দু'জনের মধ্যে যে খুনের খেলা সুরু হয়ে গেছে।

নিঃ মুঃ—তবে আরো কাছে এসে বসো, হাসান সাবাহ, উঃ ! চৌদ্দবৎসর তিনবন্ধু একত্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম, আবার আজ চৌদ্দবৎসর পরে একত্র হয়েছি ; কি আনন্দের দিন আজ ওমর খৈয়াম !

[হাফেজ ও মওলানা রুমির প্রবেশ]

কেও ? হাফেজ ? তুমিও ভাই কাছে বস ; রুমিও এসেছ ? বেশ তোমার ঐ বাঁশী খানা নিয়ে আমার বাঁ দিকে বসে যাও।

ওঃ খৈঃ—তবে আর দেরী কেন ? মজলিসই যখন ব'সে গেল, তখন একটু গুলজার হোক। সাকী, শুনছ্ না পান শালার দৈববাণী—

বলছে হেঁকে উঠের বাছা ভরিয়ে
নে তোর পেয়ালা টুক্,
জীবন সুরা শুকিয়ে না যায় আফসোসে
ফের ফাটবে বুক। (২)

শেঃ জবলঃ—ওমর খৈয়াম, মনে আছে, বিদায়ের দিন বলেছিলে, আসমানের ঐ নীল দরিয়ার কোথায় কে ডুবে যাবে ? সারা জীবন শুষ্ক গণিতের সাধনা ক'রে, নীলদরিয়ার সমস্ত জল শোষণ ক'রে-শেষে আজ বুঝি এই সুরার পিয়ালায় হাবুডুবু ? আফসোস !

হাফেজ—আমিত আগেই তা অনুমান করেছিলাম, শেখ সাহেব। ও যখন দূরবীণ নিয়ে বসে চাঁদ সেতারার রূপের নেশায় রাত ভোর করে দিত, তখনি ভেবেছি, ও বঁধুর রূপের নেশায় একদিন পড়বেই !

তখনইত বুঝছি আমি ইউসফের
ওরূপ দেখেই
স্থলের পর্দা ছিন্ন ক'রে জুলেখা
সে বের হবেই (৩)

কিন্তু দেখ ওমর খৈয়াম, তুমি শরাব শুধু চিনেছ মাত্র, পান করতে শিখ নাই ; শরাব মজলিসের জিনিস নয়, হট্টগোলের মধ্যে ওর সাধনা হয় না—চাই নিরালা জায়গা, একা, সঙ্গে শুধু জীবন সখা ; আজিকার এই প্রাতঃকালে,

এখন যখন বাগান হ'তে
বইছে হাওয়া বেহেস্তের

---

(১) কান্তিবাবুর অনুবাদ।

(২) কান্তিবাবুর অনুবাদ।

(৩) মন আজ আঁ। হমনে রোজ আফ্সুঁ কে ইউসফদাশ্ত, দানেস্তাম,
কে এন্ক আজ পরদায়ে এসমত বের্ আয়াদ জুলেখা রা।

হর-মেজাজী পিয়ারী,
　　আমি সঞ্জীবনী শরাব-ভের ; (১)

ওঃ খৈঃ—তোমারও ঠিক হলনা, হাফেজ ; ঘরের স্বল্প কোঠার মত হ'লেও হবেনা ; আর বঁধুর হাতটী অমন খালি রাখলেই বা চলবে কেন ? চাই সেই নিরালা—সহর হতে দূরে, তার একদিকে মরু, অন্যদিকে সবুজ চিক্কণ ঘাসের ময়দান, মাঝখানে কুঞ্জবীথিকা—

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা,
　　বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
　　ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় !
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
　　গুঞ্জে তব মঞ্জুস্বর,
সেইত সখি স্বপ্ন আমার,
　　সেই বনানী স্বর্গপুর !! (২)

শেঃ ফ'—গগুাহাসান, আমি শরাবের মজলিস গুলজার করতে ত আসি নাই, ভাই; আমি তোমার সঙ্গে দুটা কাজের কথা বলতে এসেছিলাম।

ওঃ খৈঃ—আমিও একদিন-বড় অহঙ্কারে ঐ "কাজের কথা" বলেছিলাম, হাসেন সাবাহ। নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে, যৌবনের দুর্দ্দম উচ্চাভিলাষে বড় গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে জ্ঞানের অন্বেষে বিশ্বের রহস্য রাজ্য অন্বেষে বের হয়েছিলাম ; কল্পনার পক্ষে ভর ক'রে অন্তরীক্ষের কক্ষে কক্ষে পরিভ্রমণ করেছি, ঐ অনন্ত নীল সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নির্ভয়ে সাঁতার কেটেছি, কিন্তু যতই এগিয়ে যাই, দেখি সম্মুখে কূল নাই, কিনারা নাই, সম্মুখে বিধাতার অনন্ত রহস্য-রাজ্য প্রসারিত রয়েছে, আরও যাই, সম্মুখে আরও অনন্ত ঘনতর রহস্য কুহেলিকা সমাবৃত বিশ্বের বিস্ময়কর বিস্তার ! ধীরে ধীরে চোখের আলো নিভে আসে, মস্তিষ্কের শক্তি স্তব্ধ হ'য়ে থমকে দাঁড়ায়, হৃদয়ের স্পন্দন মন্থরতর গতিতে চলে, হৃদয়ের দুর্দ্দম অহঙ্কার লজ্জায় মাথা নিচু করে পালাবার স্থান সন্ধান করে, সর্ব্বত্রগামিনী কল্পনার অক্লান্ত পক্ষও অবশ সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে, তার পর শাহ কায়কাউসের তখ্‌ত বাহী অক্লান্ত ঈগল যেমন কাঁপতে নিম্ন আকাশ হ'তে চঞ্চল বিহ্বল অরুণো মকিঞ্চিৎ হয়ে ঢ'লে পড়েছিল, তেমনি কল্পনা যখন জ্ঞানাভিমানীকে নিয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে, তখন ডাক পড়ে এই একদিকের শরাবের সাকীর—নিষ্ঠুর অহঙ্কার জ্ঞানকে প্রেম-ভক্তি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তুমি সে শরাবের মর্ম্মজ্ঞ। কি বলবে, মর্ম্ম হাসান সাবাহ ? তুমি একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের লোভে, কেবল তার-মত-একজন-বাদশার শরবতের পেয়ালায় জহর মিশিয়ে দিয়েছ ; আবার সেই তুচ্ছ লোভেই তুমি বন্ধুর বুকে —যে বন্ধুর বুকে তোমারই বন্ধুত্ব-স্মৃতির রক্ত আজও পেলা করে' তোমার চির-বন্ধুত্ব-প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দিচ্ছে—সেই বন্ধুর বুকে তুমি ছুরি ধরতে চাও তোমার ঐ হাতে,

(১) কর্ম্ম কে নিদমদ আজ বুর্দ্দ। বসিমে মেহেন্ত
　　মন ও শরাবে ফরাহ্‌ বখশ ও ইয়ারে চন মেহেন্ত।

(২) কান্তি বাবুর অনুবাদ।

যার নাড়ী এখনও বেজা হাসানের রক্তে টগবগ করছে ; আর আজ সেই তুমি বুঝতে চাও জমশেদের পেয়ালার গৌরব, যার আস্বাদে জমশেদের সেই বিরাট সাম্রাজ্যের জরা, ব্যাধি, রোগ শোক চির নির্ব্বাসিত হয়েছিল ?

শেঃ জঃ—ওমর খৈয়াম, তুমি আমাকে যত হীনও মনে কর, অত পাষণ্ড বোধ হয় আমি নই। সে রক্তলালের কথা আমি এখনো ভুলি নাই যদি ভুলতাম তবে এতগুলি কথা আমাকে বলবার অবসর তুমি পেতে না। তুমিও ত আমার পুরাতন বন্ধু, তোমার মঙ্গলের জন্য দুটা কথা বলার অধিকার কি আমার নাই ? বোধ হয় জান, আমি এখন একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কর্ত্তা, বোগ্দাদের খলিফার অধীনে নয় ; মিশরের ফাতেমীয় খলিফাদের নেতৃত্বে আমি ইস্‌মাইলিয়া ধর্ম্ম-মত প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেছি আমি ত তোমাদের এ শরাবের রুবাইয়াত ও পিয়ালীর গজল সহ্য করতে পারি না। যদি মুক্তি চাও, তবে শরিয়ত মেনে চল, নামাজ পড়, কোরাণশরিফ ও হদিসের অনুসরণ কর ; এ মিথ্যা উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবনটা মাটী করো না।

ওঃ খৈঃ—মাফ কর, ভাই, তোমার ইস্‌মাইলিয়া ধর্ম্ম নিয়ে তুমি থাক, আমার ধর্ম্ম নিয়ে আমি থাকি ; যদি সরল মনে উভয়ে ডাকি, উভয়ের কথাই আল্লাহ্ শুনবেন।—

মজিদ মন্দির দুইটীইত
দেখছি একই খোদার ঘর,
গির্জ্জা ঘরের ঘণ্টা আর,
মুয়াজ্জিনের একই স্বর।
গির্জ্জা, মজিদ, দেবমন্দির,
জপমালা ও তসবি গাছ,
করছে সবাই ভিন্নরূপে,
একই খোদার একই কাজ। (১)

হাফেজ :—আর যদি মুক্তি চাও, শেখ সাহেব, তবে, কসম খেয়ে বলছি, শুধু একটী পিয়ালা শরাব পান করে নিও, একদম বেহেস্তে চলে যাবে।

ওগো হাফেজ, মরণক্ষণে
শরাব শুধু একটি ঢোক,
পানশালার ও গলি ছেড়ে
অমনি যাবে স্বর্গলোক। (২)

ওঃ খৈঃ :—এর উপর যদি পার, হাসান সাবাহ, তবে মৃত্যুর দুয়ারে পা দিয়ে, তাজা লাল শরাবে তোমার শেষ গেলাসটা ক'রে নিও।—

চেতিয়ে তুলো মরণকালে
দ্রাক্ষাসুধায় প্রাণটা মোর,
মদির স্নানটা করিয়ে দিও,
ঘুচবে যবে মায়ার ঘোর,

(১) বুতখানা ও কাবাখানায়ে বসতীত,
সাকুস জদন তরানায়ে বসতীত।
অন্নার ও কলিসায়ে ও তসবিহ্ ও সলির,
হরজা কে হামা নেশানায়ে বসতীত।

(২) হাফেজা, রোজে আজল গম মকর আরি আমে,
একসর আজকু'রে খেরাবত বোয়সত কবেহেত।

পরিয়ে দিও যত্নে স্নেহে
আঙ্গুর পাতার বহির্বাস,
গোর দিও এক বাগান ধারে
সবুজ যেথায় ফুলের চাষ। (১)

শেঃ জঃ—ঐ হারামের কথাই হামেশা ভাবছ, ঐ হারাম খেয়েই তোমাদের জান যাবে। কিন্তু মনে রেখো, হাশরের ময়দানের পিপাসা এ আঙ্গুর রসে মিটবে না।

হাফেজঃ—[স্বগতঃ] এই ভণ্ডগুলার আলখিল্লার বাহার দেখে, আর মুখে লম্বা চওড়া নসিহত শুনে গা জ্বলে যায়!

ভণ্ডমৌন মোল্লাগুলার আলখিল্লার
ভার সয়না আর,
অগ্নি পূজার মন্দির কোথা? কোথায়
শরাব গোলাবদার?

[শেখুল জবলকে লক্ষ্য করিয়া] হাশরের ময়দানের ভয় দেখাচ্ছ, শেখসাহেব? আল্লাকে ভয়? ওরে, আল্লাকে যদি ভয় করব, তবে আব্বার ক'রে কাছে দাঁড়াব কার? ও ভয় তোমাদেরই মত ধার্ম্মিকের জন্য, আমাদের জন্য নয়।

ওগো সাধক, জানটা আজি সুরার তলে
ডুবিয়ে দাও,
খোদার ভয়? সে শুষ্কজ্ঞানীর দুঃখের উপর
ব্যথার ঘাও। (৩)

তুমি শরাবকে হারাম বলছ, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে কি, শেখ সাহেব, যে হিসাবের দিন যখন সূর্য্য মাথার উপর নেমে আসবে, তখন আমি আমার এই পেয়ালা চুমুক দিয়ে স্নিগ্ধ হয়ে হেসে বেড়াব, আর তোমার ঐ শাস্ত্র নয়দার শুষ্ক রুটী গলায় বেঁধে তুমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি দিবে।

ভাবছি আমি হাশর দিনে
হালাল কজি মোল্লাদের,
পারবে নাক পাল্লা দিলে
সঙ্গে মোর লাল শরাবের। (৪)

না শেখ সাহেব, এ শরাব হারাম নয়, এই-ই অমৃত—আবে হায়াত—দুনিয়ার আবে কউসর। গর্ব্বিত শাহ সেকেন্দার লোক লস্কর নিয়ে লড়াই ক'রে আবে হায়াত দখল করতে চেয়েছিলেন, তা কি হয়? এযে ভক্তের মত মাথা পেতে নেওয়ার জিনিস, সখার প্রেম-রাগ-রঞ্জিত এ রক্ত সুধা যে নিরালায় বসে এক চুমুকে নিঃশেষ করে বিভোর হওয়ার জিনিস! বাদশাহীর দেমাগে, বাহুবলের মিথ্যা গর্ব্বে, শাহ সেকেন্দর তা বুঝতে পারেন নাই। খেজের বুঝতে পেরেছিলেন, তাই নীরবে সে আবে হায়াত নিঃশেষে পান ক'রে বিভোর হ'য়ে বে'র

---

(১) কান্তি বাবুর অনুবাদ।

(২) দেলম জে সোবেরা বেগেরেফ্‌ত ও খেরকারে সালুস,
কুজাস্ত্‌ দরেরে মর্গা ও সরাবে নাব কুজা।

(৩) জাহেদা আয় বনোশ রেন্দানারা,
ফাত্তাকুলুহা ইন্না উদ্দিল আলবাব।

(৪) তরসমকে দরকাফে নাবোয়াদ রোজে বাজেখাস্ত,
নানে হালালে শেখ বেহ আবে হারামে মা

হ'য়ে গেছেন, আর শাহ সেকেন্দরের নৌকরীর তোয়াক্কা রাখেন নাই।—

জীবন—বারি—আবে হায়াত—
খুঁজছ যদি বন্ধুবর,
সেতার তালে মিষ্টি শরাব—
সোরাইখানি উজার কর। (১)

শেঃ জঃ—এখন এই দিকে একটু শোন, রেজা হাসান; তুমিও আশা করি ওদের শরাবের পিয়ালীতে ডুব দেও নাই?—আমার দুটা জরুরী কথা আছে।

নিঃ মুঃ—না ভাই, ওদের মত শরাব-মশগুল হ'য়ে মজলিস গুলজার করার অবসর আমার কোথায়? শরাবের সে লালিমা সখার মুখ স্মরণ করিয়ে ওদের বিভোর করে দেয়, সেই লালিমাই আমাকে নিপীড়িত মানবের লহু লাল বুকের কথা, স্মরণ করিয়ে আকুল ক'রে তোলে। জীবনের সকল লালসা উপেক্ষা করে, বিশ্বের সকল বন্ধন বিস্মৃত হয়ে অনুদিন তুমার অনাবিল আনন্দে মত্ত থাকার গৌরব আছে; কিন্তু এ অবহেলিত আবর্জনা-ময় নর্ত্তের দৈন্য-দীর্ণ, কলুষ-ময় জনগণের হৃদয়ের আর্ত্ত আকুলি বিকুলিতে আকুল হওয়াও অগৌরবের কথা নয় বিশ্বাস করি।

শেঃ জঃ—আমিও তাই বিশ্বাস করি; আর সেইজন্যই আমাদের সেই রক্তের ঋণটা শোধ করতে আজ এসেছি। এই নেও চার কোটা রক্ত দিয়েছিলে, চল্লিশ কোটা ফিরিয়ে দিচ্ছি। [আপন বাহুতে ছুরী চালাইয়া রক্ত দান]

নিঃ মুঃ—উঃ! হাসান সাবাস, তুমি এখনও তেমনি নিষ্ঠুর, নির্ভীক—এ ঋণ শোধের কি এমনি প্রয়োজন হয়েছে?

শেঃ জঃ—হাঁ, ভাই; কারণ আমার এই শরীরে প্রবাহমান তোমার এই রক্ত তুমিই পাত করতে যাত্রা করেছ; আমি তোমার বন্ধু; বন্ধুকে আমি নিজ হাতে নিজরক্ত পাতের পাতক হতে রক্ষা করবই।

নিঃ মুঃ—তাই যদি হয়, তবে এই নেও, তোমাকেও আমি ঋণ মুক্ত করছি, কারণ তোমার খঞ্জরই ত আগে আমার ঘাড়ে উঠেছে, আর আমারই রক্ত ধমনীতে ব'য়ে সে তুমি আমারই কলিজার রক্তে লালিত এ রাজ্যে নিরুদ্বেগে জহর ছুরিকার ব্যবসায় চালাবে, এ স্মৃতিও ত বড় সুখের নয়। [বাহুতে ছুরী চালাইয়া রক্ত দান]

শেঃ জঃ—কিন্তু তুমিইত আমাকে এ ব্যবসায় শিখিয়েছ, রেজা হাসান। মনে আছে, আমাদের সেই বন্ধুত্ব-প্রতিজ্ঞার কথা? তুমি হ'লে মালিক শাহের দক্ষিণ হাত, বোদ্দাদের উজির, ওমর খৈয়াম হ'ল রাজ জ্যোতির্ব্বিদ; আর আমি?—আমি শেখুল ইসলামের পদপ্রার্থী হ'য়ে ছিলাম, কিন্তু তোমার চেয়ে আমি ছোট ঘরে জন্ম নিয়েছি, শুধু এই অপরাধে, মালিক শাহ আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। তুমি বলবে, তুমি আমার জন্য চেষ্টা করেছিলে; কিন্তু সে কথায় ত আমি ভুলতে পারি না। তুমি এ সাম্রাজ্যের জন্য এত করেছ যে, তোমার

(১) পার বেশ। যে আবে জেবেশী ছুই,
যারে নওশি বলো মধ্যাজে রবাব।

একটি অঙ্গুলি হেলনে এ বিপুল সাম্রাজ্যের বিপ্লব বন্যা ব'য়ে যেতে পারে, আর সেই তুমি এই বৃদ্ধ অকর্মণ্য শেখুল ইসলামটাকে সরিয়ে দিয়ে আমার জন্য একটু জায়গা করতে পারলে না, এই কি আমায় বিশ্বাস করতে বল? তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এই সাম্রাজ্যের বুকের উপর একটা নূতন ধর্ম্মমত স্থাপন ক'রে তার সর্দ্দার হ'তে হ'বে; শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা নূতন ধর্ম্ম রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজ সে কাজে যে অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছি, তা বোধ হয়, আমার জ্ঞানের দুষমন নিজামুল মুলকও স্বীকার করবেন।

নিঃ মুঃ—কিন্তু দেখ, হাসান সাবাহ্—

শেঃ জঃ—না, রেজাহাসান, আর এর কোন কৈফিয়ত, জবাব শুনতে চাইনা। জানি দুনিয়ার সবে যা বলে, তুমিও তাই বলবে,—বলবে, এ জহর-ছুরিকার ব্যবস্থা কেন? কারণ বলছি,—তুমি প্রবল; অগণ্য সিপাই ফৌজ তোমার আদেশে ঝড়ের মত ছোটে, আমি নিঃস্ব, গ্রাম্য আলেম মাত্র; কাজেই ঐ গুলিই আমার অস্ত্র, তা ও গুলি ন্যায়ের বিধানে সঙ্গত কিনা বিচার করি নাই, বিচারের প্রয়োজনও বোধ করি নাই। কারণ আমি চাই বোগ্দাদের খলিফাকে শুধু এইটুকু দেখাতে যে পর্ণকুটীরেও প্রতিভা জন্মায়; আর সম্যক কদর না করলে সে প্রতিভার আগুন একটা বিরাট সাম্রাজ্যকেও জ্বালিয়ে দিতে পারে। সত্য বলব, রেজা-হাসান আমার এ ধর্ম্মমতও আমার এ বিদ্রোহ অভিযানের সঙ্গীন অস্ত্র বিশেষ। আমি চাই নাম—কীর্ত্তি, হয়ত নিজামুলমুলকও ওমর খৈয়ামের অপেক্ষাও বৃহত্তর। তোমার সিয়াসত নামা, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত বেঁচে থাকবে, আমারও বিষ ও ছুরী বেঁচে থাকবে। যুগে যুগে তোমার সিয়াসত নামা বিভিন্ন রাজ্যে শাসন শৃঙ্খল রচনা করবে, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত মজলিস্ মাতিয়ে তুলবে, আর অত্যাচারিতের হাতে আমার এই গুপ্ত ছুরিকা সেই রাজ্যের শান্তির উপর অপ্রত্যাশিত বজ্রের মত লাফিয়ে পড়বে, অব-জ্ঞাতের হাতে জহরের পিয়ালা গুলজার মজ-লিসে ছড়িয়ে প'ড়ে সকলকে জর্জ্জরিত করবে। তবে যাই ওমর খৈয়াম, তুমি তোমার ঐ শরাবের গজল নিয়ে মত্ত থাক, রেজাহাসান, তুমিও তোমার রাজ্যের চিন্তা কর; আমিও আমার কাজে লিপ্ত হই। কিন্তু মনে রেখো, ভাই, আর একটি মাত্র রাত্রি—একটি মাত্র মঞ্জিল, যদি না ফের, তবে মালিক শাহের কথা স্মরণ করো,—হাসান সাবাহ এখনও রেজাহাসানকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু শেখুলজবল নিজামুলমুলককে ক্ষমা কখ্খনোও করতে পারে না।

নিঃ মুঃ—আজই আমার তবে মাজেন্দ্রানের দিকে রওয়ানা হ'তে হ'বে হাসান সাবাহ। দুর্দ্দম শয়তান আল্লার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের ধ্বজা খাড়া করতে সঙ্কুচিত হয় নাই, কিন্তু সেই ভয়ে যদি হঠাৎ আদম শয়তানের সঙ্গে আপোষ করতেন, তবে আর তার মুক্তি হ'ত না।

শেঃ জঃ—উত্তম—আস্সালামু আলায়কুম রেজা হাসান; ওমর খৈয়াম। তোমার পেয়া-লার নেশা এখনো বুঝি ছাড়ে নাই, হাফেজ? মওলানা রুমি, তুমিও সেই বাঁশী হাতেই বসে আছ? আচ্ছা, তবে আসি।

হাফেজ—ও আলায়কুম আস্‌সালাম, কিন্তু ভাই, মাতালদের একবারে ভুলোনা।

শুনছগো শেখ? যেয়ো কিন্তু
হাফেজের সে জানাজাতে (১)
হোকনা হাফেজ মদ্য পাপে,
স্বর্গ পথে চলল সে। (২)

[শেখুল জবলের নিষ্ক্রমণ]

নিঃ মুঃ—তোমারা একটু বসো, ভাই, আমি যাত্রার আয়োজনে কুচ কাওয়াজের হুকুম দিয়ে আসছি [তাঁহার নিষ্ক্রমণ]

হাফেজ—কিন্তু দেখ ভাই রুমি, তুমি যদি মৌন বাঁশী হাতে এমনি গম্ভীর হ'য়ে ব'সে থাক, তবে আমাদের এ শরাব-মজলিস একদম বরবাদ হয়ে যাবে। বাজিয়ে যাও ভাই, বাঁশীর সুরে উচ্ছ্বসিত পিয়ালায় বঁধুর মুখের লাজ লালিমা লাল হয়ে উঠুক।

মওলানা রুমি—না হাফেজ, এ বাঁশীর সুরে শরাব পিয়ালা উথলে উঠবার নয়; এর বিরহ-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের উষ্ণশ্বাসে সমস্ত শরাব বাষ্প হ'য়ে উড়ে যাবে। দেখছ না, হাফেজ, বিরহের অগ্নিশিখা এর কলিজা পুড়ে ভস্মীভূত ক'রে অবশেষে বুক চিরে শতছিদ্র করে নির্গত হয়েছে? এ ছিদ্র দিয়ে গুমরিয়ে বের হয় এখন শুধু এর বিরহ বিদগ্ধ হৃদয়ের আর্ত্ত বিলাপ গান। যদি আমার এই বাঁশীর মত বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ-হৃদয় প্রেমিক কেউ থাক, তবে এস, এ বাঁশীর প্রাণের গান শুনতে পাবে, নইলে আর কেউ পাবে না।

সখার তরে বুকটী যাহার
দীর্ঘ শ্বাসে ভস্মসার,
সেইত আমার ব্যথার সাথী,
সেইত আমার সমজদার। (৩)

একক্ষণ কাহিনী শুনে শান্তি পাবেনা, হাফেজ, ওমর খৈয়াম।

রক্তমাখা পথের কথা
বলছে সদা বংশী মোর,
লাইলী মজনু-প্রেম-বিরহ-বিলাপ
সুরে মত্ত ঘোর। (৪)

ঐশোন, বাঁশীর আর্ত্তহৃদয়ের অনুকরণ গুমরিয়ে উঠেছে :—

শুনছ ওগো, বাঁশীর কথা?
এই শোন তার করুণ সুর,
"আর বিরহ সয়না বঁধু,
কোথায় আছ ও কোন সুদূর?
কুক্ষণে হায়! বন হতে
মোর মূলটী ছিঁড়ে আনল ঘর

---

(১) মৃতের শব সম্মুখে লইয়া তাহার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা।

(২) কদমবেরের বদায় আজ জানাজায়ে হাফেজ,
কে গায়েছ গয়কেগুনাহ্, মি রওয়াদ ব বেহেশ্ত।

(৩) সিনাহ্ খাহম শরহা শরহা আজ ফেরাক,
তা বগুইয়েম শরহে দরদে এশতিয়াক।

(৪) নায় হদিসে রাহে খুন বিকুনদ
কেস্সাহায়ে এশ্‌কে মজনুঁ মি কুনদ।

সেই হ'তে মোর করুণ সুরে
কাঁদছে ভবের থির নয় " (১)

ঐ গানই ত আমার বক্ষপঞ্জর ভেদ ক'রে মর্ম্মের তন্ত্রীতে আকুল উন্মত্ত ঝঙ্কার জাগিয়ে আমায় উতলা ক'রে তুলেছে ; পাগলের মত এ ব্যথার সাথী বাঁশীটীকে নিয়ে সখার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি—

বঁধুর কথা বলছে বাঁশী,
বন্ধু হারার বিচ্ছেদ গান
ঐ সুরে হায় টুটল আমার
নূপের লাজের ঘোমটাখান। (২)

হাফেজ— গাও, গাও, মওলনা রুমি, তোমার ঐ বিরহ-বিধুর ক্রন্দনে এ তাপিত বুক ফেটে শতধারে রক্তপ্রবাহ ছুটে বের হউক, আমি সেই কলিজা-ছেঁচা তপ্ত, তাজা লহু লাল শরবতের পিয়ালা আজ আমার সখার হাতে তু'লে দিব, কারণ এই, শীঘ্রই আমার সখা আসবে—নিশ্চয় আসবে।

সন্ধ্যা হতে এই আশ্বাসে
কাটছে আমার রাত্রিটুক,
ভোরের বায় বঁধুর প্রেমের
খোস খবরে ভরবে বুক। (৩)

যদি সখা আমার সে পিয়ালা উপেক্ষা-ভরে দূরে ফেলে দেয়, তবুও এ জান তাঁরই চরণতলে কোরবানী করে দিব—

আজকে রাতে "আনাল হক" (৪)
শিখবে লহু জমিন পর,
যদিও বঁধু ভিন্ন কর
এমন সুরের কান্না ধর। (৫)

কারণ সখার দরগাহ (৬) ভিন্ন আর আমার মঞ্জিল (৭) কোথায় ?

তোমার দ্বারের ধূলির কাজল
আঁখির আলো দিচ্ছে মোর,
ওদ্বার ছাড়ি আর কোথা যাই, হায়,
কোথা মোর চিত্ত চোর ? (৮)

সখার মিলন বাঞ্ছা ভিন্ন ত আর আমার ইহকাল পরকাল—বেহেস্ত দোজখ নাই—

তোমার-মিলন-আলোক পাতে
স্বর্গপুরী আলোকবাগ,

" (১) বেশমু আজ নায় হুঁ হেকায়েত মিকুনদ,
ওয়াজ ফুলাইবা শেকায়েত মিকুনদ,
কেজ নালেস্থঁ। তা মারা বরিদা আন্দ
আজ নাফিরম মরদওজন নালিদা আন্দ।

(২) নায় হরিফে হরকে আজইয়ারে বরিদ
পরদহায়েশ পরদহায়েমা দরিদ।

(৩) হামা শব দরি ওমেদম কে নসিমে ছোবহগাহ বা পায়ামে আশনায়ি বেনওয়াজাদ আশনায়া।

(৪) আনালহক = আমিই সত্য, আমিই খোদা

(৫) কন্দ নকশে আনালহক বর জমি খুন
হুঁ মনসুর— আয় কাশি বরদারম এমশব।

(৬) দরগাহ = মন্দির, দরবার।

(৭) মঞ্জিল = গন্তব্য স্থল, বিশ্রাম স্থান।

(৮) হুঁ কোহলে বিনশে মা খাকে আস্তানে শোমাস্ত
কুজা রওরেম যকরমা আজই অনাব কুজা।

তোমার বিচ্ছেদ দহন শ্বাসে
নরকপুরে গর্জে আগ (১)। (২)

ওমর খৈয়াম—বহু খোঁজেও সখার সন্ধান না পেয়ে নিরাশ-শ্রান্ত আত্মা এ বুকের তলে ঘুমিয়ে পড়েছিল; কিন্তু রুমি আজ আবার তোমার বাঁশীর সুর তাকে জাগিয়ে ক্ষেপিয়ে অশান্ত ক'রে তুলে যে, এখন পথ কোথায়?

তিমির পথের যাত্রী মোরা,
দীপ্ত আশার রশ্মি কই?
মর্ত্যে হ'য়ে দিশাহারা
স্বর্গপানে তাকিয়ে রই:
কর্ণে পশে দৈববাণী
"কোথাও যে নাই আলোকপথ,
অন্ধ নিয়ত চালিয়ে বেড়ায়
ভাগ্য দেবীর বিশ্বরথ।" (৩)

মঃ রুমি—নিয়তি ব'লে কিছু নাই, ওমর খৈয়াম, যা আছে, সে শুধু কর্মফল:—

কর্ম সেত মোরাই করি,
মোদের হাতেই ঘুরছে কল,
কর্মগুণে মিষ্ট কভু,
কভু হয় বা তিক্ত ফল। (৪)

আলো চাও? কেন, এই একটু চেয়ে দেখ দেখি, তারই করুণ হাসির আলোর কুণ নিত্য তোমার মাথায় ঝরে পড়ছে কিনা!

উর্দ্ধে, অধে, দক্ষিন,
বামে ছড়িয়ে আছে রশ্মি তার
জড়িয়ে আছে কণ্ঠে আমার
তারই প্রেমের আলোক হার। (৫)

তোমার ঐ উগ্র প্রেম-বাসনা তোমায় অন্ধ করে রেখেছে, নইলে তুমি সারা বিশ্ব খুঁজে সখার সন্ধান পাচ্ছনা, তুমি কে?—কোথায় তোমার অবস্থান? কার প্রাণের অনুধ্বনি তোমার বুকে স্পন্দনে অহরহ সাড়া দিচ্ছে?

বিশ্ব সেত বঁধুর বিকাশ!
প্রেম পিয়াসী পর্দ্দাবাস;
নিশ্বাসে ত বঁধুই জাগে,
প্রেমিক শুধু মোরদা (৬) লাস। (৭)

ওমর খৈয়াম—তাইত, তখন বুঝ তে পারি নাই, সেদিন নীরব নিশীথে যখন আকাশের তারার খোঁজে দূরবীণ হাতে সাগর পারে বসেছিলাম, ঝিল্লী রবের মত কাণে এল—

---

(১) আগ = আগুন।

(২) যে বাঁশে শুনলে তু ইজাদ বিলাপে রেজওয়া আব,
সে তাবে মেজরে তু দায়দ শরাবে মোজদ তাব।

(৩) কাজি বাবুর অনুবাদ।

(৪) সেক হাত ই কেয়েলে মা মোখতারে মা।
মো আজা শাহ্ মাহে মা, শাহ ইয়ারে মা।

(৫) মুরেউ দর ইসুনো ইসুরো চুহতো কওক
বর মেরো বর পরবনম মানন্দে তওক।

(৬) মোরদা = মৃত।

(৭) মোমলা মাতকাত ও আশেক পরদায়ে
মেশা মাতকাত ও আশেক মোরদায়ে।

সাগর হ'তে ছিন্ন হলেম,
　　উচ্চ কেঁদে বিন্দু কয়,
সাগর হেসে কয়, ও বোকা,
　　আমিই যে রে সর্ব্বময়। (১)

কিন্তু দেখ, রুমি, প্রেমিক যদি সব "মোরদা লাস" তবে তোমার ঐ বাঁশীর বিলাপের মত বুক ফেটে যে বেদন রাগিনী কেঁদে উঠে, ও কার?

মঃ রুমি —ও রাগিনীও সেই বঁধুর—
বাঁশীর মতই আমাদেরো
　　দুইটী মুখ, তার একখানা,
বঁধুর মধুর অধরতলে
　　রইছে ছাপা, (তা) নাই জানা,
আর এক মুখত তোমার
　　পানে চেয়ে গাইছে বিচ্ছেদ গান,
আকাশ, বাতাস কাঁদিয়ে বেড়ায়
　　তার সে অবুঝ করুণ তান।
অন্তরের চোখ ফুটলে কিন্তু
　　দেখতে পাবে পরিষ্কার,
এই মুখে যে গানটী শোন,
　　ঐ মুখে সে গানের তার, (২)
এই যে বাঁশীর কান্নাকাটী,
　　এও সে বঁধুর নিশ্বাসে,
আত্মা পাখীর আর্ত্ততানে
　　তারই আর্ত্ত বীণ ভাসে। (৩)

ওমর খৈয়াম —উঃ! কি নিষ্ঠুর রহস্যময়ী বঁধু আমার, আমারই চারদিকে ঘিরে থেকে আমারই এ দীর্ণ বুক খানাকে বাঁশী ক'রে তার বিরহের গান বাজাচ্ছে, তবু এ অশান্ত আত্মাকে একটা শান্তির কথা বলছে না!

মঃ রুমি —শান্তি? ওরে শান্তি নাই! অলস ক্ষুদ্রের, তুচ্ছ তুষ্টির শান্তিতে গৌরব কি, ওমর খৈয়াম? মিলন-পূর্ণতা বিস্মরণকারী এ দীন শান্তি যে অনন্ত কান্নার অটুট শৃঙ্খল হ'য়ে দাঁড়াবে! বরং বল, রুদ্র অশান্তির দুর্নিবার ঘূর্ণীবায়ু এ পাষাণ প্রাচীর চূর্ণ করে সসীম অসীম এক ক'রে দেক।

এই যে খাঁচায় বদ্ধ পাখী,
　　না চায় যদি উড়তে আর,
নীল আকাশের মুক্ত হাওয়ায়,
　　প্রমাণ সে তার মূর্খতার। (৪)

---

(১) কাতরা বেগুরিস্ত কে আজ বহর জুদায়েম হাস্যা।
　　বহর বয়কাতরা বখশিদ কে মায়েমহাস্যা

(২) তার=প্রতিধ্বনি

(৩) নো ঈহা দায়েম শোইয়। হামচু নায়
　　এক দমী শেবহানাস্ত দর সবহারে ওয়ায়।
　　এক দমী। নালা শোদা চুঁয়ে শোমা,
　　হায় ও হুয়ে দর কেশাশা দর সামা;
　　সেক হানদ হরদে উরা মনজরাস্ত
　　কিঁ কেশানে ই সেরে হম মাঁ। সেরাস্ত।
　　দম দমায়ে ই নায় আজ দম হায়ে উস্ত
　　হায় ও হুয়ে কহ্ আজ হায়হায়ে উস্ত।

(৪) মোরদ কু আশর কফস জেন্দানি আস্ত
　　মি না জুইয়েদ রোস্তন আজ না দানি আস্ত।

ওমর খৈয়াম—তবে এস সখা, তীব্র মধুর দহন জ্বালায় আমার কণ্ঠ আজ জড়িয়ে দাও; এস অশান্তি, এই বুকের তলে দীর্ঘ-শ্বাসের ঝড়ে তোমার বাসা বুনে নেও; আজরাইল (১) আজ তুমিই আমার সাকী, ঐ পিয়ালা ভরে আমার লহুলাল মৃত্যু মদিরায় বিভোর ক'রে তোল।

হাফেজ—মূর্খ! মৃত্যু কি আছে? ওরে, প্রেমিকের মৃত্যু নাই! ভুলে গেলে, খৈয়াম, সেই যে সেদিন পানশালার দুয়ারে দাঁড়িয়ে উভয়ে আমরা শরাব-নির্য্যাসে ললাট হ'তে মৃত্যুর ছাপ মুছে ফেল্লাম?

প্রেম-সুতে গাঁথা যে জন,
তার কি কভু মৃত্যু হয়?
মোদের অমর জীবন কথা,
কালের পটে দীপ্ত রয়। (২)

খাজা

আবু বিন্ আধাম ও স্বর্গের দূত

(Leigh Hunt)

বিন্ আধাম বা ওরফে আবু (তাঁ'র সুখ্যাতি বৃদ্ধি পা'ক্ !)
একদা উঠি' স্বপ্নক্রোড়ে নিদ্রামাঝে শান্তিময়ী,
দেখেন ঘরে জ্যোৎস্না রাশি—পদ্মফুলের পাপড়ি থাক।—
আলোতে সেই বসিয়া যেন সোনার পাতায় লিখে কে বই।

প্রশান্তি ত বিন্ আধামে তুলেছে ক'রে সাহসী বুক,
শুধান তিনি মূরতিটীরে,—"লিখিছ কি ও? বলনা ভাই।"
হাস্যরেখা অধরে টানি' স্বর্গীয় সে দূতটী চুপ,
বলেন পরে,—"তা'দেরি নাম খোদাই যা'দের পিয়ারা, ভাই!"

"আমারো নাম?"—পুছিলা আবু। "লিখিনি" কহে মূরতি সেই।
কহেন আবু মন্দ স্বরে পুলকভরা তনু সুঠাম—
"দোহাই তোমার, লও হে লিখি তালিকাটীতে লিখিছ যেই,
মানুষে যা'রা পিয়ার করে তা'দের মাঝে আমারো নাম।"

লিখিয়া লেখা লুকা'ল রূপ। পরের দিনে তেমনি ক্ষণ,
উদিল রাতে আধাম গৃহে আঁধার জ্যোতির্ময় সে দূত;
দেখান খুলি' কর্দ্দ মাঝে খোদার প্রিয় যতেক জন,
রয়েছে লেখা সবার আগে আবুর্ নাম মনঃপূত!

শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র।

---

(১) আজরাইল = যম।

(২) হাফেজ নামি রস যাঁকে দেখল দেখ শোদ বতরশ্ক সাবেতাস্ত বর জরিদায়ে আলম দওয়ামে মা।

প্রেম ও গীতি কবিতা

মেঘনাদ রচনার সমকালে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন, "আমি একটা খণ্ডকাব্য রচনা করিতেছি। "It is all about poor Radha and her বিরহ।" আরও লিখিয়াছিলেন, "আশ্চর্য হও বন্ধু, আমি তোমাদের স্কন্ধে পয়ার বা ত্রিপদী চাপাইতে যাইতেছি না।" "ইটালীর মিত্র-ছন্দকে বাঙ্গালায় আনা যায় না কি?" মধুসূদনের ন্যায় ছন্দ প্রতিভাশালী কবির পক্ষে অসম্ভব কি? বঙ্গসাহিত্যে ভারত-চন্দ্রের পর ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনই সচেতন ভাবে চলিতেছিলেন। ধ্বনির জ্ঞান এবং সঙ্গীতে পারদর্শিতা না থাকিলে এক ভাষার ছন্দকে অন্যভাষায় অবতারিত করা একেবারেই অসম্ভব। মধুসূদন বাঙ্গালার মূল ছন্দযন্ত্রকে, বঙ্গভাষার পয়ার ও লাচারীকে সংমিশ্রিত করিয়া ব্রজাঙ্গনাকাব্যের ছন্দগুলির সৃষ্টি করিলেন। এজন্য উহার প্রত্যেক কবিতাই নব নব মিশ্র-ছন্দে উল্লসিত হইতেছে।

ব্রজাঙ্গনার স্বতন্ত্র কবিতাগুলির কাঠাম (form) এবং শিল্প-প্রকৃতি (technique) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক 'ওড' হইতে অভিন্ন! কোন একটা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ, সম্বোধন বা উচ্ছ্বাস, নানা ছন্দে বা একেবারে স্বাধীন ছন্দে (vers Libers) উচ্ছ্বাসই ওডের বিশেষত্ব! বর্তমানকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'ওড' এখন নানামুখী গতি এবং প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। বঙ্গভাষায় মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার 'রাধা-উক্তি' রূপে 'ওড'কে অবতারিত করিলেন! পরে হেমচন্দ্র উহাকে বিস্তার দান পূর্বক কবিতাবলীর পিণ্ডারিক ওড'-গুলির মধ্যে উক্ত সূত্রকেই প্রকৃত শিল্প-আদর্শে অনুসরণ করিয়াছেন!

মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা ও কৃষ্ণকুমারী একরূপ এক সঙ্গেই কবির সৃষ্টিশালায় মূর্তিলাভ করিতেছিল। "কি মনে কর? ছয় মাসের মধ্যেই একটি বিয়োগান্ত নাটক, একটি কবিতা গ্রন্থ এবং একটি মহাকাব্যের আধাআধি! আর কিছু না হোক, আমাকে অন্ততঃ একটি পরিশ্রমী জানোয়ার বলিয়াই প্রশংসা করিও। বঙ্গসাহিত্যে একেবারে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর মতই উদিত হইয়া গেলাম!"

এ স্থলেও সব্যসাচীর দৃষ্টান্ত! মেঘনাদের পাঞ্চজন্য এবং ব্রজাঙ্গনার বংশী যুগপৎ বাজাইয়াছেন বঙ্গসাহিত্যের এই মধুসূদন! ভাবের দিকেও ব্রজাঙ্গনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিদ্রোহ আছে! "Poor Radha!" মধুসূদনের রাধা পুরাপুরি বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকা নহেন, তিনি মানবী। মানবীর বিরহোন্মাদ বর্ণন করাই কবির লক্ষ্য; বৈষ্ণব-কবিগণ যে রাধিকাকে গুরুর ভাবে, প্রেম-ধর্মের আরাধ্যা-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সে লক্ষণটিও ব্রজাঙ্গনায় নাই; রাধিকার

মধ্যে চিরকালের 'বিরহিনী রমণী'কে দেখিতেই কবি মধুসূদন বদ্ধ পরিকর! প্রকৃতির সঙ্গে এ রমণীর অপরিসীম সহানুভূতি বিশ্বসংসারকে আপন বিরহের দিব্যোন্মাদ-ময়ী দৃষ্টিতে গ্রহণ করাই 'ব্রজাঙ্গনা'র বিশেষত্ব! এদিক হইতে ব্রজাঙ্গনা বঙ্গ-সাহিত্যে ইংরোপীয় 'প্রেম' আদর্শের প্রথম গীতিকাব্য (Love-lyric) বৈষ্ণব-কবিগণ রাধিকা-তত্ত্বে, যেরূপ নানাদিক হইতে দৃষ্টি করিয়াছিলেন—পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন ইত্যাদি—ইহাতে তাহা নাই; কেবল 'বিরহ'। অবশ্য, মধুসূদন 'বিহার' নামে আর একটি সর্গ রচনা করিবেন বলিয়াও স্থির করেন; কিন্তু উহা সমাধা করিতে পারেন নাই কৃষ্ণ তত্ত্বের দিকে ভগবদ্ভাবে দৃষ্টি রাখার দরুণ বৈষ্ণব কবিগণের 'রাধা'র মধ্যে সময় সময় যেই সুগভীর আন্তরিকতার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাও মধুসূদনের মধ্যে কচিৎ মিলিবে! কিন্তু, এই গীতিকাব্যে মধুসূদনের সুগভীর নাটকীয় শক্তির পরিচয় আছে! মধুসূদন সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ প্রণয়িনী রাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতেই বিশ্ব-প্রকৃতিকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মেঘনাদ রচনা করিয়া মধুসূদন উক্ত প্রণালীর রচনার দিকে যেন একটু উপরতি অনুভব করিলেন—তিনি 'বীর' আদর্শের রচনাক্ষেত্রে নিজের চূড়ান্ত করিলেন বলিয়াই ধারণা হইল। এ বিষয়ে তাঁহার একটি পত্র—"কিন্তু, হয়ত মেঘনাদের পর 'বীর' আদর্শের কবিতাকে বিদায় করিতে হইল। এ ক্ষেত্রে নূতন উদ্যম মাত্রেই আমার পক্ষে পুনরুক্তি ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কিছুই হইবে না! তবে, আমার সম্মুখে রোমান্টিক এবং গীতি কবিতার সুবিস্তারিত ক্ষেত্রই দেখিতেছি! গীতি কবিতার দিকে আমার একটা ঝোঁকই বুঝিতেছি।" এ সূত্রেই ব্রজাঙ্গনার সৃষ্টি। তাঁহার রাধা প্রমীলারই সহোদরা—মানবী। বীরাঙ্গনা কাব্য কিঞ্চিৎ পরে (১৮৬২) রচিত হইলেও, ব্রজাঙ্গনা কবির 'বীরাঙ্গনা'গণেরও সহোদরা; এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান শক্তিও নাটকত্ব!

সুতরাং, প্রসঙ্গ সূত্রে বীরাঙ্গনার রীতি-বিষয়ও চিন্তায় না আসিয়া পারে না। মধু-সূদন যখন নারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তদ্-ভাবেই ভাবুক হইয়া, এবং একরূপ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াই উহা সম্পাদন করেন। বীরাঙ্গনাতেও কবি ভিন্নভিন্ন রমণীচরিত্রে সুতীক্ষ্ণ সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। অমিত্রচ্ছন্দের সমাধান বিষয়েও বীরাঙ্গনা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে! প্রবল অহমিকা-তত্ত্ব এবং নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উন্মাদিনী রমণী বলিয়াই উহাদের 'বীরাঙ্গনা' নাম সার্থক হইয়াছে! অবশ্য, বলিতে হয় যে, ওভীদের Heroic Epistles এবং পোপের Epistles এর পথেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের নামতত্ত্ব এবং প্রকাশের প্রণালী লাভ করেন। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে তিনি উহাকে সম্পূর্ণ অভিনবরূপে এবং মৌলিক ভাবেই সমাধা করিয়াছেন! ভারতীয় আর্য্য সমাজের যে অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ংবরা' হইতে জানিতেন, সমাজের যে গৌরবময় অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ং তত্ত্ব' পরিচালন করার

উপযোগী শিক্ষা এবং বিশ্বস্ততা উপার্জ্জন করিতেন, মধুসূদন তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন! এরূপ সমাজ হইতে রমণীর স্বয়ংশক্তি এবং বীরাঙ্গনা তত্ত্ব লাভ করিবার যোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে? অবস্থা গতিকে যেমন স্ত্রীজাতির তেমন পুরুষ জাতির স্বয়ংকর্ম্ম এবং স্বাতন্ত্র্য তত্ত্বকেও নানাদিকে সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করা সমাজ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় অধীনতার এবং বিপরীত-ধর্ম্মী রাজশক্তির আধিপত্য গতিকে সমাজের শক্তি হ্রাস এবং অধঃপতন হইতেই এ অবস্থা এবং নির্দ্ধারণা সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় সম্মান এখন কেবল নিজের সমস্ত আট ঘাট এবং সদর ও অন্দর দরজা বন্ধ পূর্ব্বক দুর্দ্দিনের মহানিশা যাপন করিতেই যেন নিরত আছে। 'বীরাচারী' রমণীগণের লুপ্ত স্মৃতি সচেতন করিয়া তৎসঙ্গে সহানুভূতির পথে সমাজের বিলুপ্ত গৌরবের স্মৃতিবুদ্ধি পরিস্ফুট করাই হয়ত একদিকে মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে উহাও হয়ত একটা গুপ্ত বিদ্রোহ যা হোক কবি এ ক্ষেত্রে অপরূপ ভাবেই সাফল্য সিদ্ধি করিয়াছেন। যে দিকেই হউক, এসমস্ত বীরাঙ্গনার সঙ্গে সহানুভূতি না করিয়া যায় না।

এস্থলে আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 'প্রেম' কবিতার আদর্শও প্রথম আমদানী করিয়াছে এবং ব্রজাঙ্গনা অন্ততঃ একদিকে পরকালের নানামুখী 'প্রেম' কবিতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। আরও বুঝিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যগন্ধ সত্ত্বেও ব্রজাঙ্গনাকাব্য অন্যদিকে ভারতীয় আদর্শের—বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা। ফলতঃ এরূপ বৈষ্ণবগুণ সত্ত্বেও উহা পাশ্চাত্যভাবের সংমিশ্রতা সংঘটন করিয়াই পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যেই হয়ত একটা দোষের ও অতর্কিত জন্মদাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এই অবস্থান এবং স্বরূপ লক্ষণ প্রত্যেক সাহিত্য রসিককে নিবিষ্ট ভাবেই বুঝিতে হয়।

যেমন বলিয়াছি, ব্রজাঙ্গনা নিদানতঃ বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা। বৈষ্ণব আদর্শে স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই 'রাধা'ত্ব এবং রাধিকা-ভাবের সাধক। বিশ্বের চরম 'সচ্চিদানন্দ'তত্ত্বকে 'শ্যামসুন্দর'রূপে পরিকল্পনা পূর্ব্বক উহাকেই স্বামী এবং প্রাণ-নাথ এবং পরমার্থরূপে বৈষ্ণব স্ত্রীপুরুষগণ এ সাধনা করেন; বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রাচীন সহজিয়াগণের সমসূত্রে এরূপ 'প্রেম' সাধনাই সমধিক উজ্জ্বল। সুতরাং, বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে যাহাই গান করুন না কেন, তাঁহাদের বাক্য অধ্যাত্মতার গন্ধ ছাড়াইয়া গিয়া যতই জড়তাগন্ধী হউক না কেন, অথবা কামগন্ধী হউক না কেন সমস্তকে চূড়ান্তে সেই 'রাধাচরণে নৈবেদ্য' রূপে গ্রহণ করিতে এবং ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব কবিতামাত্রের এই 'নৈবেদ্য' লক্ষণ না বুঝিলে আমরা 'বৈষ্ণব আদর্শ' কিছুই বুঝিলাম না। এখন, মধুসূদন খৃষ্টানকবি হইলেও, এবং তাঁহার কবিতায় বৈষ্ণবী আধ্যাত্মতা সবিশেষ উজ্জ্বল না হইলেও, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অকপট রাধা

'মুখশ' এবং কৃষ্ণকামিনী রাধিকার সমস্ত ভ্রূ-বিলাস এবং প্রেমোন্মাদ যে বৈষ্ণব লক্ষণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনামুখী কবিতা তাঁহার বাঙ্গালিত্ব, এবং বাঙ্গালিত্বের মধ্যেও আবার বঙ্গীয় বৈষ্ণবী প্রকৃতির প্রভাব এবং শিক্ষতাই প্রমাণিত করিতেছে! প্রেমের বুলি ধরিতেই, 'ইউরোপীয় প্রেম' তন্ত্রী খৃষ্টান কবির পক্ষেও যে 'রাধা' প্রকৃতির বশ্যতা অপরিহার্য্য হইয়াছে—এস্থলেই বঙ্গে বৈষ্ণব আদর্শ-প্রাবল্যের প্রমাণ এবং কবির 'বাঙ্গালী বৈষ্ণব'ত্বের লক্ষণ। সেইরূপে, রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংহের পদাবলী—কবি স্বয়ং উহাকে যতই 'ন্যুক্কা' মনে করুন না কেন—একটা অনামান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং বৈষ্ণব তন্ত্রের কাব্যগ্রন্থ! বুঝিতে হইবে, মুখ্য ভাবে পাশ্চাত্যশিক্ষিতা এবং 'ব্রহ্মবাদিনী'র মধ্যেও বাঙ্গালীবৈষ্ণবতন্ত্রের ওই রাধা-মুখশ এবং রাধারীতি প্রবল এবং উজ্জ্বল না হইয়া পারে নাই! উহার পর, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মমুখী কবিতা এবং ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতে, বলিতে গেলে বাঙ্গালীর ব্রহ্মসঙ্গীত গুলিতেই, আত্মনিবেদনের 'বৈষ্ণবী ধারা' কীর্ত্তনী রীতি এবং রাধামুখিতাই উজ্জ্বল হইয়াছে! সুতরাং উহাদের রাধা-মুখশ বা স্ত্রী-মুখীতাও যে সঙ্গত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়! এস্থলে আরও বলিতে পারি যে, 'ব্রহ্মপদ্য' রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিও রাধা-রীতি অবলম্বনেই উহার 'অঞ্জলিত্ব' এবং প্রধান ভাব তত্ত্বটুকু সিদ্ধি করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবীয় 'মধুর' রস অবলম্বনেই ইয়োরোপের খৃষ্টানগণের সমক্ষে—ভগবানের প্রতি 'পিতৃ'-ভাব সাধক খৃষ্টানগণের সমক্ষে—অপরিচিত ভাবপন্থার বোধ্যমধুর এবং রহস্যমধুর (mystic) কবিতারূপেই অতুলনীয় শক্তি-সিদ্ধি করিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্য রসিকের সমক্ষে এরূপ 'সুদূরতা' এবং 'অস্পষ্ট মধুরতা'র মধ্যেই উহার প্রধান শক্তি।

কিন্তু, দেখিতে হয় যে, এ সমস্ত সংসার ভাবের 'প্রেম- কবিতা নহে; এবং এই রাধা-রীতির 'মধুরতা'ই যেমন বাঙ্গালী প্রেমকবিতার প্রধান শক্তিস্থান, তেমন উহার পতনস্থান এবং দৌর্ব্বল্যস্থানও এ স্থলেই আছে! আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরুষ কবিগণের অধিকাংশ 'প্রেম' কবিতা এরূপ পতনস্থানই প্রমাণিত করিতেছে! পুরুষকবিগণও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাধা-মুখশ ছাড়িতে জানিতেছেন না; এবং বৈষ্ণবত্বের বাহিরে উহা যে কি অনর্থময়, বেরসিক পদার্থ তাহাও বুঝিতেছেন না। ঐ সমস্ত যেমন বৈষ্ণব কবিতা হইতেছে না, তেমন প্রেমের কবিতাও হইতেছে না; হইতেছে কেবল অ-প্রেমের কবিতা—অবৈষ্ণব বা ভক্তি-বৈষ্ণব কবিতা!

যেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবতন্ত্র নাই, নৈবেদ্য লক্ষণ নাই, কেবল সংসার ভাবের প্রেম কবিতা—পরিষ্কার স্ত্রীপুরুষের মিলন বিরহ সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ আকুলতা এবং অভিসারের কবিতা, সেখানে রাধা-মুখশ এবং রাধারীতি! আমাদের পুরুষ 'প্রেমিক'গণের মুখেও রাধারীতি আমরা পূর্ব্বতন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, 'আমরা প্রেম জানি না" আমাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেহ কেহ তর্ক এবং আপত্তি জানাইয়াছেন। এস্থলে

আমাদের দৃষ্টিস্থান হইতে কথাটাকে বুঝিয়া লউন! পুরুষের মুখে স্ত্রী-মুখর পরা' স্ত্রীভঙ্গিমার কবিতা! উহা ত 'প্রেম' প্রকাশের সহজ রীতি নহে—সত্য প্রেম প্রকাশের পদ্ধতিও নহে! উহা কি করিয়া আমাদের আধুনিক প্রেম কবিতায় এত প্রবল এবং উজ্জ্বল হইল! আরও দেখিয়া লউন, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার রাধা-মুখরের মধ্যেই আমাদের 'প্রেম' কবিতার প্রথম (১) পতনের ওই আদি সূত্রটি! যদিও মধুসূদনকে আমাদের আত্মবিস্মৃতি এবং অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না! স্বয়ং বৈষ্ণবী রীতির মধ্যেই হয়ত বি-চেতন ব্যক্তির জন্য এ সঙ্কটস্থান গুপ্ত আছে!

অবৈষ্ণব বা 'ভাক্ত বৈষ্ণব' কবিতা কাহাকে বলিব? যেখানে রাধার ভূমিকা মাত্র আছে, মেয়েলী ঠাট এবং 'ভরং' টুকু আছে, ত্রৈণ আকার ইঙ্গিত চেষ্টিত এবং ভঙ্গিমা আছে, মেয়েলী হাবভাব চোরাকটাক্ষ চাপারীতি এবং আঁচলের বাতাস আছে, পরকীয়া পতিতা বিপ্রলব্ধা অথবা অভিসারিকার আলোক-ভয়াতুর আকুলিবিকুলির এবং কথাবার্তার প্রণালী আছে, গুপ্তপ্রেমের দিবাভীত আকুলিবিকুলির অবলম্বন যূথি-যূতি-মল্লিকা কোকিলা ভোমরা মলয়া এবং জ্যোৎস্না আছে—অথচ কৃষ্ণ নাই! কৃষ্ণের পদে কবি স্বয়ং। একটু নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলেই স্পষ্ট হইবে, কৃষ্ণের পদে আর কেহ নহে স্বয়ং কবি। এ স্থলে পাঠক, আর একটু নিবিষ্ট দৃষ্টিতেই দেখিবেন, আটের ক্ষেত্রে-কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রেই উহা কত বড় অনাচার! সাংসারিক প্রেমনীতির ক্ষেত্রে যেমন কবির আত্মপক্ষে, তেমন পাঠকের পক্ষেও কত বড় পাপাচার!

পুরুষ কবিগণ স্ত্রীমুখে—আপনার মন হইতে একটা স্ত্রী খাড়া করিয়া —আপনাকেই 'ভালবাসিতেছে'! আপনার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য, কবিত্ব অথবা গুণিত্বকে পূজা করিতেছে। আত্মবিলাসে অহমিকা বিলাসে রত হইয়াছে—এবং পাঠককে সহপথিক করিতেছে! আমাদের এরূপ 'প্রেম-কবিতার' একটি স্ত্রীলোকই বক্তা উহা স্ত্রীকর্তৃক পুরুষ পূজা! স্ত্রীলোকটি পুরুষটাকে কতমতে কাকুতিমিনতি স্তুতি আরতি আলিঙ্গন এবং বন্ধন করিতেছে কেবলি বলিতেছে "ওগো" প্রিয়তম, আমি তোমাকে যে ভাল বেসেছি আমার সেই অপরাধ "কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা" বলিতেছে তুমি আমারি গো তুমি" আমারি পায়ে পায়ে লোটাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে "লহ লহ মোরে," কিন্তু পুরুষটি নিশ্চল নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত শান্ত ভাবে বসিয়া ওই পূজা গ্রহণ করিতেছে। ভুলেও কদাপি মুখে আনিতেছে না "আমি তোমারি"! পুরুষটির মধ্যে কোন প্রকার আত্মবিতরণ, আত্মনিবেদন অথবা প্রেমে আত্মবিস্মৃতির লেশগন্ধও নাই। মনুষ্যত্বের সাধনক্ষেত্রে কোন প্রেমের প্রধান মাহাত্ম্য কোথায়?—মানুষকে স্বার্থবিস্মৃতির এবং আত্মোৎসর্গের পথে উন্নয়নে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেম-উপাখ্যান অথবা কবিগণের আত্মপ্রেম কাকলীরই বা সাফল্য কোথায়? মানুষ কেন ব্যক্তি বিশেষের পিরীতি কচকচি শ্রবণ করিবে? জীবনতন্ত্রে কোন নৈতিক

সূত্রে উহার সার্থকতা? উহার প্রধান সার্থকতা কি এই নহে যে—সৌন্দর্য্যের এবং আনন্দের পথেই উহা মনুষ্যকর্ত্তৃক স্বার্থশৃঙ্খল-ভেদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হৃদয়কে মহত্তর আত্ম-ধর্ম্মে উন্নীত করে? হৃদয়কে উচ্চতর স্বাধীনতার শিখরে, দিব্যভাবে উপনীত করে? প্রত্যেকের সহজ পথেই অনুত্তম লোকে উদ্গতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবন সাধনার সাহায্য করে? সে সম্ভাব্যতার লেশগন্ধও যে আমাদের "প্রেম" কবিতায় নাই।

রিনেশাসের (Renaisance) পর হইতে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কবিগণের ব্যক্তিত্বগন্ধী এক আত্মসম্পর্কগন্ধী প্রেম-কবিতার প্রচলন হইয়াছে। পিত্রার্ক ও দান্তে উহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কাম বৃত্তির দৈবীকরণ! (deification of Love) আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কবিগুরু দান্তে তাঁহার 'ভাইটা নোভা, ও 'ডিভাইন কমেডীতে সংসারভাবের 'প্রেম'কেই আধ্যাত্মিক দেবত্ব ও মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রদান পূর্ব্বক উহার লোকালোক-বিজয়ী মহিমাসঙ্গীত গান করিয়াছেন! তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পথে আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য কবিগণের অহমিকা-মুখর প্রেম সঙ্গীতে ভরপুর! মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যও—অবশ্য স্বাধীন পথেই—কালিদাস ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতির ভিতর দিয়া "ভগবান্ কুসুমায়ুধের স্তুতি প্রণতি এবং আরতিতে মুখর হইয়াছে! তাঁহাদের সনসূত্রে, বঙ্গের সহজিয়া ও বৈষ্ণব কবিগণের চিত্তমন্দিরে 'পিরীতি'-দেবতা ভুক্তিমুক্তি-প্রদাতার আসন লাভপূর্ব্বক উপাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কবিগণ সমস্ত সনদ ভাবের বশে রাধাকৃষ্ণের 'মুখশ' ফেলিয়া দিয়া, অকপট অহমিকাতেই গান ধরিয়াছেন চণ্ডীদাসের "শুন রজকিনি রামি" উহারই দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের রীতি-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ 'অহমিকা' রীতি এখন আর বাধিতেছে না; উহা কোন দিকে অশিষ্টতা বলিয়াও ধারণা জন্মাইতেছে না-এই অহমিকা সাহিত্যে শিষ্টাচারসম্মত হইয়াই দাঁড়াইয়াছে! মানুষ এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও চাহিতেছে—সরলতা! পাপই হউক আর পুণ্যই হোক সাহিত্যে আত্মপ্রকাশিনী সরলতা টুকুন একটা পরম 'রস'রূপেই সাধুবাদের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে!

এরূপ সহজপথে, অহমিকা পথেই কবিগণ প্রেমের গান ধরুন, উহা অন্ততঃ শিল্পতার ক্ষেত্রে ব্যভিচারী হয় না! কিন্তু, পুরুষের মুখেই এরূপ স্ত্রীমুখা রীতি, বিশেষতঃ স্ত্রী কর্ত্তৃক পুরুষ-পূজার কবিতা! উহাকে 'ভাক্ত বৈষ্ণব' ব্যতীত আর কি বলিব? যদি বলি, উহা প্রেম নহে—আত্মবিলাস—সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের অহমিকা-বিলাস—সাহিত্য রসিকের অথবা 'রস'-পিপাসিতের পক্ষে ভয়ানক কুসঙ্গী, তা হইলে কি বলিবার আছে? জীবনের নৈতিক ক্ষেত্রে এই অনৃত ভাব এবং অনৃজুরীতি ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিব না; ঐরূপ বিচার করিবার জন্য অন্ততঃ শিল্পসমালোচকের কোন ক্ষমতা নাই বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। তাঁহার কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বই হইতেছে স্বরূপ কথন। কিন্তু, উহা ত নিদারুণ সত্য! এই অপূর্ব্ব-অদ্ভুত

এবং অস্বাভাবিক ধারা আমাদের সাহিত্যে বৈষ্ণবরীতি হইতেই অতর্কিতে প্রবল হইয়াছে! এ সমস্ত স্ত্রী-মুখী কবিতার 'আমি' টুকু যে রাধিকা নহেন, অথবা কবিও যে রাধাকেই গুরুস্থানীয় করিয়া কিংবা তাঁহার মুখেই ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করিতেছেন না, তাহা কবিতাগুলির হৃদয় দিয়া পাঠ করিলেই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে সহৃদয়তাই প্রমাণ। কবিগণ যেন আপনাদের অহংতত্ত্ব হইতেই একটী 'নারী' বহির্ভাবিত করিয়া উহার পূজালাভ পূর্ব্বক পরিতোষ উপার্জ্জন করিতেছেন! শিল্পীর দিক হইতে উহাই নির্দ্দারুণ সত্য! পুরুষকবিগণের পক্ষে তাঁহাদের আমিত্ব-বিলোপী অথবা আত্মদানী কোনরূপ ভাবক্রিয়া, হৃদয়গতি এবং রসাস্বাদের একেবারে অসম্ভাব! উহাতেই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম এবং যুগলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক একরূপে 'স্রোতের শিউলী' হইয়াই চলিয়াছি! ভারতীয় সমাজের মধ্যে উপার্জ্জনধর্ম্মী হইবার জন্য 'প্রেমের' পক্ষে তত অবকাশ নাই; 'প্রেম পূর্ব্বক পরিণয়'-প্রথা এ সমাজে প্রচলিত নহে। ভারতীয় দাম্পত্যধর্ম্মে প্রেম একটা পরিণয়-পরবর্ত্তী সাধনা, এ কারণেই হয়ত ঈদৃশ অস্বাভাবিকতা কোন কোন দিকে সম্ভবপর হইয়াছে। ফলে, আমাদের পুরুষকবিগণের এ সমস্ত প্রেমকবিতা ইউরোপীয় প্রেমকবিতার ন্যায় প্রকাশ্যভাবে উপার্জ্জনধর্ম্মী নহে, আবার স্ত্রীমুখী এবং পরস্বমুখী বলিয়া উহার মধ্যে সহজ কামগন্ধও অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে না! আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে কামগন্ধী কবিতাকে নিন্দা করি না, উহা স্বাভাবিক—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্" এবং স্বভাবের বর্ণনা করাও কাব্যশিল্পের আমল বহির্ভূত নহে। কিন্তু আমাদের প্রেম-কবিতায় সরল 'উপার্জ্জন-ধর্ম্ম'ও নাই, স্বাভাবিক কামগন্ধও নাই—উহা যেন কেবল মেয়েমুখো ভাবুকতা, অনৃত ভাবোন্মত্ততা পরের মুখস পরিয়া আত্মপূজা! একটা পরম ভণ্ডগ্রস্ত এবং শিল্পতা-বিদ্রোহী ও রস-বিদ্রোহী গ্লানিকর পদার্থ! জগতের অন্য কোন সাহিত্যে ইহার জুড়ি আছে কি না, জানি না! কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে সহজতা এবং ঋজুতাই প্রধান শক্তি! হেমনবীনের কয়েকটি সরল প্রেম-কবিতা এবং নিধুবাবুর হৃদয়োচ্ছ্বাসময় প্রেম-সঙ্গীতগুলি বাদ দিলে, প্রথম নারী-পরিচয়-জাগ্রত রবীন্দ্রনাথের কড়ি-ও-কোমল এবং মানসীর কয়েকটি মনোরম পুরুষমুখ্য কবিতা বাদ দিলে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে মুক্তকণ্ঠ এবং ঋজুপ্রকৃতির প্রেম দৃষ্টান্ত নির্দ্দয়ভাবেই দুর্লভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহাই হইল বর্ত্তমানের প্রেমকবিতার 'আর্ট'!

এই আমিত্ববাদের কবিতা প্রসঙ্গে মধুসূদনের শেষ সাহিত্য-কার্য্যের ধারাও বুঝিয়া লওয়াই আবশ্যক! মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী তাঁহার ইয়োরোপ প্রবাসের সময়ে, ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ অব্দের মধ্যেই রচিত হয়। সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা (রিনেশাঁস) নব যুগের ইটালীর সৃষ্টি—ইয়োরোপের সকল সাহিত্য ইটালী হইতে এই অভিনব সাহিত্যশিল্পের কায়া-প্রাণের নমুনা শিক্ষা করিয়াছে। উহা হইতে

আধুনিক 'গীতি-কবিতা'ও নিজের শতসহস্র-মুখী অহমিকা-তত্ত্বকে লাভ করিয়াছে, এবং ছন্দের নির্দ্ধারিত শৃঙ্খলা-বন্ধন ছেদপূর্ব্বক অগণিত উপস্থিত ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শেক্সপীয়র মিলটন, এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থের সনেট ইংরাজী খণ্ডকাব্য-সাহিত্যের একটা প্রধান সিদ্ধি! মধুসূদন সনেটকেও বঙ্গসাহিত্যে অবতারিত করিলেন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, মধুসূদনের সমকক্ষ কবি বঙ্গসাহিত্য এখনও উৎপত্তি করিতে পারে নাই। সনেটের মধ্যে একটা চিত্তসংযম আছে, ভাব-তত্ত্বে এবং ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে নিপুণ অধিকারের প্রয়োজন আছে, যে কারণে সনেট রচনায় প্রতিপত্তি লাভ করা সুলভ নহে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বোক্ত কবিগণ সনেটের মুখেই আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাদের অধ্যাত্মমূর্ত্তির পরিচয় লাভ করিতে হইলে সনেট গুলির মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। মিল্‌টনের "Soul animating strains though few" সাহিত্য-দেবিগণের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। মধুসূদনকে জানিতে হইলে—কবি মধুসূদনটি কি ছিলেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কতদূর বিস্তৃত এবং প্রগাঢ় ছিল তাহা বুঝিতে হইলেও—চতুর্দ্দশপদী কবিতাই খুঁজিতে হইবে। সাহিত্যিক মধুসূদনের বাক-শক্তি এবং বাক্‌সংযম, চিত্তশক্তি এবং চিত্তসংযম কি পরিমাণে ছিল, তিনি বিশ্বসংসারের কতদূর আপনার অস্মিতার অধিকারে আনিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাইতে চাইলেও সনেট গুলিই অন্বেষণ করুন। একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া উপায় থাকিবে না। এ সমস্ত কেন আমাদের বিদ্যালয়াদিতে পঠিত হয় না, বুঝিনা; আমরা যে উহাদের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই—তাহাতেই প্রমাণিত হয়! এ লোকটির হৃদয় কতদূর সুপ্রসন্ন এবং প্রসারিত ছিল! কোনগুণে এ ব্যক্তি নব্যবঙ্গসাহিত্যের জনক হইতে পারিয়াছিল! আমাদিগকেও আত্মপ্রসার লাভ করিতে হইলে কিরূপে তাঁহার শিষ্যতা-পথেই চলিতে হইবে! কোন্ গুণে এ লোকটি যেমন আমাদের দেশের, তেমন ইয়োরোপের অন্তরাত্মাটিকেও পুঁথির ন্যায় পড়িয়া লইয়াছিল; নিজের মধ্যে একেবারে পরিপাক করিয়াই নূতন রূপে আবার বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিল!

মধুসূদনের গ্রাস করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, পরিপাকের এবং প্রকাশের শক্তিও তেমনই অসাধারণ। তবে, মধুসূদন যে বঙ্গভাষায়, খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি-অনুরূপ সমর্থ-শিল্পী অথবা সূক্ষ্মশিল্পী হইতে পারেন নাই, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহার অল্প বয়সের ইংরাজী কবিতাগুলির মধ্যেই স্থানে স্থানে যে সূক্ষ্মতার এবং গভীরতার আভাস পাই, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনাতেও আমরাও সকল সময় উহার সমকক্ষতা অথবা পরিণতি খুঁজিয়া পাই না। উহার কারণ কোথায়? ইংরাজী ভাষার মহত্তর শক্তি, এবং শ্রেষ্ঠতর ঐশ্বর্য্যে। মধুসূদন সুলভ শিক্ষা-পথেই ইংরাজীতে সেক্সপীয়র-মিল্‌টন এবং বায়রণ-ওয়ার্ডসোয়ার্থের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গভাষায় ক্রিয়াযোগী তাবৎ শক্তিই মধুসূদনকে স্বয়ং অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল! বঙ্গভাষার অন্তরাত্মাটি চিনিয়া

লইতেই কত সময় এবং শক্তির ব্যয় করিতে হইয়াছিল! তাঁহার বাঙ্গালা রচনায় সূক্ষ্ম ভাব-ধারণা যে অনেক সময় অব্যাহত হইতে পারে নাই—স্থানে স্থানে যে আসিতে-আসিতেই আসে নাই, সচেতন-শিল্পী কবি সে বৃত্তান্ত পুরাপুরী বুঝিয়াছিলেন। এ জন্য মধুসূদন অত্যধিক সূক্ষ্মতার দিকে না যাইয়া বৃহৎ তুলিকা-হস্তে কেবল ভাবের বৃহৎ প্রবাহগতি এবং বিপুল উচ্ছ্বাসের ধারণাতেই অবহিত হইয়াছিলেন এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই নিজকে এ জীবনের জন্য কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশপদীর প্রধান রস কবির আত্মসম্পর্ক ও আত্মপ্রকাশিনী সরলতা, এবং গভীর স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি! হোমর হইতে হুগো, বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র, ভিক্টর ইমেনুয়েল হইতে 'ঈশ্বর পাটনী', আকাশের তারা হইতে 'শ্রীমন্তের টোপড়' কিছুই কবির আনন্দদৃষ্টি, প্রীতিদীপ্তি এবং মমতানুভূতি হইতে বাদ পড়ে নাই! বাহ্যতঃ পৈতৃক সমাজধর্ম্মদ্রোহী হইয়াও, সাহেবিয়ানায় রত থাকিয়াও মধুসূদন মনে প্রাণে ভারতবাসী হিন্দু এবং 'বাঙ্গালীর বাঙ্গালী' ছিলেন। মধুসূদনের সাহিত্যচর্য্যা যেমন কেবল যশো-লিপ্সায় আত্মবিলাস মাত্র ছিল না, তেমন উহার কেন্দ্রগত পরিচালনী শক্তিটাও ছিল স্বদেশ-প্রীতি! শর্ম্মিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশপদী পর্য্যন্ত কেবল উক্ত প্রীতি-বীজের ক্রমান্বিত এবং নানামুখীন বিকাশ! কবির অহমিকা, কবির ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, তাঁহার রচনার মধ্যে বিদেশী বস্তু ও বিদেশী সাহিত্যের আবহাওয়া, তাঁহার শিল্পতত্ত্বের প্রাচীনতা-বিদ্রোহী রীতি এবং উন্নতি লক্ষ্য, এ সমস্ত আমাদের তরুণ বয়সে এক নিদারুণ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল—অনেকেই মনে করিয়াছে। "দেশের সমাজ-হৃদয়ের সঙ্গে মধুসূদনের কিছুমাত্র যোগ ছিল না, তাঁহার প্রতিভা আকাশে অস্বাভাবিক শিকড় বিস্তার করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে"—এরূপ স্থূলদৃষ্টি এবং অর্দ্ধদৃষ্টির পরিচয়ও আমরা একদিন দিয়াছিলাম। শিল্প-ক্ষেত্রের যেই বিদ্রোহ-মতি এবং উন্নতিলক্ষ্য হইতে বঙ্গসাহিত্যের এত লাভ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাই আপাতদৃষ্টিতে মধুসূদনকে অপরাধী করিয়াছিল! তাঁহার কাব্যের গ্রীক Humanism বা মানবিকতার আদর্শ ও দেবতাগণকে মানবিক সুখদুঃখ এবং ভাল মন্দের প্রকৃতিতে প্রাকৃতভাবে উপস্থিত করিয়া একশ্রেণীর বিচারককে অত্যধিক কষ্ট করিয়াছিল; মেঘনাদের 'রাবণ-সহানুভূতি' তাঁহার বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর অভিরুচি বিরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য "মানুষের ভাল লাগে কেন" "বাঙ্গালীর ভাল লাগে কেন", "হিন্দুরও ভাল লাগে কেন", এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা চিন্তাই আমাদের চিত্তকে কুবিচারের বশ-বর্ত্তিতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এরূপ চিন্তা পথেই মধুসূদনের সার্ব্বমানবিক রসাদর্শ ও স্বাদেশিক ভাব-বস্তুর ভিত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সর্ব্বজনতার সহিত স্বাদেশিকতার সম্মেলন না করিয়া কোন কাব্যই স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের যাবতীয় কাব্য কবিতা-নাটক এইরূপে অন্তরঙ্গভাবে সার্ব্ব-

জনীন হইয়াও ভারতবর্ষীয়ত্ব এবং বাঙ্গালীত্ব সিদ্ধি করিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমাদিগকে 'হৃদয় দিয়া' বুঝিতে হইবে। এমন কি স্বদেশীয় সমাজতা এবং ধর্ম্মতার ক্ষেত্রে স্বয়ং বিধর্ম্মি হইয়াও মধুসূদন যে কিছু মাত্র বিদ্রোহভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহা সাহিত্যশিল্পী মাত্রের বিস্ময়স্থলী হইয়া থাকিবে। নিজের শিল্পাদর্শ এবং শিল্পি-জীবনকে দেশকালের সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা হইতে বিশেষ ভাবে অসঙ্গ রাখিতে না জানিলে এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা কখনও সম্ভবপর হইত না। দেখিতে হইবে, এরূপ অসঙ্গতা অপর কোন আধুনিক বাঙ্গালী কবির সাধ্য হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সংস্কারক, প্রচারক অথবা বিশ্বাসীর গোঁড়ামী ছাড়াইয়া, তিনি যেমন কেবল মানবিক স্থায়ীভাবের ক্ষেত্রেই স্বকীয় কাব্যকবিতার শিল্পতা সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমন অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু বা শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব অথবা খ্রীষ্টান না হইয়াও প্রকৃত শিল্পীর মতই স্বদেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সৌন্দর্য্য চিরকাল পরমমুগ্ধ মনবুদ্ধিই সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী ভাববস্তু এবং সাহিত্য-রীতির পথে হইলেও, তাঁহার শিল্পের একটা প্রধান সিদ্ধিই উহাদের বাঙ্গালিত্ব। বঙ্গ-মাতার অপর এক ভারতস্তন্য এবং মধুভক্ত বরপুত্র, বর্ত্তমানযুগের কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রকৃত জাতীয়তাসাধক বরপুত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের দেশপ্রাণতাকে প্রাণেপ্রাণে আস্বাদন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিব—"মধুসূদন ইয়োরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুলকুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন ঘাটে ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল—সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায় সেই স্থানে বসিয়া, তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন; ও না জানি কতই আনন্দ পাইতেন! বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর তাহা তিনি ভারসেল্‌সে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন! জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে, বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পথিকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সময় তিনি সাগর পারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল! "বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার ফলে" তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল!"

এই ত চতুর্দ্দশপদীর দেশ-প্রাণ এবং মধু-প্রাণ বাঙ্গালী মধুসূদন!

তবে মধুকবির অনেক ক্ষুদ্রকবিতার মধ্যে নানাস্থানে একটা ব্যাহত শক্তি এবং পদগতির একটা অসচ্ছলতা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আজ, পঞ্চাশ বৎসর পরে, তাঁহার আবিষ্কৃত কবিত্ব-পথে যাতায়াত করিয়া আমাদের অনেক ক্ষীণশক্তি এবং ক্ষীণমস্তিষ্ক কবিতা-লেখকও যে স্থূলদৃষ্টিতে তদপেক্ষা বহুতর বা আপাততঃ ভাব-বস্তুর ক্ষুদ্রকবিতা এবং গীতিকবিতা রচন করিতে পারি-

তেছেন, তাহাও অনেকেরই ধারণা হইতে থাকিবে। কিন্তু মধু ছিলেন বৃহৎ ভাব-প্রাণতার বিমুক্ত আকাশবিহারী পক্ষী! গীতি কবিতার, বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গের এই সঙ্গীতজাতীয় কবিতার ক্ষুদ্র পঞ্জরের মধ্যে তাঁহার পাখা মেলিবার এবং নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও যেন হয় না! এজন্য কোন কোন কবিতায় যেন মধুসূদনের শিল্পাদর্শটিই পৃথক্ বলিয়া মনে হইবে এবং উহাদের ভাব-গ্রহ কিংবা উল্লাসও যেন কাহিল বলিয়াই মনে হইবে। উহারা যেন তাঁহার চিত্ত-স্পন্দনকেই ধরিতে পারিতেছে না! উহাদের ছন্দ, তাল, আশা এবং ভাবভঙ্গী যেন পরস্পর সহযোগী হইতে জানে নাই; কোথাও হয়ত 'বুদ্ধি' আসিলে ভাব আসিতেছে না, ভাব আসিলে ভাষা বিগড়াইয়া যাইতেছে! গতি, দীপ্তি, কায়া এবং আত্মা ওতপ্রোত হইয়া উহাদিগকে এক একটী স্বতন্ত্র 'প্রাণী' রূপে খাড়া করে নাই; অথচ প্রাণী না হইলে কবিতাই হয় না। কিন্তু যেমন বলিয়া আসিয়াছি, অপরাধ শিল্পীর ততটা নহে, যতটা অপ্রাপ্তবয়স্কা বঙ্গবাণীর। বঙ্গের সরস্বতী তখন যাবৎ, সংস্কৃততন্ত্রের বাহিরে, কেবল বৈষ্ণবী প্রেম-ভাবুকতা এবং 'গ্রাম্যজীবন'তার পথেই স্বাধীন শক্তিসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদনের মর্ম্মগত 'বিশ্বজন'তা বলিষ্ঠ সাহিত্যবুদ্ধি এবং পৌরুষপ্রশস্ত ভাবুকতার ধারণাপথে তখনো যেন 'সমর্থ' হইয়া উঠিতে পারেন নাই! মধুসূদনের ইংরেজী কবিতা-গুলির পাশাপাশি রাখিলেই বুঝিতে পারি, তাঁহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা কবিতায় শিল্প-শক্তির মধ্যে পার্থক্যটি কোথায়। ঠিক "নওল কিশোরী" এবং পূর্ণযৌবনা ভামিনীর মধ্যে যাহা পার্থক্য! যেমন ব্রজাঙ্গনায়, তেমন চতুর্দ্দশপদী কবিতায়, কবি যেখানেই না গভীর মনস্তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়াছেন, সেখানেই ন্যূনাধিক ব্যাহৃতি এবং ইচ্ছাকৃত বিরতির ভাবটি যেন আমাদের চিত্তকে আঘাত করে। মনে হয়, ইংরাজীভাষায় হইলে কবি যেন আরও কত সুন্দর ও গভীরতর ভাবুকতায় ডুব দিতে পারিতেন, বঙ্গভাষাতেই আর কিছুকাল সাহিত্যজীবন অব্যাহত রাখিতে পারিলে আরও কত-কি যেন করিয়া যাইতে পারিতেন! এ সকল কবিতাগ্রন্থ উহাদের স্বক্ষেত্রে, ভাবসামর্থ্য এবং আন্তরিকতায় এখনও বঙ্গসাহিত্যে অনতিক্রান্ত আছে সত্য; কিন্তু মধুসূদনের মনোযোগী সঙ্গী হইলেই বুঝিতে পারিব, আর কিছুকাল আত্মপথে চলিলে তিনি বঙ্গভাষাতেই উহাদের বস্তু এবং ভাবকে কি উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি এবং গভীরতর স্ফূর্ত্তি দান করিতে পারিতেন! বঙ্গে দ্বিতীয় মধুর জন্ম হইবে না; এবং একালে উহার সম্ভাবনাও নাই। মধু বঙ্গভাষার আর্য্য-অংশে যে শক্তিসাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা কোন কোন দিকে পরকালের বঙ্গসাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু অনেক দিকে যে পারে নাই, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যই যে সুসম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা বঙ্গসাহিত্যের সাধকমাত্রেই বুঝিতেছেন।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন

শিশুর শিক্ষা।

প্রকৃতি-বাদী ফরাসী মনীষী রুশো (Rousseau) বলিয়াছেন—"Coming from the hand of the Author of all things, every thing is good ; in the hands of man, every thing degenerates." খোদাতালার হাত হইতে যাহা আসে তাহা সবই সুন্দর কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া সবই বিকৃত হইয়া যায়। কথাটী সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও মানব শিশুর প্রতি যে অনেকাংশেই সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে অতি দুর্ব্বল, অতি কোমল। সে যেন জমাট বাঁধা খানিকটা পবিত্রতা ; সে যেন আকাশের শিশু, তারারা যেন তার ভাই,—খেলা করিতে করিতে পথ ভুলিয়া গিয়া সে যেন এই বিশ্ব মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়াছে। কতকালের চেনা ঘর সে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাই যেন তার এই অজানা অচেনা নূতন দেশে মন টিকেনা ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কাঁদিয়া বলে—"কোথায় আসিলাম! ওগো আমি কোথায় আসিলাম?"

নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী ও করুণার ভিখারী হইয়াই সে আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়। সে আমাদের ভাষা বুঝে না অথবা আমরাও তার ভাষা বুঝি না, অথচ প্রাকৃতিক নিয়ম তাকে মানিয়া চলিতেই হয়। সে আমাদের কাছে একেবারেই পরাধীন ; আমরা তাহাকে খাইতে দিলে খাইতে পায়ে, মারিয়া ফেলিলে মরিয়া যায়। তাহার ক্ষুদ্র মনের গোপন কোণে কখন কোন্ বাসনা জাগিয়া ওঠে, সে তাহা মোটেই ব্যক্ত করিতে পারে না, আর আমরাও বড় একটা সেদিকে খেয়াল করি না। প্রসূতি আপন হাতে শিশু-সন্তানকে স্তন্য অথবা গো-দুগ্ধ পান করান, মা হইয়া যে কিছু কম করিয়া দুধ দিবেন তাহা ত আদতেই না, বরং বাটিতে খানিকটা দুগ্ধ পড়িয়া থাকিলে তিনি অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠেন—পাছে তাহার সন্তান শুকাইয়া যায়! তাই স্নেহের মাত্রা যতটুকু হওয়া উচিৎ, তার চেয়ে একটু 'কাও' ও আমাদের জননীদের হাতে পাওয়া যায়। ইহার ফল যে কতদূর গিয়া দাঁড়ায়, তাহা অবশ্য অনেকেরই জানিতে বাকী নাই।

জননীর স্নেহের ধারা এই দুধ-খাওয়ানের ভিতর দিয়াই সর্ব্ব প্রথম সন্তান হৃদয়কে আঘাত করে। মাতৃ-স্তন্য মাতৃ-স্নেহেরই আদি উৎস—এইখানেই তাহার স্নেহের উৎপত্তি। হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহ দিয়া জননী যেন সন্তানকে ছাইয়া রাখিতে চায়, এতটুকু ব্যথা, এতটুকু অমঙ্গল তাহার সহ্য হয় না—সন্তানকে সে প্রাণের পুতলি করিয়া তুলে। মায়ের বুকের এই অনাবিল স্নেহ-ধারাই শিশুর পরবর্ত্তী জীবনকে যে একটা অভিশাপের মতই শুধু নিষ্ফলতা ও হাহাকারে ভরিয়া দেয়, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শিশুর মন একখানি পরিষ্কার শ্লেটের (Tabula rasa) মতই হউক, অথবা সে কোন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অঙ্কুর লইয়াই আসুক, সে তর্ক না করিয়াও এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে—তাহার মন কাদার মত অতি কোমল—সেখানে কিছুর ছাপ দিলে তাহার দাগ পড়ে। প্রত্যেক মানব-শিশুই এক একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে—যাহা তাহার জীবনের সমস্ত কার্য্যে আত্ম প্রকাশ করিতে থাকে। স্বভাবের এই বিশিষ্টতা খোদা দত্ত; মানুষ তাহাকে যতই কাঁট-ছাঁট করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করুক না কেন, স্বভাবের স্বতন্ত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না। কিন্তু এই স্বভাব ছাড়া আরো একটা দ্বিতীয় স্বভাব" (Second Nature) আছে—যার উপাদান হইতেছে অভ্যাস। অভ্যাসগুলিই কালে কালে আর একরকম স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। প্রথম স্বভাবের উপরে আমাদের হাত না থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় স্বভাবের উপর আমাদের কারিকুরি খুব চলে। ইচ্ছা করিলে আমরা একটী শিশুকে দেব চরিত্র আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি, ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত করিতে পারি। এইখানেই মানুষের হাতের দেওয়া শিক্ষার কথা আসিয়া পড়িতেছে।

কিরূপ শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে? সে শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য কিরূপ হইবে?

এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়—সে যাহাতে মানুষ হইতে পারে, এই শিক্ষাই তাহাকে দিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে উকীলই হউক, ব্যারিষ্টারই হউক, কুলিই হউক, মজুরই হউক,—সকল শিশুকেই প্রকৃতি 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলে, ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং শিশু যাহাতে বড় হইয়া এই মানুষের যতরকম কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই তাহাকে দিতে হইবে। তাহার জীবন যাহাতে মানুষ হিসাবে ব্যর্থ না হয়, মানুষের সমাজে তাহার আসন যাহাতে ছোট না হয়, তাহাই আমাদের শিশু শিক্ষার মূল লক্ষ্য হইবে। শুধু বাঁচিয়া থাকাই জীবন নহে—কর্ম্মই জীবন "To live is not merely to breathe, it is to act." অদৃষ্টাকাশে চিরদিন নিবিড় নীলিমার প্রশান্ত মূর্ত্তি কখনো দেখিতে পাওয়া যায় না; চিরদিন সেখানে চন্দ্র-সূর্য্যের আলো জ্বলে না, সেখানে মেঘ ও অন্ধকার, ঝঞ্ঝা ও অশনি-পাতের খুবই সম্ভাবনা। কাজে কাজেই যাহাতে আমরা নিয়তির এই বিড়ম্বনা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারি, পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য নিজকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

কিন্তু শিশু-সন্তানকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় কি? কখনই না। তাহাকে সর্ব্বদা দুঃখ ও ক্লেশ হইতে শান্তির সুশীতল আঁচল আড়ালে ঘিরিয়া রাখা হয়। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার জীবনের প্রতি পিতা মাতার যত্নের অবসর নাই। যাহা কিছু ভাল জিনিষ সব খোকা খুকীই খাইবে, তাহাদেরই সে সব বিষয়ে প্রথম দাবী। বাড়ীতে কোন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইলে তাহারা ৩।৪ বার করিয়া আগে আগে খাইয়া লইবে, মাতা পিতার সঙ্গে আহ্লাদ করিয়া আরো দুই একবার খাইবে, তারপর আবার লোলুপ দৃষ্টি দিয়া তাকাইয়া

থাকিবে। তাহাদের সঙ্গে করিয়া খাইতে বসিলে শুধু মাছই খাইবে, ফুরাইয়া গেলে আরো চাহিবে, না দিলে কাঁদিবে! দুধের সর, ইলিস মাছের পেটী, চিনি, মিছরি, ইত্যাদি যাহা কিছু তৃপ্তিকর সুখাদ্য জিনিষ —সবই একরূপ তাহের জন্য। কমলালেবু বা সন্দেশ রসগোল্লা কিনিয়া বাড়ী লইয়া গেলে মাতা পিতা পিতামহী ও অন্যান্য স্নেহশীল বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের উদরে তার খুব কম অংশই স্থান লাভ করিয়া থাকে। নিজের অংশটুকু খাইবার সময়ও মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য আচ কাচাইয়া উঠে; "আয় নিবি—ধর" বলিয়া তারও খানিকটা বিলাইয়া দিবে।

ইহাই গেল খাওয়ার দিক। পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বিলাস ব্যসনের দিকেও এইরূপ। গৃহিণী এবং প্রথম পুত্রের পিতাও ইচ্ছা করিয়া তাহাদের নব প্রসবের ফসলটীকে মনমত পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া থেন। ভাল জুতা, ভাল টকিং, ভাল কোট-প্যান্ট, একটা রঙ্গীন ছাতা—একটা বল, একটা ঘোড়া ইত্যাদি। যাহারা বড় লোক তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম—কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যেও এই ব্যাপার! ইহা ছাড়া এমন কোন কাজ তাঁহারা সন্তানকে করিতে দিবেন না যাহার মধ্যে তিলমাত্রও অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিতে পারে। আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাওয়া খোকা খুকীদের চিরদিনের স্বভাব; সেটীও হবার যো নাই। একটু কোন রকম পড়িয়া গেলেই—"আ-হা-হা, সোণা-মণিরে! মরেছেরে! একেবারে খুন হয়েছেরে।—ইস্! দেখেছ!—ওরে আমার বাবা! ওরে আমার সোণা"—ইত্যাদি ঝুড়িঝুড়ি অনর্গল বলিতে বলিতে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়া জননী ছুটিয়া আসেন! খোকা ছুরি হাতে লইলে—"ওরে বাবা, হাত কেটে যাবে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লওয়া হয়। খোকা একটু রৌদ্রে গেলে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া ফিরাইয়া আনা হয়। খোকা যে গ্লাসে পানি খাইবে, সে গ্লাস তাহাকে দিতেই হইবে। বস্তুতঃ এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—যদ্দ্বারা শিশুর প্রতি মাতা পিতার বিকট স্নেহশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শৈশব কাল এমনই আবদার ও অভিমানের ভিতর দিয়া কাটাইয়া খোকাকে স্কুলে দেওয়া হইল। সে স্কুলে যায় আর শুধু লেখাপড়া করে, বাড়ীতে বলিয়া দেওয়া হইল —"সাবধান, খোকাকে যেন কোন কাজে না বলা হয়, তাতে ওর পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটবে!" এমনি করিয়া খোকা শুধু পড়িয়াই চলিল। জীবনের তিক্ততার আস্বাদ সে অনুভব করিল না, শুধু ভোগ বিলাসের মধ্য দিয়াই সে মানুষের কোঠায় গিয়া পৌঁছিল। অবশ্য এতখানি সময়ের মধ্যে হয় ত কাহারও কাহারও জীবনে কোন কোন সময় দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা আসিতে পারে, কিন্তু শৈশবে যে তাহাদিগকে শুধু সুখভোগী বিলাসীই করা হইল—ত্যাগী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইল না, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

দুঃখ-কষ্টের তীব্র আস্বাদ হইতে শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিবার অর্থ আর কিছুই নহে—কেবল তাহার শিশু-জীবনকে বঞ্চিত করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সেগুলিকে সঞ্চিত করিয়া রাখা শিশুকালে ভাল বাসিয়া তাহার

পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনের উপর সে শুধুই গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া। পিতামাতা শৈশবকালে যে ভাবে এইরূপ আদর ও যত্নে সন্তানকে লালন পালন করিতে পারিলেই ভবিষ্যতে আর দুঃখ-কষ্টের ভয় নাই, এমনি নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগের মধ্য দিয়া তাহার জীবন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু হায়! প্রকৃত ব্যাপার যে তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত! দুঃখ-কষ্ট যে প্রকৃতিরই স্নেহের দান। শিশুর কাশি, পেটের অসুখ, পেটে বেদনা, দাঁত উঠিবার সময় জ্বর হওয়া, ইত্যাদি সমস্তই ত প্রকৃতি দত্ত বেদনার আস্বাদ। শিশুর সমগ্র জীবনটাই একরূপ রোগপূর্ণ; শিশু-মৃত্যুর তালিকাও অতি ভয়ানক। ইহার দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? শুধু সুখভোগই কি প্রাকৃতিক নিয়ম? না দুঃখ-কষ্টের ও একটা স্থান আছে? কথিত আছে, গ্রীস-দেবী Thetis (থেটিস্) তাহার শিশু পুত্রের জীবন অজেয় করিবার জন্য Sty নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের শিশু শিক্ষার ইতিহাসে এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বিত হইত। অতি শৈশব হইতেই তাহাদিগকে জীবনের দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত করান হইত।

কিন্তু তাই বলিয়া শিশু সন্তানকে যে একেবারেই সচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা মোটেই নয়। রৌদ্র, বৃষ্টি, আপদ, বিপদ, অভাব, অভিযোগ—কিছুর প্রতিই যে লক্ষ্য দিতে হইবে না, তাহা মোটেই আমার বলিবার উদ্দেশ্য নয়। ক্ষুধা লাগিয়া কাঁদিলে যে তাহাকে ভাত দিতে হইবে না, পিঠা, মিঠাই, দুধ-সর সন্দেশ রসগোল্লা, আম-জাম-কুল পেয়ারা তাহাদিগকে না দিয়া যে দেখাইয়া দেখাইয়া নিজে খাইতে হইবে, আর তাহারা অচপল লোলুপ দৃষ্টি হানিয়া শুধু চাহিয়াই রহিবে, কাঁদিলে ঠাস্ করিয়া গালে এক চড় বসাইয়া দিতে হইবে, কাপড় জামা না কিনিয়া দিয়া গৃহিণীর সহিত শুধু দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে হইবে,—তাহা স্বপ্নেও মনে ভাবিবেন না। 'এই দুই বিভিন্ন মুখিন শেষ প্রান্তের মাঝখান দিয়া আমাদিগকে পথ কাটিয়া চলিতে হইবে। অবশ্য এজন্য মাতা পিতাকে খুব সূক্ষ্মদর্শী ও শিক্ষিত হইতে হইবে। শিশুর মনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোন্ পথটী যে অবলম্বন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুকে চালিত করিতে গেলে ফল হইবে না।

এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—সেটী শিশুর কান্না। এই কান্নাই সব অমঙ্গলের মূল। এই কান্নাই শিশুকে ঠিকপথে চালিত করার পক্ষে বিষম বাধা। মার হাতে অসংখ্য কাজ, এমন সময় শিশু কোলে উঠিতে চাহিল; মা বিরক্ত হইয়া শিশুকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, আর যায় কোথা! ছোট্ট গালটুকু যথাশক্তি বিস্তারিত করিয়া 'হা'—করিয়া শিশু কাঁদিতে সুরু করিল; মা তখন থাকিতে না পারিয়া অমনি ছুটিয়া আসিয়া 'আয়' বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। শিশুর জ্বর হইয়াছে, সে একজনকে ভাত খাইতে দেখিয়া নিজেও ভাত খাইতে চাহিতেছে। ভাত দিলে অপকার হইবে জানিয়া পিতামাতা তাহার আবদার রক্ষা করিলেন না, অমনি

শিশু তাহার অস্ত্র নিক্ষেপ করিল—কান্না, কান্না, শুধু কান্না, মুঁপাইয়া মুঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া কান্না! কিছুতেই থামে না; মা বিস্কুট হাতে তুলিয়া দিতে গেলেন, খোকা তাহা রাগ করিয়া ফেলিয়া দিল—আবার কান্না! তখন আর কি করা যায়, মা গোপনে তাহাকে একবার কি দুবার দুটো ভাত মুখে দিলেন! মার দ্বিতীয় সন্তান হইল, খোকা তখনও মার কোলের মধ্যে শুইয়া দুধ খাইতে চায়; কিছুতেই সে তাহার বাবার কাছে বা দাদিমার কাছে থাকিবে না—তা খানিক বেশী করিয়া গাইএর দুধ দিতে চাহিলেও না! বেদম কান্না! অগত্যা তখন উভয় পক্ষের ভিতর একটা সন্ধি করিতে হইল! পিতা নিকটবর্ত্তী কোন' আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন, খোকা বলিল—"আমিও যাব।" পিতা বলিলেন—"সে হবে না" অমনি খোকা তাহার কণ্ঠ বীণার ঝঙ্কার দিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে চঞ্চল করিয়া তুলিল! "তা যেতে চাচ্ছে, নিয়ে যাও না" ঘরের ভিতর হইতে উকিলের এই ওকালতিতে পিতা তখন বাধ্য হইয়া বলিলেন—"চল, কাপড় পর!" এইরূপ ভাবে সর্ব্বদাই খোকা তাহার অস্ত্র দিয়া নিজের ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে লাগিল অর্থাৎ কান্নার ভিতর দিয়া সে তাহার হুকুম (order) চালাইতে লাগিল। পিতামাতা যতই বাধা দিক না কেন, পরিণামে খোকারই জয়। খোকার এই অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান রাজনীতির বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। দেশীয় লোকে যতই বাধা দিক না, রাউলাট আইন—যাহা পাশ করিতে হইবেই তাহা পাশ হইলই। পুলিশ বাজেট পাশ করা প্রভুদের নেহায়েতই দরকার, তাই দেশীয় লোকে হাজার বাধা দিয়াও তাহা নিরস্ত করিতে পারিল না—বাজেট পাশ হইয়াই গেল। মটর গাড়ীতে কত নিরীহ প্রাণীর পৈত্রিক জীবন অনর্থক চাকার তলে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়; খবরের কাগজে, গোল দীঘিতে উহা দমন করিবার জন্য হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া যায়। কিন্তু সাহেব শুবেদার মটর গাড়ী গরীবের বুকের উপর দিয়া চলিয়াই যায়। আমাদের শিশুরাও এই রূপ ক্ষুদে Buracratic Governor স্বেচ্ছাচারী শাসক বিশেষ। যেরূপ করিয়াই হউক, তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই হইবে।

ইহার পরিণাম ফল চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ঐ যে কান্না ও ত কান্না নয়—উহা অর্ডার—উহা হুকুম। Rousseau প্রকৃতই বলিয়াছেন—"The first crying of children is a prayer. If we do not heed it well, this cry soon becomes a command." শিশুর প্রথম কান্না একটা করুণ প্রার্থনা মাত্র। যদি আমরা এই প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ না দেই, তবে তৎক্ষণাৎ উহা হুকুমে পরিণত হয়। কি গভীর সত্য কথা! বাস্তবিকই, শিশুর প্রথম ক্রন্দন একটা করুণ প্রার্থনা মাত্র, যদি সে প্রার্থনা বিফল হইল তবে তখন সে যে কান্না কাঁদে, তাহা মনীষী Locke এর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"an open declaration of their insolence or odstinacy" "শিশুর যদি শক্তি থাকিত, তবে সে সর্ব্বপ্রথম পিতা মাতার অবাধ্য হইত। তাহার সে শক্তির অভাব অথচ আবার তাহার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করারও

দরকার, কাজেই সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার হুকুম জারী করে।

সুতরাং শিশুকে সৎপথে চালিত করিতে হইলে মাতা পিতাকে এই অশ্রুর আঘাত সহ্য করিতে হইবে। সে শিশু, তাহার ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি নাই; মনে যখন যা, খেয়াল হইল, কাঁদিয়া চাহিলেই যে তাহা পূরণ করিতে হইবে, ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? অবশ্য সব কান্নাই যে খেয়াল ও বিদ্রোহ সূচক, সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। শিশুর কান্না বাস্তবিক কোন প্রকৃত অভাব অভিযোগ সূচিত করিতেছে কি না, নাকি সে শুধুই একটা বিকট জিদ, তাহা পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃতই যদি তাহার কোন অভাব থাকে তবে তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু যেই বুঝা গেল যে সে বাগ মানিতেছে না, বিদ্রোহভাব দেখাইতেছে তখনই তাহার প্রতীকার করা চাই। সে কান্নায় আদৌ মনোযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। কাঁদিবে? কাঁদুক না। তার কত কান্নাই আছে? কতক্ষণ সে কাঁদিবে? সে যখন বুঝিতে পারিবে, তাহার কান্না নিষ্ফল হইল, তখন সে বাধ্য হইয়া নিজেই চুপ করিবে। সোণা, মাণিক, চুপ কর, কেঁদো না, তোমাকে ভাল একটা পুতুল কিনে দেবো—ইত্যাদি সান্ত্বনা বাক্য মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়, আর উহাতে কোন ফলও হয় না, শিশু আরো দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে থাকে। উহাদ্বারা সে বুঝিতে পারে, তার কাঁদনে মাতার মন একটু নরম হইয়া আসিয়াছে, আর একটু বেশী জোর দিয়া কাঁদিলেই তার বাসনা প্রভৃতি পূর্ণ করা হয়, তখন সে কান্নাকেই তাহার ইচ্ছা পূরণ করিবার একমাত্র উপায় মনে করে। কাঁদিলেই তাহার ঈপ্সিত বস্তু সে পাইবে। এই বিশ্বাস তার একদিনে হয় না; সে যখন দেখিতে পায়ে সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে একদম চুপ থাকাই শ্রেয়ঃ। এসম্বন্ধে Rousseau বলিতেছেন—"So long as he cries I will not go to him, as soon as he stops, I will run to him. যতক্ষণ সে কাঁদিতে থাকিবে ততক্ষণ আমি তার কাছে যাইব না, যে-ই সে চুপ করিবে, অমনি আমি দৌড়িয়া কাছে যাইব।

এই অশ্রুর হুকুম মানিয়া চলাতে সন্তানের স্বভাবকেই যে বিকৃত ভাবে গড়িয়া তোলা হয়, অশিক্ষিত মাতা পিতা তাহা বুঝিতে পারে না। শৈশবে এইরূপ প্রশ্রয় দিয়া বুঝা বয়সে তাহারা তাহাদের বাধ্যতা ও শিষ্টতা কামনা করেন। এবিষয়ে সতর্ক করিতে গেলে কেহ কেহ এই-রূপ ও বলেন—"থাক, ছেলে মানুষ, বুঝে না, বড় হলে সেরে যাবে।" চমৎকার যুক্তি! এই জন্যই দার্শনিক Locke অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শৈশবেই শিশুর প্রতি একটু নিষ্ঠুর হইয়া (অন্তরে না হোক প্রকাশ্যে) পরে যত বড় হইতে থাকিবে, ততই তাহাকে ভাল-বাসা জ্ঞাপন করিতে হইবে।

কান্নার প্রশ্রয় দিলে শিশুর চরিত্র যে কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহার কয়েকটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একটী খোকার বিষয় আমি জানি, সে কোন একটা জিনিষ ইঙ্গিতে চাহিয়া না পাইলে অমনি মৌসা করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া তাহার মা তাহাকে হাসিয়া সোহাগ করিয়া কোলে তুলিয়া চুমো খাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই জিনিষটী দিলেন। খোকা

এখনও শিশু, ভাল করিয়া কথা বলিতে শিখে নাই। অথচ তার এত দুষ্টুমী। এই দুষ্টুমী-টুকু তার মার কাছে এত ভাল লাগিল যে সে তাহার পুনরভিনয় করাইবার জন্য বারে বারে তাহাকে সেই সেই সুযোগ দিতে লাগিলেন এবং আরো দুই একজনকে ডাকিয়া খোকার কাণ্ড দেখাইতে লাগিলেন। ও মা, দুই একদিন পরে দেখা গেল, তার কোন অভাব পূর্ণ না করিলেই সে ঐরূপ মাটিতে গড়াইয়া পড়ে; এমন কি ঘরের দাওয়ার কিনারে হামাগুড়ি দিয়া যাইয়া দুই পা নীচে নামাইয়া দিয়া ঝুলিয়া থাকে। যেন সে ভয় দেখাইয়া বলে—"শীঘ্র দাও, নয়ত পড়িয়া গেলাম।" করেক দিন সে এইরূপ করিয়া তাহার মাকে ত খুব ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে বুঝিল এরূপ করিলেই ত যা চাই তাই পাওয়া যায়! দেখিয়া দেখিয়া একদিন আমি তাহাকে তুলিতে দিলাম না। বলিলাম—"থাক না, পড়ুক না।" কিন্তু কিছুতেই সে ইচ্ছা করিয়া পড়িয়া গেল না। অনেকক্ষণ থাকিবার পর অবশেষে বাধ্য হইয়া সে নিজেই উঠিয়া আসিল। দুই একদিন এইরূপ করার পর তাহার আর এ বদ অভ্যাস দেখা যায় নাই।

আর একটী খোকা বাহির করিয়া তাহার দাদিমার হাত ছাড়া অন্য কাহারও হাতে জল-শৌচ করিতে দিবে না; আর কেহ শৌচ করাইতে গেলে সে কিছুতেই স্বীকার করে না, শুধু কাঁদিয়াই আকুল! এতদিন তার দাদিমা এই আবদার হাসিমুখেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমি ইহা জানিতে পারিয়া একদিন বাড়ীর চাকরাণীর দ্বারা তাহার শৌচ করাইলাম, সে দিন খুব কাঁদিল, কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলাম না। পরদিনও, ঐরূপ করিলাম। তারপর দিন তার মার দ্বারা করাইলাম। কান্নার বেগ কমিয়া কমিয়া ক্রমে খুৎ-খুঁতিতে পরিণত হইল। অবশেষে কয়েক দিন পরে দেখিলাম—সে আর কাঁদে না, সকলের কাছেই সে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—যাহা শিশু চরিত্রের উপর ভয়ানক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। না পাওয়ার দুঃখ তার মোটেই শিক্ষা হয় না; পরবর্ত্তী কালে ইহাই তাহার জীবনকে নিতান্ত দুর্ব্বল, অশান্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলে—সামান্য অভাব ও দুঃখের আঘাতেই সে অভিভূত হইয়া পড়ে। শৈশবে একটু আঘাত পাইলে সেই আঘাতের ফলে শিশুর যতটা ক্ষতি না হয় মাতা পিতার "আ-হা-হা, বাবারে গেছেরে,—মরেছে রে" ইত্যাদি সোহাগ ও সান্ত্বনায় তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। Rousseau তাহার Emile (একটী কল্পিত বালকের নাম) সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন "Far from taking care that Emile does not hurt himself, I shall be dissatisfied if he never does and so grows up unacquainted with pain." এমিল যাহাতে আহত না হয় সে সম্বন্ধে যত্ন লওয়া ত দূরের কথা, বরং সে যদি একটুও আঘাত ও কষ্ট না পাইয়া বাড়িয়া ওঠে তবে তাহাতে আমি অধিকতর দুঃখিত হইব।

অতএব ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শিশুর শিক্ষা প্রণালী তাহার কান্নার সহিত গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট। কান্নাকে ঠিক মত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই শিশুর শিক্ষার পথ অর্দ্ধেক প্রস্তুত হইয়া গেল।

অবশ্য একথা কেহই বলেন না, যে শিশুকে ভাল বাসিতে হইবে না, কিন্তু সেই ভালবাসা এরূপ হওয়া চাই না যাহাতে তার সারা জীবনটাই মাটী হইয়া যায়। ইহা ত প্রকৃত ভালবাসা নয়—এ যে মাতাপিতার পক্ষে সন্তানের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুরতারই পরিচয়। শুনিয়াছি, বানরের বাচ্চা হইলে বানরী তাহাকে এরূপ সোহাগ করা সুরু করিয়া দেয় যে সেই সোহাগের চোটে বেচারার আত্মারাম খাচা ছাড়া হইয়া যায়! এরূপ উৎকট ভালবাসা ত চাই না। ভাল বাসিয়া একেবারে মাথায় তুলিয়া দেওয়াও যত বড় দোষের, শিশুর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া নিজেদের হুকুম মান্য করানও ঠিক ততখানি দোষের। তাহাকে স্বেচ্ছাচারীও করা চাই না, তাহাকে ক্রীতদাসও করা চাই না।

অতএব আমাদের শিশু-শিক্ষার মূল নীতি হইবে—"Neither slaves nor Tyrants." অর্থাৎ তাহাকে একেবারে ক্রীতদাসও করা চাই না, অথবা একেবারে স্বেচ্ছাচারী "আল্লাদে"ও করা চাই না।

গোলামমোস্তফা

গান্ধী জয়

আজি ত্রিংশ কোটী গলে
বারিধি কলকলে
গান্ধী জয় রোল গরজে ঘন ঘন!
স্তব্ধ চরা চরে
পবন থর তরে
সে সাড়া বুকে করে ছুটিয়ে শন শন!
প্রতিধ্বনি তারি বধির কাণে কাণে
গমকি বেজে ওঠে, অধীর প্রাণে প্রাণে
পুলক নেচে ওঠে বিপুল কলতানে,
শক্তি ওঠে জাগি দৈব সচেতন!
দাসের ভীতি হয় মুক্তিরণবাজা বাজেরে রণ রণ!
গান্ধীজয় বাণী লোটেরে দিশি দিশি,
অন্ধ বুকে বুকে কাটেরে অমানিশি,
অরুণ উষা হাসে কিরণ বিথারিয়া—
সত্য-শতদল ফোটেরে সুশোভন!
মধুর ওঙ্কার গাহেরে জাগ্রত স্বরাজ সনাতন!
দুঃস্থ সন্দেহ খলিত পলে পলে,
চমকি স্তম্ভিত মিথ্যা পশুবলে,
হিংসা কেঁদে মরে ব্যর্থ পরিহাসে,
ভক্তি ভরপুর বিশ্বজন-মন!
গান্ধীজয় কার তোলেরে বিস্ময়ে নিখিলবাসিগণ!
ভারতে হুঙ্কারে সকলে তুলি বাঁধা,—
সত্য-স্বার জয় জয় হে স্বাধীনতা,
জননী জয় জয় ভক্তগণ জয়,
জয় হে প্রেমময় অসুর নিসূদন!
গাহরে অসুখন
গাহরে গাহ আজি সুপ্তিভঞ্জন মুক্তিস্বনন
দীপ্ত জল জল আত্মতেজোময়
গান্ধী জয় জয়, ধর্ম্ম জয় জয়!
ভারতসুত জয়! জয় হে!

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক।

---

* গত ১৫ই মাঘ বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

উচ্চ জীবন

(৪)

পিতৃ-মাতৃ ভক্তি

হজরত মোহম্মদ বলেছেন—মায়ের পায়ের তলে স্বর্গ। তিনি আবার বলেছেন—মা বাপের চেয়ে খোদাই তোমার বেশী আপন।

পিতা মাতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তবে সেখানে তা না করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পিতৃ-মাতৃ ভক্তি। মায়ের ভিতর যে সত্য রয়েছেন তাকেই মেনে নিতে হবে।

উড়িষ্যায় একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মানুষ না খেতে পেয়ে মরছিল। প্রথমে টাকা খরচ করে' চাল পাওয়া যাইত, শেষে চালেরও অভাব হ'ল। মানুষ পথে বাহির হ'ল কিন্তু সবারই যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। কে কাকে অন্ন দিবে? এর পর মানুষ গাছের পাতা খাওয়া আরম্ভ করলে। শেষে তাও ফুরিয়ে গেল। সে দেশে একটা ছোট উড়িয়া পরিবার ছিল।—দুটী ছেলে আর পত্নী। বাপ তাদের কষ্ট সহ্য না করতে পেরে একদিন কোন দিকে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না। যা কিছু ছিল সব বিক্রয় করে ফেলা হ'ল, তবুও ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল না। মানুষ ঘা তা খেয়ে, জ্বর কলেরায় মরে যেতে লাগ্‌ল। শেষে দেশে কিছুই রইল না, কেবল রইল উত্তপ্ত বালী আর রৌদ্র। একদিন ছোট ছেলেটি ভিক্ষায় বের হয়ে সেও আর ফিরে এলো না। মা ক্ষুধা ও ব্যাধি যন্ত্রণায় বিছানায় পড়লেন। তিনি প্রথমে ২।৩ দিনে সামান্য কিছু মুখে দিতেন, এখন তাও দেন না। দুর্ব্বল অস্থিসার শরীরে কাঁদবার শক্তি ও ছিল না। বড় ছেলে ভিক্ষা করে যে দুই এক মুঠা পায় তাই এনে মাকে খাওয়ায়।—সে নিজে কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না। মায়ের জন্য অশ্রুতে তার চোখ ভেসে যায়। মা না খেতে চাইলে সে অনুনয় ক'রে তাকে খাওয়ায়। না খেলে কাঁদতে থাকে। ছেলেটার নাম সনাতন।

এই ভাবে দুই চার দিন গেল। একদিন সনাতন ভিক্ষায় বের হলো মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সে ঘুরছিল আর মায়ের কথা ভাবছিল। সে ভাবছিল—এতদিন মাকে বাঁচাতে পেরেছি, আজ আর পারবো না, মা নিশ্চয়ই মরে যাবে, খোদা একমুঠা চালের জোগাড় তুমি করে দাও। মা আমার পথ চেয়ে আছে। পিতা কোথায় চলে গেছেন, ভাই ও ভিক্ষায় বের হয়ে আর ফিরে এলো না।

সেদিন সনাতনের চরণ জড়িয়ে আসছিল, তবুও সে হাটতেছিল।

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীর দুয়ারে এসে সে ভিক্ষা চাইল। ব্রাহ্মণ বড় দয়ালু, কিন্তু তা হলে কি হয়? তার ঘরে ও বেশী কিছু ছিল না। বালকের শীর্ণ চেহারা দেখে বল্লেন, বাবা আমরা যা রেঁধেছি তারই এক মুঠা তোমায় দিচ্ছি,—কিন্তু এত অল্প অন্নে

তোমার কি হবে? সনাতন বল্লে—আমায় তাই দিন, তাই আমি নিয়ে যাব। ব্রাহ্মণ সনাতনকে বসতে বলে বাড়ীর ভেতর থেকে কিছু ভাত এনে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় বসে খাবে?

সনাতন বল্লে—আমি খাব না। সঙ্গে নিয়ে যাবো। ব্রাহ্মণ বল্লেন—সে কি? এত অল্প ভাত কোথায় নিয়ে যাবে? এখানে বসেই খাও।

সনাতন বিনীত ভাবে বল্লে—না মহাশয়, একমুঠা হলেও আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে, বালক বল্লে—মা আমার তিন দিন না খেয়ে ঘরে পড়ে আছে। মায়ের কথা বলতে বেয়ে সনাতন কেঁদে ফেল্লো।

ব্রাহ্মণ বালকের কথা শুনে নিতান্ত ব্যথিত হলেন। এবারে তিনি কিছু বেশীকরে ভাত আনতে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন দুর্ব্বল শরীরে হঠাৎ মানসিক উত্তেজনায় সনাতন মাটীতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। শরীরে তার প্রাণ নাই।

সনাতনের অতুলনীয় মাতৃভক্তি চিরকালই মানুষের ভক্তি অশ্রু আকর্ষণ করবে।

পিতামাতা অনেক সময় ছেলেদিগকে অবাধ্য বলে গালী দিয়ে থাকেন। ছেলে যদি অবাধ্য হয় তবে তার কারণ পিতামাতার জ্ঞানের অভাব। বুদ্ধিহীন সৈন্যাধ্যক্ষ যেমন সৈন্যদিগকে চালনা না করতে পেরে, নিজেদেরই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন, পিতামাতাও তেমনি অবাধ্য ছেলের নিন্দা করে নিজেদের হালকামীর পরিচয় দেন। মানুষ সব জায়গাতেই মানুষ; অন্যায় রকমে আঘাত পেলেই সে ক্ষেপে উঠবে। কিরূপ ব্যবহার করলে ছেলেরা চরিত্রবান, বিনয়ী ও ভক্তিমান হয়ে উঠে, তা এখানে বলা কঠিন। একদিক হতে কোনকালে ভক্তির উৎস বয় না। স্নেহ, বিচক্ষণ ব্যবহার ও নিরন্তর সন্তানের মঙ্গলকামনা ছেলেমেয়েকে বাধ্য করতে সক্ষম। শিশু ও ছেলেমেয়েরা বিচক্ষণ গণি নয়, মুরুব্বীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, তা তারা জানে না। পিতার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা তারা চিন্তা ও যুক্তি তর্ক না করেই দেবে। শিশু ও যুবকের মনকে যুক্তি দিয়ে বশ করতে যাওয়া বড়ই ভুল। ক্রুদ্ধ হলে ছেলেরা আল্লাকে অপমান করতে ইতস্ততঃ করে না, সে যে অবোধ!

অতিরিক্ত স্নেহে অনেক সময় পুত্র কন্যাদের নৈতিক অধঃপতন হয়—পিতামাতার অসত্যতার এই জন্যেই বুঝতে পারে না। লোকে বলে—চোরের পুত্র চোরই হয়ে থাকে। পিতামাতার স্নেহের শক্তি এত বেশী যে, তা ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মানুষকে কঠিন ভাবে আঘাত করলেও সে তার পিতামাতার সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। তাই অনেক সময় পিতা বা মাতার রূঢ় ও কঠিন ব্যবহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মানব জীবনের সমূহ কল্যাণ করে থাকে।

পিতা কঠিন আঘাত করছেন সন্তানকে তা কিন্তু নীরবে মেনে নিতে হবে। অসহ্য হ'লে দূরে সরে যেতে পার, তার সঙ্গে কলহ বিবাদ করা কাপুরুষতা। বিয়ে হ'লে পুত্রবধূর সঙ্গে কোন কোন স্থলে পিতার মিল হয় না, ফলে পুত্রের সঙ্গেও অনেকটা অপ্রীতিকর সম্বন্ধ এসে

জোটে। বহু অপদার্থ মানুষ পিতৃভক্তির ভুল অর্থ বুঝে পিতার মনোরঞ্জনের জন্যে পত্নী ত্যাগ করে। এদের মত পিতৃদ্রোহী আর নাই। পিতার ভিতর যে সত্যপিতা রয়েছেন, তাকেই মানতে হবে। পিতার অসত্যকে বরণ করে অনেক পিতৃভক্ত (!) সন্তান পিতার আদর লাভ করে, এরা সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করলেও এদের মূল্য খুব কম। পুরুষের নিঃসহায় পত্নীর প্রতিও একটা কর্ত্তব্য রয়েছে।

পিতামাতার অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, অন্নাভাবে তাঁরা যদি উপবাসী থাকেন, তা হ'লে তাঁদের জন্য সম্পদশালী ব্যক্তির অর্থ প্রয়োজন মত না বলে নিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু তা যদি না হয় তবে পিতার অর্থ-লালসা বা তাঁর সুখের জীবনযাপনের জন্যে তুমি অধর্ম্ম করে পয়সা উপায় করতে পার না। তাতে তোমার পিতা যদি তোমায় অভিশাপ দেন কোন ক্ষতি নাই।

মিবারের রাণা মাড়বার রাজকন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। যখন কথা হচ্ছিল তখন রাণা রহস্য করে বলে ছিলেন—আমার মত বুড়োর হাতে আর কেউ মেয়ে দেবে না। এই রহস্যের মাঝে এতটুকু দুর্ব্বলতা ছিল না পুত্র সে কথা শুনে বল্লেন—আমার বাপের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হোক।

পুত্রের কথা শুনে রাণা ছেলেকে ডেকে বল্লেন—আমি বুড়ো হয়েছি, তোমাকেই এখন সংসারী হয়ে সব ভার নিতে হচ্ছে। পাগলের মত এ কি কথা বলছো?

পুত্র বল্লেন—আমি এ মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না।

রাণা কিছু বিরক্ত হয়ে পুনরায় বল্লেন—দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ে না করে কি কাণ্ড হবে, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?

পুত্র পুনরায় বল্লেন—আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব। ক্রমে রাণা ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে দিনও ঘনিয়ে আসছিল। রাজকন্যার নির্দ্দিষ্ট দিনে বিয়ে হওয়া চাই, নইলে সর্ব্বনাশ হবে। রাণা আর একবার পুত্রকে ডেকে তাকে বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে বল্লেন। এবার রাণা কঠিন ভাবে বল্লেন—পুত্র তবুও অসঙ্কোচে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ কল্লেন। এবার রাণা কঠিন ভাবে বল্লেন—বেশ, আমিই এই বালিকাকে বিয়ে করছি কিন্তু ঠিক জেনো এর গর্ভে যদি কোন সন্তান হয় তবে সেই সিংহাসনে বসবে। পুত্রকে ভয় দেখিয়ে পথে আনবার জন্যেই রাণা এ কথা বলেছিলেন কিন্তু তবুও পুত্র পিতার মতই কঠিন ভাষায় বল্লেন—ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি আপনার সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করলাম।

মা মরলে পিতা অনেক সময় দ্বিতীয় বিয়ে ক'রে থাকেন, এতে অনেকেই বিরক্ত হয়,—নূতন মাকে অপমান ও অপ্রস্তুত করতে আনন্দ অনুভব করে। পুত্রের পক্ষে পিতার প্রতি এর মত দুর্ব্যবহার আর নাই। নূতন নারীকে 'মা' ব'লে তো কোন দোষ হয় না,—এতে মৃত মায়ের প্রতি অসম্মান দেখান হয় না। এ যে মনে করে তার মন খুব ছোট। হারান মার আসন পুরোতে আর একজন নারী যে এলেন, সে জন্য নিজকে সৌভাগ্যবান মনে কর। মানুষ পথের নারীকে মা বলে আনন্দ অনুভব করে, আর তুমি তোমার পিতার পত্নীকে মা বলতে সঙ্কোচ বোধ কর?

নূতন মা ছেলেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, এ কথাটাও অন্যায়। বর্ব্বর সমাজে শুধু মা বলে নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কঠিন ব্যবহার করতে আনন্দ বোধ করে। আপন মৃত মায়ের মত নূতন মায়ের সহ্য করার ক্ষমতা না থাকতে পারে। সে যদি দৌরাত্ম্য সহ্য না করতে পেরে শিশুকে একটু মারে, সে জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তার স্বভাব ও মন নিষ্ঠুর নয়। পর বলেই মানুষ পর হয়ে যায়। তৃষিত পথের কুকুরকে মানুষ পানি দেয়, নিজের স্বামীর পুত্র কন্যাগণকে নারী কেন ভালবাসবে না? মানুষ প্রেম হতে জন্মেছে, ভালবাসা তার স্বভাব।

সৎমাকে সৎমা বলে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করো না। মায়ের মৃত্যুর পর পিতার বিবাহে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। বাপ বুড়ো হয়ে গিয়েছেন এ বয়সে তাঁর বিয়ে করা অন্যায়, এ সমস্ত কথা বলা নিতান্তই অভদ্রতা। বুড়ো মানুষের বালিকার সঙ্গে বিয়ে আমি সমর্থন করছি না। নূতন মায়ের ছেলে হলে, তারা সম্পত্তির অংশ পাবে এই ভয় পোষণ করাও নীচাশয়তা। বাপের সম্পত্তি ভোগ করার জন্যে, তোমার এত লালসা কেন? যতদিন নিঃসহায় ছিলে, তত দিনই তোমার অপরের সাহায্য প্রয়োজন ছিল। যে সমস্ত পুত্র পিতার সম্পত্তির লোভে ক্ষুধিত শৃগাল হয়ে বসে থাকে, তারা অপদার্থ। বিশ্বকে মানুষ সর্ব্বস্ব দান করছে, তুমি তোমার ভাইকে তোমার নিজের অংশ দিতে কষ্ট বোধ করবে কেন? হোক না যত ইচ্ছা ভাই বোন তাদের সকলকে নিয়ে এস নামের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর।

মৃত মায়ের সম্পত্তি নিয়ে অনেক পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য হয়। পুত্র পিতার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করতে কষ্ট বোধ করেন না। শিশুকালে যে একবার তোমায় চুমো খেয়েছে তার কাছে তুমি কতখানি ঋণী, আর পিতা কলিজার স্নেহ দিয়ে তোমায় পালন করেছেন তাঁর সঙ্গে কি কোন আড়ি করা যায়? পিতা যদি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে পুত্রকে দূর হয়ে থাকতে বলেন তবে নীরবে তাঁর ইচ্ছা মতই কাজ করতে হবে, তার প্রতি ক্রোধ পোষণ করা ঠিক নয়।

অত্যধিক পিতৃভক্তিতে পত্নী ত্যাগ করা কিংবা পত্নীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিও না। এর নাম মনুষ্যত্ব নয়; পত্নীর দাবী শোধ দিবার জন্য যদি পিতাকে অসন্তুষ্ট করতে হয়, তবে তা করতে হবে।* যদি পত্নীর সম্ভ্রম রাখবার জন্যে জমিদারী ত্যাগ করতে হয় তাতেও তোমার মনুষ্যত্বের অবমাননা হবে না। পিতার খেয়ালের মূলে একটা মানুষ হত্যা করা মানুষের ধর্ম্ম কখনও অনুমোদন করে না।

পিতার মৃত্যুর পর নূতন মায়ের প্রতি কখনও অসদ্ব্যবহার করবে না। এরূপ করা কাপুরুষতা।

সামান্য সামান্য ব্যাপারে পুত্র কন্যারা পিতামাতার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে, তা পিতামাতারই তাদের শিশু অবস্থায় শেখান কর্ত্তব্য নইলে এসব তারা কোন কালে নিজে শিখবে না।

* আমরা এই স্থলে লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। সং।

মা যদি অল্প বয়সে বিধবা হন, তবে তাঁকে পুনরায় বিয়ে করতে বলা উচিত। এতে কিছুমাত্র অসম্মান বা লজ্জা নেই। হীনব্যক্তির ঘরে মেয়ে যদি তার কোন অসম্মান হবার ভয় থাকে তবে সেজন্য অভিভাবক হয়ে পূর্ব্ব হতেই মাকে সতর্ক করবে, তাই বলে তাঁর স্বাধীন মতের উপর হস্তক্ষেপ করো না। যারা এবিষয়ে কোনও প্রকার বদমেয়াজি করবে তারা নিতান্তই ঘৃণিত জীব।

পুত্রকন্যা যেদিন ভূমিষ্ট হয়, সেদিন মনে ভেবো,—আজ আল্লার বান্দা আমার ঘরে এসেছে, না জানি খোদা তাকে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে জগতে পাঠিয়েছেন। আমি পিতা নই,—আমি আল্লার বান্দার সেবক। যে পিতা তার পুত্র কন্যাগণ সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করতে পারেন, তিনি কত বড়,—তাঁর পুত্রেরা মহাপুরুষ হবে না কেন? জনক জননীর জন্যে তারা অকুতোভয়ে হাসতে হাসতে তলোয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুকে পালন করো, সে বড় হয়ে তোমার জন্যে হৃদয়ের রক্ত দেবে।

মা যদি বিধবা হন, তবে দিনের মধ্যে বসে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ করা চাই। বউ নিয়ে যদি বিদেশে থাকতে হয়, তা হলে মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ব্যতীত তাঁকে একাকিনী বাড়ীতে ফেলে রাখবে না। বৃদ্ধ বয়সে নারীর একমাত্র অবলম্বন পুত্র তার সঙ্গ হতে বঞ্চিতা থাকা তার অবলম্বনহীন জীবনে খুবই বেদনার কথা। অনেক মা নিজের সুখের কথা না ভেবে, অনবরত পুত্রের মঙ্গল ও সুখের কথা চিন্তা করেন। এই জন্যেই মায়ের কথা বেশী করে ভাবতে হবে।

বিয়ের পর কোন কোন পিতামাতা মনে করেন ছেলে পর হয়ে গিয়েছে,—পুত্র বধূর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ক'রে পুত্রের মনকে নিতান্ত অস্থির করে তোলেন। জীবনের এই অবস্থাটা বড়ই সঙ্কটাপূর্ণ। নানা দ্বন্দ্বি করে, পিতামাতা ও পত্নী উভয় পক্ষেরই মন রক্ষা করতে হবে। পিতামাতা যতই কেন অন্যায় কথা বলুন, তার বিরুদ্ধে সন্তানের কিছু বলবার নেই। মনের কষ্ট বুকে চেপে রেখে, সবই নীরবে সহ্য করতে হবে। পিতামাতার সঙ্গে কদাপি কোষপূর্ণ বাক্য ও উগ্র ব্যবহার করবে না। সন্তানের পক্ষে ইহা বড়ই অগৌরবের কথা।

এক রাজা বেড়াতে বের হয়ে প্রজাদের অবস্থা দেখিতেন। প্রজারা নানা উপহার দিয়ে রাজা রাণীকে সম্মান জানাচ্ছিলেন। এক বৃদ্ধ তার সাতটী পুত্র এনে রাজাকে বল্লেন—হে সত্যের প্রতিনিধি আমার আর কিছু নেই, দেশ কল্যাণের জন্যে আমার এই সাত পুত্র আপনাকে উপহার দিচ্ছি।

রাজা বৃদ্ধকে বল্লেন—আপনার এই দানের চেয়ে আর কোন দানই শ্রেষ্ঠ হয় নাই। আপনার এই শ্রেষ্ঠ উপহার আমি মাথায় পেতে নিচ্ছি। সত্যের সেবকের কাছে সত্যের সৈনিকই শ্রেষ্ঠ উপহার।

যে পিতা দেশ কল্যাণের জন্যে পুত্রগণকে দান করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পিতা। যাদের এমন পিতা পাবার ভাগ্য হয়েছে, জীবন তাদের সার্থক। পিতার মঙ্গল উদ্দেশ্যের মুখে যদি জীবন বলি দেওয়া যায় তবে তার মত

পিতৃ ভক্তি আর নাই। হজরত এব্রাহিম যখন বল্লেন, পুত্র, সত্য তোমাকে আহ্বান করেছে, তোমার হৃদয় রক্ত দিয়ে সত্যের মর্য্যাদা রাখতে হবে। শিশু তখনই বল্লে—বাপ এতেই তো জীবনের সার্থকতা।

সত্যের জন্যে তোমার যা কিছু আছে সব উৎসর্গ করতে হবে। কারবালার মরুমাঠে তৃষ্ণায় এক এক করে মরতে হবে তথাপি অসত্যকে নমস্কার করতে পার না।

যে পিতা জীবনকে এমন করে সার্থক করে দেবার জন্যে আহ্বান করেন, তিনি ধন্য। এস বিশ্বের সকল সন্তান তাঁকে সালাম করি।

পিতাকে ভক্তি করি কেন? তিনি আমার শরীরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই-জন্যে মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে, তার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনকে সুখী করতে পেরেছে, এই জন্যে? আমি তার উপার্জ্জিত অর্থে আরামের পথ নিরাপদ করতে পেরেছি এইজন্যে? না, না, না—সে জন্যে নয়। আমি চাই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, আমি চাই পানার প্রত্যা-বর্ত্তন। মানুষের সত্য জীবনের উদ্ধার—আমি চাই অবিচারের অপমান, আমি চাই দুঃখের অবসান।—আমার সাধনাকে আমার পিতা তারস্বরে মনে করিয়ে দিয়েছেন,—এ জীবন ব্যর্থ হবার নয়। এ সোণার জীবন মাটি করে দেবার নয়। আঁধার রাতে, আমার পিতা আমার পাশে জীবনের মহা সঙ্গীত শুনিয়েছেন, আমি স্পন্দিত প্রাণে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ভয় নাই, তুমি থাক,—এই আঁধার সাগর পাড়ি দিয়ে তোমাকে আলোকের রাজ্যে দাঁড়াতে হবে—তুমি অনন্ত,—বিনাশ তোমার নাই,—তুমি বিরাট,—তুমি ছিলে—তুমি আছ—তুমি থাকবে। আমার দেহ, মন, প্রাণ, রক্ত, শিরা সবগুলি তরল হয়ে পিতার চরণ সিক্ত করেছিল।

এমন পিতার বিদ্রোহী সন্তান হয়ে কি আমি নিজকে হত্যা করতে পারি? তা হলে বিশ্বের সকল গান যে আজ থেমে যাবে। আজ আকাশ বাতাসে কেবল ক্রন্দন জেগে উঠবে।

তুমি পিতাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াও, মাতাকে বহুমূল্য পোষাক দাও, আজ্ঞা পালনের জন্য নত মাথায় তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে থাক, এই দেখেই আমি তোমাকে পিতৃমাতৃভক্ত বলতে পারবো না। আমি জিজ্ঞাসা করবো—তোমার স্বভাবে কলঙ্ক আছে কি না? তুমি চরিত্রবান কি না? মানুষ তোমার সংগুণের কথা বলে কি না? তোমার স্পর্শে এসে নর নারীকে বিপন্ন হতে হয় কি না? মানব শিশুকে তুমি স্নেহ কর কি না? যদি কোথায়ও কোন উত্তর না পাই—আমি বলবো তুমি পিতৃমাতৃ ভক্ত নও—তুমি বিদ্রোহী অভাগা।

দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে পিতা-মাতার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে না—ভুল করে তা যেন কেউ মনে না করেন।

এক ভদ্রলোক সভার মাঝে বলেছিলেন, আমি আমার সন্তানগণকে দেশের কাজে দান করলাম। সন্তানেরা বন্ধুবান্ধবের কাছে ব'ল-ছিলেন—পিতার ইচ্ছায় আমরা আমাদের জীবন নষ্ট করতে পারিনে। এরা বৃদ্ধ পিতাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন, তারা পিতার সর্ব্ব প্রকার সুখের ব্যবস্থা করে দিতেন, তবুও এ

দিগকে পিতৃভক্ত বলতে আমার সঙ্কোচ হয়। যে পুত্র পিতার জড়দেহের সেবা করেই তৃপ্তি লাভ করে তার ভক্তি নিকৃষ্ট। পিতার সত্য ও আত্মার বাণীকে যে সাড়া দেয় ভক্তি পথে তার স্থান অনেক উচ্চে। পিতার আত্মার আদেশকে অবমাননা ক'রে যে তার দেহের সুখ, বিধান করে সে কাপুরুষ, পিতার আশীর্ব্বাদ পাবার উপযুক্ত সে নয়। লোক মুখে অনেক সময় শুনেছি, দরিদ্র পিতা পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, পুত্র লজ্জা ক'রে বন্ধু বান্ধবের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেছেন। পিতা যদি দরিদ্র হন সে জন্য তো লজ্জার কিছু নাই। কার্লাইল সব সময়েই নিজকে চাষার ছেলে বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেছেন। এ জগতে বহু মহামানুষ জন্মেছেন, তাঁরা খুব দরিদ্রের ছেলে। আত্মশক্তিতে, নিজের সাধনায় মানুষ বড় হয়। বাপের দরিদ্র তোমাকে ছোট করে না।

তুমি যদি ছোট লোকের ছেলে হতে তাতেও তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই। হীন চরিত্র পিতামাতার স্নেহ অনেক সময় মানুষকে নীচও ছোট করে রাখে। কিন্তু তোমার মধ্যে যে তোমার পূর্ব্ব পুরুষের নীচতা রয়েছে, সে কথা বলবার আগে আমাকে অনেকখানি ভেবে দেখতে হবে। হীন বংশে জন্মেছ বলেই. যদি কেউ তোমাকে ছোট মনে করে, আমি তাকে ঘৃণা করি। ছোট লোকের ছেলে ছোট হয় কোন সময়ে? যখন তার মধ্যে আত্মশুদ্ধির কোন প্রচেষ্টা না থাকে, বিবেক যেখানে স্নেহের দানে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, যেখানে একটা নিরর্থক দাম্ভিকতা বিদ্যমান থাকে, যেখানে অহঙ্কার নিজের ভুল বোঝবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে আত্মা নির্ম্মল, শুদ্ধি সাধনায় সদাই সজাগ, মনুষ্যত্বের আহ্বানে চঞ্চল সেখানে কি আমি তোমায় ঘৃণা করতে পারি? যে সত্য সাধকের কুৎসা রটনা ক'রে, তাকে দুর্ব্বল করে ফেলতে চায়, তার নামাজ রোজা বৃথা। খোদার সঙ্গে যে আত্মীয়তা করেছে, হউক সে দাসীর ছেলে, তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। খবরদার তাকে অসম্মান ক'রো না।

মা বাপ ছোট হলে, তার পরিচয় দিতে কখনও লজ্জা বোধ ক'রো না। যদি কেউ ঘৃণা করে, তার সঙ্গে তুমি সম্বন্ধ নষ্ট করে ফেলো। যে বন্ধু তোমার বাপকে স্বীকার করে না, তার সঙ্গে তোমার কোন বন্ধুত্ব নাই। বাপের অপমান শুনে, তোমার বন্ধুরা প্রকাশ্যে না হোক অন্তরালে হাস্‌তে পারেন, তা বলেও তোমার লজ্জা বোধ করবার দরকার নাই। তুমি যখন তোমার পাগল বাপের মুরুব্বীয়ানা সহ্য করতে পেরেছ, তখন তোমার বন্ধুরা কি দুই মিনিটের জন্য তা পারবে না? সভার মাঝে হোক, গোপনে হোক পিতামাতার সঙ্গে দেখা হলেই সমাজের রীতি অনুসারে তাঁকে সম্মান জানাবে।*

বাপের নামের সঙ্গে কোন উচ্চ উপাধি নাই বলে লজ্জা বোধ করবার দরকার নাই। তাঁর নাম লিখা অনর্থক একটা মুন্সী উপাধি লাগালে তাঁকে অপমান করা হয়। উপাধি ব্যবহার জিনিসটা নিতান্তই আপত্তিজনক।

* পিতা মাতা ছাড়া অন্য কারো পদ চুম্বন করা নিষিদ্ধ।

নামের সঙ্গে যারা আজকাল চৌধুরী, খাঁও কাজি উপাধি লাগান, তাঁরা হয়ত বলতে চান আমরা অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। খুব বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ লেখকের বংশকে লোকে জমদার বংশ বলে থাকে। জমদার অর্থ স্বর্ণ অথবা ধন সম্পত্তির মালীক। বড় লোক ছাড়া কারো এই উপাধি হয় না। নদীয়া জেলায় অনেক ব্রাহ্মণের এই উপাধি আছে, সুতরাং এ উপাধি ব্যবহার করতে মনে গর্ব্ব ছাড়া লজ্জা আসে না। কিন্তু বিবেকের কাছে অনুমতি চাইলে সে জিজ্ঞাসা করেছে তোমার অর্থ কই? আর অর্থ যদিই থাকে, তবে তা লোকের কাছে প্রচার করা কি প্রকার ভদ্রতা?

কোন সালের টাকা, কে আমাকে দিয়েছে, এ পূর্ব্বে কার বাক্সে ছিল তা আমার জানবার দরকার নেই—আমি শুধু একটিবার তাকে বাজিয়ে দেখবো।

সংসার যখন ভারী হয়ে ওঠে, যখন ছেলে পিলে দাস-দাসী আত্মীয় স্বজনে ঘর ভর্ত্তি হয়ে পড়ে তখন অনেক সময় বুড়ো বাপ মায়ের বড় অসম্মান হয়।

এক বাড়ীতে আমি দেখেছিলাম। পিতার জমিদারী সবাই ভোগ করছে, অথচ সকলের খাওয়া শেষ হ'লে বাইরে অতিথির মত পিতাকে ভাত দেওয়া হয়। খাবার সময় তাঁকে পানী দেবার লোকও থাকে না।

ছেলের মাথার চুল পেকেছে বলে কি সে বাপকে 'বাপ' বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করবে? কে সেই নরাধম? আমি তাকে দেখতে চাই না।

পিতা বা বুড়ো মায়ের অনর্গল বকাবকী শুনে যে ধৈর্য্য হারিয়ে উপহাসের হাসি হাসে, সে অপদার্থ। মানুষ বুড়ো হলে শিশু হয়, শিশুর মতই তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে হবে।

এক ইংরাজ পরিবারে বুড়ো দাদাকে নিয়ে ছেলে মেয়েরা কৌতুক করতো। বুড়োকে যেন তারা বানর বলেই মনে করতো। বুড়োর নিজের ছেলেও যেন এজন্য বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন, বাঙ্গালী পরিবারে বুড়ো দাদাকে নিয়ে যেন কোন কৌতুক রঙ্গ না হয়।

ক্রুদ্ধ হয়ে বাপকে 'বাপ' বলে ডাকতে কখনও লজ্জা বোধ করো না। শিশুকালে কতবার তোমার মা তোমাকে কোলের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, অপমান জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়ে 'মা' 'মা' বলে তার বুকে এসে ঝাপিয়ে পড়েছ, আজ বড় হয়ে, ছেলে মেয়ের বাপ হয়ে সে কথা ভুলে গিয়েছ? জননীর বুকের ক্ষীর ধারা এখনও যে তোমার মুখে লেগে রয়েছে। সম্ভব হইলে জননীর পাশে শেষ শয্যা গ্রহণ করো, তবু মায়ের অঞ্চল ছেড়ো না।

মা বাপ নিচে বসলে তুমি কখনও উচ্চাসনে বসবে না। উপার্জ্জনক্ষম হয়ে মা বাপকে রেখে কখনও দধির প্রথম অংশ এবং মাছের মাথা খাবে না, তোমার ছেলেপিলেকেও দেবে না।

বিপন্ন হয়ে বা ব্যাধি পীড়িত হয়ে যদি তোমার পিতামাতা বিছানায় মল ত্যাগ করেন, তা হলে নিজ হাতে তা ধুঁয়ে দেবে। তোমার পত্নী যদি বুদ্ধিমতী হন তাহলে তিনিও

তোমার সঙ্গে এসে তোমার পিতামাতার সেবা করবেন।

তুমি এবং তোমার পত্নী ছাড়া পুত্র কন্যা দিয়ে পিতামাতার সেবা করাবে না।

পিতার ধন সম্পত্তির লোভ বেশী না ক'রে তাঁর সৎগুণগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে তোমার আগ্রহ যেন বেশী হয়। সেইটেই হবে তোমার যথার্থ পিতৃভক্তি।

মহামানুষকে ভক্তি কর, কিন্তু তার জীবনকে নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে যদি তোমার কোন সাধনা না থাকে, তা হলে তোমার ভক্তির কোন মূল্য নেই। গান্ধী বা বুদ্ধের পূর্ত্ত পূজা করে কোন লাভ হবে না, যদি তাদের শিক্ষাকে গ্রহণ না কর।

বহুমানুষ হজরত মোহম্মদের মহাজীবনের গুণ কীর্ত্তন করে, কিন্তু তাঁর জীবনের শিক্ষাকে তারা মানে না, এর মানে কি ভক্তি? পতিত মানুষ এই ভাবেই মহামানুষের জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবনকেও ব্যর্থ করে।

পিতাকে অন্ধভাবে ভক্তি করেও কোন লাভ নাই, যদি তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্যকে তুমি গ্রহণ না কর। পিতা খুব সাধারণ লোক ছিলেন, তাঁর গুণে ও জ্ঞানে সারা দেশের লোক মুগ্ধ ছিল, তাঁর নামে দেশ হাই ফিরত— এই সমস্তগুলি ক'রে কাপুরুষতার পরিচয় দিও না। তোমার এই সমস্ত অহঙ্কারের গলাবাজী শুনে মন বিরক্ত হয়ে উঠে।

পিতা মহাজন ব্যক্তি ছিলেন, সে কথা লোক সমাজে প্রচার করে নিজেরই পৌরুষতা বাড়াতে চেষ্টা করো না। পিতার চেয়েশ্রেষ্ঠ হয়ে তাঁর আত্মার তৃপ্তি সাধন কর, এই আমরা চাই।

উন্নত জীবনকে অনুকরণ করে কত অপরিচিত পথের মানুষ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করছেন আর তুমি পুত্র হয়ে পিতার জীবনকে অনুকরণ করতে পারবে না? পিতার চেয়ে জীবন্ত আদর্শ আর তোমার সম্মুখে কে? অনেক স্থলে দেখা যায়, যাদের মহিমা ও কর্ম্ম শক্তিতে জগৎ স্তম্ভিত তাঁদের পুত্রগুলি অপদার্থ। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কি হতে পারে? জ্ঞানে, গুণে, পদমর্য্যাদায় পিতাকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা তুমি কর। তোমার এ কল্পনায় তোমার পিতা যে কত সন্তুষ্ট হবেন, তা বলা যায় না। তুমি যে তোমার পিতারই প্রতিচ্ছবি।

পিতার অজ্ঞানতার দরুণ, বহু মানুষের জীবন বিফল হয়ে যায়, এও সত্য কিন্তু সে কথা তোলবার অধিকার পুত্রদের নাই। যে অবস্থাই হোক না, মানুষকে সকল অবস্থার ঘাড়ে চড়ে জীবনের পথ কেটে নিতে হবে। বাধা, বিপত্তি সকল প্রকার অন্তরায়কে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে।

যুবক বয়সে জীবনে একটা বড় বিপদ আসে, সেটা হচ্ছে অহঙ্কার। পল্লীর দীন দীন-মা বাপের কুটীর ছেড়ে সহরে এসে প্রাসাদবাসী বন্ধুদের সঙ্গে মিশে মনের গোপন কোণে অজ্ঞাতসারে একটা অহঙ্কার জাগে। বাড়ী যেয়ে ময়লা কাপড় পরা দরিদ্র পিতামাতা, ছিন্ন বসনা ভাইবোন, পল্লীবাসীদের অশুদ্ধ ভাষা, অনুন্নত জীবন দেখে মন অহঙ্কারে বলে ওঠে, বড় বিরক্তি কর। যখন উচ্চজ্ঞান ও উচ্চস্তরের লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে, তখন সাবধান আপনার জনের সঙ্গে কখনও দাম্ভিক ব্যবহার করো

না—বাপ মার সঙ্গে কখনও উগ্রভাবে কথা বলো না। অসভ্য ভাইবোনদের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করো না, এতে তোমার মনের দীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিয়ের পর অনেক সময় পত্নী গর্ব্বে অহঙ্কারে মা বাপকে বাধা দিতে পারেন। গরীবের ছেলে বড় ঘরে বিয়ে করে পত্নীর মনে এরূপ অহঙ্কার আসা সম্ভব।

গরীবের ছেলের পক্ষে উচ্চ ঘরে বিয়ে করতে যাওয়া মূর্খতা ও লজ্জাজনক। যারা তোমার পিতামাতাকে এতকাল বংশ মর্য্যাদায় ছোট বলে মনে করে এসেছে, তোমার যদি আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকে, তা হলে সম্মানের আশায় তাদের ছায়া স্পর্শ করো না। বিয়ে ক'রে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করার মত অপমান জীবনে আর নেই।

স্বামী যদি বিলক্ষণ টাকা উপায় করেন, অথবা পত্নী যদি অর্থশালিনী হন, তা হলেও তিনি তার মনে অহঙ্কার আনতে পারে। সাধারণতঃ নারীর মন অনুন্নত। অনুন্নত মানুষ অর্থ ও ক্ষমতা পেলে, তার স্বভাব তো কিছু উগ্র হবেই। পত্নীর ব্যবহারে যদি পিতামাতা কিছু আহত হয়ে থাকেন, তা হলে সাধ্যমত বাপ মায়ের সন্তোষ বিধান করবে, তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করবে। এসম্বন্ধে পত্নীর সঙ্গে কোন কথা তুলবে না, তাতে বিপরীত ফল ফলবে। মাতাপিতার প্রতি তোমার ভক্তি দেখে তোমার পত্নী নিশ্চয়ই লজ্জিতা হবেন। যদি এতেও কোন ফল না হয় তবে পত্নীকে কৃপার পাত্র বা বুদ্ধিহীনা মনে করে তার কথাকে সকলকেই অগ্রাহ্য করতে হবে। তার সঙ্গে পিতামাতা সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই নীরব হয়ে যাবে। এই সমস্ত কথা নিয়ে মনকে নিরন্তর শান্তিহীন করে তোলাও ঠিক নয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা যদি তাঁর সম্পত্তি কোন শুভকার্য্যে দান ক'রে যেতে চান, তা হলে কদাপি তাঁকে বাধা দেবে না। বরং এই সমস্ত কাজে পিতাকে উৎসাহ দেবে। মানুষের অভাব কোন কালেই পূর্ণ হবে না। যদি কেউ দান করবার শুভ কল্যাণ পোষণ করেন তবে তাতে বাধা না দেওয়াই ঠিক। পুত্র এবং কন্যাদের জন্য সম্পত্তির কতটুকু রাখা দরকার তা পিতাই ঠিক করে নেবেন। পুত্রকন্যাকে ভিখারী করে যাওয়া পিতার পক্ষে খুবই কষ্টকর। তবে ছেলেমেয়েদের জন্য সর্ব্বস্ব না রেখে, যদি কিছু সম্পত্তি দীন দুঃখী বা কোন সদনুষ্ঠানে দিয়ে যেতে তিনি চান, তাতে পুত্রকন্যার মনে আনন্দ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পুত্র কন্যার জন্যে মানুষ কত পাপই না করে। জীবন ভরে রাশি রাশি অর্থ জমিয়ে মানুষ রেখে যাচ্ছে, কেবল ছেলে মেয়েদের জন্যে জাতি যখন মানুষের ছেলে মেয়ের কথা ভুলে, শুধু নিজের ছেলে মেয়ের কথা বেশী ভাবে, তখন বুঝিতে হবে তারা পতিত।

দুটী যুবকের কথা জানি, তারা ঝগড়া করে বাপকে বন্দুক দিয়ে খুন করে ফেলেছিল। পিতার গালী ও দুর্ব্যবহার সহ্য করবার মত বল যদি বুকে না থাকে, তা হলে বাড়ী ছেড়ে দূরে দেশে চলে যাও, সেও ভাল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ নেই। নিজকে হত্যা করে মহা অন্যায় করো না। জগতে বাপকে কেউ হত্যা করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত

বিরল। সংসারের সমস্ত অর্থ যদি লাভ হয়, তা হলেও এমন কাজ করা যায় না।

আর দুটো যুবককে জানি, তারা বাপের সঙ্গে কথা বলে না। সর্ব্বত্র বাপের কুৎসা প্রচার করে বেড়ায়। পিতা যদি সর্ব্বত্র পুত্রের কুৎসা বর্ণনা করেন, তবুও মানুষের অপবাদ সহ্য করে, চুপ করে থাকাই উপযুক্ত পুত্রের কাজ। পুত্রকে বুঝতে না পেরে পিতা অন্যায় আচরণ করতে পারেন, তাহা বলে তুমি পিতার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করতে পার না। যদি তুমি তাই কর, তা হলে তোমার পিতৃ ভক্তির পরীক্ষা হবে না। মনুষ্যত্বের জন্য বেদনা সহ্য করলে বড় মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হবে।

মা বা মানুষের সম্পত্তি লাভ ক'রে অনেক পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। এরূপ বিদ্রোহী হওয়াতে জীবনের গৌরব কতখানি নষ্ট হয়, তা ভাষায় কেমন করে প্রকাশ করবো! পিতা নূতন বিয়ে করেছেন, তিনি অত্যাচারী অবিবেচক এ সমস্ত কথা কোন মানুষের কাছে বলবে না। পিতা হাজার অত্যাচারী হলেও তাঁর নিন্দা পুত্রের মুখে শোভা পায় না। সর্ব্বদা নিজকেই অপরাধী বলে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে। তাতে কোন দোষ নাই। আর এরি নাম পিতৃ-ভক্তি।

পিতার নব বিবাহিতা পত্নীর নিন্দা প্রচার করাও দোষের বুক ভেঙ্গে যদি বেদনা গুমরে ওঠে, জনহীন আকাশ তলে, অথবা নির্জ্জন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদো, কিন্তু এই অন্যকে ক্ষমা করো না। চিত্তকে ডেকে বলো ওরে মন, পিতার সুখেই কি তুমি সুখী হতে পার না? কেন এ দুর্ব্বলতা কেন এ ছেলেমী? যদি মৃত মায়ের কথা মনে হয় তা হলে মনকে বলো মন, এ জগতে অনন্ত মানুষ এসেছিল, এখন কোথায় তারা? সবাইকে যেতে হবে, কেন বৃথা এ আঁখিজল?

কোন কারণে পিতার কাছ থেকে যদি দূরে থাকতে হয়, তা হলে সুযোগ সুবিধা পেলেই পিতার সঙ্গে দেখা করো। নূতন মাকে শ্রদ্ধা জানাতে যেন কোন ভুল না হয়। বাপ মায়ের কাছে সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে ফেলে দাও। পিতা যদি অজস্র গালী দেন, তবে তাই শোনবার জন্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। পুত্র হয়ে পিতার কাছ থেকে দূর হয়ে থাকা বিধবার আঁখি জলের মতই করুণ ও অন্যায়। পিতার গালী গুলিতে মনে যেন একটা গোপন আনন্দ হয়, কারণ ইহাই নাম পিতৃভক্তি।

পিতৃভক্তির অর্থ যেন কেউ না বোঝে পিতার ইচ্ছায় নিজের বিবেককে বিসর্জ্জন দেওয়ায় বিবেক অনেক সময় আমাদিগকে ভুল পথে নিয়ে গেলেও সর্ব্বদা তাকেই অনুসরণ করতে হবে। বিবেকের আদেশ পালন না করে মানুষের আর উপায় নাই। বিবেকের অনুবর্ত্তী হয়ে সাধ্য মত আমাদিগকে পিতা মাতার তুষ্টি বিধান করতে হবে।

নিজের চিন্তাও ভাব পিতার কাছে থেকে গোপন করে রাখা ভুল। অনেক সময় পিতাকে শিশু ভেবে বিনয়ে তাঁর কাছে সত্য ও কল্যাণের কথা জানাতে হবে।

সাবধান। পিতার সহিত ব্যবহারে নিজকে কোনও প্রকারে রূঢ় ও অহঙ্কারী ক'রে তুলোনা।

নারী জাতিকে পরের পর করতে হয়। বিয়ের পরদিন হতেই সে স্বামীর পরিবারের একজন হয়ে যায়। পিতার কুলের কারো-প্রতি তার বিশেষ কোন কর্ত্তব্য থাকেনা। বিয়ের পর পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করাই তার পক্ষে কঠিন। যে নারী স্বামীর কথা ভুলে পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয় সে হত-ভাগিনী। সত্য কথা বলতে, পিতা মাতার প্রতি নারী জাতির বিশেষ কোন কর্ত্তব্য নাই।

নারীর একমাত্র প্রভু স্বামী। স্বামী ছাড়া আর কারো কথা শুনতে নারী বাধ্য নয়।

নারী নিতান্ত অসহায় বলে তার মনুষ্যত্ব স্ফুরণ হবার কোন সুযোগ হয় না। সে যা সত্য বলে মনে করে, তা সে করতে সাহস পায়না। সে জীবনে যা বলে ও করে তা নিজের বলা বা নিজের করা নয়। জাতির বিবেক ও ভাব স্বাধীনতা তার কিছু নাই। জীবনের দুরবস্থা ও অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে, সে কার কথা শুনবে, কি ভাবে চলবে কিছুই ঠিক পায়না। যাবৎ না সে চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির স্বাধীনতা পাচ্ছে তাবৎ তার কাছে উচ্চ-জীবনের কথা বলা বৃথা।

পিতা মাতার কথা শুনতে নারী বাধ্য নয়—বলে ব্যথার সময় সুযোগ পেলে নারী প্রাণ দিয়ে পিতা মাতার সাহায্য করবেন।

কোন কোন স্বামী শ্বশুরকে জব্দ করার জন্য পত্নীকে বাপের বাড়ী যেতে একদম বন্ধ করে দেন। এরা বড় নিষ্ঠুর।

কোন নারীর কথা জানি, তিনি যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে পীড়িতা মায়ের সেবা করে-ছিলেন, তা অতি আশ্চর্য্য। দুই তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রম করেও তিনি মাকে বাঁচাতে পারেন নি। অনেক সময় সারাটী রজনী তিনি অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতেন।

কারো কারো পিতা বৃদ্ধ কালে বহুদিন ধরে রোগ শয্যায় শায়িত থাকেন। বাড়ীর সবাই অগোচরে বিরক্তি ভেবে বলে থাকেন, এ বিপদ আর সহ্য হয় না। কতকাল আর এব্যাধি টানতে হবে।

পিতা সম্বন্ধে এরূপ চিন্তা যেন মনে কখনও স্থান না পায়।*

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

---

* বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ১০ই মাঘের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ডাকাত

খুকি যেদিন জ্বরে পড়্‌ল, সেদিন শতদল তার স্বামীর কাণের কাছে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ করে' বলবার শুনিয়ে দিল,—ওগো, এই স্যাঁতসেঁতে পুরনো বাড়ীটা ছাড়, ছাড়, ছাড়: নইলে তুমিও কোনদিন—আরে থাম, আজই বাড়ী ঠিক করে আস্‌ছি,—বলে' হিমাংশু তাড়াতাড়ি 'অফিসে' বেরিয়ে গেল। 'অফিস' থেকে ফিরবার সময়, অনেক অনুসন্ধানের পর বহুকষ্টে মেছোবাজারের এক মুসলমান পল্লীর ভিতর একটা দোতালা নূতন বাড়ী ঠিক করে' এসে পরদিন সকালেই সেখানে উঠে গেল।

···'বোকার উপর ন্যাকের আঁটি'টির মত হিমাংশুর পাঠ্যাবস্থাতেই এই 'শতদল'টী তার ঘাড়ে এসে পড়ায়, খুব তাড়াতাড়ি তাকে বিদ্যাদেবীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে ফেল্‌তে হ'য়েছিল, আর সেই জন্যই সে আজ অফিসের বড় বাবু না হয়ে—কেরাণী! যাক্, সে জন্যে তার দুঃখও নেই, আফ্‌সোসও নেই। বেশ সুখ স্বচ্ছন্দেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তাদের।

নূতন বাড়ীতে এসেই খুকির জ্বর সেরে গেছে। সেদিন রাত্রে হিমাংশু শুয়ে শুয়ে কি একখানা বই পড়্‌ছিল; আর ঘরের মেঝেতে বসে, বসে, শতদল খুকিকে পড়া মুখস্থ করাচ্ছিল—বড় গাছ, লাল ফুল।

হঠাৎ বইখানা বন্ধ করে হিমাংশু বলে উঠ্‌ল,—হ্যাগা, শুনেছ একটা কথা? নূতন বাড়ীর হুজুগে ত দিব্যি নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে এলে!

শতদল বল্লে,—কি কথা?

—জব্বার বলে' সেই মুসলমান গুণ্ডাটার যে এই পাড়াতেই বাড়ী। ভাখো আবার কোন্‌দিন কি করে বসে।

গুণ্ডার কথা শুনে শতদলের বুকটা হ্যাঁত ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু মনের কথাটা গোপন করে' হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে,—তা যা-ই বল তুমি, আমি কিন্তু এ বাড়ী ছেড়ে' কোথাও যাচ্ছিনে।

—আমার যে বড্ডো ভয় হচ্ছে।

—কেন?

একটু রসিকতা করে' হিমাংশু বল্লে,—তোমার জন্যে। শতদলও মুচ্‌কি হেসে বল্লে,—আমায় চুরি করে নিয়ে যাবে বুঝি সে? ঠিক সময় 'অফিসের' ভাত পাবে না বুঝি তাহ'লে?...আচ্ছা, আমি যাবার আগে সে ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যাবো। ভেবো না, ঘুমোও তুমি চুপ্ করে'।

সেদিন রাত্রি প্রায় দুটোর সময় শতদল ধড়মড় করে' উঠে হিমাংশুকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে, চীৎকার করে' বলে' উঠল,—ওগো, চোর, চোর, ওঠো আলোটা জেলে' ফেলো শিগ্‌গীর!

হিমাংশু চোখ্ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে

তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠে' ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ্‌টা টিপে দিয়ে ভয়ে ভয়ে বল্লে,—কি, কই, কোথা চোর ?

শতদল তখন বিছানায় বসে' বসে' ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপছিল ; হঠাৎ তার হাতের দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই বলে উঠ্‌ল,—এই যা ! আংটিটা নিয়ে গেছে। এ ঠিক তোমার সেই জন্মার।

—হ্যাগা, হাতে থেকে আংটি খুলে' নিয়ে গেল, আর তোমার এম্‌নি ঘুম, জান্‌তে পার্‌লে না কিছু ?

শতদল কাঁদ কাঁদ সুরে বলে উঠ্‌ল.—হাতে একটা হেঁচ্‌কা টান্ পেয়েই ত উঠে পড়্‌লুম।

—সন্ধ্যাবেলা অমন করে' বলে' দিলুম—দরজাটা বন্ধ করে' শুতে পার নি ?

—তুমিই না সেই বলেছিলে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা না কি একটা ব্যারাম হয় দরজা বন্ধ করে' শুলে;—তাইত আমি দরজা খুলেই রাখি !

হিমাংশু একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে,—নাও ঘুমোও এখন ; আমিই বন্ধ করে' দিচ্ছি দরজাটা।

আচ্ছা,—বলেই শতদল বিছানা থেকে উঠে' হন্ হন্ করে' আপন মনে বাইরে চলে যাচ্ছিল ; হিমাংশু বল্‌লে,—যাও কোথা ?

স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে শতদল বল্লে, —চান করব। কথাটা শুনেই হিমাংশু অবাক হ'য়ে গেল। এই শীতের রাত্রে স্নান ? আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—কেন ? ক্ষেপ্‌লে নাকি, আংটির শোকে ?

শতদল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে,—বাঃ নোছলমান হ'য়ে ওম্‌নি চুপ করে' শুয়ে থাক্‌ব ?

কথাটা শুনে হিমাংশুর বিস্ময়টা রাগে পরিণত হ'য়ে গেল ; সরোষে চোখমুখ পাকিয়ে বল্লে,—এঁ্যা, ধর্ম্মের অবতার এলেন আর কি ! ওই এক মাথা চুল নিয়ে এই শীতের রাতে চান কর্‌লে নিমোনিয়া ত হবেই, তখন তোমার সেই বিধান কর্ত্তারা আস্‌বেন না উদ্ধার কর্‌তে, জানো !

শতদলকে ফিরে আসতে দেখে সুরটা একটু নরম করে' হিমাংশু বল্লে,—ছি ! তোমার ওই ভুল বিশ্বাসগুলো এখনো গেল না, শতদল !

শতদল ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়্‌লো, কিন্তু আংটির শোকে সে রাত্রে তার ঘুমই হোল না।

পরদিন হিমাংশু 'অফিস থেকে' এসে জল খেয়ে উঠ্‌বে এমন সময় শতদল খুব হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকে বল্লে,—ওগো, শুন্‌বে একটা কথা ?...বল হাস্‌বে না।

—কি, বলই না আগে !

শতদল নিজের হাতটা দেখিয়ে বল্লে,—এই ভাখ সেই আংটি। পরশু থেকে' যে আংটিটা খুলে' বাক্সয় রেখেছি, সে কথা মনেই ছিল না আমার। এখন দিব্যি মনে হচ্ছে, কালকের সেটা স্বপ্ন। কোন সময় যে কার কি হয় বল্‌বার উপায় নেই।

(৯)

সে বৎসর কল্‌কাতায় 'প্লেগের প্রাদুর্ভাবটা এত বেশী হ'য়ে উঠ্‌ল যে দলে দলে লোকরা সব মেয়েছেলে নিয়ে সহর ছেড়ে দেশে পালিয়ে যেতে লাগ্‌ল। যাদের দেশ বল্‌তে

কিছু নেই তারাও কলকাতার বাইরে কোন একটা পাড়াগাঁয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে' নিল। হিমাংশু কিন্তু গেল না; দুবেলা দুর্গানাম জপ করে' মেছোবাজারের সেই পুরনো বাড়ীটা আঁকড়িয়েই সে পড়ে থাকল। তার যাবার উপায়ও ছিল না; কেমন করেই বা যাবে সে?—সে যে মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী!

দিনের বেলাটা সে অফিসের কাজে এম্‌নি মগ্ন হ'য়ে থাকতো যে কোন কিছুতে মন দিবার অবসরই থাকতো না তার। তাই সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরবার সময় নানারকম ভাবনা হতো,—ঢোক গিলে, গলা টিপে বার বার দেখতো, কোনরূপ উপসর্গ জুটেছে কি না।

শনিবার দিন অফিস যাবার সময় হিমাংশু দেখ্‌লে, সত্যসত্যই তার গলার একটা দিকে সামান্য বেদনা আরম্ভ হয়েছে। চিন্তায় অস্থির হ'য়ে অফিস থেকে ফিরবার সময় তাই সে একশিশি ঔষধও সঙ্গে নিয়ে এল।

সে যখন বাড়ী এসে পৌঁছলো তখন তার গলার 'বাঁ' দিকটা নাম মহাশ্বের গণ্ডী ডিঙিয়ে অসম্ভব রকম ফুলে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে দুঃসহ যন্ত্রণা!

এদিকে সন্ধ্যা না হ'তেই, শতদলও তার পায়ের একটা গ্রন্থির যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শুয়ে পড়্‌লো।

বাকী শুধু খুকি! সে শুধু অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছে, এই সব কাণ্ড কারখানা—যা চলেছে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে!

মা বল্লে,—খুকি, ছাখ্ ত মা, তোর বাবাকে সেই ওষুধের একটা দাগ খাওয়াতে পারিস্ যদি।

খুকি ধীরে ধীরে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে,—হিমাংশু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। দু তিনবার ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে, খুকি ফিরে এসে বল্লে,—বাবা ঘুমুচ্ছে, উঠ্‌লো না।

শতদল দরজার দিকে মুখ করে' পাশ ফিরে' শুয়ে বল্লে,—আচ্ছা ঘুমোক্।

এমন সময় সুমুখের দরজাটা একটু ফাঁক হ'য়ে গেল; শতদল সবিস্ময়ে দেখ্‌লে সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা অপরিচিত মুখ আর দুটো জ্বল্‌জ্বলে চোখ্ দেখা যাচ্ছে। লজ্জায় ভয়ে শতদল মুখের উপর কাপড়টা টেনে' দিতে যাচ্ছিল, আবার কি ভেবে', সাহস করে' ধীরে ধীরে বল্লে,—কে?

সহসা দরজাটা খুলে' ভিতরে ঢুক্‌লো এক বলিষ্ঠ যুবা,—খালি গা, পরনে একখান কাপড়, মাথায় একটা পাগ্‌ড়ীর মত কি জড়ানো।

জিজ্ঞাসুর মত তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে শতদল বল্লে,—কে? কি চাই?

গম্ভীরভাবে উত্তর এল,—আমি জব্বার।

জব্বার?.....শতদলের সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে শিউরে' উঠ্‌ল। খুকিকে বুকের কাছে টেনে' নিয়ে, চুপি চুপি বল্লে,—ডাকাত! গলার স্বরে তখন তার কাঁপন্ ধরে' গেছে।

জব্বার বল্লে,—ভয় করো না, মা, আমি শুধু ডাকাতি করি না।

খুকি অনেকক্ষণ থেকে জব্বারের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তারপর তাকে এম্‌নি ভাবে কথা কইতে দেখে' সে তার

মায়ের হাতটা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল; জব্বারের দিকে তাকিয়ে বল্লে,—বাবাকে উঠিয়ে একটু ওষুধ খাইয়ে দেবে না, চল।—

হিমাংশু যে তখন সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়িয়ে মত ঘুম ঘুমিয়ে গেছে,—তার শীতল, শুষ্ক শরীরে হাত পড়্‌বামাত্র জব্বার তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে। খুকির মুখের পানে তাকিয়ে তার বড় কষ্ট হলো; বল্লে,—উনি ঘুমুচ্ছেন, উঠিয়ো না আর।

সাদা চাদরটা মৃতের গায়ে মুখে ঢাকা দিতে দিতে জব্বার খুকিকে বল্লে,—তোমার মায়েরও অসুখ, না?

—হ্যাঁ, পায়ে বেদনা হ'য়েছে।

—আচ্ছা, তুমি যাও তাঁর কাছে, আমি ডাক্তার ডেকে আনি। বলেই জব্বার নীচে চলে' গেল। খুকি মায়ের কাছে এসে' বল্লে,—বাবা খুব ঘুমুচ্ছে।...ডাক্তার আন্‌তে গেল সে।

জব্বারের সন্ধানে পুলিশের লোক অনেক দিন থেকেই তার পিছনে লেগেছিল, কিন্তু এতদিন কিছুই করে' উঠ্‌তে পারে নি।

আজ, কেমন করে' জানি না,—জব্বার নীচে নাম্‌তেই, অনেকগুলি লোক একসঙ্গে তাকে ধরে' ফেলে' হাতে লোহার শক্ত বেড়ী পরিয়ে দিল।

থানায় নিয়ে আস্‌তেই, দারোগা সাহেবের হুকুম হ'লো—হাজতে রেখে দাও তাকে, আজকের মত।

(৩)

বাইরে পুলিশের প্রহরী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে আর সেই ছোট্ট গারদ ঘরটার ভিতরে বসে' বসে' জব্বার ভাবছে, তার এখন কী করা উচিত।...বিলম্ব তার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল; ধীরে ধীরে পিছনের জানলাটার কাছে উঠে' গিয়ে, দু হাতে দুটো গরাদে' ধরে' দু তিনবার সজোরে টান্ মার্‌তেই, তার বজ্রমুষ্টির চাপ্ তারা আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না—আস্তে আস্তে অনেকখানা ফাঁক হ'য়ে গেল। কোন রকমে সেই সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে জব্বার তার চওড়া বুকখানা গলিয়ে নিয়ে বাইরে এসে' পড়্‌ল। প্রহরীর দিকে' একবার চেয়ে দেখ্‌লে—সে তখনও ঘুমোচ্ছে, —সুপ্তচেতনা মহাশক্তির মত সঙ্গিণ চড়ানো রাইফেলটা দূরে পড়ে' আছে—নির্ব্বাক হ'য়ে।

জব্বার যখন সেই তার পরিত্যক্ত বাড়ীটার কাছে এসে' দাঁড়াল, তখনও চারিদিক অন্ধকার,—ফর্সা হ'তে অনেক দেরী! সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তেই মনে হলো, তারই প্রতিশ্রুতির নিরাশ আকাঙ্ক্ষার হতাশ, দীর্ঘনিশ্বাসগুলো গুমোট্ হ'য়ে তখনও বাড়ীর অবরুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেখানে হিমাংশুর শেষ শয্যা পাতা ছিল, জব্বার সেখানে গিয়েই সবিস্ময়ে দেখ্‌লে, তারই পাশে তার পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীটিও এলিয়ে পড়েছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর তার চোখ-মুখের বিকৃত-ভাব! প্রথমে সে চিন্‌তেই পারে নি,—এ-ই সেই রমণী কিনা, যাকে সে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেখে' গেছে। সে যে এমন ভাবে মরে' যেতে' পারে জব্বারের তা বিশ্বাস হলো না; দূরে থেকে নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে—না, তারও শেষ নিশ্বাসটুকু অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে!

আহা, বেচারা খুকি রাত্রিজাগরণের

ক্লান্তিতে তখনও তাদেরই পাশে মাটিতে পড়ে অগাধ নিদ্রা যাচ্ছিল।

জব্বার অনেকক্ষণ ধরে' কোমরে হাত দিয়ে অনিমেষ নয়নে এই দৃশ্যটা দেখ্‌ছিল, হঠাৎ গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে' চারটা বাজ্‌তেই তার চমক্ ভাঙ্‌ল। আস্তে আস্তে খুকির ঘুমন্ত দেহটাকে বুকের উপর তুলে' নিয়ে, সেই অন্ধকারের ভিতরে, গলি রাস্তায় তার নিজের বাড়ীর দিকে চলে' গেল।

মেয়েটীকে দেখে' জব্বারের স্ত্রী রহিমা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হ'লো না বরং আনন্দেই তার মাতৃহৃদয় নেচে উঠ্‌ল। এ ঘটনা আজ তার কাছে নূতন নয়: এমন অনেক মা বাপ হারা অসহায় শিশু খোদার কল্যাণে তারই স্তনদুগ্ধে মানুষ হ'য়ে গেছে।

খুকিকে রহিমার বিছানার পাশে শুইয়ে দিয়ে জব্বার বল্লে,—বড্ডো খিদে পেয়েছে রহিমা, ভাত আছে?

—হ্যাঁ, আছে বৈ কি, ব'লেই ঘরের এক কোণে থালা ঢাকা ভাতের থালাটা রহিমা তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিয়ে বল্লে,—বসো।

কথাগুলো রহিমা একটু জোরে জোরেই বলে' ফেলেছিল, তাই জব্বার মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করে বলে' দিল,—চুপ্! ওকে ঘুমোতে দাও।

খাওয়া শেষ করে' জব্বার বিছানার উপর উঠে' বসে' বল্লে—মনটা বড্ডো খারাপ, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

রহিমা পানের বেকাবটা হাতের কাছে সরিয়ে দিয়ে বল্লে,—ও সব ছেড়ে' দিলেই ত' পার!—চুরি, ডাকাতি?

—কী! আমি এম্‌নি ছোটলোক! চুরি ডাকাতি করি আমি?

—তা না ত' কি?

—না, তাকে চুরি, ডাকাতি বলে না। আচ্ছা, যাই হোক্, ওসব ছেড়ে' দেব এবার।

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে' আবার জব্বার বলে' উঠ্‌ল,—না, ছাড়্‌তে পার্‌ব না বোধ-হয় রহিমা! অন্ততঃ গরীবগুলোকে খাওয়াবার জন্যে তা আমাকে কর্‌তেই হবে। তোমাকে ত' কতদিন বলেছি রহিমা, ও সব আমার সহ্য হবে না। ওই যে কতকগুলো জানোয়ার গরীবের বুকে পা দিয়ে সহরের উপরে হাওয়া-গাড়ী ছুটিয়ে চলে' যাচ্ছে, অনর্থক টাকা গুলো উড়িয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে;—অথচ অন্ধ আতুর দশদিন দরজায় মাথা খুঁড়্‌লেও—

—থাম, দরজায় কে ডাকে শুনো দেখি? বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে জব্বার বল্লে,—ও, ভোর হ'য়ে গেছে বুঝি? আচ্ছা, মেয়েটা উঠ্‌লে কিছু জান্‌তে দিও না ওকে, মায়ের মত স্নেহ করে' তুলিয়ে রেখো। টাকা ত' যথেষ্ট আছে, তাই দিয়ে তোমাদের দুজনের বেশ চলে' যাবে।

জব্বার উঠে' দাড়াল; বল্লে—হ্যাঁ, আর এক কথা! দেশ থেকে' তোমার ভাইকে নিয়ে আস্‌বে এখানে, নইলে তুমিই চলে' যেও দেশে। বুঝ্‌লে? আমি চল্লুম।

এই কথাগুলা বলেই জব্বার বেরিয়ে যাচ্ছিল, রহিমা বল্লে,—কোথা, যাও কোথা তুমি?

—ওই যে বাইরে পুলিশের লোক ডাকা-ডাকি করে!

রহিমা আশ্চর্য্য হয়ে' কাদ কাদ সুরে বল্লে,—ধরা দিতে তাদের হাতে?

—হ্যাঁ।

বহ্নিমার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু উথলে উঠ্‌ল, স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে,—আর আমি?

জব্বার সাদরে তার গণ্ডদেশে বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে, হাত ছাড়িয়ে, ধীরে ধীরে উপর দিকে দেখিয়ে বল্লে,—খোদা, দুনিয়ার মালিক খোদা আছে, বহ্নিমা, ভয় কি?"

বাইরে সত্য সত্যই একদল পুলিশের লোক এসে' দাঁড়িয়েছিল জব্বার তার চওড়া বুকটা একটু ফুলিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে হাত দুটো বাড়িয়ে দিতে বল্লে,—ধরো।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পদতলে

যখন তপন যাইবে নামিয়া
দিগন্তরের পারে,
সন্ধ্যা আঁধার আসিবে নামিয়া
সুদূর গ্রামের ধারে।

আমার উটজ প্রাঙ্গণ চুমি
ছোট্ট নদীটি যাবে
কুটীর শোভিনী শেফালীর ডালে
পাখীরা মধুর গা'বে।

দিনের কর্ম্ম হবে সমাপন
তখন আমার স্বামী,
আমার কাজের সব ফলাফল
তোমারে সঁপিব আমি।

দিনের আমার সুখ দুখ বাণী—
হাসি ও অশ্রুজলে
একাকী-বিজনে নিবেদিব তব
শ্রীপদ পল্লব তলে।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার

"পল্লীসমাজের" খানিকটা

একজন Political নেতাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বলুন তো দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটা কিসের থেকে আমরা জানতে পারব? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"সাহিত্যই হচ্ছে তার একমাত্র পথ। সাহিত্য থেকে আলাদা করে দেখতে গেলে—আমাদের শুধু মাথা ঘামানোই সার হবে—কেরিওয়ালার মতো বাইরে থেকে শুধু 'চাই গো চাই' বলেই চেঁচাব—কিন্তু গানের মতো, সুরের মতো, কাজের মতো চিন্তা ও অন্তরের সাথে মিলিত হয়ে ভেতরে ঢুকে আনন্দ আস্বাদ করবার সুবিধেটুকুন আর ঘটে উঠবে না।"—কথাটা যে কত দূর সত্য—তা অল্প চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি প্রত্যেক মহাদেশেই এরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয় লইয়া আলোচিত গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।—এবং ইহা হইতেই বুঝা যায়—দেশের জনসাধারণ পুরোনো বাঁধনের প্রতি ক্রমশঃ অল্প অল্প আস্থাহীন হইয়া সমগ্র-পৃথিবীতে প্রচারিত সত্যের কিছু কিছু গ্রহণ করিতে চায়। এইরূপ উপন্যাসগুলিকে Problem novels ই সাধারণতঃ বলে। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহে এই জিনিষটা ভাল ফুটিয়াছে। তাই তাঁহার 'পল্লীসমাজের' খানিকটা অংশ লইয়াই অল্প আলোচনা করিব—কারণ আবার ভয় আছে পাছে প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়ে। যদি পরে ক্ষমতায় কুলায়—তাহা হইলে বিশদভাবে আলাদা প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কি করিয়া আস্তে আস্তে অতি ধীর পাদক্ষেপে সমাজসংস্কার সাধন করিতে হইবে—ইহা দেখানোই হইতেছে শরৎ বাবুর এই উপন্যাস লিখা। রবি বাবুর 'গোরার' ভিত্তিস্থল এবং পল্লীসমাজের ভিত্তিস্থল একই বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাস উপলক্ষ করিয়া শরৎ বাবু বিশ্বেশ্বরীর যে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। রমা বিশ্বেশ্বরীকে মা'র মতোই ভক্তি করিত,—তাঁর স্নেহের সবুজ আড়ালে বেণী ও অন্যান্যের কুপরামর্শে এবং তারও কোমল অন্তঃকরণ অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত করিয়া রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছিল সত্য কিন্তু সে-ই তখন শুধু ১র্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল—সে তাহার কতটুকু আজ হারাইল। বিশ্বসংসারের যে ব্যক্তিটি এত অত্যাচার নির্য্যাতন সহ করিয়াও তাহার ভালবাসায় পূজা করিয়া ও জ্যাঠাইমার কথায় বাঁচিয়াছিল—সে যখন নিজকে একেবারে জগতের কাজে বিসর্জ্জন করিতে গিয়া বারবার আহত হইয়াও একটু শান্তি পাইতে আসিয়াছিল রমার কাছে এবং তার কাছে এত বড় একটা বেদনা আঘাত পাইয়া যখন সে তার পরিবর্ত্তে একটাও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে জেলে ঘানি টানিতে চলিয়া গেল তখন রমেশ ভুলিয়াও জানিতে পারে নাই—

তাহারই দিকে দুটী সজল আঁখি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে—বাহিরে কেহ তাহাকে সহানুভূতি দেখাইতে থাকুক আর না-ই থাকুক—একজন লোক আছে যে তার জন্যে বড়ই ব্যথা অনুভব করে এবং এই নিঃশব্দ প্রতিদানটা যে কতদূর মহিমান্বিত ও দুঃখে ভরা তাহা রমেশের বাস্তবিকই অজানিত রহিল। তাই রমেশ যখন জেলে চলিয়া গেল—রমা শয্যা লইল। জীবনের ভিতরকার দৈন্য বাহিরের নানা জমকালো জিনিষে কিছুকাল ঢাকিয়া রাখা যায় বটে—কিন্তু তাহা চির-দিনের জন্য নয়; দুদিন পরেই অন্তরের আসল স্বরূপ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে অঙ্কিত করিয়া আসরে নামিবে—নারদ তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে ত্রিভঙ্গ হইয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবে—ইহাই যাত্রার পালা। কিন্তু নকল শ্রীকৃষ্ণ আসরে নামিলে পর—নানা ভঙ্গিমায় বাঁশী বাজানো শেষ হইলে—দলের 'মোক্তার' যখন নারদ সাজিয়া দাড়ি লাগাইয়া স্বরশিথাসম্ভব বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ওহে বিপদ বারণ! তোমার বুকে কি?' বালক ভয় পাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"আজ্ঞে এ কিছু নয়—খড়ি মাটি।" এই প্রকার কাল্পনিক দুঃখ লইয়া কেহ কেহ জীবন-যাত্রায় বাহির হইয়া যে নাকাল হন না তা বলা যায় না—কিন্তু এক্ষেত্রে রমার যতবড় দুঃখ এটার পরিমাণ তো করা চলে না।... রমেশ জেলে গেলে রমা শয্যা লইল—ইচ্ছা করিয়াই অনবরত চিন্তা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া সে নিজকে একটু একটু করিয়া ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না—কারণ এ প্রায়শ্চিত্ত যে তার নিজেরই করিতে হইবে।" গ্রামের হাতুড়ে কবিরাজ তাহাকে 'বৃহৎচিন্তামণি' খাওয়াইতে খাওয়াইতে গলদ্ ঘর্ম্ম হইয়া গেলেন; তবু রোগ এক বিন্দু কমিল না—বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। কিন্তু রমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল শুধু একজন—সে বিশ্বেশ্বরী। তিনি রমাকে ছোট বেলা হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন—এবং রমা তখন হইতে আজ পর্যন্ত তাঁর কাছে একটি কথাও লুকায় নাই—কিন্তু আজ যেন রমার অসুখে তাঁর স্নেহ মনটা নড়িয়া উঠিল—তিনি বুঝিতে পারিলেন একটা বিষের জ্বালা বুকে লইয়া সে মরিতে বসিয়াছে। তাই অপরে যখন ভুল বুঝিয়া ভুল আশা করিয়া ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতে-ছিলেন—রমার চোখ দুটী কোটরপ্রবিষ্ট—কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র, যেন বহু বহুদূরের কিছু একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন—তিনি যে রমার শুধু জ্যাঠাইমা ই নন—মার মতন আদর যত্ন করিলেই যে তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হইল না—তাঁর কন্যাসমার মনের নিভৃত-কোণে কি যে ব্যথা পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা তো তাঁর খুঁটিয়া বাহির করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিতে হইবে। তাই তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন—'রমা?' রমা উত্তর করিল—'কেন জ্যাঠাই মা?' বিশ্বেশ্বরী কহিলেন—'আমি তো তোর মায়ের মত রমা—।' রমা বাধা দিয়া বলিল—'মত কেন

জ্যাঠাই মা, তুমিই তো আমার মা।' বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন—'তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোর কি হয়েছে?—'অসুখ করেছে জ্যাঠাই মা!' বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন—'সে তো এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা। যা এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে, এ সময়ে মায়ের কাছে লুকোস্ নে রমা। লুকোলে তো অসুখ সারবে না মা।' জানালার বাহিরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই—মৃদু মন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতে ছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরীও চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড় করুণ কণ্ঠে কহিল—'আচ্ছা জ্যাঠাই মা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ড ভোগ করানোর শাস্তি কি?' বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্য্যস্ত রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমিলিত দুই চোখের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—'কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা। মেয়েমানুষের এত বড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার উপর এই অত্যাচার করেছে, এর সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে ত এর একটি কিছুও বইতে হবে না মা।' বলিয়া তিনি আবার তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার এইটুকু মাত্র আশ্বাসেই রমার রুদ্ধ-অশ্রু এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল,—'কিন্তু তাঁরা যে শক্ত। তাঁরা বলেন শত্রুকে যেমন করে হোক্, নিপাত করতে দোষ নেই। কিন্তু, আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাই মা।' "তোমারই বা কেন নেই মা?" প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি আনত করিতেই অকস্মাৎ তাঁহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। যে সংসার মুখ ঢাকিয়া এতদিন তাঁহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিয়া বেড়াইত, সে যেন তাহার মুখোস্ ফেলিয়া দিয়া, একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আজ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণেকের জন্য বিশ্বেশ্বরী বেদনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হৃদয়ের ব্যথা আর তাঁহার অগোচর রহিল না। রমেশ যাকে এত ভালবাসিত, ভক্তি করিত—সে যে কি দুঃসহ অকথ্য লজ্জা ও মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস বুকে লইয়া তাহাকে শুধুশুধু একটা আঘাত দিতে গিয়া তার নিজের অন্তঃকরণটাই যে কতদূর ভারী করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা যখন বিশ্বেশ্বরী বুঝিতে পারিলেন তখন রমা তার ক্ষুধিত হৃদয়টা খুলিয়া বেশ একটু কাঁদিয়া লইল—বিশ্বেশ্বরীকে বলিল—'আমি যখন আর থাকব না—তখনও আমাকে যদি তিনি ক্ষমা করতে না পারেন—শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলো জ্যাঠাই মা, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন—তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েচি—তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমি পেয়েচি—

তোমার মুখের এই কথাটা হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।' রমা চুপ করিল। বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—'চল্ মা, আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি। যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ তুল্লেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেইখানে যাই। আমি সব বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে, না, তবে এ বিষ বুকে পুরে জলে পুড়ে সেখানে গেলে তো চলবে না! আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।' রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল—'আমিও তেমনি করেই যেতে চাই জ্যাঠাই মা।'—তারপর উভয়ের অশ্রুধারায় শয্যা প্লাবিত হইতে লাগিল।

শরৎবাবু বিশ্বেশ্বরীকে শুধু কোমলতা ও স্নেহ দিয়া 'মা' করিয়াই গড়েন নাই—তাঁহাকে কর্ত্তব্যোচিত কঠোরও করিয়াছেন। বেণী যখন মাথায় ঘা লইয়া হাসপাতালে এবং রমা যখন তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিল—তখন বিশ্বেশ্বরী বলিয়া উঠিলেন—'দুঃখ করো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে।" প্রত্যুত্তরে রমার মুখে আবার বিস্ময়ের একটা আভাস পাইয়া তিনি কহিলেন—'ভাব্চ মা হয়ে সন্তানের এতবড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বল্চি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বল্চি মা এতে আমি ব্যথা বেশী পেয়েচি কি আনন্দ বেশী পেয়েচি তা বলতে পারি নে। কেন না, আমি জানি যারা অধর্ম্মকে ভয় করে না, লজ্জা ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেম্নি বেশী থাকে, তাহলে সংসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল পৃথিবীতে কোন আত্মীয় বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ্ বদ্লানো শক্ত না মা—তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।' রমা জিজ্ঞাসা করিল—'বাড়ীতে তখন কি কেউ ছিল না?' বিশ্বেশ্বরী কহিলেন—'থাক্‌বে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু সে তো ঘাম্‌কা মেরে বসে নি, নিজে জেলে যাবে বলে ঠিক করে, তবে, তেল বেচতে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাঁকের এক ঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল,—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া সে বলেও গেছে, এর পরেও বেণী সাবধান না হলে, সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।' রমা আস্তে আস্তে বলিল—'তার মানে আরও লোক আছে। কিন্তু আমাদের দেশে ছোট লোকের এত সাহস তো কোনদিন ছিল না জ্যাঠাই মা, কোথা থেকে এ তারা পেলে আমি তাই ভেবে আশ্চর্য্য হই।' বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—'সে কি তুই নিজে জানিস্ না মা! কে দেশের এই ছোট লোকের বুক এমন করে ভরে দিয়ে গেছে! আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা। তাকে জোর করে নেবালেও সে আশপাশের জিনিষ তাতিয়ে দিয়ে যায়। সে আমার ফিরে এসে

দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুসি সেখানে থাক্, বেণীর কথা মনে করে আমি কোন দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না।' কিন্তু এইখানে মাতৃত্বের স্নেহ একটু সজাগ হইয়া উঠিল—এ কথা বলা সত্ত্বেও তিনি জোর করিয়াই একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, রমা তাহা টের পাইল। তাই তাঁহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন—'রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে পাল্কিতে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল—তখন যে আমার কি হয়েছিল সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ পর্য্যন্ত দিতে পারি নি। এ কথা তো ভুলতে পারি নি না, যে এক সন্তান বলে ধর্ম্মের শাসন তো মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।' এর পরে যখন বিশ্বেশ্বরী রমার মুখেই জানিতে পারিলেন যে বেণীর এই অবস্থার জন্যে রমাই সব চেয়ে বেশী দায়ী—তিনি রমার ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন—'তার মা হয়ে এ যদি না আমি মাপ করতে পারি—তা হ'লে আর কে পারবে মা? আমি আশীর্ব্বাদ করি এর পুরস্কার ভগবান্ তোমাকে যেন দেন।' রমা হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল—'আমার এই একটা সান্ত্বনা জ্যাঠাই মা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন, তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা' তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের চাষাভূষারা এবার ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেচে। তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ ভুলতে পারবেন না জ্যাঠাই মা?' বিশ্বেশ্বরী কথা কহিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার চোখ হইতে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া রমার কপোলের উপর পড়িল। এইখানেই বিশ্বেশ্বরীর মাহাত্ম্য ফুটিয়াছে বেশী—তিনি স্নেহের আড়াল হইতে বেণীকে ছিনাইয়া আনিয়া বিশ্বের এই দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন—যদি তাহাতে কিছু উপকার হয়। বাস্তবিক তাহাই হইল। এজন্য বিশ্বেশ্বরীকে যে একাধারে কতদূর কষ্ট ও সুখ সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। থার্ড ক্লাশের গাড়ির দরজা খোলা পাইলে যেমন একটির পর একটি করিয়া সকল যাত্রীই ঐ গাড়িতে ঢুকিতে চায়—তেম্‌নিই রমার মনে ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি করিয়া বিগত দিনের চিন্তারাশি ক্রমাগত জড় হইতে লাগিল। রমা কহিল—'তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাই মা; কিন্তু ধর্ম্মের বিচারই যদি বড় হলো তবে রমেশদা' কোন্ পাপে এ দুঃখ ভোগ করচেন? আমরা যা করে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।' জ্যাঠাই মা বলিলেন—'না, মা, তা নেই। নেই বলেই বেণী আজ হাঁসপাতালে। কিন্তু, কি জানিস্ মা, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই।

কিন্তু কি কোরে যাড়ে তা সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্য্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারলে না, কেন একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু

করতে যে হয় রমা তাতে তো লেশমাত্র সন্দেহ নেই।' রমা নিজের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া নীরবে নিঃশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন—'এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে রমা, ভাল করব বল্‌লেই ভাল করা যায় না। গোড়ায় অনেক গুলো ছোটবড় সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য্য থাকা চাই। এক দিন রমেশ হতাশ হয়ে আমাকে বল্‌তে এসেছিল—জ্যাঠাই মা আমার কাজ নেই এদের ভাল করে, আমি যেখান থেকে এসেচি সেই খানেই চলে যাই। আমি তখন বাধা দিয়ে বলেছিলাম—না রমেশ কাজ যদি সুরু করেচিস্ বাবা তবে ছেড়ে দিয়ে পালাস্ নে। আমার কথা সে তো কখনো ঠেল্‌তে পারে না; তাই যেদিন তার জেলের হুকুম শুন্‌তে পেলাম, সেদিন মনে হল, ঠিক যেন আমিই তাকে ধরে-বেঁধে এই শাস্তি দিলাম। কিন্তু তারপর বেণীকে যেদিন হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, সে দিন প্রথম টের পেলাম—না না, তারও জেল খাট্‌বার প্রয়োজন ছিল। তা' ছাড়া ত জানি নি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিল্‌তে হয়, সকলের সঙ্গে ভালতে—মন্দতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা তো মনেও ভাবি নি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়ালে যে, শেষ পর্য্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু সে ত আমার চোখে পড়ল না মা, আমি তাকে বেতেও দিলাম না, রাখতেও পারলাম না।' রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন,—'না রমা, অনুতাপ আমি সে জন্য করি নে। কিন্তু তুইও শুনে রাগ করিস্ নে মা,—এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদের অধর্ম্ম যতই বড় হোক্, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড় গলা করেই বলে যাচ্ছি।' রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়াই কহিল,—'কিন্তু এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাই মা? আমাদের অন্যায় অধর্ম্মের ফলে যত বড় যাতনাই তাঁকে ভোগ কর্ত্তে হোক্, আমাদের দুষ্কৃতি আমাদের নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ করবে কেন?' বিশ্বেশ্বরী ম্লান ভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন—'করবে বই কি মা! নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি নাই করে, এমন কি উল্টে অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতার ঘাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই ব'ল্‌চিস্ - মা, কিন্তু তোদের কুঁয়াপুর রমেশকে কি আর তেম্‌নিটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দান করে বেড়াত, ভৈরব তার সেই ডান হাতটাই নুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।' তারপর একটু থামিয়া নিজেই বলিলেন,—'কিন্তু কে জানে! হয়ত ভালই হয়েছে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্য্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যকার কাজে লাগ্‌বে।' বলিয়া তিনি একটা গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

শরৎবাবু বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়া সমাজ-সংস্কারের যে উপায়টি বলিয়া দিয়াছেন—তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য। ভাল করিতে হইলেই যে প্রথম দোষীদের কথা অনুযায়ী খোসামোদ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিতে হইবে—তাহা অন্যে বিশ্বাস করে করুক—কিন্তু আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। চারুবাবু তাঁর 'স্রোতেরফুল' ও 'পঙ্কজিনীকে' যথাক্রমে 'নব-কিশোর' ও 'গোবিন্দের' চরিত্রদ্বারা দেখাইয়াছেন—যাহাকে সত্য বলিয়া জানি—তাহা অম্লানবদনে হাসিমুখে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য সাধন করিয়া যাওয়াই প্রকৃত লোকসেবা, সমাজসেবা ও দেশসেবা—এবং তাহাতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি। সুতরাং আজকাল এমন লোকেরই দরকার—"যাহারা সত্যের জন্য জীবনের সকল সাধনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়া ভালমন্দের উন্মত্তবিচারে উদ্‌ভ্রান্ত ভীরু মানব-চিত্তকে এই উন্মুক্ত জীবনের আশ্বাসবাণী শুনাইয়া বলিবে—

"মনেরে আজ কহ যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রত্যেক মহাত্মার জীবন-চরিত আলোচনা করিলেই ব্যাপারটা সোজা হইয়া যাইবে। রোঁম্যা রেলোঁ (Romain Rolland) ১৯১৬ সালে এবং কার্ল স্পীট্‌লার এইবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন—এবং এঁরা সকলেই তাঁদের দেশ বর্জ্জিত। সত্যকে সুনাম ও সুখের চটকে নয়—মানুষের অন্তরস্থ আত্মাকে অসুন্দর থেকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁদের এই অবস্থা। গত মহাযুদ্ধের সময় রোঁম্যা রোঁলোকে নানাবিধ কারণে দেশের ছোট বড় সকলের হাতে যত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা নিতান্ত অল্প নয়।—এবং অবশেষে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই ফরাসীদেশ ত্যাগ করিয়া Switzerlandএ আশ্রয় নিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি—যে কোনও মহাত্মা, তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সময়কে অগ্রাহ্য করিয়া সত্যের বৈজয়ন্তী জগতে উড্ডীন করিয়াছেন—তাঁহাকেই প্রথমে দেশের ও দশের অপ্রিয়-ভাজন হইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—আনন্দ-মুক্ত প্রাণে আমাদের মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এ সব দেখিয়া শুনিয়াই রবি বাবু গাহিয়াছেন—

"যদি সবাই ফিরে যায়
ওরে ওরে ও অভাগা
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে
একলা দল রে॥
যদি আলো না ধরে
ওরে ওরে ও অভাগা
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে
একলা জ্বল রে—॥"

এবং তখনই সত্য হইবে শরৎবাবুর বিশ্বেশ্বরীর মুখের কথা—'কি জানিস্ মা,

কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। আগুন জলে উঠে শুধু শুধু নেবে না বলা। তাকে জোর করে নেবালেও সে আশপাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রীসুধীর কুমার সেন

ব্যথিতের নিবেদন

প্রভু, ইহাদের জয় হোক্—
যাহাদের বুকে নিখিল ধরার বাজিয়াছে ব্যথা-শোক ;
পতিত, ব্যথিত, লাঞ্ছিত আর তুচ্ছ জনের পাশে
জননীর মত বিপুল ব্যথায় যাহারা ছুটিয়া আসে,
বেদনা-বিধুর মুখ পানে চেয়ে ভ'রে আসে দুই চোখ,—
তাঁ'রা বেঁচে থাক্, তা'রা পূজা পাক—তাঁহাদের জয় হো'ক্।

যুগ-যুগান্তের অসীম বেদনা সঞ্চিত হ'য়ে ছিল,
কোটী নর-নারী ম্লান মুখে তাহা নীরবে সহিতেছিল,
কেহ শুনে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ জানে নাই তা' যে,
মরমের মাঝে কোথায় কাহার কতটুকু ব্যথা বাজে ;
কোন্ অপমান আঁধারের মত ছড়ে আছে সারা দেশ,
দেশ-জননীর সকল অঙ্গে কেন এ মলিন বেশ ;
কেন এই ব্যথা, কেন এই বাণী কণ্ঠে ক্ষীণতার,—
পরাণে তাহার কোন অভিলাষ, কিসের দৈন্য-ভার,
কেহই বুঝেনি জননীর এই বেদনার নিবেদন,
ভাবেনি কেহই এত বড় কথা—কাঁদেনি কাহারো মন !
সেই অপমান শেল সম আজি বেজেছে যাদের বুকে,
লক্ষ প্রাণের মৌন বেদনা ফুটিছে যাদের মুখে,—
তাহাদের পানে মুখ তুলে চাও, হইওনা প্রভু বাম,
শুভ আশীর্ব্বাদ কর—তাহাদের পূরাও মনস্কাম।

তা'রা কা'রা প্রভু ? তা'রা কি মানুষ ?—না, না, তা'রা তাত নয়,—
তা'রা যে তোমারি শক্তি-বিকাশ, এই কথা মনে হয় !
তাদের পিছনে তুমিই থাকিয়া ফিরিতেছ যথা তথা,

আপনারি মহা অনুভূতি দিয়ে র'চেছ বিশ্ব ব্যথা,
শত বরষের মৌন বেদনা—বিকাশ পায়নি যাহা,
অন্তর্যামি! বুঝেছ সে ব্যথা—বিফল হয়নি তাহা!
লাঞ্ছনা আর নিগ্রহ যারা করিতেছে সবে দান,
তোমারেই তা'রা দিয়াছে বেদনা—করিয়াছে অপমান।
তাই আজি কি গো দীনের দুয়ারে দাঁড়া'লে আপনি আসি
মুছাতে সবার নয়নের জল, ঘুচাতে বেদনা-রাশি?
দেশে দেশে তাই জাগিল কি সাড়া, পড়িল কি রণ-সাড়?
বলহীন জনে লভিল কি বল, ওগো রাজ-অধিরাজ!
অনুভূতি-হীন পাষাণে হ'ল কি বেদনার সঞ্চার?—
মুক্তি-পিয়াসা বক্ষে জাগিল—তীব্র দুর্নিবার?

* * * * *

বুঝিয়াছ যদি ব্যথিতের ভাষা, কাঁদিয়াছে যদি প্রাণ,
আসিয়াছ যদি আঁখি-জল-ধারে, দয়াময় ভগবান!
ভৈরব-রবে বিষাণ তোমার বাজিয়া উঠুক তবে,
অন্যায়, পাপ, সব দূরে যাক্—ধ্বংস হউক সবে।
দুর্ব্বলে আজি দাও মহাবল, তোল তোল পতিতেরে,
অনতা-হীনের জয়ের গর্ব্বে নাশহ গর্ব্বিতেরে!
চেয়ে দেখ ওই কাঁদিছে তোমার কোটী কোটী নর নারী,
তাদের দুঃখ ঘুচাও এবার, হে চির-দুঃখ-হারি!
শক্তি আজিকে কঠোর হস্তে শাসন করিছে দেশ,
লাঞ্ছনা আর উৎপীড়নের হইয়াছে এক শেষ!
হুঙ্কার রবে মিথ্যা আজিকে করিতেছে গরজন,
সত্য নিত্য শঙ্কা-চকিত,—স্তম্ভিত জগজন!
সহায়হীনের এই অপমান, সত্যের অপলাপ,
দূর কর প্রভু জগৎ হইতে,—ঘুচাও এ মহা পাপ,
মুক্ত করগো সবার চিত্ত, বন্ধন কর নাশ,
মানুষ হইয়া থাকে নাকো যেন কেহ মানুষের দাস;
নিখিল ধরণী আকাশের মত পূত-নিরমল হো'ক,—
তারকার মত এ উহার পাশে চিরদিন ফুটে রো'ক।

গোলাম মোস্তফা

ইসলাম গৌরব

সাধারণ তন্ত্রযুগের সভ্যতা

আমরা এক্ষণে এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করিব।

যে দশবৎসরকাল হজরত মদিনায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় মধ্যে তদীয় প্রভাবে কিরূপে কলহনিরত বিভিন্ন দলসমূহ একটী সুদৃঢ় জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী চিরদিন ইতিহাস বক্ষে স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। আরবজগতে এই ত্রিংশ বৎসর সাধারণ তন্ত্র শাসনের সময়ে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও এই সময়ে মুসলমান সভ্যতার বিকাশ মাত্র হইতেছিল, তথাপি সমাজে নানাবিধ উন্নতি হইয়াছিল।

প্রধান কর্ত্তা খলিফা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের লইয়া একটি সভা গঠিত ছিল।

এই ত্রিশবৎসরকাল ওমার যে শাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন সেই প্রণালীতেই রাজ্য শাসন করা হইত। নূতন দেশসমূহের উপর আধিপত্য পাইয়া আরবগণ যাহাতে তাহাদের জাতীয়ত্ব হারাইয়া না ফেলে তদ্বিষয়ে ওমারের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। আরবগণ বিজিত প্রদেশ সমূহে ভূমিক্রয় করিয়া বসবাস করিতে পারিত না এবং তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইত।

কিন্তু যে সমস্ত বিজাতীয় প্রজা ইস্‌লাম ধর্ম্মে আশ্রয় লইত আরবগণ আইনতঃ তাহাদিগকে সমকক্ষ ভাবে গ্রহণ করিত। সাধারণ ধনকোষ সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত ছিল, খলিফার কোন বিশেষ বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল না। ধনিগণের নিকট হইতে দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণের নিমিত্ত চাঁদা আদায় করা হইত। ইহা দান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইত।

কিন্তু ওস্‌মানের শাসন সময়ে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাধারণ ধনকোষ খলিফার বিলাস ভোগের নিমিত্ত নিঃশেষ করা হইতে লাগিল। শাসন প্রণালী স্বার্থপরতার কালিমায় কলঙ্কিত করা হইল।

আলি এই অবস্থার কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ ও অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত তিনি বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই সময় সমস্ত দেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীনে ঐ সকল প্রদেশ অনুষ্ঠাপিত হইয়াছিল। দেশের যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একটী লিখিত বিবরণ রক্ষিত হইত। সমুদয় দেশের এক একটী "জরিপ" গ্রহণ করা হইত। এবং যে যে স্থানে খাল প্রভৃতি খনন করা আবশ্যক হইত সেই সব স্থানে উহা করা হইত।

প্রত্যেক প্রদেশ সমূহের নিমিত্ত বিচারক নিযুক্ত করা হইত। এই বিচারকগণ খলিফার অধীনে থাকিত। বিভাগীয় শাসনকর্ত্তাগণের কাহাদের উপর ক্ষমতা ছিল না।

প্রথমতঃ শান্তিরক্ষার কার্য্য জনসাধারণ দ্বারাই সম্পন্ন হইত। কিন্তু ক্রমে ওমার রাত্রিকালের জন্য রক্ষীগণ নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে মস্‌জিদ্ এবং বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতে লাগিল।

শাসন ও যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্য বিভাগও ছিল। প্রথমতঃ শুধু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে অন্যান্য উপকরণ সমূহের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

এই সময় সমাজের অবস্থা ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা সম্মান পাইত এবং তাহাদের নিমিত্ত পৃথক আবাসস্থান গৃহমধ্যে নির্ম্মিত হইত। সকলেই খুব পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করিত।

ওমাইদ্ বংশ

৬৬১—৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ

আলির মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান খলিফার পদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তাহার সৈন্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি মাভিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিলেন। হাসান এই সর্ত্তে তাহাকে খলিফার পদ প্রদান করিল। মাভিয়ার মৃত্যুর পর আলির কনিষ্ঠপুত্র হুসেন ঐ পদে উন্নীত হইবে।

কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মাভিয়া অতিশয় চতুর লোক ছিলেন। তিনি খলিফার পদ এইরূপে প্রাপ্ত হইয়া ওমাইদ্ বংশের একাধিপত্য বিস্তার করিলেন।

এই ক্ষণে ওমাইদগণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আবশ্যক। মক্কায় কোরাইশগণের আধিপত্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বংশে ৪৮০ খৃষ্টাব্দে আব্বাদ্‌দার নামে এক কোরাইশ মক্কানগরীর অধিপতি হন্। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। পরিশেষে মক্কার শাসন দুই ভাগে বিভক্ত হইল। জল এবং "ট্যাক্স" বিভাগ আব্বাদ্‌দারের ভ্রাতার এক পুত্রের উপর দেওয়া হইল। ধর্ম্ম-স্থান সৈন্য পরিদর্শন প্রভৃতি কার্য্যভার তাহার পৌত্রগণ প্রাপ্ত হইল। আব্বাদ্‌দারের ভ্রাতার বংশে ওমাইয়ার জন্ম হয়। এবং আব্বাদ্‌দারের পৌত্রগণের বংশেই হজরতের পূর্ব্বপুরুষ আবদুল মুতালিবের জন্ম হয়। এই দুইবংশের পূর্ব্ব হইতেই কলহ চলিতেছিল।

যাহা হউক এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে মাভিয়া যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে বংশ পূর্ব্বেই হজরতের বংশের সহিত কলহে নিরত ছিল।

মাভিয়া অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল। তাহার পর যাহাতে তাহার পুত্র খলিফার পদ প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্ত মাভিয়া সকল প্রকার নৃশংস কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিত। তাহার শাসন প্রণালী ঠিক হজরতের আদেশানুসারে চালিত হইত না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ও এই সময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাহার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিল।

এই সময় মুসলমানগণ আফ্রিকার অনেকাংশ এবং সিন্ধুদেশ ও পূর্ব্ব আফগানিস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং মাভিয়া তদীয় পুত্র ইয়াজিদকে তাহার উত্তরাধিকারী করিলেন।

৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই পরাক্রমশালী খলিফার মৃত্যু হয়। এই খলিফা যেমন অমিত-বিক্রম ছিল তেমনিই কর্ম্মঠ এবং বুদ্ধিমান ছিল। অতি কঠোর ভাবে তাঁহার শাসন-প্রণালী চালিত হইত।

এইরূপে মুসলমান জগতে একটী নবযুগের উদয় হইল। এখন আর খলিফা বলিলে ওমারের ন্যায় আদর্শ খলিফা বুঝাইবে না। ওমাইদ খলিফাগণ প্রায় সকলেই ধর্ম্মের মুখোস মাত্র পরিধান করিত, নতুবা শাসন কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব।

আবার কেহ কেহ বলেন এই সময় মুসলমানগণ অন্তর্বিদ্রোহের নিমিত্ত এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল যে মাভিয়ার মত একজন তেজঃসম্পন্ন খলিফা না হইলে শান্তি রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িত।

যাহা হউক ইয়াজিদের খলিফাপদ প্রাপ্তিতে একটী মূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। এত দিন খলিফা সাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এক্ষণে বংশানুক্রমে এই পদ খলিফার পুত্র পৌত্রগণ পাইতে পারে এইরূপ বুঝা গেল।

ইয়াজিদের শাসনকাল কি মুসলমান কি অমুসলমান সকলেরই স্মরণীয়। আলির দ্বিতীয় পুত্র হুসেন কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে খলিফা পদ-প্রার্থী হইলেন। কিন্তু শেষ সময়ে কুফাবাসীগণ তাঁহাকে সাহায্য করিল না। তাহার পর কার্ব্বালার হুসেনকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইল। যাঁহাকে হজরত কোলে লইয়া কত প্রকারে আদর করিতেন, যাঁহার জননী মনিম্বনী ফতেমা তিনি জল জল করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং শত্রুহস্তে অসহায়ের মত প্রাণত্যাগ করিলেন। তাই আজও সহস্র সহস্র মুসলমান মহরমের দিনে বক্ষে করাঘাত করিয়া সেই শোচনীয় কাহিনী স্মরণ করে।

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মাভিয়া কিছুকাল রাজত্ব করেন কিন্তু তিনি বিরক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময় মারওয়ান নামক একজন শাসনকর্ত্তা ছলে বলে খলিফার পদ অধিকার করিলেন। তাহার পর সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা আবদুল মালিক ঐ পদ অধিকার করিয়া শাসন করিতে থাকেন। তদীয় শাসন সময় মুসলমানগণের সহিত রোম সাম্রাজ্যের যুদ্ধ চলিতে থাকে। আবদুল মালিক প্রথমে মুসলমান রাজ্যে টাকশালের সৃষ্টি করেন এবং নিয়মিত রূপে মুদ্রার প্রচলন করেন। এই সময় পর্য্যন্ত সমস্ত হিসাবপত্র গ্রীক্ কিম্বা পারস্য ভাষায় লিখিত হইত। কিন্তু আবদুল মালিক এই সব বিভাগে আরবী ভাষার প্রচলন করেন।

তদীয় ভ্রাতা কিছুদিন শাসন করেন তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র ওয়ালিদ খলিফার পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় মুসলমান শাসন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আফ্রিকায় মুসলমান পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

সমুদ্রও মুসলমান কেশরীর অপ্রতিহত গতি নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পর-

পারে স্পেনেও মুসলমান সৈন্যগণ সগৌরবে পদার্পণ করিয়াছিল। এই সময় স্পেন দেশ "গথ" নামক জাতির অধীনে ছিল। এক পারে যখন আফ্রিকা মুসলমানগণের উদার শাসন প্রণালীতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছিল তখন অপরপারে স্পেনবাসীগণ 'গথ'গণের বজ্রকঠোর শাসনে নিষ্পেষিত হইতেছিল। এই সময়ে স্পেনের অধিপতি ছিল রডারিক।

তারিক্ ও মুসা নামে পর পর দুই মুসলমান সেনাপতি স্পেনে গমন করেন এবং দেশ সমূহ অধিকার করিতে থাকেন। রডারিক মুসলমান হস্তে প্রাণ দান করিলেন। পশ্চিম দেশ প্রায় করতলগত হইল। কিন্তু মুসা যখন করাসীদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছিল তখন দামাস্কাস হইতে খলিফা প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। সুতরাং মোসলেম আলো পশ্চিমের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে পারিল না।

স্পেন মুসলমানগণ দ্বারা সুশাসিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ উৎপীড়ন হইতে নিস্তার পাইল। নানাবিধ উপায়ে নানা শিক্ষার বিস্তার হইতে লাগিল। বস্তুতঃ স্পেনের অরণ্যানী একটী রমণীয় উদ্যানে পরিণত হইল।

আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীগণের সাহায্যেই এই স্পেন দেশ বিজিত হইয়াছিল। এক্ষণে স্পেন দেশ আরবগণের আবাস স্থল হইল। আরবীয় স্পেনীয় এবং আফ্রিকাবাসী এই তিন প্রকার মুসলমান ইহাদের ভিতরে ক্রমে কলহ উপস্থিত হইল।

এই সময়ে ওমাইদগণ ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। একমাত্র দ্বিতীয় ওমার কিছুদিন পরে খলিফার আসন গ্রহণ করিয়া উদার ভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত কোনও নৃপতি তাদৃশ সুন্দররূপে শাসন করিতে পারেন নাই।

ওমাইদগণের রাজত্বের শেষ ভাগে আব্বাসাইদ গণের দল বলিয়া একটী বৃহৎ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ওমাইদগণ বস্তুতঃ কোরাণ মানিয়া চলিত না। আরবীয় মুসলমানদিগেরই বিশেষ আধিপত্য ছিল। নূতন মতাবলম্বীদের বিশেষ অধিকার বা সম্মান ছিলনা। এই সময় মুসলমান সাম্রাজ্যে বহু জাতীয় মুসলমানগণের বাস ছিল। কিন্তু ওমাইদগণের প্রভুত্বে ও অত্যাচারে প্রায় সকল প্রকার মুসলমানগণই উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং সকলেই বুঝিল যে হজরতের বংশের এক জন খলিফার আসন গ্রহণ করিলে ভাল হয়। আলির পুত্র পৌত্রগণ ইমাম নামে অভিহিত হইতেন। তাহারা আর সংসারে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। এই সময় আব্বাসের বংশধরগণ কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

আব্বাস মহম্মদের খুল্লতাত ছিলেন। এই আব্বাসের প্রপৌত্র মহম্মদ প্রচার করে যে আলির পুত্র হুসেনের মৃত্যুর পর ইমামের (ধর্ম্মগুরু) পদ আলির জীবিত পুত্র না পাইয়া মহম্মদ পাইবে। কেহ কেহ এই মতে মত প্রদান করিল। কিন্তু সাধারণে জানিল যে এই মহম্মদের দল হজরতের পুত্র পৌত্রদের জন্যই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। যাহা হউক সাধারণ মুসলমানগণ যে কোন উপায়ে ওমাইদগণের অত্যাচার

হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় মহম্মদের মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহার পুত্র পৌত্রগণ তাহার কার্য্য অগ্রসর করিতে লাগিল। এই মহম্মদের পৌত্র আবুল আব্বাসই পরিশেষে কৌশলে খলিফার আসন অধিকার করিয়া সাফা নাম গ্রহণ করতঃ আব্বাস বংশের রাজত্ব আরম্ভ করেন।

যে বংশের খলিফাগণ বৎসরে বৎসরে নূতনদেশ জয় করিতেন, যাহাদের বিজয় পতাকা য়ুরোপে পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছিল, তাহাদের এইরূপে শোচনীয় পতন হইল কিন্তু এই পতন অনিবার্য্য। যেখানে ওমারের মত খলিফা সাধারণের ধনের অপব্যয় হইবে ভাবিয়া বিনা কার্য্যে রাত্রিকালে দীপ প্রজ্বলিত করিত না সেই স্থানে ওমাইয়গণ সর্ব্বদাই বিলাস ভোগে রত থাকিত। মন্ত্রীগণের উপর সকল ভার ন্যস্ত থাকিত। সৈন্যগণ বেতন পাইত না। প্রজাগণ প্রপীড়িত হইত। এবং অধিক পীড়নের ফলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

পরিত্যক্ত

তারা এসে গেল চলে
হেসে খেলে কুতূহলে,
একাকী রহিনু পড়ে
ধরণীর ধূলিতলে!

বাঁতরে আবেগ ভরে
সেধেছিনু কত করে
আমারে লইতে সাথে
একটুকু হাতে ধরে!

বারেক নয়ন তুলে'
হেরিল না কেহ ভুলে'
বুঝিলনা কি যে ব্যথা
লুকান মরম-মূলে!

একজনা আপনার
নাহি আজ অভাগার
হেলা-ফেরা এ জীবন
বুক ভরা আঁখি-ধারা!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

ছেলেদের গল্প

হাওয়ার গলায় ফাঁসী

রাজা দুর্জয় সেনের রাজ্যের এক বটগাছ তলায় আস্‌তানা গেড়ে, বড়জোর পাঁচ এক সাধুকে দেখ্‌তে পেয়ে লোকেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। রাজা সাধু ফকীরের ওপর হাড়ে চটা—তাদের নাম শুনলেই তিনি একেবারে আগুন হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশ্বাস এই যে, ব্যাটারা সব পাঁজাকোরা ঝুটমারেস, তাদের মধ্যে ভাল লোক একটিও থাকতে পারে না। তাই দেখ্‌তে পেলেই ধ'রে এনে কারো মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালেন, কাকেও দেন মাটী কোপাতে, কাকেও দেন ঘোড়ায় ঘাস কাটতে। তাই কোনো সাধু-ফকীর আর কিছুতেই থেকতে চায় না। কেউ হঠাৎ এসে পড়লেও রাজার কথা শুনলে কোন্ পথে ছুটে পালাবে, তার উদ্দেশ পায় না। কিন্তু এই সাধুটিকে রাজার কথা সব খুলে বলা হলেও তিনি এতটুকু নড়্‌লেন না, আরো বেশ চাঙা হয়ে বোসে বল্লেন, "রাজা যাদের ধরে নিয়ে সাজা দেন, নিশ্চয় তারা দুষ্টু লোক হবে—নিশ্চয় তারা কোন অন্যায় কাজ করে থাকবে।"

লোকেরা বল্ল, "আপনি জানেন না, তাই অমন কথা বল্‌ছেন। অন্যায় করুক, চাই নাই করুক রাজা তা দেখেন না। দেখেন খালি সাজ পোষাক। সাধুর সাজ দেখ্‌লেই তিনি যান চটে, আর লোককে ধরে নিয়ে দেন সাজা। আমরা এমন কত দেখ্‌লুম।"

সাধু হেসে বল্লেন, "তা হলে তো তারি মজার লোক তোমাদের এই রাজা। আমাকে যদি ধরে নিয়ে যান তিনি, মন্দ হয় না তো তা হলে। এই সম্পর্কে তবু তাঁকে একবারটি আমি দেখে আস্‌তে পারি।"

লোকেরা কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। অন্যান্য বারে কোনো সাধুফকীর রাজ্যের সীমানায় পা বাড়াতে না বাড়াতেই সে খবর রাজার কানে যায়। এবার কিন্তু তা হোলো না। প্রজাদের মধ্যে সবাই তো আর ভাল লোক নয়; অন্যায় জুলুম দেখ্‌লে খুসী হয়, এমন লোকও ঢের-ঢের আছে। কিন্তু এবার তারাও যে কেন চুপ করে গেল, রাজার কানে কথা লাগানে না, তা ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, তবু কিন্তু কথাটা চাপা রইল না কিছুতেই।

রাজার ছোট ছেলের খুব অসুখ। সে কিছুই খেতে পারত না, যা-যা খেত, সব বমি হয়ে উঠে যেত। ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম কারো অষুধেই কোনো ফল হয় নি। দিনকার দিন সে শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে যাচ্ছে। একদিন তাই রাণীর এক দাসী রাণীকে বল্ল, "মা, এদেশে যে এক সাধু এসেছে, তার কথা শুনেছ? সে যাকে যে অষুধ হাতে কোরে দিচ্ছে, তাতেই তার অসুখ আরাম হয়ে যাচ্ছে। কত লোক যে ভাল হয়ে সাধুকে ধন্য ধন্য করছে, সে আর কি বলব।"

রাণী বল্লেন, "শুনেছিস, না দেখেছিস? সাধু ফকীরের গুণের কথা, অমন ঢের-ঢের শোনা গেছে, কিন্তু তারা সব ভুয়ো। সেই জন্যেই তো মহারাজ ওদের নাম শুনলেই জ্বলে যান।"

দাসী বল্ল, "ভুয়ো কথা কেমন কোরে বলি! আমার এক ভাই-পো-ই যে তার ওষুধে ভাল হয়েছে। বাঁচার আশা ছিল না তার। ছেলে ভাল হবার পর আমার ভাই সাধুকে গিয়ে বল্ল, 'আপনি আমার ছেলের প্রাণ দিয়েছেন; এর শোধ আমার দেবার সাধ্য নাই, তবে আমার সাধ্য মতো আপনি যা চাইবেন, তাই আমি

আপনাকে দেব। আপনার কি চাই বলুন।' সাধু বলেন, 'এক মুঠো চা'ল। তোমাদের রান্না করার জন্য এ বেলায় যে চাল নেপে নেওয়া হবে, তারি ওপর থেকে এক মুঠো চাল।'

কি জানি কেন, সাধুর ওপর রাণীর বিশ্বাস ছোলো। রাজা রাজকাজ সেরে' অন্দরে আসতেই রাণী সুমতি সেই কথা রাজাকে বল্লেন। রাণী রাজার স্বভাব অবিশ্যি বেশ ভাল রকমেই জানতেন, তবু ভেবেছিলেন যে, সাধুর গুণের কথা শুনলে, তার গুণে ছেলে ভালো হতে পারে বুঝলে, তিনি আর রাগ করবেন না। কিন্তু তিনি কি আগ্ মানবার লোক! সেই সাধুর নাম শোনা, অমনি রাগে জ্বলে উঠে বল্লেন, 'বাটারা সব পাজি, সব জুচ্চোর, বদমায়েস। কতদিন আমি বলেছি, শুধু লোক ঠকিয়ে পয়সা নেওয়াই ওদের কাজ। তবু তোমার চৈতন্য হলো না।'

রাণী নরম ভাবেই বল্লেন, 'না গো না, এ তেমন লোক নয়, কারো কাছ থেকে টাকাকড়ি কিছু নেয় না।'

রাজা বল্লেন, 'এখন নিচ্ছে না, পরে নেবে—আরো বেশি করে নেবার ফন্দী। কোথায় আছে সে বাটা ঠগ্ আমি এখনি তা জানতে চাই।'

রাণী ভালমন্দ কোন কথাই কইলেন না। তিনি জান্তেন, কথার ওপর কথা কইতে গেলেই হিতে বিপরীত হবে।

রাজা কিছুক্ষণ একলা-একলাই বকর-বকর কোরে বকে তারপর আবার কাছারীতে বেরিয়ে গেলেন। গিয়েই হুকুম দিলেন, 'সাধুকে এক্ষণি ধরে আনতে হবে, যেখানেই থাক্, সেইখান থেকে।'

মন্ত্রী সুসেন রাজবাড়ীতে আসতে-যেতে পথের পাশের গাছতলায় দেখতে পেতেন, সাধু কখনো চুপ করে বোসে ভগবানকে ডাকছেন, কখনো একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গান করছেন—ভগবানের নাম; আবার কখনো লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন। লোকটার ওপর তার কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল। কিন্তু তিনি রাজাকে সে সব কথা জানতে না দিয়ে বল্লেন, 'মহারাজ, লোকটা যদি সত্য সত্যই সাধু হয়, তাকে ধরে আনা কি ভাল হবে?'

রাজা মন্ত্রীকে ঠাট্টা করে বল্লেন, 'না; সে আমাকে আস্তো গিলে খাবে। তোমার ভয় হয়ে থাকে, তুমি ঘরে গিয়ে ইঁদুরের গর্ত্তে লুকোও।'

মন্ত্রী সুসেনকেও অবস্থা বুঝে চুপ করতে হলো।

সাধুকে কাছারীতে ধরে আনা হলে রাজা দুর্জ্জয় চীৎকার করে বল্লেন, 'তুমি নাকি সাধু?'

খুব শান্তভাবে সাধু বল্লেন, 'সাধু, কি অসাধু তা আমি জানিনে, কিন্তু আমি মানুষ।'

রাজা বল্লেন, 'মানুষ তো সবাই।'

সাধু বলেন, 'হাঁ, সবাই মানুষ, আর আমিও তাদেরই একজন।'

রাজা বল্লেন, 'তবু ভাল যে তুমি স্বীকার করছ, কারো চাইতে তুমি বড় নও; কিন্তু এতেও তোমাকে আমি রেহাই দিতে পারছিনে। যদি মানুষই হও তুমি, তা হলে আর আর মানুষে যা করে, তোমাকেও তাই করতে হবে।'

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর আর মানুষে কি করে? আর আমাকেই বা কি করতে হবে—শুনি?'

দুর্জ্জয় দুষ্টহাসি হেসে বল্লেন, 'দরোগাগী, খানসামা-গিরি, কি এইরকম ভাল আর কোনো কাজ।'

সাধু বলেন, 'ঐ রকম কাজ ভাল কি মন্দ তা আমি বলতে চাই না। তবে দুনিয়ার সবাই ঐ রকম কাজ করে না, অনেকে আরও অনেক রকম কাজ করে থাকে। তার মধ্যে যে কাজ আমি পারি, তাই আমি করবার চেষ্টা করছি; আর অন্য কোনো কাজ আমার করবার ইচ্ছা নেই।'

রাজা গরম হয়ে বল্লেন, 'তোমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কার কি আসে যায়?'

সাধু বল্লেন, 'তবে কার ইচ্ছায় আসে যায়?'

রাজা খুব জোরের সহিত বল্লেন, 'কার ইচ্ছায় আসে যায়, তা তুমি এখনি জান্তে পারবে। ওরে কে আছিস?...'

সাধু ঠাণ্ডাভাবে বল্লেন, 'মহারাজ, ভুল বুঝেছেন, আপনার আমার কারো ইচ্ছাতেই কিছু আসে যায় না। আমরা খালি ইচ্ছাই করতে পারি।'

কথা শুনে সভার সবাই খুসী হয়ে ভাবলে সাধু যা

বল্‌ছেন, তাই ঠিক। কিন্তু রাজার মনে হলো, কৃতর্ক বড়াই। রাগে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল জবা-ফুলের মতো। তিনি লোহার মতো শক্ত হয়ে হুকুম দিলেন, "আটক করো ওকে একখানি আমার জেলে, আর জারো রোজ একখানা ক'রে বেত ওর পিঠে। দেখি কার ইচ্ছায় কাজ হয়। যতদিন না ও মন্ত্র দেবে মন্ত্রী করতে ইচ্ছা করে, ততদিন ওর এই শাস্তি।"

সাধু গেলেন জেলে, আর রাজা দেখতে লাগলেন, রাজকাজ—যেমন যেমন দেখেন তেমনি। রাজারও দিন যায়, প্রজারও দিন কাটে, আর সাধু—যিনি জেল-খানায় আটক আছেন, তাঁরও দিন চুপটি করে বোসে থাকে যা।

একদিন রাজা কাছারীতে এসে বোসেছেন, দেখেন, বাইরে লোকের বড় ভিড়, মন্ত্রীর দিকে চাইতেই মন্ত্রী বল্লেন, "ওরা সব জেলের পাহারাওয়ালা, পাহারা দিতে চাইছে না।"

রাজা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "কেন চাইছে না ওরা পাহারা দিতে?"

মন্ত্রী বল্লেন, "কেন চলো চোর-ডাকাতদের জন্যে, আর তাদের জন্যেই পাহারা। সাধু ফকীরের জন্যে তো পাহারা নয়, আমরা পাহারা দিতে পারব না। দিলে সাধুর কোপে আমরা মারা যাব।"

রাজা রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে বল্লেন, "সাধুর কোপে মারা যাবে! আর রাজার কোপে বুঝি বেঁচে থাকবে! জানে না ব্যাটারা যে রাজা দুর্জ্জয় সেন আমার নাম, ইচ্ছা করলে এক্ষুণি আমি ওদের সব কটার গর্দ্দান নিতে পারি, মাটিতে জ্যান্ত পুতে ফেলতে পারি। বলে দাও ওদের, ভাল চায় যদি, একণি আবার ওরা জেলখানায় গিয়ে পাহারা দিক—ভাল মানুষের মতো।"

প্রাণের দায় বড় দায়, সবাইকেই আবার জেল-খানার দিকে ছুটতে হলো কিন্তু কেউ ইচ্ছা করে গেল না।

হুকুম দিয়ে রাজা গেলেন অন্দরে। যেতেই রাণী সুমতি রাজপুত্রকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, "ঐ দেখো, সাধুর গুণ। না দেখলে তো বিশ্বাস করবে না কিছু!"

রাজপুত্র তখন তাঁর কাঠের ঘোড়ায় চেপে তার পিঠে শপাং শপাং করে চাবুক কষছিলেন, আর তাকে পক্ষিরাজ ঘোড়া মনে ক'রে বলছিলেন, চল্ চল্ দিয়ে চল—চাঁদা মামার দেশ।

কাছারীতেও সাধুর গুণ! গুণে তার পাহারা ওয়ালারা কাজ ছেড়ে দিতে চায়! আবার অন্দরেও সাধুর গুণ। গুণে তার রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়েন! ঘরে বাইরে সবাই এক জোট হয়ে তাকে ঠেলিয়ে তোলবার চেষ্টায় আছে না কি!

রাজা দুর্জ্জয় একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাধুর গুণেই ছেলে তোমার ঘোড়ায় চেপেছে না কি?"

রাণী সুমতি গর্ব্বভরে বল্লেন, "হাঁ সাধুর গুণেই ছেলে আমার ঘোড়ায় চেপেছে। যতদিন তোমার বাইনে করা ডাক্তার বদ্যির ওষুধ দিয়েছি, ছেলে বিছানা ছেড়ে এক-পা-ও নড়ে বস্‌তে পারে নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সাধুর ওষুধ। সবে দিন দুই ওর পেটে পড়েছে দেখো এরই মধ্যে ওর আপদ-বালাই সব কেটে গেছে!" বলেই সুমতি এগিয়ে গিয়ে আদর করে ছেলের গালে একটি টোনা মারলেন।

রাগে ফুলতে ফুলতে রাজা দুর্জ্জয় সেন বল্লেন, "সাধুর ওষুধেই ছেলে ভাল হোক, কি আর কারো ওষুধেই ছেলে ভাল হোক, সে কথা আমি জানতে চাইনে। আমি জানতে চাই তুমি লুকিয়ে জেলখানায় গেছলে কি না।"

সুমতি বল্লেন, "না মহারাজ যাইনি। কিন্তু আমি গেলুম—যাবার ইচ্ছে হয়েছিল আমার। ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার রাগের ভয়ও আমি করলুম না। কিন্তু কেমন করে যাই!—যাকে জেলে পোরা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে কেমন করে বলি যে, ওগো, তুমি আমার ছেলেকে ভাল করে দাও। তাই নিজে না গিয়ে ছেলেকে দাসীর হাতে পাঠিয়েছিলুম। জেনেছিলুম কার না কার ছেলে সাধু টের পাবেন না। কত লোকই ত যাচ্ছে, তাদের ছেলেদলে দিয়ে।"

রাজা দুর্জ্জয় গর্জ্জে উঠে বল্লেন, "এঁ!! ছেলেও সব লোক মান্ছে—সাধুর কাছে! পাহারাওয়ালারা সব কি করছে তা হলে?"

সুমতি বল্লেন, "কি আবার করবে তারা। সাধুকে ছেলে পুরলে বুঝি জেলখানা কখনো জেলখানা থাকে! তাই আবার পাহারাওয়ালারা পাহারা দেয়!"

পাহারাওয়ালাদের ওপর তো রাজার আগেই রাগ হয়েছিল, এইবার সেই রাগ তাঁর আরও ভয়ানক হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু শাস্তি পেয়েও যে কেউ কখনো শাস্তি-দাতার ছেলেকে ভাল হবার ওষুধ দিতে পারে, একথাও তো বিশ্বাস করা শক্ত! তাই তিনি মনের ভাব মনে রেখেই বল্লেন, "তুমি কি করে জান্‌লে যে, ছেলেকে সে চিন্‌তে পেরেছিল?"

সুমতি বল্লেন, "তিনি দেখেই বলে উঠেছিলেন—এ যে দেখ্‌ছি রাজপুত্তুর। ছেলে আমার রোগে ভুগে ভুগে প্যাকাটির মতো রোগা; সাজগোজ করেও পাঠাই নি; তবুও তিনি ওকে দেখেই চিন্‌লেন। এও আমি আশ্চর্য্য বলে ভাবছি না; আশ্চর্য্য ভাবছি এই যে, তিনি ছেলেকে আদর করে কোলে নিলেন, রোগ সারাবার ওষুধ দিলেন, ঘুনাক্ষরেও বল্লেন না যে রাজা তার ওপর অবিচার করেছেন।"

দুর্জ্জয় বল্লেন, "বুঝতে পেরেছি, ব্যাটা ভারি শেয়ানা! কি ভেবেছে জানো? ছেলের রোগ সারিয়ে দিলেই আমি তাকে খুশী হয়ে ছেড়ে দেব।"

রাণী দুঃখিত ভাবে বল্লেন, "কি পাঁচেরা বুদ্ধি তোমার! সহজ সরল ভাবে তুমি কি কোনো কথাই ভাবতে পারো না। সাধুর কি শক্ত মিত্র জ্ঞান আছে, না তোমার জেলখানার ভয় আছে?"

রাজা রাণীর কথার আর জবাব দিলেন না, চুপ ক'রে কি ভাবলেন। তারপর উঠে আস্তে আস্তে জেলখানার দিকে চল্লেন। গিয়ে দেখেন, রাণী যা বলেছেন, তাই ঠিক জেলখানা যেন আর জেলখানা নেই। সেখানে কেউ পড়ছে কোরাণ, কেউ পড়ছে পুরাণ, কেউ কচ্ছে গান—একতারা বাজিয়ে বেচে বেচে, আর কেউ দিচ্ছে হাততালি। জেলখানায় যত চোর-ডাকাত ছিল সব হয়েছে সাধু! চারদিকে লোক গিজ গিজ করছে। ভিতরের লোক বাইরে যাচ্ছে, বাইরের লোক ভিতরে আসছে। কেউ কাকেও কিছু বলছে না। পাহারাওয়ালারা যেন সব সং, লম্বা লাঠী হাতে দুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু যেন না থাকলে নয় তাই। রাজাকে কেউ দেখেও না, গ্রাহ্যের মধ্যেও আন্‌ছে না। মনে তার রাগও হয়, কৌতূহলও জাগে। ভাবলেন, আচ্ছা যার উপরে বেত মারবার হুকুম ছিল, সেই বা কি করছে, তাও তো একবার জানতে হয়। তাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বলি হুকুম মতো কাজ করছিস তো? সাধুর পিঠে বেত ভাঙছিস তো—রোজ এতখানা করে?"

সে হাত জোড় করে বল্লে, "হা হুজুর, ভাঙ্‌ছি বই কি বেত। তবে ঠিক সাধুর পিঠে ভাঙ্‌ছি না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার পিঠে ভাঙ্‌ছিস্ তবে? তোর নিজের পিঠে?"

"আজ্ঞে, না হুজুর, নিজের পিঠে ভাঙ্গা তেমন সুবিধের নয় তাই ভাঙ্‌ছি মেতালের পিঠে।"

"প্রাণের ভয়ও নেই তোদের?"

"আজ্ঞে না হুজুর, আগে ছিল, এখন নেই। থাকলে আর এমন কাজ করি?"

চারদিকের ভাবগতিক দেখে রাজা বুঝলেন, অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়। তার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আজ আর কিছুই হবার জো নেই—প্রাণের ভয় দেখিয়েও নয়। ছোটবড় যে যেখানে ছিল, আজ তাদের সবারই ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার ওপরে জয়পতাকা উড়িয়েছে। তিনি সাধুর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বল্লেন, "আমার ভুল হয়েছে। না বুঝে আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি আমাকে আপনি মাপ করুন।"

সাধু হাসিমুখে বল্লেন, "আমার তো কোনো কষ্ট হয় নি। কেন আপনি আমার কাছে মাপ চাইছেন। সাজতলাতেও আমি যেমন ছিলাম, এখানেও আমি ঠিক তেমনি আছি।"

রাজা সাধুর পায়ে পড়ে বল্লেন, "আমায় তেড়েও স্বাধীন যে সাধু তাঁকেও আমি বাঁধিতে চেয়েছিলুম, কি মূর্খ আমি! জেলখানায় বসে থেকে আর আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না চলুন আপনি, আমার রাজসভায়।"

শ্রীনিশিকান্ত সেন

ইরাণ কাহিনী

শাহ্ জমশেদের গল্প

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জমশেদের মত বুদ্ধি, হেকমত ও শক্তি আর কোনও রাজা-বাদশার ছিল না। জিন পরীরাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং তিনি তাদের দিয়ে অনেক ভাল ভাল বড় দালান গড়ে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া কাস্পিয়ান সাগরে শা জমশেদের যত বড় ছোট কিস্তি জাহাজ ছিল, তাহাদের সবগুলির মাঝি মাল্লা ছিল জিনরা, এমন কি তারা জমশেদের সিংহাসন কাঁধে নিয়ে হাওয়ায় উড়ে যেখানে তিনি চাইতেন, সেই খানে তাঁরা চোখের নিমিষে নিয়ে যেত। শা জমশেদ দেবতাদের প্রিয় পাত্র ছিলেন, ইরাণ সাতশ বৎসর কাল তাঁর শাসনে থেকে সোনার যুগ ভোগ করেছিল। তাঁর শাসন কালের এই সোনার যুগে সমস্ত ইরাণের মধ্যে কারো কোন অসুখ বিসুখ হয় নাই, রাজ্য হ'তে বার্দ্ধক্য পালিয়ে গিয়েছিল; জমশেদ নিজেও অটুট যৌবন ও স্বাস্থ্য ভোগ করেছিলেন।

বাদশার ইনসাফে সুখে থাকে মুলুক
দূরে যায় দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, রোগ, শোক।

কিন্তু বড় হ'লে যশের যা হয় জমশেদেরও তাই হ'ল, তাঁর মন অহঙ্কারে ভরে গেল, যে দেবতাদের আশীর্ব্বাদেই তাঁর উন্নতির মূল, তিনি তাঁদেরকে ভুলে গেলেন।

করিয়া দুনিয়া জয় দেও জিন পরী,
জমশেদ মারা যায় অহঙ্কার করি।

এক দিন শা জমশেদ তাঁর প্রজাপুঞ্জকে তাঁর শাহী দালানের সামনে সমবেত হতে ফরমান (১) জারী করলেন। এই দালানটী তৈরী করেছিল সব জিনেরা, আর ইহা এমনি সুন্দর ছিল যেন একটা পরীর স্বপ্ন-পুরী। দালানের বাইরের দেওয়ালগুলিতে যে চমৎকার ছবিগুলি আঁকা ছিল, তা কেবল পরীজাদীর হাতের যাদু তুলিতে তার নিজের হৃদয়ের অপরূপ স্বপ্নরাগের অনুলেপনেই সম্ভবে। তার হাজার হাজার জানালা, তাতে নানা রকম বহু মূল্য পাথরে খচিত মাঝে মাঝে মায়াময়ী আয়না বসানো; তাতে প্রভাত সূর্য্যের সোনালী কিরণে সমস্ত প্রাসাদটী হীরক মহলের মত ঝল মল জ্ব'লে উঠত। লোকে দূর হতে দেখে অবাক হ'য়ে ভাবত, একি বেহেস্তের এরেম বাগ, হুর পরীর মায়াপুরী, না দুনিয়ার দালান?

দালানের ভিতরে বড় বড় কোঠা, তাতে মাঝে মাঝে গোলাপ জলের ফোয়ারা ফুর ফুর করে ছুটে উঠছে, আর পালকে বহু-মূল্য জরোয়া মখমল বিছানা, ঝিল মিল হীরার নুক্তার রেণু জড়িত কিংখাবের

(১) ফরমান = আদেশ।

তাকিয়া, দেওয়ালের গায় বিচিত্র ছবি ও জরীর ঝালরদার রেশমী পরদা ঝুল ছে।

প্রাসাদটী ছিল ঠিক শহরের মাঝখানে, তার উত্তরে আলবুরুজ পর্ব্বতের আকাশভেদী চূড়া ধবল-তুষার পাগরী প'রে দরবেশের ন্যায় ধ্যাননিমগ্ন ; ডেমাওন্দ আগ্নেয়গিরি হতে ধীরে ধীরে ধূম উঠে পরিষ্কার পায়ন্ত আকাশে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে অদৃশ্য হচ্ছে।

প্রাসাদের সম্মুখে পরাক্রান্ত জমশেদের শাহীতখত স্থাপন করা হ'ল। এই সিংহাসনে বসে জমশেদ তাঁর মুল্‌কের বিভিন্ন অংশে এক পলকে যেতেন। সিংহাসনটী ছিল দেও শিল্পীদের হাতের তৈরী—কিশ্তী হীরা জহরতে জড়িত। যখন সূর্য্য কিরণে সমস্ত তখতটী ঝলিয়ে উঠত, তখন কার সাধ্য তার দিকে তাকায় ? সিংহাসনের চারদিকে থাড়ান সারি সারি পাহাড়ের মত জোয়ান সব দেও, দৈত্য, দানবও জ্বীন আর উপরে পরীরা এক অপরূপ চাঁদোয়া ধরত, আর ছোট ছোট ফুলের মত পরীস্ত্রীরা কেউবা পেস্তাবাদাম-আঙ্গুরের সরবৎ সোনার পেয়ালায় হীরার ঢাকনিতে ঢেকে সামনে হাজির থাকত, কেউ ছোট ছোট সুগন্ধি মশাল বিচিত্র কায়দায় জ্বে'লে ধ'রে থাকত, আবার কেউবা চামেলী কেওয়ার আতর জলের গোলাব-পাশ হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে তরল গন্ধের বৃষ্টিপাত করত।

কিছুক্ষণ পরে বড় বড় দস্তার ঢাক ও দুন্দুভির চামড়ায় দক বেজে উঠল, নকিব এসে হাঁ'কলেন,"বাদশানামদার আস্‌ছেন, পারস্যের মহা প্রতাপশালী জমশেদ এখানে তশরিফ নিয়ে আসছেন," তখন সেই সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘ চঞ্চল হ'য়ে উঠল, তাদের অমিতবিক্রম শাহান-শাহকে দেখতে এবং তিনি কেন তাদেরকে ডেকেছেন তা তাঁর মুখে শুনতে সকলে উৎকর্ণ হয়ে অধৈর্য্যের সঙ্গে বাদশার আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে শাহজমশেদ তাঁর বড় বড় যোদ্ধা ও রাজ্যের বড় বড় আমীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে প্রাসাদ হ'তে এসে সিংহাসনোপবেশন করলেন ; উপস্থিত সকলে মাথা নুঁয়ে তাঁকে সালাম করল। জমশেদ তাঁর জাকাল পোষাকে সজ্জিত ছিলেন, তাঁর বিচিত্র পাগরীতে একটী বড় হীরকখণ্ড ধক ধক জ্বলছিল। তাঁর মহান আকৃতি দেখে রাজ-ভক্ত প্রজারা সমস্বরে ঘন ঘন "বাহবা" "বাহবা" চীৎকার শুরু করে দিল।

এক মিনিট পর শাহান শা-জমশেদ তাঁর রাজদণ্ড সঞ্চালনের ইঙ্গিতে সকলকে দাঁড়িয়ে নীরব থাকতে আদেশ করলেন ; মুহূর্ত্তে সব নীরব হ'ল, এমন গম্ভীর নীরবতা যে তা'তে ডেমাওন্দের ধূম উদ্গীরণও শোনা যায়, এমনই উদ্‌গ্রীব হয়ে তারা সবাই তাদের আলম্পনার বাণী শুনতে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

খাজা

গ্রন্থ পরিচয়

মতিচূর—(দ্বিতীয় খণ্ড) মিসিস আর, এস, হোসেন প্রণীত। ২০১ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲ টাকা। ৮৮এ লোয়ার সার্কুলার রোড. হইতে গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪এ কলেজ স্কোয়ার মথুরমী লাইব্রেরী ও কলিকাতার অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মিসিস আর, এস, হোসেন সাহেবার নাম আমাদের পাঠক সমাজের নিকট অপরিচিত নহে। তিনি এই পত্রিকার একজন লেখিকা এবং তাঁহার রচিত মতিচূর (প্রথম খণ্ড) ও Sultana's Dream প্রভৃতি পুস্তক সাহিত্য সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। আমরা মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়াও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে: (১) সুর ইসলাম (২) সৌরজগৎ (৩) সুলতানার স্বপ্ন (৪) ডেলিশিয়া হত্যা (৫) জ্ঞানবল (৬) নারী সৃষ্টি (৭) নার্সনেলী (৮) শিশুপালন (৯) মুক্তিফল এবং (১০) সুশিক্ষা। বিষয় সূচী হইতে দেখা যায় যে লেখিকা সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। ভাব ও ভাষায় তাঁহার লেখা সহজেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। নারী জাতির দুঃখ দৈন্যে ব্যথিত হইয়া লেখিকা যে সরস মধুর ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। "মুক্তিফল" রূপকথাটি Political carricature হিসাবে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠক বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে, এই পুস্তকখানি আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকের আকার বৃহৎ, ছাপা সুন্দর ও বাঁধাই শোভন হইয়াছে সুতরাং মূল্য ২৲ টাকা বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

জন্ম-অভিশপ্তা—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস। মূল্য ১৷০ টাকা। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নারীর সুখ দুঃখ, নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা এবং নারীর বেদনা ও যাতনা নারী যেমন বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে পুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তাই এই নারী লেখিকার করুণ রসসিক্ত উপন্যাসখানি পড়িয়া আমাদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়াছে। আমাদের দেশের নারীর জীবন আগাগোড়া একটা হৃদয় বিদারক তপ্ত শ্বাস গুমরা। সংসার ও সমাজের চাপে নারীর জীবন এদেশে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে না, শুধু অশ্রু ও আর্ত্তনাদের হাহাকারে তাহা ভরপুর হইয়া থাকে। পুরুষের হাতে নারী নিরন্তর যে কত নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকে তাহাই এই উপন্যাসখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—তিনি নারী জীবনের অন্ধকার দিকটা খুবই সুস্পষ্টভাবে আঁকিয়াছেন। জগদ্ধাত্রীর চরিত্রে নারী চরিত্রের মাধুর্য্য, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা ফুটিয়াছে ভাল। উপর্য্যুপরি আঘাত সইয়া জগদ্ধাত্রীর সুপ্ত "মনুষ্যত্ব" কেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাহাও মনোরম ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার স্বামীকে এক কথায় বলিতে গেলে একটি জীবন্ত Catalogue of crimes বলা যায়। বাস্তব সংসারে এই শ্রেণীর জীব নিতান্ত দুর্লভ না হইলেও এইরূপ দানবী চরিত্র মানবের জীবনে যে সদ্ভাবের সত্তা মোটেই নাই ইহাতে আমরা যতটা না বিস্মিত হইয়াছি, ব্যথিত হইয়াছি তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের বিশ্বাস যে মানুষ যতই হীন ও ঘৃণ্য হউক না কেন, সে মানুষ ভগবানেরই—। ঘোষজায়ার অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা যায় যে প্রধান চরিত্রগুলি হয় সদ্গুণের আধারে আদর্শ মানব নয় নানা দোষের আকর নিখুঁত দানব হইয়া উঠে।

এই লেখিকার উপন্যাসগুলি আমরা আগ্রহের সহিতই পড়িয়া থাকি কিন্তু কথা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে তাহার রচনা ভঙ্গী নির্দ্দোষ মনে করি না। লেখিকা অনেক স্থলেই কতকগুলি সংযুক্ত বাক্য (Sentence) সংবদ্ধ করিয়া যে ভাব প্রকাশ করেন

...ছাত্রে ছেলে বিষয় অধিক ১ হইত উঠে না। ...স্থানের ভাষা সহজ ও সরল হইতে হইবে, অর্থের ...বাক্যের সমাবেশে ভাষা ভার না। আমরা নিম্ন একটি দৃষ্টান্ত দিলাম "বড় সাহেব সময়ের বিপুল ...সম্পত্তি আমাদের মাথা ...আমাদের ...পাঠশালা, আমাদের নীচের ক্লাসের ছাত্রী "মেমুরাণী আমাদের ছাদে 'চুকিয়া' ভাষার সম্বন্ধে মোটা বিদ্যা চর্চ্চিলার ক্লাস, প্রবাহ বেড়ো 'কইয়া' সভার আমরা পাঠের ...ধরে ...পড়িয়া' এইবেট চলে চাকার ...পাত 'কহিয়া' লিখার ...ছাড়া ...আমাইয়া' আমার ...'পড়াইয়া' করিয়া' বলিয়া..." উপরোক্ত বাক্য কয়টিতে এতগুলি অসমাপিকা ক্রিয়ার ...করেন ...যে ...পাঠকের ...ভাহা পাঠকের ...জড়াইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের ... একের চরিত্রটি ...হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী অপরাধী মেয়ে একস্থানে ...সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "চেহারায় সরলতা ও নিরপরাধ ভাব আছে, তার চেয়ে বেশী আনন্দ বোধ হচ্ছে।" সরলতা ও নিরপরাধতা উভয় ভাবই চিত্রিত হইয়াছে ...কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর আত্মকথার ...ভাষাখানি যে ...পড়িল ইহা আমাদের কাছে নিতান্ত ও ...মনে হয়। অসমাপিত ...সরল মুখে লেখিকা ...অনেক ...কথা ...জড়াইয়াছেন ...ঘুখে শোভা পায় না। সরলমুখে ...না করিয়া বিদ্যালয়ের ...শিক্ষয়িত্রী করিলেই ...চরিত্র ...বলা আবশ্যক যে ...কাহিনীকে ...বিদ্যালয়ের একটি ...চিত্র ...সুনিপুণ ...লেখিকা ...।

সমিতি-সংবাদ

...বিগত ২৮শে চৈত্র ...সন্ধ্যা ৬-৩০ ...সমিতির কার্য্যালয়ে, ...মুখোপাধ্যায় ...পরীক্ষায় ...অনুরূপ করিয়া বি-এ ...পরিচয় ...এক ...সভা। ...হইয়াছিল। ...সভাপতি ...ও ...মহাশয় ...করিয়াছেন।

...মুখোপাধ্যায় ...সভাপতি ...করিতে ...উঠিয়া ...—শ্রীযুক্ত ...করিয়া বি-এ ...একজন ...সমিতির ...। ...ইহাদের ...মুসলমান ...ইস্তফা' ...পড়িয়া ...করিয়াছেন ...ইহারা ...সম্বন্ধে ...করিতে ...। ...শিক্ষা ...ইহাদের ...আছে। ...বক্তৃতায় ...করিয়া ...সভায় ...সমিতির ...ইহাদের ...চান ...। ...সমিতি ...করিয়া ...এক ...ধন্যবাদ ...।

...সমিতির ...সভায় ...পৃষ্ঠপোষক ...। ...সভায় ...টাকা ...দান ...এবং ...সভায় ...সমিতির ...সাহায্য ...। ...তাহারই ...উদ্দেশ্যে ...সমিতির ...আন্তরিক ...। ...তাহার ...দেশহিতৈষণা ...করিতেছে, ...তাহাকেই ...সভাপতিত্বে ...করিয়াছি। ...মৌলভী ...করিম ...সাহেব ...করিতে ...করিলে ...আবদুল ...করিম বি-এ ...সভা-...সমিতির ...আবদুল ...করিম ...ধন্যবাদ ...করিয়াছেন। ...সভাপতি ...সমিতির ...সাহায্য ...করিতে ...। ...সভাপতি ...সমিতির ...করিয়াছেন। ...সমিতির ...সভাপতি ...করিয়াছেন। ...সমিতির ...সভাপতি ...করিয়াছেন। ...সমিতির ...সভাপতি

...কটা মস্ত ... মুসলমান ... পুরুষ ... হিন্দু ছিলেন। বাস্তবিক একই মাটীতে ... একই আবহাওয়ার মধ্যে ... বিশেষতঃ উভয়ের মধ্যে ... ধর্ম্মে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য ... ধর্ম্মের জন্য বর্ণভেদ বর্জ্জন ... ধর্ম্মের, ব্রাহ্মণের সহিত ... এক হইতেই পারে না। কিন্তু একজন ... একজন মুসলমানের শোণিত ... কিরূপে অস্বীকার করিবেন? ... ঈশা, মুসা, উপনিষদ, রামায়ণ ... তুলসীদাস, ভরতরি প্রভৃতি ... মুসলমানেরও "ওয়ারেসী সম্পত্তি" ... এই সমুদয় পৌরুষ সম্পত্তির ... হইবার মুসলমানেরও গৌরব অনুভব করা ... বঙ্গবিহারী ... বাঙ্গালা ... বাঙ্গালী বলিতেন কিন্তু ... ধর্ম্ম সভ্যতার উপাদান করিতেন ... বঙ্গদেশের বাঙ্গালী খৃষ্টান ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ কাজে সভ্যতারই গৌরব করেন। আমি বুঝিতে পারি না বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতৃগণ কেন, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারতের ভাষা করিয়া শুধু হাফেজ, বেজানী বা সাদীতে ভক্ত থাকিবেন কেন? আশা করি, বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতৃগণ একথা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, যে সঙ্গেই তাঁহারা বেদ উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারতের আর্য্য সভ্যতার ভাষা ভাষী পরিত্যাগ করিয়া শুধু মুসলমান সভ্যতারই আশ্রয় করিবেন সে দিনই হিন্দুমুসলমানের মিলনের পথ সহজ হইবে না।" সভার ভদ্রমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে প্রবন্ধটী শ্রবণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সাহিত্যিক-গণকে প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান করিলে মৌলবী সৈয়দ আবদুল হাফিজ সাহেব বলেন—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালী মুসলমানদিগের পূর্ব্ব পুরুষ অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন একথা বলিয়া ভিত্তিহীন। মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। তবে আমরাও কাহারও পূর্ব্ব পুরুষ যে হিন্দু ছিলেন তাহা অস্বীকার করি না। একজনের হিন্দুর সহিত অন্য ধর্ম্মের হিন্দুর কোন সম্পর্ক নাই এ কথাও ঠিক নয়। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু উচ্চবর্ণের পরিচারিকা থাকেন।" একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া খানবাহাদুর সাহেব তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। অধ্যাপক সালাউদ্দীন সাহেব বলেন—"যোগেন্দ্রবাবু বাঙ্গালী মুসলমানগণকে হিন্দু ভারতাদি গ্রন্থ পড়িতে আহ্বান করিয়াছেন যাঁহার বুঝ বিষয় এবন বাঙ্গালী মুসলমান গুরু কমই আছেন—যিনি বঙ্গের শিক্ষাভাব, সমাজের অবস্থা, নীতির দারিদ্র্যাদিগত প্রভৃতি না আঁকো কিন্তু কারণ বাঙ্গালী হিন্দু কোরআন হাদিসের উপদেশ, প্রেরিত মোহাম্মদের পুণ্যময় জীবন কথা, ইসলামী ওমারের জ্ঞান বিস্তার বিষয় অবগত আছেন? মুসলমানদের যেরূপ উপাদান রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করা উচিত, হিন্দুভ্রাতৃগণেরও তেমনই মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার মৌলবী সাহেব বলেন—"যোগেন্দ্রবাবু বাঙ্গালী মুসলমানগণকে হিন্দু সভ্যতার জন্য গৌরব করিতে বলিতেছেন কিন্তু তাঁহারাই ত মুসলমানগণকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বলিলে শুধু হিন্দুকেই বুঝায়। আজও সর্ব্বত্র দেখিতে পাই হিন্দুরা মুসলমানগণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। হিন্দুভ্রাতৃগণ বাঙ্গালী মুসলমানকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন বলিয়াই মুসলমানগণ কাপড়াদিকে অনুকরণ গোড়ামীসত্ত্বেও হিন্দুদের আপনার লোক বা শোণিত সম্পর্কের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করেন।" এই সময়ে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যগ্রতা সহকারে তাঁর প্রবন্ধকে অনুরোধ করিয়া বলেন—"বাপু, আর ও সব অপ্রীতিকর কথার উল্লেখ করিবেন না। বাস্তবিকই আমরা মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি এ যাবৎ যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এখন তাহার জন্য সকলেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। এখন বিগত কালের

প্রবন্ধের সময় আসিয়াছে এখন বোধের আপনার বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি বৃদ্ধ বাক্তি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ হিন্দুসমাজকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোককে বুকে হাত টানিয়া লইয়া বক্ষে ধারণ করেন এবং "ভাই, ভাই" বলিয়া অশ্রুপাত করেন। দৃশ্যটী সকলের সাহিত্যিক ও যুবকবৃন্দের হৃদয়ে গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল।

রৌলাট বোর্ডার পদস্থ ইংরেজ বি-এ. সাহেব বলেন—"বোধের বাবু যে বহু ইংরেজ প্রশংসিত হইয়া পঞ্চম-মুসলমান-গণকে ভারত প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরূপের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা উচিত। বাঙ্গালা সাহেবের রেসার রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—তিনি বাঙ্গলার মুসলমানদিগকে—ডোম, বাগ্দী, বেদে, বহুপূর্ব হইতেছি বিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান গাজনবীর মোলবী আবদুল করিম সাহেব, তাঁহার পুস্তিকাতে মুসলমান বাঙ্গালা ও The Origin of the Musalmans of Bengal নামক গ্রন্থদ্বয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা রিজলী সাহেবের ঐ মত ভিত্তিহীন বলিয়া এবং বাঙ্গালী মুসলমানের অধিকাংশই হিন্দু আর্য্য, পারস্য; তাতার ও আফগানিস্থান হইতে আগত বীরগণের বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ভারতে যে নব জাগরণের ভাবধারা বহিয়াছে তাহার ঢেউ হিন্দু মুসলমান, সকলের হৃদয়েই আঘাত করিয়াছে। ভূস্বর্গবাসী মাননীয় এখন পর্য্যন্ত চালিতেছেন কিন্তু সেই বরফের স্তূপের পাষাণ গলিতে হইতেছে হিন্দুমুসলমানের মিলন, এই মিলনস্রোত যা হইতে পরাজিত বিজিত হেলেও স্বাধীন হইতেছে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের মিলনের মিলন যাহাতে সহজ সাধ্য হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁহার বক্তব্যকে সমর্থন করিতে গেলে কয়েকজন বাঙ্গালী মুসলমান বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিলেন যে তাঁহারা হিন্দুদের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন। আমি বিনীত ভাবে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলাম যে, হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন, এ কথা সত্য নহে। তবে এ কথা সত্য যে, হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বিজাতীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বিজাতীয় মনে করেন বলিয়া তাঁহারা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা মুসলমানদিগকে বিজাতীয় মনে করেন বলিয়া তাঁহারা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা মুসলমানদিগকে বিজাতীয় মনে করেন বলিয়া তাঁহারা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা মুসলমানদিগকে বিজাতীয় মনে করেন বলিয়া তাঁহারা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন না।

অতঃপর [illegible] প্রথম সভাপতির অভিভাষণের উত্তরে বলেন—"আমি প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে ভূমিকায় বলিয়াছি এবং এখনও পুনরায় বলিতেছি যদি কেহ বাড়ী যাইতে চাহেন, আমার বা সভাকক্ষের বন্ধনে থাকেন—তিনি আমার প্রবন্ধের আলোচনায় বিলীভূত হউন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। তবে একথা অধীক্ষ করিবার উপায় নাই যে, প্রবন্ধের বাটী তুর্কী ও আফগান হইতেছে বর্ত্তমানে ইহারা প্রবন্ধে বর্ণ করিতেছেন ইহাদের মধ্যে এ সৌহৃদ্যের মিলন কোথায় সভ্যতাদি সাহায্যাদি হওয়া যাহা তুর্কী বা আফগানের [illegible] খুব কমই আছে। অধ্যাপক সিলভাঁয়া লেভি অভিযোগ করিয়াছেন, মুসলমানগণ হিন্দুদের শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি জানি হিন্দুগণ মুসলমানদের শাস্ত্র সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক জানেন না এবং তাঁহা [illegible] হিন্দুগণ, যদি না-ই জানেন সেজন্য কি হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্ম? সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রই বাঙ্গলায় অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন কি? বাঙ্গলার অধিবাসী প্রকাশ [illegible] তবু হিন্দুদের উপর দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? হিন্দুরাই প্রথমে কোন্ শাস্ত্র বাঙ্গলার [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে হিন্দুগণ একাকী আরবী পারসী জানেন না, এবং ঐ সময়ে হিন্দুরা তাঁহা নিজেদিগকে করিয়া মুসলমানদের আধিপত্যে [illegible] সাহায্যের পক্ষে সম্ভবও নয়। সুতরাং হিন্দুগণ মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে সে দোষ মুসলমানদেরই। তারপর টাগ সাহেব বলিয়াছেন, হিন্দুগণ মুসলমানদের ঘৃণা করেন। আমি বিনীত ভাবে মুসলমান

[illegible] ছাত্রবৃন্দ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

বঙ্গীয়
মুসলমান-সাহিত্য
পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২৯ | ২য় সংখ্যা

হজরত মোহাম্মদের শক্তিলাভ
ও
মানবের অধিকার

হজরত মোহাম্মদের জীবন ও শক্তির স্বাভাবিকতা তাঁহাকে মানব সাধারণের পরম আত্মীয় ও পরম আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। এই সুখদুঃখময় সংসারে সাধারণ মানুষ ধর্ম্ম-জীবনের কি মহাপ্রাণে উঠিতে পারে, অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ পাইয়া নহে, অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়া নহে, পরন্তু মানব জীবনের সাধারণ শক্তির সহিত সমন্বয় রাখিয়া কিরূপে ভিতরে নিকাশ লাভ করতঃ স্তরে স্তরে পরিক্ষেপ করিয়া উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে, হজরত মোহাম্মদের শক্তি-সাধনা তাহার চমৎকার উদাহরণ। তুমি আমি সাধারণ মানুষ যে রূপ হইতে পারি, আমাদের জ্ঞান-পুণ্যময় উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভে উঠিয়া সেই সুধাপান করিতে পারি, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কি দেখিয়া বিশ্বাস করিব? ধর্ম্ম-জীবনের অধিকার লাভ কি আমাদেরই সাধ্যায়ত্ত? উহা জীবনের অন্তর্হীন গতি, তাহাতে কি আমাদেরই অধিকার?

বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ, শাক্য ও চৈতন্যের শক্তি-লাভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এ প্রশ্নের যে উত্তর প্রাপ্ত হই তাহা নিরাশা-সাধনের। যীশুখৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ আজন্ম মহাপুরুষ শৈশবেই তাঁহাদের শক্তির লীলা-বিকাশ তাঁহাদের জীবন-সাধনায় কোন স্তরে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাদের শক্তি সাধারণ

আরম্ভ কেমন করিয়া, তাহার কোন পরিচয় ঠিকটি আমরা প্রাপ্ত হই না।

তাঁহাদের শক্তির যৌবন-জোয়ার আমাদিগকে প্রথমেই অভিভূত করিয়া ফেলে, আমরা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবার অবসর পাই না।

শঙ্করাচার্য্য বালক কালেই মহাপণ্ডিত ও ধর্ম্মবীর। একেবারেই মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের মত প্রখর কিরণ জালে দেদীপ্যমান অসাধারণ শক্তির অবতার। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে সে শক্তির অধিকারী হইবার আশা করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য যৌবন পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যের চর্চ্চা করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, মাতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া গৃহ ছাড়িলেন; পাণ্ডিত্যের জয় গৌরব দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেমের পাগল হইলেন। কী সে মহাবল যাহা দিগ্বিজয়ী সুপণ্ডিত যুবককে যশ ও প্রতিষ্ঠার সিংহাসন হইতে নামাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষের পায়ের তলে পথের ধূলায় লুণ্ঠিত করিল তাহা মানুষের নিকটে রহস্য-বিস্ময়ে সমাচ্ছন্ন।

বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম হইতেই মহত্ত্বের প্রেরণা চলিয়াছে। কিন্তু সে মহত্ত্বের পরিণতি মূলতঃ বিকাশের নিয়মে সাধিত নহে। জীবের দুঃখবার্ত্তা তাঁহার চিত্তে বাতাসের মত অতর্কিতেই ভাসিয়া আসিয়াছে। সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধের দেহের উপরে দুঃখের যতখানি দাবাগ্নি জ্বলিত হইয়াছে, রাজনন্দন শাক্যসিংহের তনুর উপরে সুখের ততখানি পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছে শাক্যসিংহ রাজনন্দনের মতই সুখের কোলে পালিত হইয়াছেন, রাজপুত্রের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন; রাজ-ভবনের সৌভাগ্য বিলাস ইচ্ছার না হইলেও সম্ভোগ করিয়াছেন। উত্তর কালে দুঃখ সাধনায় যে রোমশিখা তাঁহাকে ধ্বস্ত করিয়াছিল, তাঁহার জীবনের সহিত প্রথমে তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বুদ্ধের সংসার ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনা সাধারণ মানুষের নিকট বিভীষিকাময় অসাধারণ ব্যাপার, সাধারণ মানুষ তাহার অনুসরণ করিয়া বড় হইবার আশা করিতে পারে না।

সুতরাং মনুষ্যত্বের যথোচ্চ সোপানে—ভূমার পূর্ণানন্দময় আলোক মণ্ডলে উঠিবার অধিকার আমাদের নাই। সে জন্য বিধির বিশেষ অনুগ্রহ চাই, দুষ্কর ও ভীষণ সাধনা চাই; তাহাতে তোমার আমার অধিকার নাই। কিন্তু হজরত মোহাম্মদের জীবন-শক্তির বিকাশও জীবনের সাধনা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতেছে যে, আছে,—সে অধিকার মানুষের আছে, প্রত্যেক মানুষ বড় হইতে পারে, মহীয়ান হইতে পারে, অমৃতের মহিমা লোকে গরীয়ান আসন লাভ করিতে পারে।

সত্য বটে ধর্ম্মস্থাপক মহাপুরুষ বিধাতার বিশেষ বাণী জগতে বহন করেন, তিনি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত পয়গম্বর;—ভগবানের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরূপে মানবোদ্ধারের জন্য জনসমাজে প্রেরিত হন; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ কেবল মাত্র বিধিদত্ত বিশেষ শক্তির অধিকারেই বার্ত্তাবাহক মহাপুরুষের সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। তিনি আত্মের সাধনার তার বহনের উপযুক্ত হইয়াই মানবোদ্ধারের মহাব্রত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শক্তি লাভের ইতিহাস ক্রমোন্নতির ইতিহাসের স্বভাবের ব্যাপার। তিনি যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জন্মগত

অধিকার নহে, উহাদিগকে শক্তির আকস্মিক আবির্ভাবের ও পরিণাম নহে। তাহা স্বাভাবিক বিকাশ ও সাধনার ফল। পুষ্পকোরক ধীরে ধীরে গন্ধে পূর্ণ [illegible] পর দল মেলিয়া কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তাঁহার শক্তিও তেমনই ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

শৈশব হইতে দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার আত্মা দর্পণের মত উজ্জ্বল হইয়াছিল। জন্মের পূর্ব্বে পিতা হারাইয়া, জন্মের পরে মাতার বক্ষহারা হইয়া, আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তরে গমন করিয়া তিনি নিজে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে মানুষের দুঃখে তাঁহার অন্তর সদা সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছিল। দুঃখের মধ্যে থাকিয়াই তিনি মানুষের দুঃখে সদা করিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছিলেন। কেবল মাত্র অনুভূতি-বলেই তাঁহার মর্ম্ম-বীণার বিশ্ববেদনার ঝঙ্কার উঠে নাই; সে ব্যথা সেই মাতা পিতৃহীন অনাথ বালকের জন্মাবধি শত দুঃখ, দৈন্য ও শোক যন্ত্রণা রূপে সাক্ষাৎ ভাবে নিপীড়িত করিয়া মানুষের ব্যথা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে সঞ্চারিত করিয়াছিল। স্বীয় স্নেহবঞ্চিত দুঃখভরা হৃদয়ের মধ্যে জগতের যত অনাথ মানুষ নিয়া, তাহাদের বেদনা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে যিনি বিপুল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে গিয়া ইহুদির হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, ধনীর মধ্যে অবস্থান করিয়াও যিনি সপ্তাহের অনশনে উদরে পাথর বাঁধিয়াছিলেন, অনশনের কি ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, কৈশোরে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধনীর সৌধমালার উপরে পদস্থাপন করিয়াও চির জীবন যিনি খর্জ্জুর পত্রের উপরে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রথমে কত রাত্রি ক্ষুধায় আশ্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোরেশ কুলের বধূ-মাতাকে জীবিকার্জ্জনের জন্য খোরমা খাইর দাসত্বেটিকা বহন করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের চক্ষুতে যে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার অন্তরালে দুঃখ-বৈরাগ্যের রক্ত-লোহিত কি খেলা চলিত ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। [illegible] ও ব্যবসায়ীরূপে কঠিন পরিশ্রম

কৈশোর যখন প্রভাতে মার্ত্তণ্ডের রক্তিম তপের মধ্যে তাঁহাকে জীবিকার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অন্যের কাছে যখন ধরণীর যত নর-নারী, তাহাদের দুঃখ-ব্যথার তপ্তশলাকা তাঁহার অন্তরতলে একেবারে গোজাসুজি বিদ্ধ হইয়াছিল। সে দুঃখ দীর্ণচিত্ত ভেদিয়া যে সহানুভূতি ও করুণার যে ধারা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতির বক্ষঃজাত ঝরণা ধারার নিত্য ও নির্ম্মল। দুঃখী জগতের ভার বহিতে গিয়া হইতে দুঃখের যে [illegible] তিনি লাভ করিয়াছিলেন, দুঃখের আঘাত তাঁহাকে নির্ম্মল করিয়াছিল, দুঃখের হুতাশন তাঁহার প্রাণে দৃঢ় করিয়াছিল, দুঃখের আঘাতে তাঁহার মেরুদণ্ড সরল হইয়াছিল। দৈন্য তাঁহাকে ধৈর্য্য ও সন্তোষ তাঁহাকে প্রেম করিয়াছিল।

কিশোর বয়সেই তিনি মানব-সমাজের নিত্য পরিচিত স্বাভাবিক প্রতিনিধিরূপে

আমাদের চক্ষুর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি অলস জীবন যাপন করেন নাই, পিতৃ পুরুষের অধরাগত ধনাধিকারী ধনীর অকর্ম্মণ্য নন্দ দুলাল রূপেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। অন্নহীন ভিখারী রূপে তিনি হাহাকার করেন না, দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াও তিনি সুখের সৌধ নির্ম্মাণে তৎপর নহেন। তিনি বিশ্বের লক্ষ কোটি জনগণের আত্মীয়-রূপে শান্ত মনে জীবিকার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন,—মক্কার রাজপথে তাঁহার কর্ম্ম-চঞ্চল চরণ সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। পরিশ্রমে তাঁহার দেহ সবল, আত্মনির্ভরে ললাট সমুন্নত, সন্তোষে তাঁহার আনন প্রভাত কমলের মত মনোহর। ব্যবসায়ীরূপে তিনি বহির্জগত ও মানব সমাজের সাক্ষাত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পাপও ব্যথার যে অগ্নি স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহার জ্বালা তাঁহার চিত্তকে সাক্ষাত ভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল। রক্তস্নোপম জিঘাংশু আরব সমাজে তিনি রোগীর সেবা করিতেন ও কলহের নিষ্পত্তি করিতেন। কিশোর বয়সে রণ-ক্ষেত্রে হতাহত সৈনিকের শুশ্রূষা করিয়া আরবের নির্ম্মম অগ্নিক্ষেত্রে তিনি সমবেদনা ও কর্ত্তব্যবোধের আশ্চর্য্য ও মহান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসন্ন বদন শিশু সমীপে আনন্দ হাস্যে উজ্জ্বল হইত, রোগীর পার্শ্বে সেই প্রফুল্ল বদন ঘিরিয়া করুণার ছায়া নামিয়া আসিত, তিনি অশান্তি-ক্ষেত্রে শান্তির দূতরূপে অগ্রসর ও গৃহীত হইতেন। বিশ্বাস করিয়া ধন সম্পত্তি তাঁহারই নিকট গচ্ছিত রাখা যাইত। এইরূপে প্রতি প্রয়োজন সাধন করিয়া সততা ও পটুতায় কোরেশ কুলের বিশ্বস্ত 'আমিন' রূপে তিনি সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধা অধিকার করিয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহার জীবনে স্বাভাবিক ভাবে মহত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যতে যাঁহার শক্তির প্লাবন দেশ কূল ভাসাইয়া বিশ্ব মানুষের মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, যৌবনে তিনি জাতির সম্মুখে উন্নতি ও কল্যাণের পরিষ্কার আদর্শ হইয়াছিলেন।

কোটি কোটি নর নারীর চিত্তাধীপ মহা-পুরুষের জন্য প্রথমে দেশপ্রিয় জাতিনায়কের সম্মুখেই অপেক্ষা করিতেছিল।

উদার আকাশতলে, বিশাল মরু প্রান্তরে, গম্ভীর পর্ব্বত-গাত্রে মুক্ত প্রকৃতি দিনে দিনে তাঁহার মনকে জ্ঞানালোকের প্রতি উন্মুখ করিয়াছিল। তিনি শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। চতুর্দ্দিকে মানুষের দুঃখ পাপ ও বর্ব্বরতা অনুক্ষণ তাঁহার চিত্তে চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিত। সমবয়স্ক বালকদল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে উল্লাসভরে ক্রীড়া করিত, তিনি বলিতেন, বৃথা আমোদ প্রমোদের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই, মহৎ উদ্দেশ্যে তাহার জন্ম। জীবনের এই গভীর অনুভূতি উল্লাস-চঞ্চল কিশোর বয়সে হৃদয় তাঁহার গম্ভীর ভাবে পূর্ণ করিত, যৌবনের চঞ্চল কর্ম্ম জীবন জীবনের সুমহান উদ্দেশ্য-বোধ চিত্তের মধ্যে গভীর মন্ত্রে বাজিয়া উঠিত। প্রাণের মধ্যে প্রশ্ন জাগিত, জীবনমরণের রহস্য চিন্তায় চিত্ত তাঁহার অসীম আবেগে আকুল হইত :—কি আমি ?—কেন আসিলাম ? —কেন এ জীবন ধরিলাম ? এই যে দৃশ্যমান অনন্ত বিশ্ব, ইহার মূলে কি রহস্য

নিহিত আছে ? —ইহার সহিত আমার এ জীবনগতির কি গভীর সম্বন্ধ আছে ? আমার চতুষ্পার্শ্বে এই যে দুঃখ ও পাপের ক্রীড়া, ইহার মধ্যে কি কর্ত্তব্য স্থির করিব ?—কি উদ্দেশ্য সাধন করিব ?

জীবনের উদ্দেশ্য-চিন্তায় চিত্ত তাঁহার ধ্যানের মধ্যে মগ্ন হইত, দৃশ্যমান বিশ্ব হইতে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে রহিয়া রহিয়া প্রয়াণ করিত। দিবস তাঁহার কর্ম্মে কাটিত, নিশায় তিনি মৌন প্রকৃতির রহস্য-তিমির ছিন্ন করিয়া সত্যের জ্যোতি বাহির করিতে চেষ্টার পর চেষ্টা করিতেন।

এখানেও সেই মানবের উদ্ধারকামী মহাপুরুষ মানুষেরই আত্মীয় রূপে সত্যের সন্ধান করেন। তিনি অধিকাংশ সাধকের মত মানুষের সংসারকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া একান্তরূপে নির্জ্জন অরণ্য-বাসে প্রস্থান করেন নাই, সংসারজীবনের সহিত সাধন-জীবনের যোগ সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সত্য লাভের সাধনা করিয়াছিলেন। হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় ধ্যানস্থ হইয়া আত্মার আলোক পানের জন্য তিনি অধ্যাত্মের উচ্চ হইতে উচ্চ লোকে উত্থান করিতেন, সাধনায় তাঁহার সপ্তাহ কাটিত, মাস কাটিত, আবার তিনি গুহা হইতে গৃহে ফিরিতেন, সংসারের কর্ম্ম করিতেন, আহার পানীয় গ্রহণ করিতেন, আবার হেরার গম্ভীর গহ্বরে সত্য সাধনায় মগ্ন হইতেন !

এইরূপে ক্রম সাধনায় পনর বৎসর কাটিয়া গেল ; বৎসরের পর বৎসরে তাঁহার হৃদয় সাধনায় মার্জ্জিত ও শুদ্ধ হইল। সুস্থির চিত্ত ভিতরে ভিতরে দলের পর দল মেলিয়া সত্যের আলোক সম্পাতে স্নাত হইতে প্রস্তুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যৌবনের উদ্দাম জীবন অতিক্রম করিয়া মানুষের পরিণত বয়সের স্বাভাবিক জ্ঞানজীবনে উপস্থিত হইলেন। যে জীবন পর্ব্বত-গহ্বরের মত গম্ভীর মুক মন্দ নিশার নিশীথ নীরবতার ন্যায় সুগভীর, তাহা সাধনায় শুদ্ধ, বিজ্ঞতায় সুধীর, সূক্ষ্মবিচারে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

তখনই আলো জ্বলিয়াছে। তাঁহার মনুষ্যত্ব তখনই মহাপুরুষের মহিমায় ভাস্বর হইয়াছে। কৈশোরের চপলতা, যৌবনের উদ্দামতা অতিক্রম করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বার্দ্ধক্যের সীমায় উপস্থিত হন,—যখন হৃদয়ের মানবোচিত চাঞ্চল্য স্বতঃই স্তব্ধ হইয়া আসে, মায়ামোহের বিভ্রমময়ী রাগিণী আর চিত্তের মধ্যে মত্ততা সৃষ্টি করে না, অভিজ্ঞতার আলোকে মন যখন ভ্রম প্রমাদ মুক্ত হইয়া সত্য দৃষ্টি লাভ করে, তখনই স্থির নির্ম্মল বাণী-বক্ষে শুভচন্দ্রোদয়ের মত তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের হিরণ কিরণ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জ্ঞান যখন আপনা আপনি পরিষ্কার হয়, বিজ্ঞতা যখন স্থিরতার সঙ্গে আপনা আপনি আগমন করে, সত্যের শুভ্র জ্যোতিঃ তখনই তাঁহার চিত্ত-ফলকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই মহাজ্যোতির প্রথম বিভাসে, সত্য প্রকাশের মহামুহূর্ত্তে মহাপুরুষের মানবধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বভাব-সিদ্ধ সত্য জীবনের অস্ফুট উষালোকে তাঁহার সঙ্গে মাটীর ধরার মানুষের যে শোনিত-সম্বন্ধের ছবি ফুটিয়াছে, মানুষের কাছে তাহা নিত্য কালের সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

দৈবজ্যোতির প্রথম ছটায় তাঁহার চক্ষু চমকিত হইল, দৈববাণীর গভীর নাদে তিনি সহসা-সচকিত কম্পিত হইলেন। তিনি কম্পিত কলেবরে গৃহে ফিরিয়া খোদেজা বিবিকে বলিলেন, 'চাদর, আমায় চাদর—কাপড় দাও আমায় আবৃত কর।' ঐশী শক্তির তাড়নে রক্তমাংসের মানব-দেহ ভয়ের সঙ্কোচে কম্পিত হইতেছে।—সত্যজ্যোতির প্রথম ঝলক নর-নয়ন সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না।

কি মধুর এই দৃশ্য!—কি স্বাভাবিক, কি সুন্দর! সুলের বুকি কলম কিরূপে নয়ন মেলিতে প্রথম প্রথম এমনই ভাবের সঞ্চার হয়। ভিতর তাহার রসে গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, দল-তাহার বক্ষ মেলিতে আবেগভরে দুলিয়াছে, পবনের নিমন্ত্রণ তাহার স্বর্ণিম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিরণের চুম্বন সে অনুভব করিতেছে, পবনে ভিতর নয়ন মেলিতে প্রাণ আকুল হইয়াছে, সন্ধ্যার বাতাসে তাহার শিহরণ আসে, তুল ফুটি ফুটি করিয়া ফুটে না, দল তাহার খুলি-খুলি করিয়া খুলে না অজ্ঞাত আলোক-রাজ্যে প্রবেশ করিতে কতই সঙ্কোচভরে ধীরে ধীরে পুষ্পকলি প্রস্ফুট হয়।

যে সত্যের শাশ্বত শক্তিলাভ করিতে প্রাণ তাঁহার কত কাল ধরিয়া উন্মুখ হইয়াছিল, আজ তাহারই বিরাট বিকাশে মহাপুরুষের মানব চিত্ত সহসা সভয়ে কম্পিত হইল, তিনি মানব-স্পর্শ লাভ করিতে বিহ্বল চিত্তে মানবকণ্ঠে গমন করিলেন, বলিলেন, আমার ভয় করিতেছে, আমায় ধর। সাধনা সার্থক হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে, মহাজীবনের আলোক-রাজ্যে প্রবেশ করিতে গভীর আহ্বান আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার [illegible] হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিতেছে,—কি শুনিলাম! কি দেখিলাম! কিসের এ মহা আহ্বান হৃদয়ে আমার প্রবেশ করিল।

মহাপুরুষের মহিমালোকের প্রাঙ্গণে হজরত মোহাম্মদের এই মানবসুলভ দুর্বলতাকে আমি সহস্র সম্ভ্রমে নমস্কার করি। তিনি মানুষকে বিস্মিত করেন নাই, ঐশী-শক্তির প্রবাহ মধ্যে মানুষকে বিসর্জন দিয়া মানব সত্তার উর্দ্ধদেশে মহাপুরুষের অলৌকিক মহিমাসন রচনা করেন নাই। তিনি মানবস্পর্শ লাভের নিমিত্ত মানব সকাশে আগমন করিয়া জড়জগতের লক্ষকোটি মরনারীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আমাদের রক্তের প্রবাহ মধ্যে, আমাদের অস্থিমজ্জা স্নায়ুর মধ্যে তাঁহার শক্তি প্রবাহ অনুভব করিতেছি। হুমহান ব্রহ্মলোক হইতে মুহূর্তের জন্য তিনি মাটির ধরার মানুষের নিকট ফিরিয়াছিলেন, সেই মুহূর্তে মানুষের জন্য যেসব লাভের অক্ষয় অধিকার সৃষ্ট হইয়াছে, মহাপুরুষের সত্যপূত মহিমালোকে তাঁহার মানবচিত্ত বারেকের নিমিত্ত কম্পিত হইয়াছিল, সেইক্ষণে রক্তমাংসের মানবমন মহিমালোকের আশায় মহানন্দে নৃত্য করিয়াছে—এই দুঃখ-ব্যথাও ব্যর্থতাপূর্ণ জীবন লইয়া, শত শঙ্কা ও সঙ্কোচভরা হৃদয় লইয়া, রক্তমাংসের শরীরধারী মরণশীল দুর্বল মানুষ মহাজীবনের মহিমালোকে আরোহণ করিতে পারে।—উর্দ্ধজীবনের অন্তঃহীন গতিতে তাহারই অনন্ত অধিকার আছে।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

ইস্‌লাম ও রবীন্দ্রনাথ

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতি-কবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইস্‌লামের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোন মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষায় আর কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই। শুধু বাংলা ভাষা কেন, জগতের কোন অ-মুসলমান কবির হাত দিয়াই এমন লেখা বাহির হয় নাই। অনেক কবি ও লেখকই ইঙ্গিতে ইস্‌লামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের লেখায় এমন কিছু অনৈসলামিক ভাব মাখানো আছে যাহা কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু গভীর আনন্দের বিষয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে দোষ একটুও নাই। বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথায়ও আমরা ইসলাম-বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই। বরং তাঁহার লেখায় এত ইস্‌লামী ভাব ও আদর্শ আছে যে তাঁহাকে অনায়াসে মুসলমান বলা চলে। পৌত্তলিকতা, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তর-বাদ, সন্ন্যাস-বাদ প্রভৃতি যে সমস্ত ধারণা ইস্‌লামের ঘোর বিরোধী তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখায় আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল—ইস্‌লাম কী, উহার বিশেষত্ব কী; কারণ তাহা হইলে ইস্‌লামের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোথায় কতটুকু মিল আছে, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

ইস্‌লামের বিশেষত্ব :—

(১) খোদাতা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় প্রভু মনে করা—ইস্‌লামের মূল মন্ত্রই হইতেছে "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ" (এক খোদা ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নাই)। নিখিল-বিশ্বের নিয়ামক তিনি, জীবন মরণের প্রভু তিনি। "আমরা তোমাকেই আরাধনা করি, এবং তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি ইহাই মুসলমানের দৈনন্দিন প্রার্থনা।"

(২) খোদাতালার মহান ইচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা—তাঁহার ইচ্ছাকে সর্ব্ব অবস্থায় জয়যুক্ত করাই ইস্‌লামের প্রধান শিক্ষা। সফলতা, নিষ্ফলতা, সুখ-দুঃখ, সম্পদ বিপদ—সমস্তই তাঁহারই দান। এখানে অহমিকা নাই, আমিত্বের কোন গর্ব্ব নাই। রিক্ত-মুক্ত ভাবে খোদাতা'লার জন্যই সমস্ত কাজ করিতে হয়।

(৩) খোদাতা'লা এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের সহিত প্রেম স্থাপন করা—ইসলামের ধাতুগত অর্থও হইতেছে শান্তি। সুতরাং ইস্‌লাম শান্তির ধর্ম্ম। এখানে বিরোধ নাই, বিদ্রোহ নাই, আছে কেবল শান্তি, আছে

কেবল প্রেম—খোদাতা'লার সহিত প্রেম, তাহার সৃষ্টির সহিত প্রেম।*

(৪) বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বর্জ্জন করা—ইস্‌লাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস কখনো অনুমোদন করে না; সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে বিধান দেয়। খোদাতা'লা দত্ত এই আলোক-বাতাস, এই ভোগ-বিলাস, এই প্রিয় পরিজন সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিয়া নির্জ্জন বনে একাকী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মুক্তি-সাধন করা ইস্‌লামের বিধি নয়। বিশ্বের পরতে পরতে আপনাকে জড়াইয়া দিয়া অন্তরে অন্তরে অনন্ত প্রেম-রাজ্যে বাসা বাঁধাই ইস্‌লামের অনুমোদিত ধর্ম্ম পদ্ধতি।

(৫) জন্মান্তর-বাদ অস্বীকার করা।

(৬) সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম স্থাপন করা—ইস্‌লামে কৌলিন্য প্রথা নাই। এখানে সকলেই ভাই ভাই। মানুষ হিসাবে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, রাজা প্রজা, ধনীভিক্ষু সকলেই সমান।

ইহাই হইতেছে মোটামুটী ভাবে ইস্‌লামের বিশেষত্ব। এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব—রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে এই সমস্ত ভাব ও আদর্শ কোথায় কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে। (অবশ্য ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি রবি বাবুর সমস্ত কবিতাই নিঃশেষে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সেরূপ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ইস্‌লামী ভাব সমন্বিত এত কবিতা রবি বাবু লিখিয়াছেন যে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান অসম্ভব। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, গীতপঞ্চাশিকা, শেফালী, কেতকী ও অন্যান্য গানের বই সমস্তই খোদা প্রেম-বিষয়ক কবিতায় ভরপূর। তত্ত্বান্বেষী পাঠক রবিবাবুর কবিতা পড়িলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন)।

আত্ম-সমর্পণ

সর্ব্ব প্রথমেই গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম দলে।"

* A Muslim, according to the Holy Quran, is he who has made his peace with peace with God and man, with the creator as well as His creatures. Peace with God implies submission to His will who is the source of all purity and goodness, and peace with man implies the doing of good to ones fellowmen—Muhammad Ali Preface to his Holy Quran.

এই কবিতাটিকে আমি সর্ব্বোচ্চ স্থান দি। কোরাণ শরিফে "সুরা ফাতেহা" যেমন কোরাণের প্রথমে থাকিয়া সমস্ত কোরাণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিও সর্ব্ব প্রথমে বসিয়া তাহার যাবতীয় ভাবসম্পদের আভাষ প্রদান করিতেছে। "সুরা ফাতেহা" যেমন সমস্ত কোরাণের সার মর্ম্ম, এই কবিতা তেমনই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার সার মর্ম্ম। মাত্র এই একটি কবিতার দ্বারাই কবির সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও গতি-পথ নির্ণয় করা যায়। এই কবিতার ভিতরে ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে। একমাত্র খোদাতা'লাকেই সর্ব্বময় প্রভু মনে করিয়া তাহার চরণ-তলে মাথা নত করা, নিজের অক্ষমতা নিবেদন করা এবং তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করা, অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া খোদার ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করা, অন্য কিছু কামনা না করিয়া খোদাতা'লারই 'চরম শান্তি' ও 'পরম কান্তি' প্রার্থনা করা,—এ সমস্তই খাঁটি ইসলামের কথা। কোরাণ শরিফে আছে—পরকালে বেহেস্তে শুধু চির শান্তি বিরাজ করিবে; সকলের মুখেই "শান্তি" "শান্তি" রব উত্থিত হইবে। আর বেহেস্তের দার্শনিক ব্যাখ্যাও হইতেছে—খোদাতা'লার 'দিদার'লাভ করা (অর্থাৎ জ্যোতিঃ দর্শন।) পুণ্যবানেরা সেখানে সর্ব্বদা খোদাতা'লার দিব্য কান্তি অনুভব করিবে। এই দুইটী কথার সহিত

"যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি"

এ কথার কি গভীর সম্বন্ধ!

অন্যত্র কবি বলিতেছেন,—

"যায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে তোমার পানে
তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে তোমার কানে
তোমার কানে।"

এখানেও কবি শুধু খোদাতা'লাকেই একমাত্র অধিতীয় প্রভু মনে করিতেছেন এবং নিজের আশা-আকাঙ্খা, অভাব অভিযোগ তাঁহারই সকাশে নিবেদন করিতেছেন।

অনিত্য সংসারে সকল ঠেলিয়া একমাত্র খোদাতা'লাকেই যে কামনা করিতে হয় সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই
এই কথাটি সদাই মনে
বল্‌তে যেন পাই.
আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে সব, মিথ্যা ওগো
তোমায় আমি চাই।"

ইসলামের শিক্ষাও ত এই! খোদাতা'লাকে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া, আর যা কিছু সমস্তই মিথ্যা।

কবি যে পৌত্তলিকতা বা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন না, তাহা নিম্নের কবিতা হইতে অতি সুন্দর ভাবে বুঝা যায়—

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্ন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধূলায় গড়া দেবতারে

লুকিয়ে রাখিস আপন মনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে !"

এই সমস্ত কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ খাঁটী ইস্‌লামী ভাবেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। একমাত্র খোদাতা'লাকেই তিনি অদ্বিতীয় প্রভু মনে করেন, তাহারই চরণে তিনি মাথা নত করেন, তাহারই সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ছাড়া আর কোন "ধূলায় গড়া দেবতারে" আপন মনে স্থান দেন না।

প্রেম ও শান্তিস্থাপন

এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আলোচ্য কবিতার সমস্তই ত গভীর ঐশী প্রেমের পরিচায়ক! প্রেম না থাকিলে আত্ম-সমর্পণ ও মিলন কিসের? রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর সকল কবিতাতেই একটা অকৃত্ত মিলনের আকাঙ্খা সূচিত হইয়াছে। কোথায়ও তিনি উদ্ধত ভাবের বা বিদ্রোহের পরিচয় দেন নাই। "তুমি এস, হৃদয়-পদ্ম-দলে দাঁড়াও", 'গানের সুরের আসনে বস' ঐ যে তুমি "আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে," 'যেও-না সখা হেলায় ঠেলে'—ইত্যাদি ভাবের বিরহ ও বেদনার অভিব্যঞ্জনায় সমস্ত কবিতা ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকৃতিও মিলন-প্রয়াসী। নিখিল বিশ্বের ছোট বড় সকলকেই তিনি তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন; সকলকেই তিনি ভালবাসিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

"জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ
জগত-প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!"

বাস্তবিকই তিনি "জগতের" সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে আলাদা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। নিখিল বিশ্বের মর্ম্মে মর্ম্মে যে সহজ সুরের ঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি যেন বিশ্ব প্রকৃতিরই বেশী আপন, আমাদের কেউ নন! কোরাণ শরিফে আছে—

"আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে যে নিয়মের (সংস্কারের (Nature বা প্রকৃতির) উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, (তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর) আল্লার সৃষ্টিতে রদ-বদল নাই, ইহাই সরল দিন' (ধর্ম্ম)—সুরা রুম, ৩০ আয়েত।

রবীন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতিরই সন্তান। তিনি প্রকৃতিকে বাস্তবিকই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে কোনই রদ-বদল হয় নাই।

বিশ্ব-প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

কোরাণ শরিফে আছে—

"নিশ্চয়ই স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বাসীদিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।"—সুরা আল জাসিয়া, ৩ আয়েত।

"এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্ত্তনের মধ্যে এবং খোদাতা'লা লোকের জীবন ধারণের জন্য মেঘ হইতে পৃথিবীতে যাহা প্রেরণ করেন এবং তদ্দ্বারা মৃত্তিকে পুনর্জ্জীবিত করেন, (তাহার মধ্যে) এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে—যাহারা চিন্তা করে।

—সুরা আল জাসিয়া, ৫ আয়েত।

কোরাণের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের জীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইস্‌লামের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। সূর্য্য চন্দ্র, আঁধার-আলোক, সন্ধ্যা-প্রভাত, ঝঞ্ঝা-বাদল, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া তিনি একমাত্র খোদাতা'লারই অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। দৃশ্যের সম্মুখে কখনো তিনি মস্তক অবনত করেন নাই, দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দৃশ্যের আড়ালে লুকান সেই বিরাট পুরুষের আভাষ পাইয়াই তাঁহার মন উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয় হরণ!
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোণার বরণ!
এই যে মধুর আনন্দ ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ,
এই ত তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ!"

প্রেমিকের উপযুক্ত কথাই বটে!

বসন্তে কবি গাহিতেছেন—

"আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে
• • •
আমি পুলকিত কার পরশনে।"

অন্যত্র—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
• • •
মোর পরাণে দখিন বায়ু জাগিছে
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে
এই সৌরভ বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতল জাগিছে!
ওগো সুন্দর বল্লভ কান্ত
তব গম্ভীর আহ্বান কারে!"

বর্ষায়—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
• •
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে!"

অন্যত্র তিনি বাদল বরিষণের ভিতর দিয়া খোদাতা'লাকে কেমন সুন্দর ভাবে আহ্বান করিতেছেন—

"এস হে এস সজল ঘন
বাদল বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।"

শরতে—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গারে হৃদয়
আনন্দ গান গারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখবে যেয়ে গভীর সুখে
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যারে।"

ঝড়ের রাতে—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম

দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।"

সূর্য্য চন্দ্র দেখিয়া—

"এই যে তোমার আলোক বেণু
সূর্য্য তারা দলে দলে
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগণ তলে।

মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দিবে কি সন্ধ্যা হ'লে।"

প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলেই দেখিয়া থাকি, কিন্তু এমন ভাবে কয়জন দেখি? স্বর্গে মর্ত্যে যে "অসংখ্য নিদর্শন" আছে, সে কথা ত মিথ্যা নয়! রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুখ-দুঃখ

ইসলাম সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জীবনে মরণে খোদাতা'লারই জয়-গৌরব ঘোষণা করে। কোরাণ বলিতেছে—

"বল (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয়ই আমার আরাধনা, ত্যাগ, জীবন ও মরণ সমস্তই আল্লার জন্য।".

—সুরা আল আনাম, ১৬৩ আয়েত।

কবি বলিতেছেন :—

"সুখী হও দুঃখী হও, তাহে চিন্তা নাই
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্ব্বাদ তাই।"

* *

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।"

অন্যত্র—

"মোর মরণে তোমার জয় হবে
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।"

এই সমস্ত কবিতাতে কবি এই কথাই বলিতেছেন যে, সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে খোদাতা'লাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, সব অবস্থাতেই তিনি "আল্লার জন্য।"

সাফল্য বা বিজয় গৌরবের মধ্যেও যে খোদাতা'লারই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিতে হয় আর তাহারি সকাশে সাফল্যের গৌরব নিবেদন করিয়া দিতে হয়, সে কথা কবি তাহার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে লিখিত কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন

"কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।"

অন্যত্র এই সম্বন্ধেই কবি বলিতেছেন—

"এই মণিহার আমার নাহি সাজে,
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিড়তে গেলে বাজে।
তাইত বসে আছি
এ হার তোমার পরাই যদি
তবে আমি বাঁচি।"

মুসলমানগণ দৈনন্দিন জীবনে প্রতি কাজে যে কথা ব্যক্ত করে ইহাও তাই।

দুঃখ দৈন্যকেও কবি ঠিক ইসলাম অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখ-দৈন্য পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এমন কথা তিনি কোথায়ও

ঘুণাক্ষরে ও প্রকাশ করেন নাই। জীবনের সার্থকতার জন্য যে দুঃখ-মৈত্রেরও প্রয়োজন আছে, দুঃখ যে খোদাতা'লার বিশেষ অনুগ্রহেরই রূপান্তর, সুখ সম্পদ ছাড়া জীবনের যে মহত্তর লক্ষ্য আছে, এই কথা মনে করিয়াই কবি সগৌরবে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে :—

"হে বিশ্বাসিগণ! ধৈর্য্য এবং প্রার্থনার ভিতর দিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্য-শীল-দিগের সহিত।"—সুরা বকর, ১৫৩ আয়েত।

"এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে ভয়, সম্পদ-হানি, জীবন-হানি, ফল-হানি বা তদ্রূপ কিছু দিয়া পরীক্ষা করিব; এবং যাহারা ধৈর্য্যশীল তাহাদিগের নিকট সুসংবাদ প্রেরণ করিব (অর্থাৎ ধৈর্য্যের পুরস্কার দিব)"

সুরা বকর, ১৫৫ আয়েত।

"তাহাদেরই উপরে (অর্থাৎ উক্ত ধৈর্য্যশীলদিগের উপরে) তাহাদের প্রভুর দিক হইতে আশীর্ব্বাদ এবং করুণা (বর্ষিত হইবে।)"

ঐ ১৫৭ আয়েত।

কবি বলিতেছেন—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচানে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া তবে এ জীবন
তব মিলনেরি যোগ্য করে।"

* *

"দুঃখ যদি না পাবে ত
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।"

* *

"পুষ্প দিয়ে মার যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।"

"লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না।"

"দুঃখ-রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু
তুমি শঙ্কট, তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ।"

"এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভাল
এম্‌নি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বাল।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত-সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার!"

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌ল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থাম্‌ল।"

ইহাই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ দৈন্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা। "সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সকল অবস্থাতেই তিনি খোদাতা'লাকে বন্ধু বলিয়া আকাড়িয়া ধরিয়াছেন। লক্ষ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ, কোন অবস্থাতেই তিনি গতি-পথ হইতে স্খলিত হন নাই। মুসলমানগণও দুঃখের দিনে বলিয়া থাকে—"আমরা আল্লার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং আল্লাই আমাদের লক্ষ্য।"—(সুরা বকর, ১৫৬ আয়েত)

বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। গম্ভীরভাবে তিনি ঘোষণা করিতেছেন—

" বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। • • •
• • • ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

ইহাই ত ইস্‌লাম! অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তি লাভ করাই ত প্রকৃত পৌরুষের কার্য্য! কোরাণ বলিতেছে—

"এবং যে সন্ন্যাস ব্রত (খৃষ্টানগণ)সৃষ্টি করিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য যে (ভোগের) স্বত্ব নির্দ্ধারিত আছে, তাহা বিস্মৃত হইও না।"

"হে মুসলমানগণ! খোদাতা'লা তোমাদের জন্য যে সমস্ত জিনিষ বৈধ করিয়াছেন, তাহা অবৈধ করিও না।"

হজরত মোহাম্মদের জীবনের গতিও এই পথেই চলিয়াছে। সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তিনি অধ্যাত্ম জগতে বিহার করিতেন। সব আনন্দের মাঝখানেই তিনি খোদার আনন্দ উপভোগ করিতেন।

সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম

সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ইস্‌লামের উক্তিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন—

" মুক্ত করহে সবার সঙ্গে
মুক্ত করহে বন্ধ
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।"

" এস হে আর্য্য এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।

এস ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন
ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত হোক অপনীত
সব অপমান ভার।"

কোরাণ বলিতেছে—

" সমস্ত মানব মণ্ডলীই এক জাতি "
সুরা বকর, ২১০ আয়েত।

"হে মানব, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বংশ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার।"

—সুরা অল্-হুজুরাত, ১৩ আয়েত।

অতএব কবি, মানুষ হইয়া মানুষকে

ঘৃণা করার জন্য দেশের লোককে অভিশাপ দিতেছেন—

"যে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদেরে করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ইস্‌লাম যে সত্য গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিয়াছে, আজ তাহা নূতন করিয়া রবীন্দ্র নাথের মুখে শুনিয়া কোন্ মুসলমানের প্রাণে না আনন্দের সঞ্চার হয়!

উপসংহার

এইরূপে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতি কবিতাতেই ইসলামী ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। আকাশে-বাতাসে, স্থলে-জলে, সুখে-দুঃখে খোদাতা'লার মহিমা এমন ভাবে উপলব্ধি করিতে আর কোন কবিকে দেখি নাই। এক মাত্র খোদাতা'লাকে অধিতায় প্রভু জ্ঞান করা, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়া, তাঁহার ইচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা, সমস্ত কার্য্যে অহমিকা বিসর্জ্জন দেওয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অদম্য পিপাসা জাগাইয়া রাখা, তাঁহার সৃষ্ট পদার্থকে ভালবাসা উদার হৃদয় লইয়া সকল মানুষের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হওয়া—ইত্যাদি যা কিছু ইস্‌লামের বিশেষত্ব, সমস্তই রবীন্দ্রনাথে পূর্ণ-মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লেখাতে মুসলমানের দিক দিয়া আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে; সেটা হইতেছে অশরীরি ভাব spirit of abstraction ইহা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা। আমার মনে হয় পারস্যের অমর কবি হাফেজ ও ওমর খৈয়াম ছাড়া এ ভাব আর কোন কবি ধরিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই এই ভাবের গুরু। তাঁহার কবিতা পড়িলে মন যেন কোন্ অনন্তে উধাও হইয়া যায় এবং এমন কিছু উপলব্ধি করে যাহার আকার দেওয়া যায় না। এই ভাবটী মুসলমানের পক্ষে খুবই দরকার, কারণ তাঁহারা নিরাকারবাদী। নিরাকার খোদার ধারণা করিবার জন্য এ হেন কবিতারই প্রয়োজন বেশী। উহা মানবাত্মাকে অনন্ত ভাব রাজ্যে লইয়া যায়।

এই সমস্ত কারণেই আমি তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াছি। ইহা দ্বারা আমি এই কথাই বুঝাইতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ অ-মুসলমান হইলেও তিনি আমাদের অতি নিকট অতি আপনার। কিন্তু হায়! মুসলমান সমাজ রবীন্দ্রনাথকে একটুও চিনিতে পারে নাই। সুদূর বার্লিনে, জাপানে এবং অন্যান্য অ-মুসলমান প্রদেশে কবি-সম্রাটের সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, কিন্তু বিরাট মোসলেম জগতের একটী প্রাণীও তাঁহাকে আদর বা appreciate করেন নাই, ইহা আমাদের মত বড় অগৌরবের কথা সন্দেহ নাই। আজ যদি সকলের আগে মুসলমান জাতিকে কবিকে আদর করিতে দেখিতে পাইতাম, তবে কী আনন্দই না হইত! তাহা হইলে ঠিক হইত।

এস মুসলমান! হিন্দু ভ্রাতৃগণের সহিত আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া কবিবরের জয়গান করি,

"জগত-কবি-সভায় মোরা তোমার কবি গর্ব্ব
বাঙ্গালী আজি গাহার রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

গোলাম মোস্তফা

আমরা পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার মাণিক-গঞ্জের লোক, আমাদের সধবা বিধবার রান্না এক ঘরে চলে না, সেই জন্য সকাল বেলা নিরামিষ রান্না করে নিতেম। অপর্য্যাপ্ত জিনিষ,—দুধ, মাছ পেতেম, আমরা যথেষ্ট খেয়েও তাদের আর আফ্‌শোষ মিটাতে পারতুম না। পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধরা হ'লো, সেখানে ছিলেম মাত্র তিন দিন, সে মাছও সব খেয়ে আসতে পারিনি, সে জন্যও তাদের কত আফ্‌শোষ।

বাড়ীর মেয়েরা কেহই তেমন শিক্ষিতা নয়, "আ--র" মেজ দাদাও খেত-খামার দেখা নিয়েই থাকে, লেখাপড়ার চর্চ্চা বড় করে না। এ ছেলেটী ও বৌরা এবং একটী বিধবা মেয়ে আছে, ঐ মেয়েটী বাড়ীর কর্ত্রী। ইহাদের স্বভাব এত সুন্দর যে, কোনো শিক্ষিতা মেয়েদের ভিতর এত সরল সুন্দর ভাব আমি পাইনি। শিক্ষিতাদের ভিতর পেলে সেটা অসম্ভব মনে হ'তোনা ব'লে বেশী উল্লেখ-যোগ্যও মনে করতেম না। ভাবতেম বা বলতেম যে, বেশ শিক্ষা পেয়েছ। লেখাপড়া না জানলেই আমরা সাধারণতঃ তাহাদিগকে অশিক্ষিত বা অসভ্য বলে থাকি। সামান্য শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে এতটা সুশিক্ষা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।

সকলের বড় "খান" আর সকলের ছোট "আ—পান" এই দুইটীর সঙ্গে আমার অনেক দিন থেকে জানা শুনা। "আ" আমার পুত্র "বী—র" সহপাঠী,- তার সঙ্গেই আগে পরিচয়, সে আমাকে মা বলে এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তার জন্যই তার ভাগ্নির (অতএব আমার নাতনীর) বিয়েতে তাদের বাড়ী গিয়েছিলেম। মুসলমানের বিয়ে এই প্রথম দেখলেম। ওদের বিয়ে একদিনে হয় না, সেদিন হ'লো আমাদের পাকা কথার মত বা লগ্ন পত্রের মত (এখন ও প্রথা উঠে গেছে)। বিয়ে তো ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলতে লাগলো মধ্য পথেই, এখন আমাদের বিদায়ের পালা—সে যে কি কান্না-কাটী আমাদের ছেড়ে দিতে, তা' আর কি লিখব, লিখে বা বলে তা বুঝানো যায় না। মেয়ে বৌদের থেকে আরম্ভ ক'রে বাড়ী শুদ্ধ সবাই কাঁদতে কাঁদতে আমাদের সঙ্গে ঘাটে এসে আমাদের নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে গেল। সে কান্নার কথা মনে হলে এখনও চোখে জল আসে। রাত্রে নৌকায় উঠেছিলেম, পাছে গ্রামের মধ্যের ছোট খাল দিয়ে যেতে কোন বিপদ হয়, সে জন্য সেই সরল-স্বভাব মেজ ছেলেটী নৌকায় সকাল পর্য্যন্ত থেকে "কো—গঞ্জের" বাজার থেকে আমাদের আবশ্যকীয় খাবার জিনিষ কিনে দিয়ে হেঁটে বাড়ী রওয়ানা হয়ে গেল। এবার গোমতী দেবীকে উল্টো ঠেলে নিয়ে আসতে হলো ব'লে একদিনের রাস্তায় তিন দিন কাটিয়ে আমরা নিশিভোরে কুমিল্লায় এসে পৌছুলুম।

শ্রীবিরজা সুন্দরী দেবী

ইব্‌ন বত্তূত্তা এবং তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ

ইস্‌লামের অভ্যুত্থান যুগে পশ্চিমে স্পেন হইতে পূর্ব্বে চীন, দক্ষিণে যাবা হইতে উত্তরে রুসিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ মুসলমান বণিক্, বিদ্যার্থী, ভ্রমণকারী ও ফকীরদিগের বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল। এইরূপে সেই সময়ে এক দেশের সঞ্চিত জ্ঞান ও ধন অনায়াসে অন্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। তাহাতে সমস্ত ইসলাম-জগৎ সভ্যতার অমৃত ধারায় সরস হইয়া উঠিয়াছিল। পরে খ্রিষ্টীয় ১৮শ শতকে যখন স্পেনিয়ার্ড পর্ত্তুগীজ প্রমুখ য়ুরোপীয় জাতিগণের নূতন উদ্যমের প্রবল স্রোতে মুসলমানদের বাণিজ্য একেবারে ভাসিয়া গেল, তখন মুসলমান জগতে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা হেতু পরিচয়ের অভাব ঘটিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী মুস্‌লিম জাতির ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিল।

ইব্‌ন বত্তূত্তা ইসলামের উন্নতির যুগের শেষ সময়ের এক জন ভ্রমণকারী। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তদানীন্তন ইসলাম জগতের বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে গাঢ় সম্পর্কের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। তিনি স্পেনের গ্রানডার ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষে ও চীনে গ্রানডা-বাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মরক্কোবাসী দুই সহোদরের একজনকে তিনি চীনে এবং অপর জনকে আফ্রিকার নাইজারল্যাণ্ডে দেখিতে পান। ইব্‌ন বত্তূতার ন্যায় বহু পর্য্যটক তখন বিদ্যমান্ ছিল। কিন্তু লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের কারণে কেবল তিনিই সুবিদিত রহিয়াছেন। ইব্‌ন বত্তূতার পূর্ব্বতন যে সমস্ত মুসলমান ভূগোল ও ভ্রমণ বিবরণ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় বোধ হয়, এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। * ইব্‌ন ওয়াদিহ্, কিতাবু-ল্ বুল্‌দানের লেখক, হিঃ ২৭৭।

২। ইব্‌ন ফুয়দানিহ্, কিতাবু-ল্ মসালিকি ওয়া-ল্ মমালিক্, হিঃ

৩। আবু অব্দ 'আব্‌দুল্লাহ্ হুস্‌ন্ সিন্নরাকী, কিতাবুল্ হিন্দি ওয়া-স্ সীন্, হিঃ ৩০৩।

৪। হম্‌দানী, কিতাবু যিয্‌রাকীয়ে যজীরতি-ল্ 'আরব, হিঃ ৩৩৩।

৫। ইব্‌ত্তখ্‌রী, কিতাবুল্ আকালীম্, হিঃ ৩৫০।

৬। মস্'উদী, মরুযু-জ্‌জহব্, হিঃ ৩৩৬।

৭। ইব্‌ন হউকল্ মুম্বলী, কিতাবু-ল্ মমালিকি ওয়া-ল্ মসালিকি ওয়া-ল্ মকাজিরি ওয়া-ল্ মহালিক্, হি ৩৫৯।

* আরবীর বাঙ্গালায় অনুলেখন (Transliteration) সম্বন্ধে স্বকীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রণালী অনুসরণ করিয়াছি। লেখক

৮। 'আল্লামহ্ বিশারী, কিতাবু আহ্সনু-ত্-তক্বাসীমি ফী মা'রফতি-ল্ আকালীম, হিঃ ৩৭৫।

৯। আল্ বীরূনী, কিতাবু ল্ হিন্দ, হিঃ ৫ম শতাব্দীর আদি।

১০। আবু আব্দিল্লাহ্ বিক্রী, কিতাব মু'আযম, হিঃ ৪৮৭।

১১। ইদ্রীসী, কিতাবু নজ্হতিল্ মুশ্তাক্, হিঃ ৫৪।

১২। ইয়াকূত হামুভী, মু'অযামু-ল্ বুল্দান্, হিঃ ৬২৬।

১৩। সরখ্সী, রিহ্লতু—সফরখ্সী, হিঃ ৪৯৩।

১৪। ইব্নল-'ঈষ আন্দুলুসী, কিতাবু-ল্ নফ্হতু-ল্ মস্কীয়, হিঃ ৬৭৩।

১৫। 'আব্দুর রহ্, কিতাব্ রিহ্লতু-'আব্দি রহ্, হিঃ ৬৮৮।

১৬। আবুল্ ফিদা, তারীখ্ আবি-ল্ ফিদা এবং কিতাব তক্ভীম্-ল্ বুল্দান, হিঃ ৭৩২।

১৭। ইব্নু-ল্ওয়ার্দী, কিতাব্ খরীদতু-ল্ 'আযায়িব, হিঃ ৭৪৩।

১৮। খালিদ্ বিন্ 'ঈসা আবু-ল্ বক্কা, কিতাবু তাহ্ফু-ল্ মুফর্রিকি ফী তখল্লিয়তি-ল্ মশ্রিকি, হিঃ ৮ম শতাব্দী।

১৯। রশীদু-দ্দীন, যামি'উ-ত্ তওয়ারীখ, হিঃ ঐ।

২০। ওয়াস্সাফ, তারীখ ওয়াস্সাফ, হিঃ ঐ।

২১। ইব্ন বুতুতা আন্দুলুসী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, হিঃ ঐ।

ইব্ন বতূতা মরক্কোর তন্জা (Tangiers) শহরে হিঃ ৭০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিঃ ৭২৫ সালের রজব মাসে ২২ বৎসর বয়সে হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি জন্মভূমি হইতে রওয়ানা হন। ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহর গুলি ভ্রমণ করিয়া শেষে তিনি মিসরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে 'ঈযাব' বন্দরে পৌঁছিয়া মক্কা শরীফে যাইবার উদ্যোগ করেন। সেই দেশের রাজা তখন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইব্ন বতূতা সেই জন্য তথায় কোন জাহাজ না পাইয়া পুনরায় মিসরে ফিরিয়া আসেন। সেখান হইতে তিনি সীরিয়া দেশে যান। দমশ্কে (Damascus) হদীসের বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে দুই জন বিদুষী রমণীও ছিলেন। তার পর তিনি তথা হইতে গত বৎসরের হজ্জের সংকল্প পূরণের জন্য প্রথমতঃ মদীনা শরীফে উপস্থিত হন। তৎপরে মক্কা শরীফে যাইয়া হজ্জ সম্পন্ন করেন।

হজ্জ ব্রত শেষ করিয়া তিনি ঈরানী কাফেলার সহিত ইরাকে পৌঁছেন। নযফ আশ্রফের দর্শন জন্য বগদাদে যান। সেখান হইতে ওয়াসিত্বা, ওয়াসিত্বা হইতে রওয়াকে সৈয়দ আহ্মদ রফা'ঈর কবর জিয়ারত করেন। সেখান হইতে বস্রা এবং বস্রা হইতে তিনি ঈরানের সরহদ্দে পৌঁছেন। কিছুদিন শুস্তরে অবস্থান করিয়া ইস্ফাহান হইয়া শীরাজ নগরে উপস্থিত হন। সেখানে সূফী শেখ আবু 'অবদিল্লাহ্ খফীফ এবং বিখ্যাত নীতিকার শেখ সাদীর কবর দর্শন করেন। সেখান হইতে গাজরুন বন্দর হইয়া পুনরায় ইরাকে উপস্থিত হইয়া কূফায় পৌঁছেন। সেখান হইতে দ্বিতীয় বার বগদাদে আসেন। তখন বগদাদ ধ্বংস হইয়া থাকিলেও বড় শহর ছিল। বগদাদ

হইতে মুবল এবং মারতান হইয়া ইবন বতূতা দ্বিতীয় হজ্বের জন্য ৭২৮ হিঃ অব্দে মক্কা শরীফে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি দুই বৎসর থাকেন। তৎপরে চতুর্থ হজ্ব করিয়া হিজাজ যান।

সেখান হইতে জাহাজে উঠিয়া লোহিত সাগরের অপর তীরে আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া য়মনে আসেন। পরে 'অদন হইতে জাহাজে চড়িয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব তীরে পৌছেন। সেখান হইতে যান্‌জিবার ও মম্বোজা ভ্রমণ করিয়া জাহাজ যোগে আরবের দক্ষিণ ভাগে হযরমউতের অন্তর্গত শহরে আসেন। সেখানে হইতে উমান হইয়া হরমুজ সহরে উপস্থিত হন। সেখানে বিখ্যাত দাতা বাদশাহ তহমতনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখান হইতে তিনি আনাতোলিয়ায় চলিয়া যান। তখন আনাতোলিয়া অরাজক ছিল। ক্রমা হইতে জাহাজে চড়িয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরে তীরে শহর দেখিতে দেখিতে কবচাক মরুভূমিতে উপস্থিত হন। পরে ছয় মাসের রাস্তা অতিক্রম করিয়া ক্রীমিয়ায় পৌছেন। তখন ক্রীমিয়া সুলতান উজবকের রাজত্বাধীন ছিল। এই রাজা চন্‌গিজ খাঁর বংশসম্ভূত ছিলেন। রুসিয়ার অধিকাংশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল, ভালগা নদীর তীরস্থ সরায় তাঁহার রাজধানী ছিল।

সেখান হইতে ইবন বতূতা বুলগার দেশে যান। রুসিয়ার উত্তরাংশকে এই নামে অভিহিত করা হইত। তখন রমজান মাস ছিল এবং দিন বাড়িবার কাল ছিল। রোজা খুলিয়া মগরিব ও ঈশার নমাজ তাড়াতাড়ি পড়িতে না পড়িতে সকাল হইত। সেখান হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল। ঈদের দিন পর্য্যন্ত তিনি বাদশার শিবিরে রহিলেন। যখন তিনি বাদশার সঙ্গে হাবী তুরগান শহরে ছিলেন, তখন বাদশার এক বেগম যিনি কুস্‌তুন্‌তুনিয়ার খ্রিষ্টান রাজার কন্যা ছিলেন, কুস্তুন্‌তুনিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইবন বতূতা তাঁহার সহিত কুস্‌তুন্‌তুনিয়ায় গিয়া পুনরায় সরায় সহরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেখান হইতে বুখারায় পৌছিলেন। সেখানে চঙ্গিজ খাঁর বংশীয় সুলতান 'আলাউদ্দীন তরম শীরীনের দরবারে কিছুদিন থাকিয়া সমরকন্দে চলিয়া যান। তথা হইতে বল্‌খ, বল্‌খ হইতে হিরাত, সেখান হইতে বাম, মরুদ ও নয়শাপুর ভ্রমণ করিয়া কুস্‌দুজ দিয়া অন্দরাব ও পঞ্জসেরের রাস্তা দিয়া পশাই ও পরওয়ান হইয়া ঘজনী ও চরখে পৌছিলেন। সেখান হইতে কাবুলে গেলেন। কাবুল হইতে কির্মাশ হইয়া সম্ভবতঃ কুরম পাস দিয়া সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ, ডেরা ঘাজী খাঁ এবং কশমুরের ইলাকা দিয়া মরুভূমির পথে সিন্ধুর তীরবর্ত্তী শুক্করের নিকট কোন স্থানে ৭৩৪ হিযরীর মুহর্রম মাসে ইবন বতূতা উপস্থিত হইলেন।

তৎপরে শুক্কর হইয়া সিন্ধুর মোহনাস্থিত বন্দর লাহিরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে মুলতানে আসিলেন। মুলতান হইতে যাত্রা করিয়া অযুধ্যা অর্থাৎ পাক পট্টনের ঘাট পার হইয়া শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। তথা হইতে অবুহর, সরসা ও হাঁসী হইয়া মদ্‌উলপুরে পৌছিলেন। সেখান হইতে পুরাতন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ

সুলতান মুহম্মদ তোঘলক তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া শহরের কাজী নিযুক্ত করিলেন। ইব্‌ন বতূতা নয় বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীতে থাকেন।

৭৪৩ হিজরীর শফর মাসে তিনি চীনরাজের নিকট বাদশাহের দূতরূপে উপহার দ্রব্য লইয়া যাইতে নিযুক্ত হইলেন। দিল্লীতে অবস্থান কালে তিনি কনৌজ, আমরুহা ও বিজ্‌নৌর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখন দিল্লী হইতে তলপত, বিয়ানা, কোইল, কনৌজ, গোয়ালিয়র, চন্দেরী ও ধার হইয়া উজ্জয়িনী পৌঁছিলেন। সেখান হইতে দৌলতাবাদ আসিলেন। দৌলতাবাদ হইতে ফিরিয়া সাগর তীরে পৌঁছিয়া সেখান হইতে খম্বায়েতে (Cambay) উপস্থিত হইলেন। বহ্‌ড়োচের (Boroch) নিকটবর্ত্তী কম্বার বন্দরে জাহাজে সওয়ার হইয়া ঘোঘা, গোয়া ও হনুর হইয়া মালাবারে পৌঁছিলেন।

পরে মালাবারের বন্দর হইয়া কালিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জাহাজ ভগ্ন হইয়া গেল। জাহাজস্থ সমস্ত লোক জন ও বাদশাহের উপহার দ্রব্য নষ্ট হইয়া গেল। ভাগ্যক্রমে ইব্‌ন বতূতা তখন জাহাজে ছিলেন না তাই বাঁচিয়া গেলেন। বাদশাহের ভয়ে ইব্‌ন বতূতা দিল্লী ফিরিয়া না গিয়া হনুরের সুলতান কমাল উদ্দীনের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হনুর হইতে ফিরিয়া শালিয়াতে আসিলেন। সেখান হইতে জাহাজে করিয়া ৭৪৪ হিজরীর রবি-উস্‌-সানী মাসে মালদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

ঠিক এক বৎসর পরে ইব্‌ন বতূতা মালদ্বীপ হইতে রওয়ানা হইয়া সিংহলে পৌঁছিলেন। সেখানে রাজার সহিত বঙ্গালা (পত্তলাম) নগরে সাক্ষাৎ করিয়া এবং বাবা আদমের পদ চিহ্নের জিয়ারত করিয়া মা'বরে (কর্ণাট রাজ্যে) উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার শ্বশুর সৈয়দ জলাল উদ্দীন আহ্‌মদ বাদশাহ মুহম্মদ শাহ্‌ তোঘ্‌লক হইতে বিদ্রোহী হইয়া মদুরায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি ইব্‌ন বতূতার আগমনের পূর্ব্বেই মৃত হইয়াছিলেন। ইব্‌ন বতূতা সেখান হইতে কোইলম চলিয়া আসিলেন। সেখানে তিনি তিন মাস রহিলেন। সেখান হইতে হনুর যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি জাহাজে যাইতেছিলেন। পথে জলদস্যুগণ তাঁহার জাহাজ লুট করিয়া লইল। অন্যান্য সামগ্রীর সহিত তাহার স্মারক লিপিও অপহৃত হয়। এইজন্য ইব্‌নে বতূতার ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে মধ্যে কিছু গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ইব্‌ন বতূতা কালিকটে ফিরিয়া আসিলেন। সেখান হইতে পুনরায় মালদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

সেখান হইতে জাহাজে রওয়ানা হইবার ৪০ দিন পরে বাঙ্গালা দেশের সপ্তগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নদী পথে কামরূপে গিয়া শেখ জলাল উদ্দীন তব্‌রিজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখান হইতে সোনারগাঁয় উপস্থিত হন। অনুমান খৃঃ ৭৪৬ অব্দের প্রারম্ভে ইব্‌ন বতূতা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন।

সোনারগাঁ হইতে একটী চীনা জাহাজে চড়িয়া ইব্‌ন বতূতা আরাকান ও পেগুর তীর দিয়া সুমাত্রায় উপস্থিত হন। তখন সেখানে মালিক আহির রাজা ছিলেন। সুমাত্রা হইতে মূল বাবা পৌঁছেন। মূল বাবা

সম্ভবতঃ শ্যাম, কম্বোডিয়া ও কোচিন। সেখান হইতে চীন দেশে গিয়া কিছু দিন সেখানে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় সুমাত্রায় উপস্থিত হন।

সেইখানে দুই মাস থাকিয়া জাহাজে রওয়ানা হন এবং ৪০ দিন পরে কোইলম পৌঁছেন। সেখানে তিনি রমজান মাস কাটাইয়া ঈদের নমাজ পড়েন। ৭৪৮ হিজরীর মুহর্রম মাসে শায়রের অফার শহরে উপস্থিত হন। তৎপরে মস্‌কত, শীরাজ, য়জ্‌দ, ইস্‌ফাহান ও শুস্তর হইয়া এবং বসরা ও কূফা ভ্রমণ করিয়া হিঃ ৭৪৮ অব্দের শওয়াল মাসে বগদাদে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া ঘুরিয়া মিসর, তুনিস, সার্ডিনিয়া ও স্পেন হইয়া হিঃ ৭৫০ অব্দের শা'বান মাসে মরক্কোর রাজধানী ফেজ সহরে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ২৫ বৎসর বিদেশ ভ্রমণের পরে ইবন বত্তূতা স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দেশে আসিয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সুদান ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভ্রমণ শেষ করিয়া, হিঃ ৭৭৪ সালের মুহর্রম মাসে তিনি বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইয়া ৭৫৫ হিজরির শেষে বাড়ী পৌঁছিলেন।

৭৫৬ হিজরীতে তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত একত্র করেন। পর বৎসর ইব্‌ন যজ্জী ইহার সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেন। এই ইবন যজ্জী মরক্কোর সুলতান আবু ইনাত মরণীর সেক্রেটারী ছিলেন। মুহম্মদ বিন্ ফত্হ-আল্লাহ বীলূনী ইব্‌ন যজ্জীর পুস্তকের এক সার সংগ্রহ করেন। ইবন বত্তূতার মূল পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না। ফরাসী অনুবাদসহ ইব্‌ন যজ্জীর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার লী বিলূনীর পুস্তকের এক ইংরাজী অনুবাদ ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন। খান সাহিব মৌলভী মুহম্মদ হসন্, এম্, এ, লাহোর হইতে ইব্‌ন যজ্জীর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের এক সটীক উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় খণ্ডে ইব্‌ন বত্তূতার ভারত ভ্রমণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহার উক্ত অনুবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এইজন্য প্রবন্ধলেখক তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছে।

(২)

(ইব্‌ন যজ্জীর সংক্ষিপ্ত সারের ২য় বাঙ্গালা হইতে অনুবাদিত)

১৩ অধ্যায়। বঙ্গালহ্ (বঙ্গদেশ)।

১ পরিচ্ছেদ। বঙ্গদেশের সুলভতা।

বাঙ্গালা এক বহু বিস্তৃত দেশ। চাউল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এত সস্তা আমি আর কোন দেশে দেখি নাই। কিন্তু এই দেশ ভাল নয়। অন্ধকারময়। এইজন্য খোরাসানের লোকে ইহাকে "দোজখ্ পুর্ নি'আমত" (সম্পদপূর্ণ নরক) বলে। সেখানে এক রূপার দীনারে (ক) ৫০ রতল (খ) চাউল পাওয়া যায়। এই দিল্লীর রতল ২০ পশ্চিম দেশীয় রতলের সমান। ৮ দিরহমে এক রূপার দীনার হয়। উহাদের এবং আমাদের দিরহম সমান। বলা হয় যে এই

ক। রূপার দীনার বর্ত্তমান টাকার সমান ছিল।

খ। রতল দিল্লীর মণ। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তার মতে ইহার ওজন বর্ত্তমান ৫২ সের, মসালিকুল আবসারের গ্রন্থকারের মতে ১৫ সের।

বৎসর ছুতিক ছিল। মুহম্মদ মন্‌সুরী মঘ্‌রিবী তিনি একজন আওলিয়া এবং দিল্লীতে আমার বাড়ীর নিকটে থাকিতেন, তিনি বলিতেন যে তাহার এক স্ত্রী এবং এক চাকর ছিল। তিনি তাহাদের তিনজনের এক বৎসরের খোরাক এককালে ৮ দিরহমে খরিদ করিয়া রাখিতেন। তিনি বলেন সেই সময়ে ৮ দিরহমে দিল্লীর ৮০ রতল পরিমাণে গম পাওয়া যাইত। কুটিবার পর তাহা হইতে ৫০ রতল চাউল হইত। ইহা ১০ কিন্‌তার হইল। সেখানে দুধওয়ালা মহিষ তিন রূপার দীনারে পাওয়া যায়। সেই দেশে গাভী হয় না। ভাল মোটা মুরগী ১ দিরহমে ৮টী পাওয়া যায়। পায়রার বাচ্চা দিরহমে ১৫টী। মোটা ভেড়ার দাম ২ দিরহম, চিনীর রতল (দিল্লীর) ৪ দিরহম, গোলাবের রতল ৮ দিরহম, ঘির রতল ৩ দিরহম, সরিষা তেলের রতল ২ দিরহম, ৩০ গজ লম্বা তুলার কাপড়ের দাম ২ দীনার এবং সুন্দরী বাঁদীর দাম ১ সোনার দীনার (যাহা পশ্চিম দেশের ২ দীনারের সমান)। আমি এই মূল্যে 'আশ্‌ফুহ্‌' নামে একটী বাঁদী কিনিয়াছিলাম। সে খুব সুন্দরী ছিল। আমার একজন সঙ্গী লুলু নামে একটী অল্প বয়সের গোলাম ২ দীনারে খরিদ করিয়াছিল।

২য় পরিচ্ছেদ। সদ্‌কাওয়ান

(সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ)।

বাঙ্গালার প্রথম যে শহরে আমি দাখিল হইলাম, তাহা সদ্‌কাওয়ান। ইহা সমুদ্রের কিনারে একটী বড় শহর। এখানে গঙ্গ (গঙ্গা) ও যূন (যমুনা) (গ) নামে দুইটী নদী মিলিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই শহরের বন্দরে অনেক জাহাজ আছে, যাহার সাহায্যে ইহারা লখনৌতির (গৌড়ের) লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়া থাকে। বাঙ্গালার বাদশাহ ফখরুদ্দীন। তিনি ফখরা নামে বেশী প্রসিদ্ধ। ইনি খুব বিদ্বান। বিদেশী, ফকির ও সুফীদিগকে ইনি বড় ভালবাসেন।

আসলে এখানকার বাদশাহ সুলতান নাসিরুদ্দীন ছিলেন, যাঁহার পুত্র মুইজ্জুদ্দীন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধ ও সাক্ষাতের বিষয় আমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্‌সুদ্দিন বাদশাহ হয়েন। তাঁহার পর শাহাবুদ্দীন। শাহাবুদ্দীনকে ঘিয়াসুদ্দীন বাহাদুর ওরফে ডঁওরা হারাইয়া দেন। শাহাবুদ্দীন সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক তাঁহাকে বন্দী করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু তিনি অঙ্গীকার মত আপন রাজত্বের অংশ বিভাগ করিতে অস্বীকার করায় বাদশাহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাহাতে তিনি নিহত হয়েন। তাঁহার পর তাঁহার জামাতা বাদশাহ হয়েন। সৈন্যগণ তাঁহাকে হত্যা করে। এই সময়ে 'আলা শাহ লখনৌতিতে বাদশাহ হইয়া বসেন।

ফখরুদ্দীন যখন দেখিলেন যে তাঁহার প্রভু নাসিরুদ্দীনের বংশ হইতে বাদশাহী চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি সদ্‌কাওয়ানে

টীকা গ। ইহা এলাহাবাদের যমুনা নহে। হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণীতে যেযমুনা নদী গঙ্গার শাখারূপে নির্গত হইয়াছে ইহা তাহাই।

বিদ্রোহী হইলেন। তখন তাঁহার সহিত 'আলীশাহের প্রবল যুদ্ধ বাধিল। গরমী ও কাদা পানির সময়ে ফখরুদ্দীন জাহাজের সাহায্যে জলনৌতি আক্রমণ করিলেন। কেননা 'আলীশাহ অপেক্ষা তাঁহার নৌ-শক্তি অধিক ছিল। বর্ষা শেষ হইলে 'আলী শাহ ফখরুদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। কেননা তাঁহার স্থলশক্তি বেশী ছিল।

ফখরুদ্দীন ফকীর ও সূফীদিগকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি শয়দা নামে এক সূফীকে সাতগাঁয়ে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং এক লস্করের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শয়দা বিদ্রোহী হইলেন এবং পাকাপাকি বাদশাহ হইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বাদশাহের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিলেন। ফখরুদ্দীন শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। শয়দা এবং তাঁহার সঙ্গিগণ সুনারকাওনের (সোনার গাঁর) দিকে পলাইয়া গেলেন। ইহা একটী মজবুত জায়গা। বাদশাহ সেখানে সৈন্য পাঠাইলেন। সেখানের বাসিন্দাগণ ভীত হইয়া শয়দাকে গ্রেফতার করিয়া বাদশাহী সৈন্যের নিকট পাঠাইয়া দিল। সৈন্যাধ্যক্ষ বাদশাহকে লিখিলেন যে কি করা যায়। তিনি হুকুম পাঠাইলেন যে তাঁহার মাথা কাটিয়া পাঠান হউক। এই রূপেই তাঁহার মস্তক পাঠান হইল এবং তাঁহার সঙ্গী অনেক ফকীর নিহত হইল।

আমি সাতগাঁয়ে পৌঁছিয়া সেখানকার বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। কেননা তাঁহার সহিত দিল্লীর বাদশাহের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্য আমি ভাবিলাম সাক্ষাতের পরিণাম ভাল হইবে না।

৩য় পরিচ্ছেদ। কামরূ (কামরূপ) দেশ।

সাতগাঁ হইতে আমি কামরূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলাম। এই দেশ সাতগাঁ হইতে এক মাসের পথে। ইহা বহু বিস্তৃত পাহাড়িয়া দেশ এবং ইহা চীন ও যে তিব্বতে কস্তুরা হরিণ পাওয়া যায়, তাহার সংলগ্ন। এই দেশের অধিবাসীরা আকৃতিতে তুর্কিদের ন্যায়। ইহাদের ন্যায় কদাচিৎ অন্যস্থানে দেখা যায়। সেখানের একজন চাকর অন্যস্থানের কয়েকজন চাকরের সমান কাজ করে। ইহারা বিখ্যাত যাদুগর।

আমার এই দেশে যাইবার উদ্দেশ্য এই ছিল, যে আমি বিখ্যাত আউলিয়া শেখ জলালুদ্দীন তব্‌রিজীর (ঘ) সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই শেখ নিজ সময়ের কুতুব (পীরশ্রেষ্ঠ) ছিলেন। ইঁহার অলৌকিক কার্য্য প্রসিদ্ধ। ইঁহার বয়সও অনেক বেশী হইয়াছিল। তিনি বলেন যে তিনি খলীফা মুস্‌তা'সিম বিল্লাহকে বাগদাদে দেখিয়াছিলেন এবং যে সময়ে খলীফা নিহত হয়েন সে সময়ে তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি ১৫০ বৎসর পূর্ণ করিয়া মরেন। তিনি ৩০ বৎসর হইতে বরাবর রোজা রাখিতেছিলেন। দশ দশ দিন অন্তর তিনি একবার ইফ্‌তার (পারণা)

টীকা ঘ। এই শেখ জলালুদ্দীন ইঁহাদের শাহ্‌জলাল হইতে ভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ে অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। শাহ্‌জলাল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে কিংবদন্তি আছে, তাহা এই বৃত্তান্ত অপেক্ষা অনেক আধুনিক। কাজেই তাহাতে গল্প মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা। 'আখ্‌বারুল্ আখিয়ার' নামক পুস্তকেও এই শেখ জলালুদ্দিন তব্‌রিজীর জীবন-বৃত্তান্ত আছে।

করিতেন। তাঁহার শরীর রোগা পাতলা ছিল। তাঁহার আকৃতি লম্বা এবং গণ্ডদ্বয় ক্ষীণ ছিল। তাঁহার হস্তে সেই দেশের অধিকাংশ লোক ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার একজন সঙ্গী আমাকে বলিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সকল বন্ধুকে ডাকিয়া এই উপদেশ দিলেন যে "তোমরা আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ্ চাহেন ত কাল আমি তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হইব, আল্লাহ্ই তোমাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত রহিলেন।" জোহরের নমাজের সময়ে শেখ সিজ্‌দার অবস্থায় তাঁহার দম বাহির হয়। তাঁহার ওহার নিকট একটী খোঁড়া কবর দেখা গেল। তাহাতে কাফন এবং খোশবু মৌজুদ ছিল। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে গোসল দেওয়াইয়া কাফন পরাইয়া জনাজার নমাজ পড়িয়া দফন করিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে দয়া করুন।

যখন আমি এই শেখ সাহেবের দর্শনের জন্য গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বাসস্থানের দুই আড্ডা দূরে তাঁহার চারি জন সঙ্গীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা বলিলেন যে "শেখ সাহেব ফকীরদিগকে বলিয়াছিলেন যে একজন মরক্কো-দেশীয় ভ্রমণকারী আমার এখানে আসিতেছেন, তোমরা তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া আন। আমরা শেখের হুকুম অনুসারে আসিয়াছি।" আমার সম্বন্ধে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না। তিনি যাহা কিছু জানিয়াছিলেন, তাহা দিব্যজ্ঞানে জানিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত শেখের খিদ্‌মতে হাজির হইলাম।

আমি শেখের খান্‌কায় পৌঁছিলাম। এই খান্‌কাহ্ একটী শুষ্কার বাহিরে ছিল। তাহার নিকট কোন লোকালয় ছিল না। সেই দেশের হিন্দু মুসলমান সকলে শেখের দর্শনের জন্য আসিত এবং তাঁহাকে ভেট ও নজর দিত। তাহা ফকীর ও কাঙ্গাল সকলে খাইত; কিন্তু শেখ নিজে কেবল একটী গরুর দুধ খাইয়া দিন গুজরান করিতেন। যখন আমি তাঁহার খিদ্‌মতে হাজির হইলাম, তিনি খাড়া হইয়া আমার সহিত গলায় গলায় মিলিলেন এবং আমার বাড়ী ও আমার সফরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি আরবের মধ্যে (বিখ্যাত) ভ্রমণকারী।" তাঁহার একজন সঙ্গী বলিলেন, "হজ্‌রত, ইনি 'আরব ও 'আজম (অনারব) উভয়ের মধ্যে একজন ভ্রমণকারী।" শেখ বলিলেন, "আরব ও 'আজমের মুসাফির, তোমরা ইহার সম্মান কর।" তার পর আমাকে খান্‌কায় লইয়া গেলেন এবং তিন দিন পর্য্যন্ত আমার আতিথ্য সৎকার করিলেন।

যেদিন আমি প্রথমে শেখের সাক্ষাৎকারের জন্য যাই, তিনি এক উনের চোগা পরিয়াছিলেন। আমি আপন মনে বলিলাম, "যদি শেখ সাহেব আমাকে এই চোগা দান করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।" আমার বিদায় সময়ে শেখ সাহেব শুষ্কার এক-দিকে গিয়া আপনার শরীর হইতে চোগাটী খুলিয়া আমাকে পরাইয়া দিলেন এবং নিজের মাথার টুপী খুলিয়া আমার মাথায় রাখিয়া-দিলেন। ফকীরেরা বলিলেন যে "চোগা পরা শেখের অভ্যাস নয়। কেবল তোমার আসিবার খবর শুনিয়া শেখ সাহেব চোগা

পরিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে 'মরক্কো নিবাসী আমার নিকট এই চোগা চাহিবে এবং এক কাফের রাজা ইহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে এবং সেই রাজা ইহা আমার ধর্ম্মভাই বুরহানুদ্দীনকে দিবে।" ফকীরদিগের মুখে ইহা শুনিয়া আমি আপন মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে "শেখ আমাকে আপনার পোশাক দান করিয়াছেন এবং আমার এক অপূর্ব্ব ধন লাভ হইয়াছে। আমি কখনই এই চোগা পরিয়া কোন মুসলমান বা কাফের রাজার নিকট যাইব না।" আমি শেখের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

ইহার দীর্ঘকাল পরে আমার চীন দেশে যাওয়া ঘটে। আমি চীনের খন্‌সা সহরে সঙ্গীদিগের সহিত বেড়াইতেছিলাম। ভিড়ের জন্য একস্থানে আমি সঙ্গী হইতে আলাহিদা হইয়া পড়ি। আমি এই চোগা পরিয়াছিলাম। পথে উজীরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে নিজের কাছে ডাকিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। কথায় কথায় আমরা রাজপ্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। তিনি আমাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা আমাকে মুসলমান বাদ্‌শাহদিগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলাম। রাজার দৃষ্টি আমার চোগার উপর পড়িলে তিনি তাহার বড়ই প্রশংসা করিলেন। উজীর বলিলেন, "তুমি ইহা খুলিয়া দেও।" আমাকে সহজে রাজুম মানিতে হইল। রাজা চোগা লইয়া তাহার বদলে আমাকে দশটী খল'আত একটী ঘোড়া মায় সাজ সরঞ্জাম এবং খুরচের জন্য কিছু নগদ প্রদান করিলেন। আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। পরে শেখের উক্তি স্মরণ হইয়া আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল।

ইহার পর বৎসর আমি চীনের রাজধানী খান বালিকে (পিকিনে) যাই। তখন শেখ বুরহানুদ্দীন স্বাখরুবীর খান্‌কায় ঘটনাক্রমে উপস্থিত হই। সেখানে দেখি শেখ কেতাব পড়িতেছেন এবং সেই চোগা পরিয়া আছেন। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সেই চোগা উলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিলাম। শেখ আমাকে বলিলেন, "তুমি কেন উহা উলট পালট করিয়া দেখিতেছ? তুমি ইহা চিন?" আমি বলিলাম, "হাঁ; এই চোগা খন্‌সার রাজা আমার নিকট হইতে লইয়াছিলেন।" শেখ বলিলেন, "শেখ বদরুদ্দীন এই চোগা আমার জন্য তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে অমুক লোকের মারফত তোমার নিকট এই চোগা পৌঁছিবে।" শেখ আমাকে সেই পত্র দেখাইলেন। আমি সেই চিঠি পড়িলাম এবং শেখের সত্য ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তারপর আমি সমস্ত কাহিনী শেখ বুরহানুদ্দীনের নিকট বর্ণন করিলাম। শেখ বলিলেন, "আমার ভাই শেখ বদরুদ্দীনের পদ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সংসারের সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার অধিকার আছে। এক্ষণে তিনি পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।" পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি তিনি প্রত্যেক দিন ফজরের নমাজ মক্কা শরীফে পড়িতেন এবং

প্রত্যেক বৎসর হজ্ব করিতেন। তিনি 'আরফা এবং 'ঈদের দিন অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। কাহারও কোন খবর হইত না।"

৪ পরিচ্ছেদ। সুনারকাওন।(সোনারগাঁ)

শেখ বদরুদ্দীনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি হবনক (ঙ) শহরের দিকে গেলাম। ইহা একটী বড় শহর। ইহার মধ্য দিয়া নদী বহিতেছে। এই নদী কামরূপের পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে। ইহাকে নীল (আয্‌রক) নদী (চ) বলে। এই নদী দিয়া লোক বাঙ্গালা এবং লখ্‌নৌতি গিয়া থাকে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে ক্ষেত্র, বাগান ও গ্রাম দৃষ্ট হয়, যেমন মিসরের নীল নদীর তীরে দেখা যায়। সেখানকার বাসিন্দা কাফের। কিন্তু বাদ্‌শার রাজত্ব। তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধেক ভাগ রূপে লওয়া হয়। খাজনা ইহার অতিরিক্ত। আমি এই দেশে ১৫ দিন পর্য্যন্ত সফর করিয়াছিলাম। গ্রাম এবং বাগান এখানে এত বেশী যে, বোধ হইতেছিল যে বাজার দিয়া যাইতেছি। অসংখ্য জাহাজ এই দেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাহাজে এক একটী ঢাক থাকে। দুই জাহাজে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা ঢাক বাজায়। এই হইল তাহাদের সালাম। সুলতান রুকনুদ্দীনের হুকুম এই যে এই দেশে ফকীরদিগের নিকট হইতে কোন মাসুল আদায় করা হইবে না। ফকীর কোন শহরে উপস্থিত হইলে বাদ্‌শার তরফ হইতে তাহাকে আধ দীনার দেওয়া হয়। ১৫ দিন সফরের পর আমি সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হইলাম। এই শহরের অধিবাসিগণ শয়লাকে ধরিয়া বাদ্‌শার হাতে দিয়াছিল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

প্রেমিক

পথরেখাহীন বনে ফিরি খুসী,
সাগর-বেলায় দেখি মো রঙ্গ ;
বাজে জল-বীণা সদা মন তুষি'
বনে নিরজনে লভি সু-সঙ্গ ;
মানব-প্রেমিক,—তবু প্রেম পুষি'
দেখিতে প্রকৃতি-রূপ-বিভঙ্গ।

শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র।

---

* টীকা ঙ। হবনক শহরের অবস্থান বুঝা যাইতেছে না।
টীকা চ। আয্‌রক নদী ব্রহ্মপুত্র বলিয়া বোধ হইতেছে।

ছাই

(১)

গরিবুল্লা কাচারীতে ঢুকিয়া ম্যানেজার বাবুকে সালাম দিতেই তিনি ভ্রুভঙ্গি করিয়া কহিলেন, "কিরে ব্যাটা বড় যে নবাব হয়েছিস, দেখছি ; এ কয় দিন কাচারীতে গর-হাজির কেন ?" গরিবুল্লা হাত জোর করিয়া কহিল, "বাবু আজ চার দিন যাবত আমার বাপ মরার মতে পড়ে আছে, জবান বন্ধ, পানি ফোঁটাও খায় না ; তারই জন্য সারাদিন রাত তার কাছে থাকি, কি জানি কখন জানটা বের হয়ে যায় ; এদিকে রাত জাগতে জাগতে আমারও শরীরটা একটু ব্যারাম—" ; কথা শেষ না হইতেই ম্যানেজার বাবু মুখ খিচাইয়া কহিলেন, "ব্যাটা, আমি এ সব কেচ্ছা শুনতে ত তোকে ডাকি নাই ; যদি চাকুরীর সাধ থাকে, তবে আজ বৈকাল হ'তে আমি তোকে কাচারীতে হাজির চাই, নইলে কাজ ইস্তাফা দিয়ে বাড়ী গিয়ে নবাবী কর।" গরিবুল্লা আবার হাত জোর করিয়া কহিল, "একটা হপ্তা আমায় মাফ দেন বাবু, তারপর —তারপর আমার বাপেরে আমি মাটীর তলে থুয়ে চাকুরীতে আসব—এক হপ্তা আর আমার বাপ কিছুতেই বাঁচবে না" বলিয়া সে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল ; ম্যানেজার বাবু আরও গরম হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ন্যাকামী রাখ্ বেটা—" কথার শেষভাগে কতকগুলি অশ্লীলতাবোধক শব্দ ব্যবহার করিলেন। গরিবুল্লা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এবার গলায় কাপড় দইয়া বাবুর দুই পা জড়াইয়া ধরিল। বাবু সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া আবার কটূক্তি বর্ষণ করিলেন। গরিবুল্লা উঠিয়া কহিল, "বাবু, আজ বৈকালে কাজে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমার ইস্তাফা মঞ্জুর করুন।" জলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হইল ; বাবু গর্জ্জিয়া হাঁকিলেন, "কি বল্লি, হারামজাদ, ইস্তাফা ? এই দিচ্ছি। খানা বাড়ীর প্রজা, আবার কাচারীর পেয়াদা হ'য়ে দেখেছ ব্যাটার আস্পর্দ্ধা ! বরকন্দাজ এই—র দুই কান ধরে ওখানে বসিয়ে রাখ ; শুমারনবিশ বাবু, আপনি এখ্খনি দেখে দিন ওর নামে বাকী খাজানা কত।" হুকুম মোতাবেক কাজ হইল ; শুমারনবিশ কাগজ হাতড়াইয়া কহিলেন, "ওর পাঁচ বছরের খাজানা বাকী—পঞ্চাশের উপর উঠেছে।" ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "হাঁ, খাজানা বাকী রেখে উপকার করার এই কৃতজ্ঞতা ! বরকন্দাজ, তুমি এখ্খনি এই নিমকহারাম কুত্তাকে গর্দ্দনী দিতে দিতে মালখানায় নিয়ে যাও, খাজানা দিয়ে তবে খালাস পাবে।" গরীবুল্লার বাপ রাজবাড়ীতে চাকুরী করিয়া চুল পাকাইয়াছে, আজ সে মরণপথে— গরীবুল্লাও আজ দশ বৎসর যাবত কাচারীতে প্যাদগিরী করিতেছে ; সুতরাং বরকন্দাজ গরীবুল্লাকে হুকুম মোতাবেক গর্দ্দনী দিবে কিনা ভাবিয়া একটু ইতঃস্তত করিতেছিল ; বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আবার্দার,

এই দুই ও—কে কাণ মলতে মলতে মালখানায় তোল্ ত।" হুকুম শুনিয়া বরকন্দাজ অবিলম্বে গরীবুল্লাকে গর্দ্দনী দিতে দিতে মালখানায় লইয়া গেল, এবং সুনজর বহাল করার জন্ত গরীবুল্লার পিঠে দুই তিনটী মুষ্ট্যাঘাতও করিল।

কতক্ষণ সে মালখানায় থাকিত বলা যায় না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাজবাড়ীতে কি একটা পত্র আসায় আনন্দের রোল পড়িয়া গেল; সাহেব বৈকালে বাহিরে যান, কি জানি ব্যাটার কান্নাকাটী শুনে সাহেবের সান্ধ্য ভ্রমণের আনন্দের ব্যাঘাত হয়, তাই তাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিয়া দেওয়া হইল—"আগামী তিন দিনের মধ্যে খাজানা পরিশোধ ক'রে না দিলে তোর ভিটায় ঘু ঘু চড়বে।" ম্যানেজার চালাক মানুষ, সাহেবের মেজাজ বুঝিয়া কাজ করিতেন; জানিতেন, টিকেট ছাড়া কোন দর্শনেচ্ছুকে তাঁহার বৈঠকখানায় যাইতে দিলে পাহারাওয়ালার উপর সে দিন বহুত গজব হয়, বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইলে যদি কোন প্রজা বা চাকর সামনে পড়িয়া কাঁদা-কাটা করে, তবে তাঁহার মেজাজ আগুন হইয়া যায় এবং সে রাগের জের সপ্তাহ মোসাহেব, আমলাদের উপর পর্য্যন্তও গড়ায়।

(২)

গরীবুল্লার মায়ের কাছে মালখানার খবর আগেই পৌঁছিয়াছিল, গরীবুল্লা বাড়ী ফিরিতেই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল; গরীবুল্লা পাষাণের মত স্থির কণ্ঠে কহিল, "কেঁদ না মা, এখন বাজানের এই সময়; এখন কি কাঁদতে আছে।" মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমাদের এখন কি উপায় হবে?" গরীবুল্লা উপরের দিকে দেখাইয়া কহিল, "সবাই যদি ছেড়ে যায়, মা, তবে ও ব্যাটা কি ফেলে দিতে পারবে!"

আরও দুইদিন পরে গরীবুল্লার বাপের হুস হইল, সে কথা কহিল,—গরীবুল্লার মা'র আশা হইল, এবার বুঝি খোদা মুখ তুলিলেন; আশা হইতেই সে কাঁদিয়া মালখানা, বাকী খাজানা, চাকুরী ইস্তাফা ইত্যাদির সব কথা বলিল। বুড়া নীরবে সব কথা শুনিয়া গরীবুল্লাকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "আমি ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না,—আর বোধ হয় পারবও না; যদি পারতাম, একবার আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা বলে দেখতাম—; আর বলবই বা কা'কে? শরিকী মামলার সময় বা'র জমিদারী রক্ষা করতে খুন করেছি, জখম হয়েছি, জেলে গিয়েছি, জান পণ করেছি, সে ত আর এখন নাই; এখন যে মালীক আছে, সে ছিল তখন শিশু, কাজেই সে খবরও রাখে না; সে কখনও করে না—, আহা এর বাপের মত একটা জমিদার কি আর হয়!" বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিল। স্থির হইয়া আবার সে বলিতে লাগিল, "অবস্থা যখন এই তখন আমি বলি, যদি সাহেব তোকে মাফ ক'রে এখানে থাকতেও দেয়, তবু আর এখানে থাকিস নারে বাবা। জমীদার বাড়ীর কাছে থাকলে কুট কয়মাইস ক'রে দিনটা গুজরান হয়ে যায় বটে, কিন্তু তা'তে বড় জিল্লতি, তাদের উপর দুইটা বল ভরসা করা অবশ্যই যায়, কিন্তু কখন যে আবার হঠাৎ বাজ এসে মাথায় পড়ে, তা বুঝবার জো নাই।

খোলাবান্দা গিয়ে একটা বাড়ী করে জঙ্গল কেটে যদি কয়েক পাথী জমি বের করে নিতে পার, তবে সেই মাটী নেড়ে চেড়েই এক রকম চ'লে যাবে।"

(৩)

ইহার একদিন পরে শ্রীপুরের মাঝার ডোর কাটিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। গরীবুল্লা অশ্রু মুছিয়া দা হাতে কাঁচা বাশ আনিতে বাড়ে চলিল। সংবাদ ম্যানেজার বাবুর অবিদিত রহিল না—; তিনি বলিলেন, "আজ বাদে কাল হবে ও রাজবাড়ীর খামার, ওখানে ত কবর টবর দিতে দেওয়া যায় না।" বাবু সাহেবত যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, সাহেবও একদম তৈয়ার। এমন সময় তিনি সাহেবের সামনে একটা কাগজ দস্তখতের জন্য ধরিলেন; সাহেবের মেজাজ আজ বড় ঠাণ্ডা, তিনি প্রসন্নহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ম্যানেজার বাবু, খুব জরুরী?" ম্যানেজার বাবু কহিলেন—"হাঁ হুজুর, ঐ যে বলেছিলাম খানা বাড়ীর প্রজা একটা বেয়াড়া প্যায়দার কথা,—তারই তিটা সম্বন্ধে আদেশ।" সাহেব কলম তুলিয়া খচ্ করিয়া সংক্ষেপে নামটা সহি করিয়া দিয়া কহিলেন, "হাঁ, ম্যানেজার বাবু, এমনিই আমাদের কর্ত্তব্য করতে হবে, যত আনন্দের কারণই আমাদের হোক না কেন, এ ষ্টেটের কাজ দস্তরমত করতে কিন্তু আমরা কেউ গাফলতি করব না।" ম্যানেজার বাবু স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা ভরিয়া, সালাম দিয়া কহিলেন, "সে কি আর হুজুর বলতে? হুজুরের সম্মানেই ত আমাদের সম্মান; দিন দিন হুজুরের সম্মান বাড়বে, আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে এ ষ্টেটের কাজ চালাব।"

হুকুমনামা দস্তখত হইতেই গরীবুল্লার বাড়ীর দিকে একজন বরকন্দাজ ছুটিল। তখন গরীবুল্লা কোদাল হাতে কবর খনন করিতেছিল, বরকন্দাজ গিয়া জানাইল, "বাবুর কড়া হুকুম, খোদ সাহেবের দস্তখত, এ বাড়ীর উপর কোন কবর দিতে পারবে না। গরীবুল্লা কথাটা প্রথম বুঝিতে পারিল না, মোটের উপর কথাটা সে শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহার কানকে বিশ্বাস করাইতে পারে নাই; বরকন্দাজ আবার বুঝাইয়া দিল, গরীবুল্লা হাতের কোদালটা খুব উঁচাইয়া মারিয়া একটা নূতন মাটির চাপড়া চাড় দিয়া তুলিতে তুলিতে নিতান্ত শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "তোমার বাবুকে বল গিয়া আমি কবর কাটতেই রইলাম, যদি বাপকে কবর না দিতে পারি, তাও কবর খালি পড়বে না যে বাধা দিতে আসবে তাকে কবর দিব।" বরকন্দাজের রাগ হওয়ার কথা; কিন্তু তাহার দয়া হইল, সে নিজে গরীব বলিয়া কি না বলিতে পারি না। সে গরীবুল্লাকে অনেক বুঝাইল, "দেখ ভাই, কথাটা বাবুর কানে গেলে তিনি ত আগুন হ'য়ে উঠবেন, তারপর বাপের লাস ঘরে রেখে বাইরে একটা খুনাখুনি—সে বড়ই খারাপ হবে; মাঠে খৈ খৈ পানি, যাদের বাড়ী নাবা জায়গায়, তারা ত সব লাস ভাসিয়েই দেয়; তুমিও আনাস্থে পড়ে লাসটা ভাসিয়ে দাও, সব গোল চুকে যাক।" কিন্তু গরীবুল্লা বোঝে না। অবশেষে বরকন্দাজ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কোদাল ছাড়, বাড়ী চল;" গরীবুল্লা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ রাঙাইল, গালি দিল, রাগত স্বরে কহিল, "তুমি যদি আমার হাত ধ'রে

নিয়ে করতেই এসে থাক, তবে হুঁশিয়ার।" বরকন্দাজও রাগ করিয়া রাজবাড়ী চলিল, উপস্থিত হিতৈষীরা তাহাকে দুই কথা মিষ্টি বলিয়া থামাইল।

৪

আগেই বলিয়াছি, জমিদার সাহেবের বাড়ীতে বড় ধুমধাম, ডাকহাঁক, অপরিচিত বিদেশী কেহ হঠাৎ দেখিলে মনে করিত, সাহেবজাদা বুঝি বিবাহ করিতে রওনা হইতেছেন। আসলে তিনি যাইতেছেন কলিকাতা; কারণ স্বয়ং লাট সাহেবের হস্তখতী এক এনায়েত নামার সাহেব লাট দরবারের দাওয়াত পাইয়াছেন; সেই ধুমেই আজ কয়দিন বাড়ী মত; আজ তিনি রওনা হইতেছেন—দাওয়াত রক্ষা করতে। দাওয়াতে নানা আশা—'লাট সাহেবের হস্তখতী পত্রে দাওয়াত, সেই ত একটা পরগণা খরিদ করার সমান; —তারপর দাওয়াত কি শুধু দাওয়াতেই শেষ হবে, আর কিছু মিলবে না? এর উপর লাট সাহেবের কৌন্সিলে মেম্বর হওয়ার আশা—যেন অল্পই চোখে ভাসছে; বি, এম, এ, পাসকরা ছোকরারা চাকুরীর উমেদারীতে একটা প্রশংসাপত্র নিতে পাছে পাছে ঘুরছে।" একেত কাকীপুরের না কেরামত আলী খাঁ সাহেবের বংশ, বাদশা শাহজাহানের আমলের পিতলে লিখিত সনদ এখনও বর্ত্তমান, তাহাতে যদি আবার ইংরেজ বাদশাও তেমনি সম্মান করা সুরু করে' দেয়, তবে বাঙ্গলা দেশের জমিদারদের মধ্যে রাজা মিঞা সাহেবের সামনে দাঁড়ায় কে? আর কেনই বা তাঁহার এ গৌরব-বৃদ্ধি না হইবে? তাঁহার মত বদান্য অতিথি-বৎসল জমিদার দেশে কয়জন আছে? দারোগা হইতে শুরু করিয়া কমিশনার পর্য্যন্ত সকলের সম্মুখেই তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত, এদিকে দেশ বিদেশে যেখানে দুঃখকষ্ট, সেখানেই তাঁহার দানের হস্ত প্রসারিত। বেলজিয়ান প্রতিম কণ্ড, নায়েগারা প্রপাত কণ্ড, কসের কুকুর দৌড় কণ্ড, কলিকাতা-সুভক্ষণ কণ্ড ইত্যাদি কোন কণ্ডই তাঁহার দানের ঋণমুক্ত নহে। আর তিনি গত জগতের স্বাধীনতা উদ্ধারিনী মহাসভাকে সত্যের উপাসক পক্ষকে একটী স্বেচ্ছাসৈনিক জোগার করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা তাহার বিভাগে আর কেহই পারে নাই!

রাজামিঞা সাহেব রওনার আগে সবার নিকট বিদায় হইয়া পরে বাড়ীর মা'র কাছে বিদায় লইতে গেলেন। বাড়ীর মা এক বুড়ী, রাজামিঞাকে কোলে কাপে করিয়া মানুষ করিয়াছে—দুনিয়াতে আর তাহার কেহ নাই, এক কাণি জমিও না। বুড়ী রাজামিঞাকে বড় স্নেহ করে, আবার তাহার নিকট বড় আব্দারও করে, সুযোগ পাইলে তিরস্কার করিতেও কসুর করে না, এই শেষোক্ত গুণের জন্য জমিদার সাহেব তাকে একটু খাতির করিয়াই চলিতেন। একদিনের কথা বলি:—কোন সাহেব—বিলাতি সাহেব—একদিন আসিয়াছে, জমিদার সাহেব তাহাকে দেওয়ার জন্য একটী ডালা সাজাইয়াছেন। ডালা অন্দরে ছিল, ভরা ডালা বাহির করিয়া আনার সময় বুড়ীর নজরে পড়িল ডালা ও রাজামিঞা, বুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথায়

পেলে বাবা—কে এ হাজত পাঠিয়েছে—কার জন্য—তোমার জন্য ?" রাজামিঞা কহিলেন, "না ব্যাঙার মা, এ একজন সাহেব এসেছেন, তাঁরই জন্য।" ব্যাঙার মা মুখ খিঁচাইয়া ভেঙাইতে ভেঙাইতে কহিল—"একটা সাহেবের জন্য !—তোমার দাদার নামে, তোমার বাপের নামে জীবন কাটে, মৃত্যুর পর কত সিন্নি সন্দেশ এনেছে, তুমি আজ কোথায় হাজত পাবে, না নিজেই একটা কি কিরিঙ্গির জন্য নিয়ে যাচ্ছ !" তাই আজ কাছে যাইতেই ব্যাঙার মা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এত সেজে গুজে যাও, বাবা ?" তখন তাঁহার মন একটু কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, "কলকাতা।" আজ বুড়ীর মন বড় খুসী ছিল, রাজামিঞা সাহেবকে বহুমূল্য কাপড় চোপড়ে সজ্জিত দেখিয়া তাহার আনন্দ বৃদ্ধি হইয়াছিল. সে প্রসন্ন হাসো, মাথায় গায় আশীর্ব্বাদের হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, 'তা যাবে, বাবা, যাও ; কিন্তু এর পরের রওনা কিন্তু আর কলকাতা নয়. একদম মক্কা শরিফ। তোমার বাবাকে আমার মা কোলে কাখে মানুষ করেছিল, মা'র বুড়া বয়সে তোমার বাবা তাকে মক্কাশরিফে সাথে নিয়েছিল ; আমিও কিন্তু বাবা তেমনি তোমার সাথে হজে যাওয়ার আশাতেই এখনো বেঁচে আছি।"

(৫)

রাজামিঞা সাহেব বজরা ছাড়িয়াছে, আশে পাশে পাঁচ সাতখানা নৌকা, আমলা ফয়লারা সাহেবকে বিদায় করিতে যাইতেছেন। বজরায় সাহেব, ম্যানেজার বাবু, নায়েব সাহেব শুমারনবিশ বাবু ইত্যাদি। বজরা রাজবাড়ীর সীমা পার হইতেই রাস্তার বাঁদিকের একটা বাড়ীতে কান্নার রোল শুনা গেল। নায়েব সাহেব, যেন অন্যমনস্কভাবে অথচ কথাটা সাহেবের কানে যায়, কহিলেন, "আহা ! এই সুখের যাত্রায় আবার কান্না কাটা কেন ?" ম্যানেজার বাবু মনিবের মঙ্গলের জন্য কম উদ্বিগ্ন হইতে পারেন না, তিনি ধমকায় দিয়া উঠিলেন—"ওখানে কাঁদে ওটা কে রে ?" বজরার ছৈয়ের উপর হইতে কে জবাব দিল, "গরীবুল্লার মা।" বাবু হুকুম দিলেন, "কে আছিস রে, সেত মাগীর চিল্লানীটা বন্ধ করে ; সময় অসময় বোঝে না, মাগী কেবল চীল্লাতে জানে।" এমন সময় ছৈয়ের উপর হইতে আর এক মাল্লা চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই দেখুন বাবু, একটা লাস, এ বুঝি গরীবুল্লার বাপের লাস—হুঁ—তাইত ভেসে যাচ্ছে ?" নায়েব সাহেব অমনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ওরে, দেখিস যেন কিছুতেই লাসটা বজরা না ছোয়, সামনে আসে ত চৌড় দিয়ে ঘা মেরে সরিয়ে দে।" সাহেব এতক্ষণ এ সব কথা শুনিতেছিলেন কিনা বলিতে পারি না, এখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে ম্যানেজার বাবু—গোলমাল কিসের ?" বাবু কহিলেন, "গরীবুল্লার বাপ মরেছে, তাই তার মা কাঁদছে।" সাহেব শুনিয়া বলিলেন, 'হুঁ'। বাবু আবার বলিলেন, "তার লাসটা বজরার সামনে এসে পড়ে, তাই নায়েব সাহেব বলছেন, লাসটা চৌড় দিয়ে সরিয়ে দাও।" সাহেব কহিলেন—"যাক না ও লাসের মত লাস ভেসে, ওকে খোঁচা দেওয়ার প্রয়োজন কি ?" তখন শুমারনবিশ বাবু উচ্চ চীৎকারে কহিলেন, "ওরে খবরদার যেন

লাসের গায়ে চৌড়, বৈঠা না লাগে ?" তাহার পর সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুজুর, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রমতে যাত্রা করে চিতা দেখ শুভ, হুজুরের যাত্রাও তেমনি শুভ হইবে, তারই লক্ষণ চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি।" সাহেব মৃদু হাস্য করিলেন।

(৬)

সাহেব বাড়ী ফিরিতেছেন—মহাধুমধামে, শাঁখ শওকতে। সঙ্গে বজরার জিনিসপত্র, লোকজন, খানসামা বরকন্দাজ, সব ছিল, কাজেই আগমন সংবাদ বাড়ীতে না দিলে কোন অসুবিধাই হইত না; এতদুপরি সাহেব মনে করিলেন, আগে খবর দিয়ে খোশ খবরের জুশটুকু নষ্ট না করিয়া হঠাৎ গিয়ে বাড়ী উপস্থিত হইব। বাড়ীর কাছে বজরা যাইতেই একটা শুস্ত, সদ্য চাষ করা ভিটার উপর সাহেবের নজর পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ভিটাটা কার ম্যানেজার বাবু?" ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "ভিটাটা এতদিন ছিল গরীবুল্লার বাপের, এখন হুজুরের খামার।" "হুজুরের খামার" শব্দে যেন একটা সোয়াস্তি বোধ করিয়া তিনি সোৎসাহে কহিলেন, "ঐ ভিটায়, ম্যানেজার বাবু, একটা ভাল ডাকবাংলা করতে হবে, কারণ এখন ত সাহেব সুবা আরো বেশী আসবে, খাবার আয়োজনটাও আগের চেয়ে এখন ভাল না হ'লে চলবে কেন?"

ইতিমধ্যে সাহেবের আগমন সংবাদ নিয়ে একজন বরকন্দাজ রামবাড়ী ছুটেছে, ইচ্ছা উভয় খোশ খবর দিয়ে বেগম সাহেবের নিকট হইতে একটা বখসিশ আদায় করা। সংবাদে কাচারী বাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল, সে রোল অন্দর মহলেও গিয়া পৌঁছিল। কোলাহল শুনিয়া ব্যাঙার মা বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো ওগো, কি হয়েছে তাই এত গোলমাল?" অন্দরের খানসামাদের সর্দার ঘোতা তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "ইস, এত বড় একটা কথা, তা এখনো তোমার কানে গেল না, বড় ত সাহেবের দরদী।" "কি, কি হয়েছে ঘোতা?" বুড়ী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল। ঘোতা বলিল, "শুনিস নাই এখনো—সাহেব, সাহেব;" বুড়ী কহিল "সাহেব তাই কি?" ঘোতা উত্তর দিল "সাহেব সি, আই, ই, হয়েছেন, কলিকাতার লাট সাহেবরা আমাদের সাহেবকে সি, আই, ই, করেছেন।" শুনিয়া বুড়ী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায়, হায়রে, আমি তখনি আমার বাচারে বলেছিলাম রে, বাড়ী ছেড়ে অত শহরে শহরে ফিরিস না আর ঐ ফিরিঙ্গীওলার সাথে মিশিস না, সেই কথা না শুনে বাছা আজ আমার ছাই হয়ে গেছেরে! হায়! কোথায় কি করে কিসের আগুন তার গায়ে ধরল রে!"

খাজা

কোর-আন ও নারী

কোর-আন এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের উপর নারীরও সমান অধিকার আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পুরুষ সে কথা নারীকে জানিতে দেয় নাই।

মানুষরূপে নারীরও মানব সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। নারীর স্বামী এবং পুত্র দার্শনিক পণ্ডিত, দেশপূজ্য হতে পেরেছে বলে সত্যি করে তার কি লাভ হয়েছে?—তাকেও যে আল্লাকে বুঝতে হবে,—তাকেও সে সাধনার দ্বারা পূর্ণ মানুষ হতে হবে—তাকেও যে সজাগ হয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রাণময় প্রকৃতির বার্ত্তা তার কাছে মিথ্যা হয়ে যাবে না। তার প্রাণ-কুসুম চিরকাল মুদিত হয়ে থাকবে না, দক্ষিণ বাতাসে সমস্ত সৌরভ নিয়ে, সে বুক খুলে দাঁড়াবে। তার প্রাণের সমস্ত সৌরভকে চূর্ণ করে পুরুষ শুধুই তাহার দেহ নিয়ে টানা-টানি যেন না করে।

শুধু কি গোলামীর জন্যেই মানুষ জ্ঞান লাভ করবে? সে চরিত্রবান, বিদ্বান, পরোপকারী এবং সত্যনিষ্ঠ হবে?—কখনও না। পরম আত্মীয়ও যদি কাজে ও ব্যবহারে এই কথা জানাতে থাকেন, তাহা হলে তিনি আর তোমার পরম আত্মীয় নন,—তিনি অত্যাচারী যিনি আল্লার মানুষকে নিজের অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন।

মানুষের আত্মাকে পবিত্র সুন্দর মধুর করে তোলবার জন্যেই বিদ্যালাভ আবশ্যক। মেয়েরা চাকুরী করবে না বলে, এদেশের মানুষ স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিতা রাখে। হতভাগারা বোঝে না, খোদা বা জগতের কোন মহাপুরুষ মানুষকে গোলামী শেখবার জন্যে—জ্ঞান লাভ করতে বলেন নি।

মুসলমান হয়ে যদি কোর-আন বোঝার ঝামেলাটাকে নারীর জন্য তুমি বাজে মনে কর, তা হলে তোমায় আমি কি বলবো? কোর-আন তুমি শুধু নিজে পড়ো না, তোমার পত্নী, তোমার কন্যাকেও কোর-আন পড়তে দাও।

বাল্যকাল হতে প্রায় সাত আট বৎসর ধরে না বুঝে কোর-আন পড়ানোর কিন্তু কোন মূল্য নাই। যে জিনিসের অর্থ বুঝা যায় না, তা পড়ে আল্লাকে চেনা যায় না। উর্দ্দুই হোক বা বাঙ্গালা হোক সর্ব্বদা অর্থ বুঝে আল্লার বাণী আলোচনা কর। ক্রন্দনের সুর ধরে খোদার কাছে কাঁদলে কোন লাভ হবে না; তোমার প্রাণ কাঁদবে, তোমার মুখ নয়,—তোমার জিহ্বা নয়।

কোর-আনের এক বড় আদেশ—অজ্ঞাত, অবোধ ও মূর্খের কাছে খোদার কথা প্রচার করতে হবে। এ আদেশ নারীকেও শোনান হয়েছে।

তুমি তোমার প্রাণের বাণী সর্ব্বত্র প্রচার কর। মানুষকে সত্যপথ দেখাও। আল্লার জন্য তুমি বুকে শক্তি সংগ্রহ কর। তোমার অত লজ্জা করলে চলবে না।

নারীকেও খোদার সত্যপ্রচারে বাধিনীর শক্তি (শেরে খোদা) সংগ্রহ করতে হবে। কে নারীর রূপ ও পবিত্রতা রক্ষা করবে ?—দারোয়ান, চাকর, লোহার বেড়া, নারীর স্বামী ?—এদের কেউ নারীকে রক্ষা করবে না। নারীর ভিতর যে নারী গৌরব আছে, তোমার ভিতর যে "ফাতেমা মা" ঘুমিয়ে বসে আছেন, তার ভিতর যে সতীত্বের অগ্নিশিখা আছে, সেই তাকে রক্ষা করবে। নারীকে আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে চোখে চোখে রাখতে গিয়ে পুরুষ তাকে শুধুই অপমানে করেছে—জিজ্ঞাসা করি নারীর স্বামীকে কে রক্ষা করে ?

হিন্দুরা তাদের মেয়েদিগকে শিখিয়ে দিয়েছে স্বামী নারীর ঈশ্বর। স্বামী যদি পত্নীর গলা কেটে ফেলে তাতে পত্নীর কোন কথা বলবার অধিকার নেই। স্বামী দুরাচারের একশেষ হলেও কোন ক্ষতি নেই, পত্নী চিতায় আরোহণ করে জগতে সতীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করুক !

নারী সমাজকে এদেশের সমস্ত পুরুষ যেমন করে হাত পা ভেঙ্গে "দ" অক্ষরে পরিণত করেছে, এর প্রতিফল পুরুষ এবং সমস্ত দেশের মানুষকে ভোগ করতে হবে। এই অত্যাচারের শাসন, এই প্রাণহীন বিধি ব্যবস্থা নারী সহ্য যেন না করে।

ডাক্তার লুৎফর রহমান

স্নেহের বাঁধন

স্নেহের ডোরে বাঁধতে গিয়ে,
নিজেই পড়ে গেলাম বাঁধা।
না বুঝিলাম এ কার বাঁধন,
হ'ল যেন গোলক ধাঁধা॥
ভেবেছিলাম বাঁধন দিয়ে,
আন্‌ব তারে কাছে টেনে।
সুখের ভাগী হ'তাম না তার,
দুঃখে চাইতাম সুখের পানে॥
প্রাণের সহিত করতে যতন,
সদাই আমার ইচ্ছা ছিল।
ভাগ্য দোষে দয়াল বিধি,
সেটি আমার ঘুচিয়ে দিল॥

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

ইস্‌লাম গৌরব

ওমাইদ সভ্যতা

সাধারণ তন্ত্রের সময়ে মদিনার জনসাধারণ খলিফা মনোনীত করিত। কিন্তু মাভিয়ার সময় হইতে খলিফাই তাহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিতেন এবং সৈন্য সামন্ত ও অমাত্যবর্গ তাহা অনুমোদন করিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ লোকমত তখনও মান্য করিয়া চলা হইত।

পূর্ব্বে সাধারণ ধনকোষ সাধারণের নিমিত্তই ব্যয়িত হইত। কিন্তু এই সময়ে তাহা খলিফাগণের বিলাস ভোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

নানাভাবে ধনকোষে ধনাগম হইত। বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। বিভাগীয় শাসনকর্ত্তাগণ বিভাগীয় আয় হইতে ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ খলিফার নিকট প্রেরণ করিত। শাসনকর্ত্তাগণের উপর রাজনীতি ও সৈন্যের ভার দেওয়া হইত। কিন্তু রাজস্বের ভার অন্য এক কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হইত। পৃথক পৃথক বিভাগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইত। এমন কি 'ডাক' বিভাগেরও অভাব ছিল না। খলিফা আবদুল মালিক যে নূতন মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

সকল প্রজাকেই সামরিক শিক্ষা লইতে হইত। সৈন্যগণ উচ্চ বেতন পাইত। রণ-পোতবাহিনীরও তখন অভাব ছিল না।

সহরগুলি দেখিতে অতিশয় চমৎকার ছিল। চারিদিকে প্রশস্ত এবং সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত থাকিত। প্রত্যেক শ্রেণীর লোক-দিগেরই একটী করিয়া দল ছিল এবং তাহারা এক স্থানেই বাস করিত।

দামাস্কাস নগরীর বর্ণনা করা অসম্ভব। মুসলমান সাম্রাজ্যের মুকুটমণি দামাস্কাসের সমুচ্চ প্রাসাদের মনোমোহন শোভা, সারি সারি মস্‌জিদ সমূহের গম্বুজের সেই অপূর্ব্ব এবং গম্ভীর শ্রী লেখনীতে অঙ্কিত করা অসম্ভব।

মুসলমানগণের ন্যায় সুমার্জ্জিত রুচিজ্ঞান-সম্পন্ন জাতি অদ্য পর্য্যন্তও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কেবলমাত্র খলিফা এবং অমাত্য-বর্গেরই সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ছিল তাহা নহে, সাধারণ সকলেই উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিত। বহুদূর হইতে খাল কাটিয়া সহরের সর্ব্বস্থানে জল আনা হইত। খলিফার প্রাসাদের শোভা অতুলনীয়। সুবর্ণ মাণিক্য খচিত পোষাক পরিধান করিয়া দাসগণ সর্ব্বদাই আজ্ঞা বহন করিত। কত অমাত্য কত সৈন্য সামন্ত প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করিত। প্রতি নিয়ত যেন খলিফার প্রাসাদে ভোজ হইতেছে এইরূপ প্রতীয়মান হইত।

খলিফার দুইটী দরবার হইত। যেখানে খলিফা প্রতিনিয়ত শুধু অমাত্যদিগের লইয়া সভা করিতেন সেই স্থানকে খাস দরবার বলা হইত এবং যে স্থানে সর্ব্বসাধারণ উপস্থিত হইতে পারিত তাহাকে আম-দরবার বলা হইত।

গীতবাদ্য, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি কোনরূপ আমোদ প্রমোদ হইতেই সেই সময়ের মুসলমানগণ বঞ্চিত ছিল না। রমণীগণ কি বিদ্যায় কি অন্যান্য গুণে পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিতেন। যৌবনতায় মুসলমানগণ অদ্বিতীয় ছিলেন। এই সময়েই চামচ এবং রুমালের ব্যবহারের কথা জানিতে পারা যায়।

কয়েকখানা ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া কোনও বিশেষ সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়া ছিল না।

আব্বাস বংশের ইতিহাস

আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের অধীনে মুসলমান জগতে এক নূতন ভাবের সমাবেশ হইল। যেন বিজয়ের দিন গত হইয়া প্রকৃত সভ্যতার দিন আগমন করিল। স্পেনে ওমিয়াবংশীয় একজন সাহসী যোদ্ধা অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। আফ্রিকায়ও আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের বিশেষ আধিপত্য রহিল না। এই দুই স্থানের এবং মিশরের মুসলমানের ইতিহাস আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিব।

এই বংশের প্রথম নয় জন খলিফা অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। তন্মধ্যে হারুণ-অর-রসিদের নাম জগদ্বিখ্যাত।

দ্বিতীয় খলিফা মনসুর প্রসিদ্ধ বোগদাদ নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নূতন নগরীর শোভা অতুলনীয় ছিল। ইহার আকৃতি গোলাকার এবং চারিদিকে দুইটী সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। সৈন্য সামন্ত বণিক ব্যবসায়ী পরিবৃত হইয়া এই প্রসিদ্ধ নগরী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত।

মনসুরের পুত্র মাদি অতিশয় উদারচেতা এবং বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তদীয় শাসন সময়ে বাইজানটীন সাম্রাজ্যের সহিত মুসলমানগণের যুদ্ধ ঘটে। ফলে বাইজান্টীন্ রাণী আইরিন মুসলমানদিগকে কর দিতে বাধ্য হন।

মাদি মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যবস্থা করিয়া যান যে, তাহার পর তদীয় পুত্র হাদি এবং হাদির পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র হারুণ খলিফার আসন গ্রহণ করিবেন। মাদির মৃত্যুর পর হারুণ হাদিকে খলিফার আসন গ্রহণ করিতে সন্তুষ্টচিত্তে সাহায্য করিলেন। কিন্তু হাদির ইচ্ছা ছিল যে তাহার পর নিজের পুত্রকে খলিফার আসন দান করিয়া যান। যাহা হউক হাদির মৃত্যুর পর হারুণই খলিফার আসন গ্রহণ করিলেন।

আরব্য উপন্যাস যাহারাই পাঠ করিয়াছেন তাহাদের কাছে হারুণ অর-রসিদের নাম অবিদিত নাই। তিনি নিশীথে সামান্য লোকের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রজাগণের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। বস্তুতই তিনি পৃথিবীর, মহত্তম নৃপতিগণের অন্যতম ছিলেন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। একদিকে তিনি যেমন সাধু, উদারচেতা এবং দানশীল ছিলেন অন্যদিকে তিনি তেমনি রাজোচিত ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। তিনি একজন বিশেষ পণ্ডিত ও যোদ্ধা ছিলেন এবং বহুবার নিজেই রণক্ষেত্রে অসিধারণ করিয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তখন এশিয়া কেন ইয়োরোপে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে হইলে দস্যুর ভয় করিতে হইত কিন্তু মুসলমান সাম্রাজ্যের এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পথিক বণিকগণ এবং যাত্রীগণ নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারিতেন।

রসিদের শাসন প্রণালী

তাহার মন্ত্রীর জন্যই এরূপ সুশৃঙ্খলাপূর্ণ হইয়াছিল। এই মন্ত্রীবংশ বারমেকবংশ নামে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু কালক্রমে কুচক্রীর মন্ত্রণায় এই বিখ্যাত বংশের সহসা পতন হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। খলিফাও মন্ত্রীর পরামর্শ ভিন্ন ধনাগার হইতে এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতেন না।

এই সময় বাইজান্টাইন সম্রাট মুসলমানগণের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করে এবং আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে আবার সন্ধি হয়। কিন্তু নিকেফরাস্ যখন সম্রাট হইলেন তখন তিনি ঐ সন্ধি পুনরায় ভঙ্গ করিয়া রসিদের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে পূর্ব্বের সন্ধি অনুসারে আপনি যে ধনরাশি পাইয়াছেন তাহা অবিলম্বে ফিরাইয়া দিবেন নতুবা আমার অসি এই ব্যাপারের মীমাংসা করিবে। রসিদ ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর দিলেন, "আমরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু নিকেফরাস সন্ধি প্রার্থনা করিলেন কিন্তু বার বার ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াও বার বার সন্ধি ভঙ্গ করিতে লাগিলেন।

প্রায় চব্বিশ বৎসর শাসন করিয়া রসিদ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একজন শাসনকর্ত্তা প্রজাগণের নিমিত্ত কি করিয়াছেন ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বার বার তিনি সাম্রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতেন। নয় বার তিনি নিজে প্রজাদিগকে লইয়া তীর্থস্থান সমূহে গমন করিয়া প্রধানের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার সভা অতিশয় সুবিখ্যাত ছিল এবং তথায় দূরদূরান্তর হইতে পণ্ডিতগণ আগমন করিত। তিনি কেবল সাহিত্য এবং বিজ্ঞানেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, গীতবিদ্যার প্রতিও তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং গীতবিদ্যাগেও নানারূপ উপাধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে যখন চারিদিক অজ্ঞানান্ধকারে পরিবৃত ছিল তখন রসিদের সভাপণ্ডিতগণের কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক পুস্তক সকল দেশান্তর হইতে আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিতেন। সুদূর চীনসম্রাট হইতে ইয়োরোপের প্রতাপান্বিত সম্রাট সারলমান পর্য্যন্ত সকলেই রসিদের দরবারে দূত পাঠাইতেন। এমনও একটী বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে রসিদ সারলমানের নিকট একটী অদ্ভুত ঘড়ী পাঠাইয়াছিলেন। যখন ঘণ্টা বাজিবার সময় হইত তখন একটী দরজা খুলিয়া যাইত এবং ঘড়ীর ভিতর হইতে কতগুলি অশ্বারোহী বাহির হইত। আবার ঘণ্টা বাজিয়া গেলে, উহারা ভিতরে চলিয়া যাইত।

রসিদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আমিন খলিফার আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আমিন অতিশয় অকর্ম্মণ্য এবং বিলাসী ছিলেন। সহস্র সহস্র সুন্দরী বালিকা মণিমুক্তা খচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে

ব্যস্ত থাকিত। বিহারের নিমিত্ত টাইগ্রীস নদীতে পাঁচখানি অত্যুচ্চল বজরা ভাসমান থাকিত। তাহার কোন খানির আকার সিংহের মত, কোন খানির বা সর্পের মত ছিল।

পরিশেষে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমিন তাহার ভ্রাতা মামুনের পরিবর্ত্তে স্বীয় পুত্র মুসাকে উত্তরাধিকারীর পদে মনোনীত করেন। ক্রমে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং বিখ্যাত মামুন খলিফার আসন গ্রহণ করেন। কিছুকাল মধ্যে আমিন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণদান করেন।

মুসলমান জগতের বিজ্ঞান এবং সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলেই খলিফা মামুনের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। এই সময়ে মুসলমান আকাশে জ্ঞান-সূর্য্য সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কি অঙ্কশাস্ত্র, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য সর্ব্ববিষয়ই তাহার সময়ে বিশদভাবে আলোচিত হইত। এই সভ্যতার ভগ্নাবশেষ মুসলমানগণের সময় স্পেনে রহিয়া যায় এবং তথা হইতে ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি এ সম্বন্ধে ইয়োরোপ মুসলমান সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ ভাবে ঋণী।

চারিদিকে বিদ্যালয় সকল স্থাপিত করিয়া মামুন শিক্ষাবিস্তারের বিশেষরূপে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যখনই জানি, সেই সময় মামুন জাতি বা ধর্ম্ম বিচার না করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তি মাত্রকেই কার্য্যভার অর্পন করিতেন তখনই আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়। আজিও সভ্যজগত এ বিষয়ে শ্লাঘা করিতে পারে না। কিন্তু মামুনের পরামর্শ সভায় ইহুদি, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম্মেরই প্রতিনিধি বিদ্যমান ছিলেন। তাহার সাম্রাজ্যে শত শত ইহুদি এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মমন্দির ছিল। কি ইহুদি কি খৃষ্টান সকলেই স্বাধীন ভাবে থাকিয়া আপন আপন ধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেন।

ধর্ম্মজগতেও মামুন এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। ক্রমে মুসলমানগণ শুধু কোরাণ মানিয়া চলিতে যাইয়া ধর্ম্মবিষয়ে অনুদার হইয়া চলিতেছিল। শাস্ত্রই তাহাদের কর্ত্তা হইয়া পড়িল। মামুন উদারতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইমামের বংশধরের সহিত একমত হইয়া স্বাধীনতার এবং উদারতার বাণী ঘোষণা করিলেন। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চ্চা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এমন কি তাহার সভায় একজন ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদিবার নিমিত্ত বিদ্যমান ছিল। যখন খ্রীষ্টীয় জগত মনে করিত পৃথিবী সমতল, তখন মুসলমানগণ পৃথিবীর আকার পরিমাপ করিয়াছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ে ও বহুবিধ উন্নতি লাভ হইয়াছিল।

দর্শন এবং বিজ্ঞান আলোচনা করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে কয়েকবার পণ্ডিতগণের সভা আহূত হইত এবং খলিফা তাহাদের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

মামুনের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা মুতালিম খলিফার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি আরব এবং পারস্য দেশবাসীগণকে অবহেলা করিতেন। তুরস্কদেশবাসী কয়েকজন সৈন্য তাহার রক্ষীভাবে নিযুক্ত হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি আব্বাস বংশের উত্থানের কারণই ছিল পারস্য এবং অন্যান্য দেশবাসীর সাহায্য

এই দেশ সমূহের অধিবাসীগণ ওমাইদ শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া আব্বাসবংশীয়দের সাহায্য করে কিন্তু এক্ষণে তাহারা আবার ঘৃণিত হইতে লাগিলেন এবং দুর্ব্বল খলিফাগণ ক্রমেই তুরস্কদেশের রক্ষীগণের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। এই তুরস্ক সামন্তগণ ক্রমে একটী অমাত্যশ্রেণীর সৃষ্টি করিল এবং কিছু কাল পর্য্যন্ত মুসলমান জগতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্পেনে আব্বাস বংশীয়দের কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। মিশর এবং আফ্রিকারও তাহাদের বিশেষ আধিপত্য ছিল না। যাহা হউক এশিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি স্থান তখনও খলিফার শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু খলিফা নাম মাত্র শাসন কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। তুরস্কের নানা বংশ খলিফার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

এই সময় বিখ্যাত গজনবী বংশ স্থাপিত হয় এবং খলিফা কর্ত্তৃক স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই তুরস্ক জাতির বিখ্যাত বংশের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুলতান মামুদ বহুবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

গজনবি বংশের ভগ্নাবশেষ হইতেই সেল্‌জুকবংশের উৎপত্তি হয় এবং সেলজুকগণের প্রথম শাসনকর্ত্তার নাম তুগরেল বেগ। যখন খলিফা কাইম জনৈক তুরস্ক সামন্তের অধীনে প্রপীড়িত হইতেছিলেন, তখন তিনি তুগ্‌রেলের সাহায্য ভিক্ষা করেন। তুগ্‌রেল ক্রমে খলিফের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি হন।

এই সেলজুক বংশ ইতিহাসে একটী বিখ্যাত বংশ। তুগরেলের পর তাহার পুত্র আলপ—আরসলান সুলতান হন এবং রোমীয়গণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তাহার পুত্র মালেক্ সাহ বীরগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাহার শাসন সময় কিছু দিনের নিমিত্ত মুসলমান সভ্যতা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ নিরাপদ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ একত্র হইয়া পঞ্জিকা সংশোধন করিয়া জগতের এক মহা উপকার সাধিত করিয়াছিলেন। এটিয়ক্ প্রভৃতি স্থান রোম সম্রাটের হস্ত হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছিল। কিন্তু মালেক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক গৌরবরবি অস্তমিত হইল। এদিকে খলিফার পর খলিফা নামে মাত্র শাসন করিতে লাগিলেন।

জিহাদ এবং পতনের ইতিহাস।

এই সময় প্রসিদ্ধ জিহাদ আরম্ভ হয়। ইয়োরোপ এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও সকল দেশীয় নৃপতিগণই পোপের বশ্যতা স্বীকার করিত। যখন রোম সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত ইয়োরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল তখন পোপগণ ক্রমে রোম সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িলেন। পোপগণ প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ পোপগণের আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইতেন না।

জেরুজালেম প্রভৃতি স্থান সমূহ খ্রীষ্টানগণের নিকট পবিত্র তীর্থস্থান ছিল এবং

প্রতিবৎসর শত শত খ্রীষ্টান সুদূর ইয়োরোপ প্রান্ত হইতে ঐ সকল স্থানে আগমন করিতেন। ক্রমে স্থানীয় মুসলমানগণের সহিত বিবাদবিসম্বাদ আরম্ভ হয়। পোপগণ ঐ সকল স্থান মুসলমানগণের নিকট হইতে অধিকার করিবার নিমিত্ত ইয়োরোপীয় রাজা এবং প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করে। ফলে দলে দলে খেতকায়গণ রাজা এবং বিখ্যাত সামন্তগণের অধীনে পশ্চিম এসিয়ার ক্ষুদ্র কয়েকটী স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বহু লোক প্রাণত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

একখানি মুখের স্মৃতি

নিভৃত নিকুঞ্জে বসি' চেয়ে রই চাঁদ পানে
নেহারি' নেহারি' তারে পাই বড় সুখ,
কৌমুদীবিধৌত নিশা, কোকিলের কুহুতানে
আঁখি আগে ভেসে উঠে এক খানি মুখ।

মধুময়ী প্রকৃতির রূপ হেরি' অনিবার
ব্যাকুল হইয়া উঠে মোর শূন্য বুক,
থামাইতে হৃদয়েরে পারি না—পারি না আর
তারে যে আকুল করে একখানি মুখ।

গভীর নিশীথ কালে দূরাগত বাঁশী স্বনে
স্তব্ধ রহে হিয়া মম—বেদনায় মূক,
ব্যথাহত, উচ্ছ্বসিত কাহার বিরহ-গানে
হিয়ারে আকুল করে একখানি মুখ।

দিবসের অবসানে মৃদুল সাঁজের বায়
হেসে ফুটে উঠে ফুল, কিন্তু মোর দুঃখ
বাত্যাহত উদ্বেলিত বিশাল বারিধি-প্রায়
হিয়ারে আকুল করে একখানি মুখ।

সুনীল অম্বর ভালে ফোটে গোধূলির তারা
ঝলমল করে তার ক্ষুদ্র হিয়াটুক্
ব্যাকুল এ হিয়া নিয়ে আমি যে গো হই সারা
হিয়ারে পাগল করে একখানি মুখ।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার

যৌবন

দেবী, একি অভিনব দান !
কত যুগযুগান্তর ধরি,
কত বরষে বরষে নিমেষে নিমেষে একটি একটি করি
তুমি সুধার বিন্দু দিয়াছ ভরিয়া পূরিয়া শূন্য প্রাণ !
দেবী একি অভিনব দান !

এই পৃথিবীর থলে জলে
ওই চারিভিতে দোলে প্রাণ-হিন্দোল সে অমৃতময় সঞ্জীবনীর বলে,
ওগো সেই সুধা মোর অরুণ বক্ষ মাঝে
তুমি দিয়াছ ঢালিয়া ঝলকে ঝলকে শত জনমের দুঃখ সুখের কাজে !
ওই নয়ন জুড়ানো সজীব শ্যামলিমায়,
ওই পাতায় পাতায় কলিতে কলিতে বিকচ কুসুম গায়,
ওই পরতে পরতে প্রতি পাপড়ির প্রাণে,
ওই অমল কোমল রেণুতে রেণুতে মরম-প্লাবন-বানে,—
ওগো শুকুতে শুকুতে সেই রসধারা উথলিয়া পড়ে ঝরি
তুমি সেই রস দিলে ভরি !
দেবী, আমার তনুতে তনুতে অণুতে অণুতে বিন্দু বিন্দু করি
তুমি সেই রস দিলে ভরি
কোটী যুগযুগান্তর ভরি !

তাই আত্মা আমার উঠিছে মাতিয়া,
প্রাণময় দেহ নাচে তাতাথিয়া,
রস-ভরপুর বক্ষ মথিয়া—
উঠিছে অধীর গান !
দেবী একি অভিনব দান !

ওগো যৌবন আজি উঠেছে ছাপিয়া অঙ্গে আমার মনে,
রস বিন্দু ক্ষেপেছে সিন্ধুর সম গম্ভীর পরজনে !
আজি ভীম তরঙ্গ উঠিছে কেনারে কি বিপুল কলরোলে।
তাই মত্তরঙ্গে বক্ষ আমার দুলিছে দোদুল দোলে !

আজি রসের বিন্দু সিন্ধুর সম ক্ষেপে উঠে কলরোলে !
আজি দুকূল ভাসিয়া চল-ছল ছলে ওঠে উর্ম্মির তান !
দেবী একি অভিনব গান !

মম চল চল চল পূর্ণ এ অম্বরে
আজি আনন্দ মোর হাত লাগে উরসি সত্বরে !
ওগো যাহা কিছু আছে আজ,
ওগো যে কেহ পরেছে যৌবন-জল অল-উজ্জ্বল সাজ,
আমি সবারে পেয়েছি গো !
আমি সবারে পেয়েছি অন্তর মাঝে—সকলেরি গান
আপনি গেয়েছি গো !
আজি খরনিদাঘের তীব্র তপন-জ্বালা
হের তপ্ত করিয়া তুলেছে আমার সৃষ্টি স্বপন-মালা !
আজি আমার ভিতরে ঝরে ঝর ঝর শাওনের বারিধার,
করি কেকারব নাচে ময়ূর-ময়ূরী বিথারি পেখম ভার !
আজি আমার ভিতরে উঠেছে হাসিয়া আশ্বিন আকাশ নীল,
ফোটে কমলের কলি অমল অরুণ সরসীতে অনাবিল !
আজি আমাতে খেলিছে সবুজের খেলা মাঠ ঘাট ভরা ধান,
ওঠে কানন বুকের পত্রবীথির মৃদু মর্ম্মর তান !
আজি আমাতে শোভিছে শাখে শাখে শাখে নব পল্লব মেলা,
রাজে মধুময় কচি মঞ্জরী ঘিরে মত্ত অলির খেলা !
আজি আমাতে বাজিছে পিক-কুহু কুহু বিরহিনী-মন-ছাওয়া,
আজি আমার ভিতরে হহ হহ হহ উদাস ফাগুন হাওয়া !
আজি আমার মাঝারে জ্যোৎস্না উজারি হাসে পূর্ণিমা-চাঁদ,
ডাকে ভরা তটিনীর পূর্ণ জোয়ার, ভেঙ্গে যায় সীমা বাঁধ !
আজি আমার ভিতরে ঝরণা ঝরিছে গিরির পাষাণ কাটি,
বুকে সহসা বহ্নি-বন্যাতে গেল আগ্নেয়গিরি ফাটি !
আজি আমারে মাঝারে ক্ষীরোদ সাগর উঠিয়াছে উছলিয়া,
মম বক্ষের মাঝে মোহিনী মূর্ত্তি ফুটিয়াছে উজলিয়া !
আজি আমার ভিতরে শ্রীরাম ভেঙেছে জনকের হর-ধনু,
আজি আমার ভিতরে ষোড়শ কলায় পূরেছে সীতার তনু !
আজি আমার ছাপায়ে তরুণী উমার

ভোলানাথ ভোলা তনিমা উঠেছে ভরি !
আজি　　আমার মাঝারে যমুনা উজান—
বাঁশরী পাগল রাধা কাঁদিয়াছে, মরি !

আজি　　যৌবন ভরপুর !
আজি　　কণ্ঠে আমার ছায়ানট নাচে বাজায়ে নিত্য-সুর,
আজি　　আমার ভিতরে কস্তুরী মৃগ লভিয়াছে যৌবন,
তাই　　আপন গন্ধে উন্মাদ আমি ছুটিতেছি বন বন !
আজি　　যৌবন আমি রাখিতে পারি না কাটিয়া পড়িতে চায় !
ওগো　　কে তোরা লুটিবি এই সুধাধারা আয় আয় ওরে আয় !
আজি　　আকুলি বিকুলি প্রাণ !
আজি　　সবারে ভাসাবে বিশ্বপ্লাবন এই যৌবন বান !
আজি　　যাই যাই আমি ছুটে যাই ওগো আন্ চান্ করেপ্রাণ !
দেবী　　একি অভিনব দান !

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

লর্ড মেকলে

এইপ্রবন্ধের শিরোনামা দৃষ্টে হয়ত অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন যে আমরা লর্ড মেকলের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

লর্ড মেকলে, তাঁহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে, বিশেষ বিষয় অবলম্বনে, ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার যে সকল প্রবন্ধে ভারতবাসীর প্রতি কটাক্ষ আছে আমরা সেই সকল ও তদানুসঙ্গিক কতিপয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

লর্ড মেকলে ইংরাজী সাহিত্যে যে একজন প্রথিতনামা ও শক্তিশালী লেখক ছিলেন, তাহা বোধ হয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি শক্তিশালী লেখক হইলেও পার্থিব লোক চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই ছিল বলিয়া আমাদিগের অনুমান হয়; এবং এইরূপ অনুমান হওয়ার অনুকূলে তাঁহার স্বীয় লেখাতেই যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ তাহার লিপি-কলা অতীব মনোহারিণী হইলেও একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাতে যে বহুস্থানে আদৌ সামঞ্জস্য নাই তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

তিনি তাঁহার ওজস্বিনী লেখায় ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী কি হিন্দু কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই লোকদিগের নৈতিক জীবন যে অতি হীন, এবং তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকদিগের নৈতিক জীবন যে অতি মহৎ, এইরূপ প্রমাণ করিতে যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। মাত্র তাহাই নহে, স্থল বিশেষে স্বজাতীয় নৈতিক মহত্ব বর্ণন করিতে গিয়া আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

স্বজাতির সুনাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বা যত্ন প্রশংসনীয় হইলেও তিনি যে ভাবে তাঁহার স্বদেশীয় জনসাধারণের নৈতিক মহত্ব সগর্ব্বে ও সুবর্ণ বর্ণে স্বকীয় সুমার্জ্জিত ভাষা ও লেখনী-তুলিকা দ্বারা চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, অসামঞ্জস্য দোষ দুষ্ট বিধায় তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে এবং তাঁহার সেই আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সর্ব্বথা নিষ্ফল হইয়াছে। সেই বিমোহন চিত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া, বরং তিনি সমগ্র ইংরাজজাতির নৈতিকচরিত্রে ঘোরকালিমা লেপন করিয়াছেন।

তাঁহার জ্ঞান ছিল না যে এই বিপুল ভূমণ্ডলের যাবতীয় সুসভ্য মানব সমাজে যে সমস্ত নর-নারীর আবির্ভাব হয়, তাহাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রের সমষ্টিতে জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতি বা সমাজস্থিত লোকদিগের মধ্যে দুইটি ভাব পরিলক্ষিত হয়। উহার একটিকে দেবভাব ও অপরটিকে পিশাচভাব নামে আমরা অভিহিত করিতে পারি। মনুষ্য মাত্রেই রজস্তমঃ গুণের অধীন। যিনি এই রজস্তমঃকে নিজের বশে আনিতে পারেন তিনিই দেব ভাবাপন্ন হয়েন। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা সংসারে অতি বিরল। সুতরাং ব্যক্তিগত মানব চরিত্রে সদসৎ অর্থাৎ দেবভাব ও পিশাচভাব ন্যূনাধিক রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা ভারতবাসী বা বঙ্গবাসী সুতরাং ইহারা সকলেই পিশাচভাবাপন্ন, আর ইহারা ইংলণ্ড-বাসী সুতরাং ইহারা সকলেই দেবভাবাপন্ন, অথবা বাঙ্গালী মাত্রেই অধিক অসৎ আর ইংরাজ মাত্রেই অধিক সৎ এরূপ বিবেচনা করা নিতান্তই অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। লর্ড মেকলের ব্যক্তিগত চরিত্রে আমরা এইরূপ অর্ব্বাচীনতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারি।

এইরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে ভারতীয় বড়লাটের সভায় যৎকালে লর্ড মেকলে বিধান প্রণেতা সদস্যরূপে কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে কলিকাতাস্থ জনৈক রজক তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান পরিচ্ছদ ধৌত করিতে লইয়া আত্মসাৎ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহার বাঙ্গালী পরিচারকগণ উক্ত রজককে ধরিবার পক্ষে সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করে নাই। এই কারণে তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাহারই অবান্তর ফলে তিনি সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অতি হীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল বাঙ্গালীকে তিনি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, জালিয়াৎ প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া আত্ম-তৃপ্তি সংসাধন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে যেমন দেব লোকও আছে আবার পিশাচ চরিত্রের লোকও আছে। সেইরূপ বাঙ্গালীর মধ্যেও দেব ও পিশাচ চরিত্রের লোক আছে। বিদ্বান,

মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সাধু, অসাধু, সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী, চোর, ডাকাত, জালিয়াৎ প্রভৃতি ভাবের লোক পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের সকল সভ্য সমাজেই আছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা কোন সমাজেই নাই। তিনি সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ হইলে প্রাগুক্ত অকিঞ্চিৎকর উক্তি কখনই করিতেন না।

তিনি অনবধানতা বশতঃ ইংরাজ জাতি বা সমাজকে যেরূপ উৎকোচগ্রাহী স্বার্থপর এবং ঐ জাতির বা সমাজের ব্যক্তি বিশেষকে যেরূপ জালিয়াৎ ও লুণ্ঠনকারী দস্যুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা সাধারণভাবে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, সেরূপ চরিত্রের লোক সকল সভ্য জাতি ও সভ্য সমাজের মধ্যেই আছে। আবার দেব চরিত্রের লোকও কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী সকল সমাজেই আছে। এ জন্য পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে কোন এক সভ্য জাতিকেই আমরা এক কালে নীতিবিহীন বা এক কালে নীতিপূর্ণ স্বীকার করিতে পারি না। আমরা বলিতে চাহি যে সকল সমাজেই ভাল ও মন্দ লোক আছে।

স্থলবিশেষে লর্ড মেকলে মহোদয়ের উক্তি ও যুক্তি দেখিয়া আমরা তাহা খণ্ডন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি লর্ড ক্লাইব ও হেষ্টিংসের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন যে এদেশীয় নৈতিক চরিত্রহীন লোকদিগের সংসর্গে পড়িয়াই তাঁহাদিগের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল। ভাল, তর্কের অনুরোধে আমরা স্বীকার করিলাম তাহাই যেন হইল, কিন্তু ইংরাজী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মন্ত্রী ও সদস্যগণ তৎকালে কেহ কখনও ত এদেশে আসেন নাই; তাঁহারাই বা উৎকোচদাতা ও উৎকোচ গৃহীতা হইলেন কেন? এইরূপ ব্যবহার কি নৈতিক হীনতার পরিচায়ক নহে? তৎকালে উক্ত মহাসভার সংসৃষ্ট লোকদিগের মধ্যে উৎকোচ আদান ও প্রদানের অত্যধিক বাহুল্য তিনিই ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা বলি উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান সকলের পক্ষেই তুল্য নৈতিক হীনতার পরিচায়ক। আমরা অবশ্য একথা স্বীকার করি যে সংসর্গ দোষে লোকের চরিত্রে দোষ স্পর্শিয়া থাকে। কিন্তু কিরূপ লোকের চরিত্র ঐরূপ সংসর্গ দোষে দূষিত হয় তাহাই এখন বিবেচ্য। যাহাদিগের চরিত্র অতিশয় দুর্ব্বল, যাহারা সুযোগ অভাবে কেবল আপনাদিগের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু সুযোগ পাইলে লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, তাহাদেরই চরিত্র সংসর্গ দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। নচেৎ প্রকৃত নৈতিক চরিত্রবান লোকের চরিত্রে কখনই কুসংসর্গের দোষ স্পর্শিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই সামান্য নৈতিক অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল না। যে ভারতবাসী বা বঙ্গবাসীর নৈতিক চরিত্র তিনি অতি হীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই জাতির প্রাচীন নৈতিক উপদেষ্টা বলিয়াছেন :—

"প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতির্যায়তে নোত্তমানাং।" অর্থাৎ প্রাণান্তেও প্রকৃতসৎলোকদিগের প্রকৃতির বিকৃতি হয় না। সুতরাং কোন জাতীয় বা ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষতা সেই স্থলে পরীক্ষা হয়, যে স্থলে অন্যায় লাভের সুযোগ পাইয়াও প্রকৃত নৈতিক

উৎকর্ষতা হেতু কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষ কিছুতেই প্রলোভনের বশীভূত না হইয়া অন্যায় অর্জ্জনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে; নচেৎ "অশক্তস্তকরঃ সাধু" হইয়া নৈতিক চরিত্র-মহত্বের 'বড়াই' করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের প্রাথমিক কালে সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পে হইতে অধস্তন সমুদয় ইংরাজ জাতীয় লোকদিগকে অর্থলিপ্সু ও অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বজাতীয় সমাজে ব্যঙ্গোক্তিস্থলে "নবাব" উপাধি লাভ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির নৈতিক মহত্ব আর রহিল কোথায়? তাঁহার এই বর্ণনায় বোধ হয় যেন ইংরাজ জাতি অর্থোপার্জ্জনের জন্য সকল দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই এরূপ বিবেচনা করিতে পারে না।

মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের তৎকালিন একজন প্রধান রাজ কর্ম্মচারী মোহাম্মদ রেজা খাঁর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডে সম্ভবতঃ খাঁসাহেব একজন ধন-লোলুপ, উৎকোচ-কলুষিত রাজনৈতিক বিবেচিত হইতে পারেন কিন্তু ইংরাজ জাতি অপেক্ষা ভারতবাসীর হীনতর নীতি মানে তিনি বঙ্গদেশে একজন সাধু ও মাননীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আর মহারাজা নন্দকুমারকে উপলক্ষ করিয়া তিনি সগর্ব্বে একথাও বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী চরিত্রের নৈতিক হীনতা সেই সকল ইংরেজে আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে না, যাহার মন ইংলণ্ড দ্বীপের মানব প্রকৃতি পরিজ্ঞাত আছে। ইহাতে প্রকারান্তরে প্রমাণ করা হইতেছে যে ইঙ্গ দ্বীপের সমস্ত মানবগণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষাও অধিকতর নৈতিক চরিত্রবান্। বাঙ্গালী জাতির ন্যায় তাহারা নৈতিক চরিত্রহীন নহে। সুতরাং সচক্ষে বাঙ্গালী চরিত্র না দেখিলে মাত্র তাহার বর্ণনা পাঠে তাহারা বাঙ্গালী চরিত্রের নৈতিকহীনতা কখনই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না।

ভারতবাসী ব্যবহারশাস্ত্র উপজীবি মাত্রেই ইংলণ্ডের দণ্ডবিধিশাস্ত্রের কাঠিন্য সম্যক অবগত আছেন, কারণ তাহারই অনুকরণে লর্ড মেকলে সাহেবই ভারতীয় বর্ত্তমান দণ্ডবিধি শাস্ত্রের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত লোকই যদি এতাদৃশ সাধু ও নৈতিক চরিত্রবান্ ব্যক্তি হয়েন তাহা হইলে ওদেশে তাদৃশ সুকঠোর দণ্ডবিধি শাস্ত্রের অবতারণা কি জন্য হইয়াছিল তাহা তিনিই বলিতে পারেন। বোধহয় উহার ধারা সকল তদ্দেশীয় বিচারালয়ে কোন ব্যবহারে আসে না। সুতরাং মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

লর্ড মেকলের প্রাগুক্ত বর্ণনানুসারে বুঝা যাইতেছে যে ইংরাজ জাতির মধ্যে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, জালিয়াৎ, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা হীন চরিত্রের লোক আদৌ নাই। তাহারা সকলেই সাধুপুরুষ। উল্লিখিত ভাবে যিনি স্বজাতির নৈতিক মহত্ব জাহির করেন, তিনি লর্ড মেকলেই হউন আর ডিক্টর হিউগেই হউন তাঁহাকে উন্মাদ, আত্মম্ভরী ও অর্ব্বাচীন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লর্ড মেকলে একজন শক্তিশালী লেখক হইলেও তাহার লেখায় বহুস্থানে সামঞ্জস্য নাই। যে ইংরাজ

জাতিকে তিনি সাধুতার আদর্শ বলিয়া প্রকারান্তরে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাদিগের মধ্যে নাকি এমন একজনও লোক নাই যাহার চরিত্র দেখিয়া প্রবঞ্চক, জালিয়াৎ, বাঙ্গালী চরিত্রের উপলব্ধি তাহার দেশীয় লোকেরা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই সাধু ইংরাজ জাতির একজন প্রধান পুরুষ ভারতে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইবকে তিনিই স্বীয় লেখায় জালিয়াত প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারই স্বদেশী অপর একজন মহাপুরুষ, গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে মনি বেগম চৈতসিংহ, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতি নিঃসহায় নর ও নিঃসহায় নারীদিগের লুণ্ঠনকারী বলিয়া তিনিই উল্লেখ করিয়াছেন। মাত্র তাহাই নহে, তিনি তাহার আর্ল অব চাথাম প্রবন্ধে ইংরাজ জাতির গৌরবের বস্তু পার্লিয়ামেণ্ট নামক জাতীয় মহতী রাজসভার উভয় বিভাগের সদস্য ও মন্ত্রিগণকে যেরূপ হীন চরিত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সুস্পষ্টই অনুমতি হয় যে সমগ্র ইংরাজ জাতির আদর্শ বা মুখপত্র প্রতিনিধিগণের নৈতিক চরিত্র তাঁহার বর্ণিত বাঙ্গালী চরিত্র অপেক্ষা বহুগুণে হীন, কুৎসিত ও ঘৃণার্হ। তাঁহারই বর্ণনায় উপলব্ধি হয় যে উৎকোচ প্রদান ও উৎকোচ গ্রহণ যেন ইংরাজদিগের জাতীয় স্বভাব, পক্ষান্তরে প্রথম জর্জ্জের বিধবা মহারাণীর সহিত লর্ড বুটের অবৈধ সংস্রবের উল্লেখ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ইংরাজ জাতির কি পুরুষ সমাজ, বা নারী সমাজ উভয়কেই অতি ঘৃণিত ভাবে জন সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। আবার তাঁহার লিখিত লর্ড হেষ্টিংস প্রবন্ধেও ইংরাজ চরিত্রের উপরে কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

মানবচরিত্র সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই ইংরাজ জাতির নৈতিকচরিত্র অতি উৎকৃষ্ট এবং বাঙ্গালী জাতির নৈতিক চরিত্র অতি নিকৃষ্ট ইত্যাকার অর্ব্বাচীন উক্তি করিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ছিল না যে পৃথিবীর সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ব সমাজের মধ্যেই ভাল ও মন্দ উভয়বিধ লোকই আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল সমাজেই সদসৎ উভয় শ্রেণীর লোক আছে। সুতরাং আমাদিগের বিশ্বাস যে তৎকালে যে সমস্ত লোক ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই ইংরাজ সমাজের-জঞ্জাল ও চরিত্রহীন লোক ছিল। সুতরাং তখন এদেশে ইংরেজ দেব চরিত্রের আবির্ভাব প্রায় হয় নাই। আর উহা আবির্ভাব হইলেও সেরূপ লোকের সংখ্যা এতই সামান্য ছিল যে তৎকালিক অর্থলিপ্সু ইংরেজ পিশাচগণ এ দেশীয় পিশাচগণের যোগে মহানুভব ইংরাজ দেবগণের শক্তিকে পরাভূত করিয়া ভারতভূমে আপনাদিগের পৈশাচিক শক্তির সম্যক প্রভাব প্রচার করিয়াছিল; মহাত্মা বার্কের বর্ণিত "ইম্পিচমেণ্ট অব ওয়ারেন হেষ্টিংস" পুস্তকে সেই পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ এইরূপ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে যে তাহা পাঠ করিলে এখনও আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার বক্তৃতা কালে শ্রীমতী শেরিডেন নাম্নী জনৈক ভদ্রমহিলা সেই পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। তৎকালে যে সমস্ত ইংরাজ

ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্ব্ব প্রধান লোক ছিলেন। তাঁহারা এদেশে অবস্থান কালে যে সমস্ত নীতি বিগর্হিত কুকর্ম্ম ও পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইয়া দেবোপম বহু ইংরাজ মহাত্মার অন্তর কাঁদিয়াছিল। তাই তাহারা উক্ত মহা পুরুষের চরিত্রকেই নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মের বিভীষিকাময়ী মানসিকী অশান্তির তাড়নায় ক্লাইব আত্মহত্যা পূর্ব্বক নিরন্তর যাতনার অবিরাম বিষময় দংশনের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং হেষ্টিংস একান্ত ঈপ্সিত রাজসম্মানে বঞ্চিত সর্ব্বস্বান্ত ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অপরের ভিক্ষাস্পদ হইয়া অবশিষ্ট জীবন অসহ্য মানসিক ক্লেশে যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। এই ঘটনায় আমরা ইংরাজ চরিত্রের দেব ভাবও দেখিতেছি। এই কারণেই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে সকল সমাজেই ভাল মন্দ লোক আছে। আমাদের সমাজের লোক সব ভাল, আর তোমাদের সমাজের লোক সব মন্দ, একথা বলিয়া মানব সমাজে কাহারও স্পর্দ্ধা করিবার সাধ্য নাই; যে করে, সে মানবচরিত্র অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লর্ড মেকলের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনুমান হয় যে তিনি একজন বিশ্বনিন্দুক লোক ছিলেন। কি স্বদেশ, কি বিদেশ তিনি প্রায় সকল লোকেরই নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপ নিন্দাবাদের ফলে যে স্বজাতীয় লোকদিগের নৈতিক চরিত্রে ঘোর কলঙ্ক পড়িতেছে তাহা তাঁহাদের বুদ্ধিতে আসে নাই। যিনি স্বজাতীয় প্রধান পুরুষগণকে অর্থাৎ জাতীয় মহাসভার মন্ত্রী ও সদস্যগণকে উৎকোচপ্রিয় নৈতিক চরিত্রহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে স্বজাতীয় নৈতিক মহত্বের "বড়াই" করা নিতান্ত হাস্যকর হইয়াছে। এই কারণেই আমরা বলিতেছি যে তাঁহার লেখায় সামঞ্জস্য নাই। তাঁহার লেখায় আমরা কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য ও উপমার আধিক্য ভিন্ন আর কোনরূপ সার বস্তু দেখিতে পাই না।

৺চারুচন্দ্র মিত্র

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

হায়, ছন্দের রাজ সত্যেন আজ নির্ব্বাক-নিশ্চল !
তার কণ্ঠের বীণ্ ঝঙ্কার-হীন—টঙ্কার নিষ্ফল !
আজ সঙ্গীত-শেষ বাংলার দেশ, হর্ষের নাই লেশ,
নাই হীন্ হীন্ মা'র কণ্ঠের হার—পাণ্ডুর তার বেশ !

আজ অম্বর-তল্ উচ্ছল্-জল ছল্-ছল্-চঞ্চল
ঝরে ঝুর্-ঝুর্-ঝুর অশ্রুর সুর, ভরপুর্ অঞ্চল,
করে বর্ষার বায় 'হায় হায় হায়,' ধায় কোন্ বন-বন
একি উন্মাদ-রোল—হিন্দোল-দোল—মৃত্যুর ক্রন্দন !

আজ কুঞ্জের গীত নিস্পন্দিত, গম্ভীর বন-পথ
নাই উৎসব-রব, নিঃশেষ সব সৌরভ-সরবং !
আজ ফুল-ফুল হায় ঢুল্ঢুল্-কায়, বুল্বুল্-হীন বাগ,—
তার বক্ষের 'পর জর্-জর্ শর—নির্ম্মম-নীল দাগ !

আজ বিশ্বের বীণ গম্গিন্-ক্ষীণ, ক্রন্দন-ভরপুর,
হায় স্থল-জল নীল, বন-মঞ্জিল, সবঠাঁই একসুর !
ছিল সত্যের মাঝ কার কোন্ কাজ, কার কোন্ বন্ধন ?—
যায় বিচ্ছেদ দুঃখ তড়্পায় বুক ?—অস্থির-ক্রন্দন ?

একি বিস্ময় ! জয় সত্যের জয়—অব্যয়-অক্ষয় !
পেনু মৃত্যুর মাঝ সন্ধান আজ 'সতের' সত্য'র,—
সে যে বিশ্বের-সুত, নির্ম্মল-পূত—স্বর্গের সন্দেশ,
সে যে নন্দন-বন-ফুল-চন্দন মর্ত্তের বন্-দেশ !

সে যে রূপ-রস-রাগ সব্জীর দাগ, ফুলবন-নিশ্বাস,
সে যে সৃষ্টির সার—অন্তর তার সন্ধার নির্য্যাস,
তাই উল্লাসহীন এই দুর্দ্দিন বর্ষার সন্ধ্যায়
তার মৃত্যুর ভার অন্তর-তার সন্ধার স্পন্দায় !

ওরে সত্যের প্রাণ, সত্যের গান, বিশ্বের সম্পদ,
এই বঙ্গের বাস নয় তার বাস—নয় তার কর্ম-পদ।

সারা বিশ্বের 'পর সব তা'র-ঘর, কেউ নয় পর-পর—
এই নির্ঝর-নীর, গঙ্গার-তীর, পত্রের মর্-মর্!

ওরে সত্যের প্রাণ, সত্যের গান, মৃত্যুর নয় বশ
কভু সত্যের ক্ষয় সম্ভব নয়, অব্যয় তার যশ,
ওরে দুর্ব্বল দল, অশ্রুর জল মোছ মোছ্ সত্বর
দেখ্ সৃষ্টির মাঝ মিশ্রিত্ আজ অন্তর সত্য'র!

আছে সত্যের প্রাণ স্পন্দনমান ছন্দের নাচ্নায়
আছে অম্বর-গায়, হিল্লোল-বায়, চন্দ্রের জোছনায়,
আছে 'পাখির গান,' দেশ-কল্যাণ ' ঘর্ঘর-চক্রকায় '
আছে ' সূত্রের ' সাথ, ' নওরোজ ' রাত, মর্ম্মর-ঝরকায়!

আজ নাই নাই শেষ, নাই বিচ্ছেদ, নাই শোক একতিল
তা'র সুর-খোলবায় মন-বন ছায়, মশ্গুল যেপ্ দিল!
সে যে আপ্নিই আজ সুর-খাম্বাজ, বিশ্বের বীণ্-লীন
তার হস্তের বীণ্ র'য় রো'ক ধীন—গানহীন গম্গিন্!

আজ অজ্ঞাত এই সাগ্রেদ—সেই অশ্রুর কুল-হার
শুধু দুঃখের দান—বেদনার গান—বুল্বুল্-বুল্বুল্ বাংলার!

গোলাম মোস্তাফা

দুঃখ ও সুখ

মেঘেতে মেঘেতে লাগে
সহিত অশনি, বেদনার ধ্বনি
হৃদয়ের মাঝে জাগে।
চপলা যেদিন হাসে
ফিরে চেয়ে দেখি, ভোজবাজি একি
মিলায় হৃদয়াকাশে।

এ, লোহানী

খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

বৃথা তর্কে কখনও শ্রেয়োলাভ হয় না।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

তর্কের ফল—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা ও কলহ। এইজন্যই জ্ঞানিগণ আদেশ করিয়াছেন—চরম তত্ত্বের বিচার স্থলে তর্কের প্রয়োগ করিবে না। শাস্ত্র বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, শাস্ত্রবাক্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে, যুক্তি দ্বারা মনন করিতে হইবে এবং একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে, সত্য নির্ণয়ের ইহাই প্রকৃত পন্থা। (পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মও এ সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রচারকগণকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে আদেশ করিয়াছেন :—

"ওদ্‌য়ো এলাছবীলে রব্বেকা বিল্‌হেকমতে ওয়াল্ মওআজতেল্ হাছনতে ওয়া জাদেল হুম্ বেল্লতিহিয়া আহ্‌ছনো।"

সুরা নহল—১৬রুকু।

"মনুষ্যদিগকে সুযুক্তিসহকারে সুমিষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে আহ্বান করিবে, তাহাদের সহিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সদ্ভাবে (ধর্ম্মসম্বন্ধে) আলোচনা করিবে।")

এখন এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া শাস্ত্র গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরে ভক্তি, সর্ব্বজীবে প্রীতি, ইন্দ্রিয় সংযম, ও নিষ্কলঙ্কভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানই সকল ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। শাস্ত্রাদি গ্রন্থে আর যাহা কিছু আছে তাহা ইহারই সম্প্রসারণ মাত্র। কায়মনোবাক্যে এই চারিটি বিধি যথাযথ প্রতিপালন করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। কি এস্‌লাম ধর্ম্ম, কি হিন্দু ধর্ম্ম, কি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিত্তি এই চারিটি বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি হিন্দু ধর্ম্ম ও এস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যত্র* কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উপরি উক্ত চারিটি বিধি সম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ এই :—

১ম বিধি—ঈশ্বরে ভক্তি

"Thou shalt love Thy Lord Thy God with all Thy heart, and with all Thy soul, and with all Thy mind, and with all Thy strength. This is the first commandment."

St. Mark. XII.

"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তিদ্বারা প্রভু পরমেশ্বরকে ভাল বাসিবে ইহাই প্রথম আদেশ।"

"Thou shalt worship Thy Lord Thy God and Him only shalt Thou serve."

St. Matthew IV.

"একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিবে এবং তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিবে।"

* মৎপ্রণীত 'বোধক' নামক গ্রন্থের "ধর্ম্ম সমন্বয়" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২য় বিধি—সর্ব্বজীবে প্রীতি

"Blessed are the merciful, for They shall obtain mercy."

St. Matthew. V.

"দয়াশীল ব্যক্তিগণই ধন্য কেন না, তাঁহারা (ঈশ্বরের) দয়া পাইবে।"

"Love your enemies, do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you."

St. Luke VI.

"শত্রুকেও ভালবাসিবে, যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে তাহাদেরও উপকার করিবে। যাহারা তোমাদিগকে অভিসম্পাৎ করে তাহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করিবে, যাহারা তোমাদের প্রতি দ্বেষ ও ঘোষারূপ করিয়া থাকে তাহাদের জন্যও প্রার্থনা করিবে।"

৩য় বিধি—ইন্দ্রিয় সংযম

"You have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart."

St. Matthew V.

"তোমরা শুনিয়াছ, প্রাচীনেরা আদেশ করিয়াছেন "ব্যভিচার করিও না।" আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করে।"

"If thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee : for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell."

St. Matthew V

"যদি তোমার দক্ষিণচক্ষু তোমার (সংযমের পথে) বিঘ্ন জন্মায়, তাহা হইলে উহা উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর, তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া ভাল।"

"Take heed and beware of covetousness."

St. Luke XII

"সাবধান, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাকে রক্ষা করিও।"

"Blessed are the pure in heart, for they shall see God."

St. Matthew V

"পবিত্র যাহাদের অন্তঃকরণ তাহারা ধন্য, কেননা তাহারাই ঈশ্বরের দর্শনলাভ করিবে।"

৪র্থ বিধি—নিষ্কাম কর্ম্ম

"Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them : otherwise ye have no reward of your father which is in heaven. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth :"

St. Matthew VI.

"সাবধান, লোককে দেখাইবার নিমিত্ত দানাদি কার্য্য করিও না, করিলে স্বর্গস্থ পিতার নিকট পুরস্কৃত হইবে না। যখন তুমি দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তোমার বামহস্তকে তাহা জানিতে দিও না।"

"But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again—"

St. Luke VI.

"কিন্তু তোমরা প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া তোমাদের শত্রুগণকে ভালবাসিও, তাহাদের মঙ্গল করিও এবং ঋণদান করিও।"

"So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do." St. Luke XVII.

"সেই প্রকারে ঈশ্বরের আদেশ সমূহ প্রতিপালন করিয়া তোমরাও বলিও—আমরা তোমার অনুপযুক্ত ভৃত্য, যাহা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল আমাদের সাধ্যানুসারে তাহাই সম্পাদন করিয়াছি।"

"But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind: And thou shalt be blessed, for they can not recompense thee "

St. Luke XIV.

"উৎসবাদির সময় দরিদ্র, পঙ্গু, খঞ্জ ও অন্ধদিগের নিমন্ত্রণ করিও, তাহাতে ধন্য হইবে, কেন না, তোমাকে প্রতিদান করিতে তাহাদের কিছুই নাই।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র

সাহিত্য

সাহিত্যের গূঢ়ার্থ কি তা' জানিনে, তবে এই জানি—সাহিত্য আমার সাথী, বন্ধু, পরম আত্মীয়।

সাহিত্য জাতির দুর্দ্দশা ঘুচায় কি না, জাতিকে সত্যপথে পরিচালিত করে কি না,—এ আমি বিশেষ আলোচনা করতে চাই নে, করার দরকারও নেই—সাহিত্যের পুণ্য-স্পর্শে আমি নবীন চেতনা পাই কি না, সত্যের সৈনিক হতে পারি কি না, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পারি কি না,—এর দিকে আমি লক্ষ্য করি; কারণ, আমি একটা ছোট-খাট জাতি, কোটি 'আমি' নিয়েই ত বিরাট জাতি গঠিত হয়েছে।

সংসারের ধূলি-মলিন পথে যখন আমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে চলে যেতে চাই, তখন কে আমাকে জীবনের সন্ধান বলিয়ে দেয়? অবসাদ ঘূর্ণি-বায়ু যখন আমার জীবন-তরীকে অকালে ডুবিয়ে দিতে চায়, তখন কে এসে হাল ধরে আমাকে বাঁচায়? সে আর

কেউ নয়—সে যে সাহিত্য। সাহিত্য যার সাথী, সাহিত্যে যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে, তার জীবনে কোন অবসাদ নেই, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—সে নির্ঝর-উচ্ছ্বসিত অমৃতের স্নিগ্ধ ধারা পানে নবীন জীবন লাভ করে। সাহিত্যের অমৃত-স্পর্শে রত্নাকর দস্যু মহর্ষি বাল্মিকী হন, এ যখন মনে হয়, তখন মনটা কেমন করে নেচে উঠে।

জগতের কর্ম্ম-চঞ্চল মানব-সমাজের সঙ্গে মিশবার সুযোগ না থাকলেও মৃত ও জীবিত ভাবুকমণ্ডলীর চিন্তা ও গবেষণার ভেতর দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ আছে—তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার তৃপ্তি লাভে আমি বঞ্চিত নই।

অনুকরণ জিনিসটা খারাপ নয়—যতক্ষণ মানুষ কর্ম্মের নিয়মটাকে অনুকরণ করে, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অনুকরণ করে। সাহিত্য যে এত বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাও অনেক অনুকরণের ফল। তাঁকে হাজার ধন্যবাদ যিনি নিজের চেষ্টায় সর্ব্ব প্রথম বই লিখেছিলেন, যাঁকে অনুকরণ করে মানুষ সাহিত্যকে এত বিপুল করতে সমর্থ হয়েছেন।

তুমি কাউকে ভালবাস—তার নিকট চিঠি লিখতে কি তোমার ক্লান্তি বোধ হয়? কিম্বা ভাষার কোন অভাব বোধ কর? সাহিত্যিকও হয়ত মহামানবতাকে ভাল বেসেছেন—তিনি সত্য ও প্রেমের ভেতর দিয়ে মানুষকে পূর্ণ করতে চান, অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বুকে অসীম বল দিয়ে দাঁড় করাতে চান—তাই তিনি বই লিখেন। বইগুলি বড় বড় চিঠি ব্যতীত আর কিছু নয়।

বোবার দুঃখ কেউ উপলব্ধি করেছ? তার ভেতরে ভাল-মানুষের মত ভাব আছে, চিন্তা আছে, সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, মানুষের নিকট হৃদয়টা খুল্‌বার একটা প্রবল বাসনা আছে—কিন্তু মুখের জড়তার দরুণ তা' সে করতে পারে না। বোবার হাত-পায়ের নাচনা ও মুখের ভঙ্গী দেখে নিষ্ঠুরের মত কেউ হেস না। তার দুঃখে সহানুভূতি দেখাও। যাদের প্রাণে ভাষা আছে, ভাব আছে, সাহিত্যের দর্পণে নিজের মনের ছবিটা প্রতিফলিত করবার তীব্র আকাঙ্খা আছে, অথচ, পারে না, তাদের পাগলামি দেখে হেস না। যদি নিষ্ঠুরের মত হাস, তবে জেন ও-কোমল বুকে বড় ব্যথা বাজবে—এতে তোমারও মঙ্গল হইবে না। যারা বোবার মত নিজের হৃদয়টা খুলে কিছু বল্‌তে পারে না,—তারা কত সহানুভূতি পাবার যোগ্য। আর যারা বলবার মত শক্তি রাখে, অথচ নিজকে নিজে ইচ্ছা করে মূক করে রেখেছে—সাধ করে বোবা হয়ে আছে, তারা কত হতভাগা।

জাতিকে বিরাট ভাবে চিন্তা করবার শক্তি আমার নেই। তাই আমি একটা মানুষকে মাত্র চিন্তা করি—যে হবে সত্যের সৈনিক, প্রেমের অমিয়ধারা, দুঃখী-আর্ত্তের পরম বন্ধু, অত্যাচারীর পাশব শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। যুগে-যুগে যাঁরা পাশব শক্তি চূর্ণ করে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেমের বন্যা বহায়েছেন, তাঁরা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান করেছেন। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব;

প্রেমিক রুসো সাহিত্যের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জেলে দিয়েছিলেন। ঋষি-প্রকৃতি টলষ্টয় ন্যায়ের ও প্রেমের রাজ্য-সংস্থাপনের জন্য মহামানবতাকে আহ্বান করেছেন। শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য মেজেনি সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যদিও প্রেরিত-পুরুষগণ কোন বই লিখে যান নি, তবু তাঁদের মুখের অমৃত বাণীগুলিই বই হয়ে গেছে। হজরত মহম্মদ (দঃ)কে প্রথম দিনেই জেব্রিল বলেছিলেন,—"পড়, পড়, তাঁর নামে পড় যিনি কালী-কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন।" এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কালী-কলমের ব্যবহার হউক ইহাই খোদার প্রথম ইচ্ছা। হজরতও বলেছেন—"লেখকের দোয়াতের কালী, শহীদের পবিত্র রক্ত থেকে পবিত্রতর।" "খোদার আরশের নীচে এক জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে, কবি তার কুঞ্চিকা।" "দর্শন বিশ্বাসীর মুখ-ভ্রষ্ট উষ্ট্র, যেখানে পাও, সেখান থেকে এনে ইহাকে নিজ ঘরে বাঁধ।"

মানুষের স্বাধীন চিন্তা বেড়ে যায় সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। মানুষ যখন নিজের বিশ্বাসটা—তা' সত্যই হ'ক, আর মিথ্যাই হ'ক, —সমাজের নিকট ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করবে না, তখন সেই মানুষটা উন্নত হবে। মানুষকে দুটা বিবেকের আদেশ মানতে হয়, একটা নিজের, আর একটা মানবতার। নিজের বিবেকের আদেশটা দোষমুক্ত বলে আমার মনে হয় না—অথবা, কোন্‌টা আমাদের বিবেকের আদেশ তা' সব সময় ঠিক করা যায় না। যেখানে মানুষের বিবেকের ও মানবতার বিবেকের কথা এক, সেখানে সত্য আছে। মানুষ নির্ভীক ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করে যখন মানবতার বিবেকের অনুমোদন পায়, তখনই মানুষ সত্যকে বুঝিতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে। আর মানবতার অনুমোদন না পেলে, মানুষ বুঝে যে তার বিবেকের বাণীটা সে ঠিক-ঠিক ধরে উঠতে পারে নি তাই সে নিজকে সংশোধন করে নেয়। এমনি করে মানুষ বড় হয়, মানুষ বড় হলে জাতি বড় হল না হল এর সংবাদ নিতে হয় না।

পরের মঙ্গল হ'ক বা না হ'ক, সাহিত্য-চর্চ্চা করলে নিজের মঙ্গল হয়। মানুষ যা' বলে তা' নিজেই পালন করতে পারে না। কিন্তু মহা মানুষের জীবনী, জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস আলোচনা করলে, পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তি বাড়ে। মানুষের মনে সদাই একটা না একটা চিন্তা থাকে,—সে চিন্তা যদি ভাল হয়, তবে তার নৈতিক উন্নতি হয়;—সে চিন্তা যদি খারাপ হয়, তবে নৈতিক অধঃপতন হয়। সাহিত্য সুচিন্তার সমষ্টি। সাহিত্য-চর্চ্চা তাই মানুষের হৃদয়কে পবিত্র, কুসংস্কার-মুক্ত, নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লুটার্ক (Plutarch) বলেছেন— "প্রথমে পরের জন্য কলম ধরি; কিন্তু অনতিবিলম্বেই নিজের লেখা নিজের জীবন-গঠনে ব্যবহার করে নিজকে এমন ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, যে কোন খারাপ সহবাসে পড়তাম না কেন, তাতে আমার চরিত্রে আঁচর লাগত না। বই পড়েছি, লিখেছি—এতেই আমার চরিত্র পবিত্র ও উজ্জ্বল হয়েছে।

প্রত্যেকটা মানুষ যদি এমনি করে পবিত্র হত, তবে সংসার যে উদার মুক্ত পবিত্র উজ্জ্বল উন্নত হত, তা' বলা বাহুল্য।

আহেদুল হোসায়েন*

ওয়ারেসী সম্পত্তি

আমাদের এই বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক মুসলমান। অথচ ১২শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক জনও মুসলমান ছিল না। তখন বাঙ্গলায় হিন্দু বৌদ্ধ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল। এদেশে যে সকল বৌদ্ধের বাস ছিল এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও আছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই দেশেরই অধিবাসী, তাঁহারা চীন ব্রহ্মদেশ বা তিব্বত হইতে আসিয়া বাস করেন নাই। তাঁহারা বিদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই।

কিন্তু বঙ্গের মুসলমানদের সম্বন্ধে বোধ হয় ঠিক একথা বলা চলে না। যে দিগ্বিজয়ী মুসলমান বাহিনী ধর্ম্ম প্রচার বা রাজ্যজয় করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধু নদীর পশ্চিম পার হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতবাসীর দৃষ্টিতে শুধু বিধর্ম্মী ছিলেন না, বিদেশীও ছিলেন। কিন্তু সেই বিদেশী মুসলমান পুরুষানুক্রমে ভারতে বাস করাতে আর বিদেশী রহিলেন না, তাঁহারাও ভারতবাসী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষকেই তাঁহাদের জন্মভূমি বলিয়া জানিলেন এবং আফগানিস্থান, পারস্য, তাতার, তুরস্ক, প্রভৃতি যে সকল দেশ হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশ কালসহকারে ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষে বিদেশে পরিণত হইল।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। পঞ্চনদ প্রদেশে, অযোধ্যা ও এলাহাবাদ অঞ্চলে ও পরে বিহার এবং বঙ্গদেশে মুসলমানগণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে হিন্দুস্থানের বহু অধিবাসী হিন্দু ধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মুসলমানের সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে সকল হিন্দু সন্তান হিন্দু সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন মুসলমান সমাজ সাদরে তাঁহাদিগকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিলেন। ঔপনিবেশিক মুসলমানগণের বংশধরদিগের সহিত এই সকল কৃত মুসলমানের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিতে লাগিল। আর্য্য শোণিতের সহিত যবন শোণিতের সংমিশ্রণের ফলে মুসলমানের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ এই মিশ্রণের ফলে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল, তাহারা হিন্দু সমাজে স্থান পাইল না, মুসলমানগণ তাহাদিগকে আগ্রহে আপন সমাজে গ্রহণ করিলেন। মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে ধীরে ধীরে পাঞ্জাব হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাঞ্জাব হইতে তাঁহারা যতই দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের বিশুদ্ধ মোগল বা পাঠান শোণিত ভারতীয় আর্য্য শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। তখন রেলগাড়ী

ছিল না, পাঞ্জাব হইতে যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিনে বঙ্গদেশে আসিতে পারা যাইত না। দিগ্বিজয়ী সেনাদল যুদ্ধ করিতে করিতে যেমন অগ্রসর হইতেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিজিত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, পরাজিত জাতিকে স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা করিতেন এবং সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলে, পরাজিত অথচ স্বধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। এইরূপ এক প্রদেশে ঘর সংসার গৃহস্থালী পাতিয়া পরে তথা হইতে আবার অন্যদেশ আক্রমণে অগ্রসর হইতেন।

সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রথম উপনিবেশ পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে মুসলমানগণ যতই দূরতর প্রদেশে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের ধমনীতে ভারতীয় শোণিতের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেই বিজয়ী সেনাদলের সেনানীদের মধ্যে হয়ত কেহ তাতার বা তুর্কী থাকিতে পারেন কিন্তু মোটের উপর অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মুসলমানের বাহুবল, ধর্ম্মানুরাগ ও চেষ্টার ফলে এক একটা প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর অর্দ্ধেকেরও অধিক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। এই যে আমরা বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ মুসলমান দেখিতে পাই, ইহাদের সকলেরই পূর্ব্বপুরুষগণ কি সিন্ধু নদীর পশ্চিম পার হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন? না তাঁহারা এককালে আমাদেরই মত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরে মুসলমান হইয়াছিলেন? পিতৃকুল দিয়াই হউক আর মাতৃকুল দিয়াই হউক, অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের শরীরে যে হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহা ধ্রুব সত্য। বোধ হয় কোন মুসলমানই একথা অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার করিবার কোন হেতুও নাই। কারণ বাঙ্গালী হিন্দু, আফ্রিকার জুলু, নিগ্রো বা আণ্ডামানের আদিম অধিবাসীর ন্যায় বর্ব্বর অসভ্য নহেন যে তাঁহার শোণিতের অস্তিত্ব স্বীয় শরীরে বিদ্যমান একথা স্বীকার করিতে কোন মুসলমান কুণ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বে যাহারা হিন্দুরূপে বাঙ্গলার অধিবাসী ছিলেন, এখন তাঁহাদেরই অনেকের বংশধর মুসলমানরূপে বাঙ্গলার অধিবাসী। তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র বাসস্থানের পরিবর্ত্তন করেন নাই। আমি যেমন বাঙ্গালী তোমরাও সেইরূপই বাঙ্গালী, প্রভেদের মধ্যে এই যে আমি আমার পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছি আর তোমরা সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ।

যাহা হউক সেই প্রথম কালের মুসলমান সেনার সংখ্যাও যে বহু লক্ষ ছিল তাহা নহে। ১৭ জন মুসলমান অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, ইহা অতিরঞ্জিত, মুসলমান ঐতিহাসিকদের অত্যধিক স্বজাতি-প্রীতির নিদর্শন হইতে পারে কিন্তু যে সকল মুসলমান সেনার সাহায্যে মুসলমান বাদসাহ-গণ বঙ্গদেশে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই মুসলমান সেনার সংখ্যা যে অনেকস্থলে হাজারের কোঠা ছাড়াইয়া লক্ষের কোঠায় পৌঁছায় নাই, বোধ হয় ইতিহাস একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

তারপর বঙ্গ-বিজয়ের পর বিজেতা সেনার

কেহ বা এই দেশেই রহিয়া গেলেন আর কেহ বা দিল্লী, এলাহাবাদ, আগ্রা, পাঞ্জাব অর্থাৎ যে দেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলে যে দেশে তাহাদের স্ত্রীপুত্র, চাষ আবাদ ছিল, সেই দেশে ফিরিয়া গেলেন। যাঁহারা বঙ্গে থাকিয়া গেলেন তাঁহারা এই দেশেই সংসার পাতিয়া গৃহস্থ হইয়া রহিলেন। ইহার পর নব বিজিত রাজ্য শাসন করিবার জন্য রাজধানী দিল্লী হইতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু রাজপুরুষ বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বঙ্গদেশে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের পর হইতে তাহারাও নিজ ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টাও বিফল হয় নাই।

আমি যে পৈতৃক সম্পত্তি গৌরবের দ্রব্য লইয়া সভ্য সমাজে দণ্ডায়মান হইব, তুমিও সেই দ্রব্য লইয়াই সভ্য সমাজে আমারই ঠিক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে, কেহ তোমাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।

কথাটা বোধ হয় একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। আমি বাঙ্গালী হিন্দু-ব্রাহ্মণ, আমি আমাকে পৃথিবীর কোন উন্নত ও সভ্য জাতি অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করি না। কেহ যদি আমাকে হীন বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করে তবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমি প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার উল্লেখ করিব। যখন রোমের সভ্যতার শৈশবাবস্থা তখন ভারতীয় সভ্যতা-দিবাকর মধ্য আকাশ অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়াছে। যখন টাইবার নদীর কূলে রোমাস ও রেমিউলাস বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-সভ্যতার বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র অন্বেষণে ব্যস্ত, তখন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন রচনা করিয়া, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি কলা বিদ্যার অসংখ্য গ্রন্থ রচনা-পূর্ব্বক জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। শেক্সপিয়ারের কে জানে কত শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যেও একজন অভিজ্ঞান শকুন্তলা রচনা করিয়া নাটকের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন যে, যে জাতির অতীত ইতিহাস লইয়া গৌরব করিবার কিছুই নাই, যে জাতির ভবিষ্যত বড় অধিক উজ্জ্বল নহে। সে জাতিকে উন্নতি লাভ করিতে হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। আজ এই জীবন যুদ্ধের দিনে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের এই কথা বারংবার আমার মনে পড়ে। আমাদের অতীত যখন গৌরবে মণ্ডিত তখন আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল না হইবে কেন?

হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ এই আশার সঙ্গীত কি তোমাদের কর্ণেও ধ্বনিত হইতেছে না? আমার অতীত আর তোমার অতীত যে একই। আমরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা বলিয়া থাকি আমরা এক দেশ জননীর দুই সন্তান—হিন্দু মুসলমান আমরা দুই ভাই। অনেকে এই কথাকে ভাবমূলক বা সেন্টিমেণ্টাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু ইহাত ভাবমূলক নহে, ইহা যে ধ্রুবসত্য—এ সম্পর্ক যে শোণিতের সম্পর্ক। এই সভাতে এই যে মুসলমান যুবকগণ উপস্থিত আছ তোমাদের সহিত কি আমাদের হিন্দুদের শোণিত সম্পর্ক নাই? যদি কেহ বলেন যে পিতৃকুল

বা মাতৃকুল, কোন কুল দিয়া ভারতীয় শোণিত তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ যিনি আফগানিস্থান বা পারস্য হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই আদি পুরুষের সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত বংশাবলী ক্রমে তাঁহারা খাঁটি আফগান্, ইরানী, বা তুর্কীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, তবে আমি তাহাকে সালাম করিয়া বলিব, "ভাই আমাকে মাফ কর, আমি তোমার কথা বলি নাই, আমি আমার বাঙ্গালী ভ্রাতাদের কথা বলিতেছি।"

আমি বুঝিতে পারি না বাঙ্গালী মুসলমানগণ, অন্ততঃ সকলে না হইলেও অনেকে আর্য্য সভ্যতা অপেক্ষা সাম্রাসান, পারস্য বা তুর্কী সভ্যতাকে আপনাদের পক্ষে গৌরবকর বলিয়া কেন মনে করেন। বুঝিতে পারি না কেন বাঙ্গালী মুসলমান কালিদাস, মাঘ, ভারবী, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরায় অপেক্ষা সাদী বা হাফেজ বা ওমর খৈয়ামকে আপনার জন বলিয়া মনে করে। জিজ্ঞাসা করি, রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জ্জি, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাশালী সুপণ্ডিত, বাঙ্গালী খৃষ্টানগণ কখনও কি প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা অপেক্ষা সাম্রন, বা নর্ম্মান সভ্যতা বা স্লেমক সভ্যতাকে একান্ত আপনার এবং আপনাদের গৌরবকর বলিয়া মনে করিতেন? মহাকবি মাইকেল মধুসূদনদত্ত, খৃষ্টান হইলেন, মেম বিবাহ করিলেন। কিন্তু তিনি যে আর্য্যবংশোদ্ভব, একথা ত তিনি এক দিনের জন্যও, বিস্মৃত হয়েন নাই। শুনিয়াছি তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা ভাষায় মেঘনাদ বধ রচনা করিয়াছেন তাহা সংস্কৃত শব্দ বাহুল্যে অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

শুনিয়াছি কোন কোন মুসলমান সাহিত্যসেবী নাকি বলেন যে হিন্দু গ্রন্থকারেরা যদি বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, তবে আমরাও পারসী বা উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করিব, আমার স্থূল বুদ্ধিতে আমি এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারি না। সংস্কৃত ভারতের প্রাচীন ভাষা—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ভাষা। বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের সকল প্রাদেশিক ভাষা সংস্কৃতেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের সকল ভাষায় সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত ভাব এমন কি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পর্য্যন্ত থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু পারসী বা আরবী ভাষার সহিত বাঙ্গালার কি সম্পর্ক? আরবী বা পারসী ত বাঙ্গালী মুসলমানেরই অন্ততঃ অধিকাংশ মুসলমানের পৈতৃক ভাষা নহে। মুসলমানের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণশরিফ আরবী ভাষায় রচিত, সুতরাং যে মুসলমান কোরাণশরিফ পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারই আরবী ভাষা শিক্ষা করা উচিত একথা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু সেজন্য আমার দেশের ভাষাকে, আমার পিতৃপিতামহের ভাষাকে আমি অকারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদেশীয় ভাষার ভাবে বিকৃত করিব কেন?

অবশ্য বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিদেশীয় যে কোন ভাষা হইতে শব্দ

ভাব, ভঙ্গী আহরণ করা আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি না। মুসলমান নবাব-বাদশাহের আমলে যে সকল পারসী শব্দ এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা দেশের ভাষার সহিত একাত্ম ভাবে হইয়াছে, তাহাকে বাদ দিয়া কাজ করা চলে না, বাদ দিবার চেষ্টা করিলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। মোকদ্দমা করিবার জন্য আদালতে গিয়া উকিলের সাহায্য না লইয়া যদি বিচার কার্য্যের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া প্রোড়বিবাদের সাহায্য লইতে হয় তাহা হইলে জীবন বিড়ম্বনাময় হয় না কি? কেবল পারসী ভাষা বলিয়া নহে, আজকাল অনেক ইংরাজী কথাও আমাদের ভাষার মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। হাইকোর্টে আপিল করা অপেক্ষা, উচ্চতম বিচারালয়ে পুনর্ব্বিচারের আবেদন করা যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অর্থাৎ রাজা বিদেশী হইলে সেই রাজার ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে বিজিত দেশের ভাষাতে স্থান পাইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। সেই হিসাবে বহু আরবী ও পারসী শব্দ আমাদের দেশের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, এখনও বহু ইংরাজী শব্দ এদেশের ভাষাতে প্রবেশলাভ করিয়া স্থায়ীভাবে আপনার আসন স্থাপন করিতেছে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এখন যিনি বাঙ্গালা ভাষা হইতে যাবতীয় আরবী, পার্শি বা ইংরাজী শব্দকে নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে নিশ্চিত হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কোন বহুভাষাবিদ সাহিত্যসেবী সুবিখ্যাত ব্যক্তি হুগলীতে একটি সভাতে বক্তৃতা কালে বলেন যে আমরা বাঙ্গালী, আমরা আমাদের ভাষাতে ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশীয় ভাষাকে স্থান দিব কেন? আমাদের কথাবার্ত্তা সমস্তই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাতে হওয়া উচিত। এই মর্ম্মে তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। সেই সভাতে একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান সভাপতি ছিলেন। তিনি এই বক্তার কথার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইলেন যে, বক্তা মহাশয় বক্তৃতা কালে বিশেষ সতর্কতার সহিত ইংরাজী শব্দগুলি বাদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু পদে পদে আরবী, পারসি বা উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ নাই। অথচ লাভের মধ্যে শক্তির অপব্যবহার—অপচয় মাত্র। সুতরাং যে সকল বিদেশীয় শব্দ অযাচিত ভাবে, বর্ষার জলধারার ন্যায় আমাদের ভাষার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা না করাই ভাল। কিন্তু অন্য পক্ষেও সেইরূপ খাল কাটিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক লোনা জল আনিয়া আমার মিঠা জলকে পাতাল করাও সঙ্গত নহে। যে সকল স্থানে পরিষ্কার খাটি বাঙ্গলা ভাষা চালাইতে পারি আমার পিতৃপিতামহের ভাষা চালাইতে পারি সেখানে, হইনা আমি খৃষ্টান বা মুসলমান, আমি বিদেশীর নিকট হইতে ভাষা ধার করিতে যাইব কেন? বাঙ্গলা ভাষা যে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, স্বেচ্ছায় সেই সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পরের দ্বারস্থ হইতে যাই কেন?

কেবল যে এই বাঙ্গলা ভাষাই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি আর কিছুই আমাদের পিছু-

পিতামহগণের নিকট হইতে আমরা পাই নাই তাহা নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রচুর অতুলনীয় সম্পত্তি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত। প্রাচীন গ্রীস মিশরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সভ্য হইয়াছিল, সেইরূপ গ্রীসের শিষ্য রোম, রোমের শিষ্য ফ্রান্স, ফ্রান্সের শিষ্য বর্ত্তমান ইউরোপের খৃষ্টান জাতি সমূহকে স্পেনের সভ্যতা শিক্ষার জন্য দীর্ঘকাল মুসলমানের সাক্রেদী করিতে হইয়াছিল। এইরূপ পৃথিবীর আধুনিক সকল সভ্য জাতিকে সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্য কোন না কোন প্রাচীন জাতির নিকটে সাক্রেদী করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সেই অতীত যুগের পূর্ব্বপুরুষগণ, সেই বৈদিক যুগে যে সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও সাক্রেদী করিয়া তাঁহাদিগকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই। শুনিয়াছি চীন দেশের সভ্যতাও নাকি এইরূপ মৌলিক সভ্যতা। আমি চীনের ইতিহাস জানি না, টেরিটি বাজার ব্যতীত অন্য কোথাও চীনাদের সহিত আমার আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হয় নাই, সুতরাং চীনের সভ্যতার আলোচনা না করাই আমার পক্ষে শোভন।

আমাদের এই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা যে আমাদের বড় গৌরবের জিনিষ, বড় গর্ব্বের জিনিষ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এক কথায় আমরা প্রাচীন বনিয়াদী বড় ঘরানা ঘরের সন্তান, এ কথা আমরা বুক ফুলাইয়া জগতে প্রচার করিতে পারি। তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে আমাদের এই গর্ব্ব আজ কাল অনেকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহারা আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতাকে, কোন মতে গ্রীক সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। তাহাদের মতে, ভারতের উন্নতি, ভারতের সভ্যতা গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কল্যাণে হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন করিয়াই হউক তাঁহারা আমাদিগকে, খৃষ্ট জন্মের দুই চারি শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কালা আদমির প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কিন্তু যাহাদের বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠের এই একটা স্তর গঠনেই লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে, লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীতে মানবের বাস ছিল। আবার তাহাদেরই ধর্ম্ম পুস্তকের মতে এখনকার হাজার ছয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভগবানের কি খেয়াল হইল তিনি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র অন্ততঃ আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য্যে হাত দিলেন আর পুরা ছয়টা দিন পরিশ্রম পূর্ব্বক এই জল স্থল, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, নর নারী সম্বলিত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, যাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানে এত প্রভেদ, সে জাতির সাটিফিকেটের মূল্য কত তাহা তোমরা অক্লেশে বিবেচনা করিতে পারিবে।

অপর লোকে যাহাই বলুক না কেন, আমরা আমাদের ওয়ারেসী সম্পত্তি ছাড়িব কেন? উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি, মানব জাতির ইতিহাসে যে সম্পত্তি সত্য সত্যই অমূল্য তাহা কে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া পরের দাসত্ব হইবে? আমাদের এই সম্পত্তি যে কতদূর মূল্যবান তাহা

একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিব। তোমরা সকলেই বোধ হয় জান যে, প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপ beggar question বা ভিক্ষুক সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কত মহা মহা প্রতিভাশালী সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এই সমস্যার মীমাংসার জন্য আপনাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন কিন্তু কেহই কোনরূপ সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য সমাজে সহৃদয় ধনীগণ দাতব্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোটী কোটী টাকা দান করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারক সমিতি সমূহ কত কাণ্ডই না করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে ভিক্ষুকের দুর্দ্দশা মোচন হয় নাই, নিরন্নের উদরে এক মুষ্টি অন্নও পড়ে নাই। কিন্তু আমাদের এই প্রাচ্য দেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সমাজে কেমন সহজে এই জটিল সমস্যার মীমাংসা হইয়া আছে। ভিখারী দ্বারে আসিয়া দাড়াইলে তাহাকে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে হইবে। অভুক্ত অতিথিকে খাওয়াইয়া তবে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিব এই ব্যবস্থা আমাদের ধর্ম্মাচরণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কাহারও দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহাকে অন্ততঃ এক মুষ্টি অন্নও দিতে হইবে। এ দান উপকার দান নহে স্রষ্টার দান, ভিক্ষা দিতে সামর্থ না হইলে ভিক্ষুকের নিকট "মাপ কিজিয়ে" "মাপকর বাবা" প্রভৃতি বলিয়া তাহার নিকট ক্রটী-স্বীকার করিতে হইবে। beggar law বা ভিক্ষুক বিধান প্রণয়ন করিয়া যাহারা ভিখারীকে কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করে, তাহারা এই দান ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া হয়ত, আগন্তুকে প্রত্যুপকার দান বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে কিন্তু আমরা জানি এইরূপ আগন্তুকে প্রত্যুপকার দানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের পিতৃপিতামহগণ কত সহজে কত বড় একটা দুরূহ সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে আমাদের এই প্রাচীন সমাজ পাশ্চাত্য দেশের অর্ব্বাচীন সমাজ হইতে কেন শ্রেষ্ঠ, কত শ্রেষ্ঠ।

এই স্থানে তোমাদিগকে আমি আরও একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয় নিতান্ত অপ্রসঙ্গিক হইবে না। যখন আমরা (হিন্দুরা) তোমাদিগকে অর্থাৎ বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করি, তখন আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, কেহ কেহ বলেন "এই ভাই সম্বোধনটা কেবল মৌখিক আলাপ মাত্র, হিন্দুর সহিত মুসলমানের কখনও ঘনিষ্টতা হইতে পারে না।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই ভাই সম্পর্ক পাতান ভাই নহে ইহা শোণিতসম্বন্ধজনিত ভাই-সম্পর্ক। আমি ব্রাহ্মণ, আমার সহিত একজন কায়স্থ বা বৈদ্যের শোণিতসম্পর্ক থাকিতে পারে না। বাঙ্গালার ঐতিহাসিক যুগ হইতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের সহিত অব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্বন্ধ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। সুতরাং আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কিছুতেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সার জগদীশ বসু বা ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীলকে আমার সহিত শোণিত সম্পর্কে সম্পৃক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালার যে সকল মুসলমান হিন্দু সমাজ হইতে মুসলমান সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও আমি একথা বলিতে পারি না। আমি একজন

কায়স্থ বা বৈদ্য হইতে যত দূরে আছি, একজন মুসলমান হইতে হয়ত তত দূরে নহি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ধমনীতে যে শোণিত অদম্য তেজে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার লেখনী হইতে—

"কি বলিলি বাসবি! পর্ব্বতের গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

বীরাঙ্গনা প্রমীলার উক্তিরূপে বাহির হইয়াছিল, সেই শোণিতই যে কবি কাজি নজরুল ইসলামের লেখনী হইতে—

"আমি বিদ্রোহী আমি বীর
চির উন্নত মম শির"

এই অগ্নিগর্ভ পদ্য প্রকাশ করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে যে, যে শোণিত কবি হেমচন্দ্রের শিরায় প্রবাহিত হইত সেই শোণিত মহম্মদ মোস্তফা বা কবি কৈকোবাদের শিরায় প্রবাহিত হইতেছে না? মহাকবি কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, সপ্রমাণ হইয়াছে। কবি সৈয়দ সিরাজী বা কবি মোজাম্মেল হক্ যে কালিদাসেরই উত্তরপুরুষ নহেন তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি? হয়ত জয়দেব বা বিদ্যাপতিরই কোন বংশধর মুসলমান আমলে হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পরে হয়ত সেই বংশেই চট্টগ্রামের সাহিত্য-সেবী আবদুল করিম জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের সাধনার ফলস্বরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি একবার শুনিয়াছিলাম যে মৌলানা আক্রাম খাঁর পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং মৌলানা সাহেবের সহিত আমার শোণিত সম্পর্ক নাই একথা আমি অথবা যে কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি কি? এই যে আজ তোমরা মুসলমান যুবকগণ এই সভাতে উপস্থিত হইয়াছ, ইহাদের মধ্যে যে কেহ আমার জ্ঞাতি নাই, অথবা কাহারও পূর্ব্ব পুরুষের সহিত আমার কোন পূর্ব্ব পুরুষের বৈবাহিক বন্ধন ছিল না তাহা কেমন করিয়া বলিব।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের পরিবর্ত্তন হয় না, পিতৃপিতামহের যে শোণিত শরীরে প্রবাহিত হইতেছে তাহারও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ দ্বারা অন্য শোণিত শরীরে আসিতে পারে কিন্তু সেই নবাগত শোণিত কি পূর্ব্বশোণিত কেহ দেহ হইতে একেবারে তাড়াইতে পারে না।

অতএব ভাই বঙ্গীয় মুসলমানগণ, তোমাদের সহিত আমাদের যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ ইহা পাতান সম্বন্ধ নহে, ইহা সত্য সত্যই শোণিত সম্বন্ধ। শুনিয়াছি কাশ্মীর দেশে নাকি, একই পরিবারে এক ভ্রাতা হিন্দু, এক ভ্রাতা মুসলমান, বেশ মিলিয়া মিশিয়া একই বাটীতে বাস করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ভোগদখল করে। যদি কাশ্মীরে ইহা সম্ভবপর হয়, তবে বাঙ্গলায় হইবে না কেন? তোমার ধর্ম্ম ও আমার ধর্ম্ম এক নহে—না হউক তাহাতে ক্ষতি কি? এই বঙ্গদেশে হিন্দু পরিবারের মধ্যে এমন অনেক দেখিয়াছি যে এক ভাই বৈষ্ণব আর এক ভাই শাক্ত। উভয়ের ধর্ম্ম মতে ধর্ম্ম

আবরণে এমন কি আহারে পর্য্যন্ত বিশেষ পার্থক্য আছে, তথাপি তাহারা এক জননীর সন্তান, উভয়ে সমান ভাবে পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার ও ভোগ করে।

তবে তোমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমরাই বা ঘর সংসার করিতে পারিব না কেন? এস ভাই আমরাও আমাদের ওয়ারেসী সম্পত্তি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কঠোর সাধনায় অর্জ্জিত সম্পত্তি মিলিয়া মিশিয়া ভোগ করি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি বেদ বেদান্ত উপনিষদ দর্শন জ্যোতিষ গণিত কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি মীমাংসা পুরাণ, মহাকাব্য ইতিহাস। এত সম্পত্তি কোন্ কোন্ জাতির পিতৃপুরুষ রাখিয়া গিয়াছেন? কালিদাস, মাঘ, ভারবী, শ্রীহর্ষ, ঘণ্ডী, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহাদের এক এক জনই এক একটা সভ্য জাতির গৌরবস্থল। হও না তোমরা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী—সেক্সপিয়ার, মিল্টন, স্কট, সুইফ্‌ট পড়িতে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, তবে আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ এই সকল মহামহাপণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিতে তোমাদের আপত্তি হইবে কেন? তোমাদিগকে আমি ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিতে বলি না, যে ধর্ম্ম তুমি আজন্ম পালন করিয়া আসিতেছ সেই ধর্ম্মেই তোমার দৃঢ়-নিষ্ঠা থাকুক, সেই ধর্ম্মের উপদেশ তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর কিন্তু তাই বলিয়া পিতৃ-পিতামহের অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবে কেন? স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে খৃষ্টানের সন্তান, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুসভ্য আর্য্য-বংশে তাঁহার জন্ম, একথা তিনি এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হয়েন নাই। একবার কলিকাতা টাউন হলে একটা বক্তৃতা করিবার সময় তদানীন্তন লর্ড বিশপের কোন উক্তির প্রতিবাদে তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"I am also a Christian, but I am a Brahmin Christian." আমার ইচ্ছা হয়, তোমরাও একবার সেইরূপ সগর্ব্বে উন্নত মস্তকে উচ্চ কণ্ঠে বল "আমরা মুসলমান, আমরা বাঙ্গালী মুসলমান।" আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আমার কথায় নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ আমার উপরে খড়্গহস্ত হইবেন। আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমানকে বেদ বেদান্ত গীতা রামায়ণ মহাভারত আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি ইহা হিন্দুর দৃষ্টিতে হয়ত বড়ই অসমীচীন হইতে পারে, কিন্তু সত্যের দৃষ্টিতে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে ইহা আমি অপরাধ বলিয়া মনে করি না। আমার স্বজাতি যদি অজ্ঞানত বা কোন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ওয়ারেসী সম্পত্তি অধিকার না করেন, তবে সেই সম্পত্তিতে যে তাঁহার কোন অধিকার নাই ইহা আমি মনে করি না। এই সকল ওয়ারেসী সম্পত্তিতে আমারও যেমন অধিকার, তোমারও তেমনই অধিকার। তুমি রাম বা কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার না করিতে পার, কিন্তু সেজন্য কি তাঁহাদের অতুলনীয় চরিত্র, অলোকসামান্য প্রতিভার বিষয়ও তোমরা আলোচনা করিবে না? এই সকল দেব চরিত্র কেবল ত হিন্দুর সম্পত্তি নহে, ইহা যে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—এক কথায় ভারত-

বাসী আর্য্যের সম্পত্তি। এ সম্পত্তি হইতে তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চিত হইতেছ কেন?

অতএব এস ভাই বাঙ্গালার মুসলমান, একই জননী জন্মভূমির যুগল সন্তান হইয়া আমরা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত সুরে গান করি—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।" এস ভাই দেশ জননীর ক্রোড়ে বসিয়া আমরা আমাদের ওয়ারেসী সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া ধন্য হই। *

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফুল

সুন্দর ফুলগুলি সুষমায় ভরে দিক;
ধরণী আদরে বুকে ধরে;
শিশুদের হাসি মত ফোটে যেন তারা ঠিক,
আশার স্বপন সম ঝরে!
দেশে দেশে যুগে যুগে দেখি মানুষেরি মন
বেসেছে তাহারে যে গো ভালো;
লিখে গেছে নীতিবিৎ, গায় গুণ কবিগণ—
সাদার আখর দিয়ে কালো।
প্রেমিক প্রসূন দিয়ে বলিছে কাহিনী সব,
প্রকাশিয়ে ভয় আর আশা;
কথা আর রূপ যেথা মেনেছে গো পরাভব,
কিশোরী কুসুমে কয় ভাষা।
জড়াই যতনে ফুল আসরে যে বাজে বীণ,
ফুল-তাজে সাহসীরা ভোলে;
বালিকা অলকে পরে, বধূর সোহাগ-টিপ—
মৃতেরো গলায় ফুল দোলে।

শ্রীচণ্ডিচরণ মিত্র

---

* বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

কেরামত শাহ্

(গল্প)

(প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

শীকারপুর একটি গণ্ড গ্রাম। অধিবাসি-গণের প্রায় পনর আনা লোকই মুসলমান। বৎসরাধিক কাল হইল এই গ্রামে কেরামত শাহ্ নামে একজন দরবেশ আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছেন। দরবেশের বয়স ত্রিশের অধিক অনুমিত না হইলেও কিংবদন্তীতে প্রকাশ তিনি বহু শতাব্দীর লোক। যেহেতু তাঁহার শিষ্যগণ নাকি তাঁহাকে যুগে যুগে এক ভাবেই দেখিয়া আসিতেছে। তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ জটা, বদন মণ্ডলে শ্মশ্রুর স্নেহাধিক্যের অভাব কিন্তু ঈষৎ গোঁফের রেখা বিদ্যমান। হস্তে ৵১। সের ওজনের একছড়া আতসী তস্‌বিহ্; পরিধানে গেরুয়া রং এর সুদীর্ঘ আলখেল্লা। অবিশ্রান্ত অধরোষ্ঠ-পুট অস্ফুট "মাহ্‌বুব" শব্দে সদা সঞ্চালিত এবং রক্ত জবা সদৃশ চক্ষুর্দ্বয় সতত ধ্যান-নিমীলিত। রাত্রিকালে এই দরবেশ সাহেব যখন "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ" শব্দ নানারঙ্গে নানাঢঙ্গে উচ্চারণ করিয়া চেল্লাকসি করিতে থাকেন, তখন গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন ঝড় বহিয়া যায়! অন্যান্য বালক বালিকাগণ ভয়ে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া অচিরেই ঘুমাইয়া পড়ে। ফলতঃ দরবেশের আগমন হেতু এই গ্রামে ছেলে পিলের বড় একটা কান্নাকাটি শুনিতে পাওয়া যায় না। শুনা যায় শাহ্ সাহেবের সহিত দৈনন্দিন কলেরার তিনবার, বসন্তের পাঁচবার, জ্বর ও জেন-পরী এবং ভূত-প্রেতাদির একবার করিয়া সাক্ষাৎ-কার ঘটে। কাজেই তিনি এই সমস্ত ব্যাধি উপসর্গ বেহ্কামত দেশ বিদেশে চালান দিয়া থাকেন। দরবেশ সাহেব বড় একটা কাহারও সহিত কথা বলেন না, এমন কি শিষ্যগণের সহিতও না। তবে দেলটা খোদার দিকে সমধিক 'রগবত' করিবার জন্য হস্ত মুঠা করিয়া চোষণ মারিলে শিষ্যগণ গাঁজার ব্যবস্থা করিয়া থাকে এইমাত্র। 'তাসাউফে'র এমনি জোর যে দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে কেহই খাইতে দেখে না। কামেল দরবেশ না হইলে এত মারফতি অনাহারে প্রাণ ধারণ! সকলে তাঁহার ঐ সমস্ত অলৌকিক 'মোজেজা' সন্দর্শনে বা শ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধ। এরূপও শুনা যায় যত কিছু খাদ্যোপহার তাঁহার পদমূলে সঞ্চিত হয়, তাহা তিনি স্পর্শও করেন না। তবে বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তদীয় জনৈক শিষ্য নাকি গভীর রজনীতে একটি করিয়া পূর্ণ থালা দরবেশের মশারি আবৃত হজুরার মধ্যে দিয়া আইসে। উদ্দেশ্য তিনিই জানেন।

যাহা হউক অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে শীকারপুরবাসিগণ স্ত্রীলোকের জেন ছাড়ানের বিষয়েই কেরামত শাহের বিশেষ কেরামতির পরিচয় পাইয়াছেন। এযাবৎ তিনি এ স্থানে

আসিয়া প্রায় ২৫।৩০ টা জেন ছাড়াইয়াছেন। তাঁহার জেন ছাড়ানের প্রণালী এইরূপ যথা :—তিনটা অনুপম কলা, একসের পায়স, অর্দ্ধসের মুরগীর কাবাব, ৭ খানা রুটি ও অর্দ্ধ ছটাক ঘৃতের একটা মশাল ও একটা নির্জ্জন গৃহ।

দেড় ঘন্টা আন্দাজ তপ জপ করিয়া অতঃপর জেনাশ্রিতা রমণীকে সেইগৃহে আহ্বান করা হয়। অনন্তর প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহের আশে পাশে সাড়ে পাঁচ গজের মধ্যে কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় না। জেনদিগের অবাধ্যতার হিসাবে কাহারও জন্য সমস্ত রাত্রি, কাহারও ৩।৪ ঘন্টা আবার কাহার ও শরীরে শুধু হাত বুলাইলেই আরাম হয়। আবার কতকগুলি জেন শাহ সাহেবের খুব বাধ্য। আবশ্যক হইলে তাঁহাকে তাহারা শূন্য পথে লোক চক্ষুর অন্তরালে পাল্কীতে উঠাইয়া যত্র তত্র ভ্রমণ করাইয়া আনে। বোধ হয় এই জন্যই শুনা যায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বাড়ীতে দেখা দিয়া অলৌকিক কেরামতি দেখাইয়া থাকেন।

হুজুরার চতুষ্পার্শে যখন সমাগত ছায়া সঙ্গীত পঞ্চমে উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট নর নারীগণ ভক্তি-গদ্-গদ্ প্রাণে (বিমল ?) শান্তি লাভেচ্ছায় তথায় ছুটিয়া আইসে। ক্রমে জোস সপ্তমে উঠিয়া গেলে তখন নৃত্য আরম্ভ হয়। ভাবাবেশে কেহ কেহ উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আত্মহারা হইয়া 'মোরাকেবা' সাধনা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ ব্যাপার সচরাচর সন্ধ্যার পরেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

শিষ্যগণের মুখে প্রকাশ একদা জনৈক পুত্রপ্রার্থিনী রমণী পুত্র কামনায় শাহ সাহেব সকাশে উপনীত হইলে তিনি রজনীযোগে "রোজ আজল" (যে স্থানে পার্থিব জীব সৃষ্টির হিসাব নিকাশ হয়) নামক স্বর্গীয় আফিসে উপস্থিত হইয়া তথাকার কেরাণীকে বড় গম্ভীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "অমুকের সন্তানাদি হয় না কেন ?"

পার্থিব শরীরী মানবের একেবারে স্বর্গ-রাজ্যে আগমনে রোজে আজলের হিসাব রক্ষক (কেরাণী) থতমত খাইয়া পরক্ষণেই একটু সামলাইয়া বলিলেন, "জনাব ! আমার হুকুম নাই এই দেখুন দপ্তর।" তখন শাহ সাহেব খাতা দেখিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম দপ্তরে লেখা নাই। আমার হুকুম, এখনই লিখিতে হইবে।" কেরাণী বেচারা ত ভয়ে অস্থির। কি করেন—এক দিকে খোদার হুকুম, অন্যদিকে কেরামত শাহ্। তিনি যখন এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় কেরামত শাহ্ সবলে খাতা টানিয়া লইয়া স্বেচ্ছায় পাঁচটি সন্তান লিখিয়াদিলেন। কেরাণী ত একবারে থ হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর শাহ্ সাহেব মর্ত্তভূমে অবতরণ করিয়া উপরোক্ত রমনীকে সমস্ত বলিলেন এবং একটা কবচ দিয়া বলিলেন "এই কবচটি সাবধানে রাখিও। অচিরেই ৫টি সন্তান লাভ করিবে। কিন্তু সাবধান এই কবচ কদাপি পরিত্যাগ করিও না।" রমণী হর্ষোৎফুল্ল বদনে গৃহে প্রস্থান করিল।

কালক্রমে যুবতী পাঁচটি প্রিয়দর্শন সন্তানের জননী হইয়া অপত্র আনন্দসাগরে ভাসমান

হইলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য তাহার অধিক কাল স্থায়ী হইল না। কিছু দিন অতীত হইতেই সেই রমণী একদিন মহা ক্রন্দন রোলে আকাশতল বিদীর্ণ করিয়া শাহ সাহেবের নিকট হাজির। তিনি জানিতে পারিলেন রমণীর পাঁচটি সন্তানই একেবারে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। আর ও জানিতে পারিলেন যে যুবতী অপ্রয়োজন বোধে তৎপ্রদত্ত কবচটি পরিত্যাগ করিয়াছিল। এবং উহা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই সর্ব্বনাশকর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। দরবেশ সাহেব ক্ষণেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "হতভাগিনী, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলাম কবচটি সাবধানে রক্ষা করিও। রোরুদ্যমানা রমণী তাঁহার পদতলে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল ও পুনঃ পুনঃ স্বীয় সন্তানগণের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিল।

শাহ সাহেব রমণীর ক্রন্দন-বিলাপে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্ত্রীলোকটিকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, " ইচ্ছা এখনই ইহার প্রতীকার করিতেছি।"

পরক্ষণেই তিনি রমণীর চক্ষুর অন্তরালে নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এদিকে হজরত আজরাইল স্বর্গপুরে স্বীয় উদ্যানে কোরছির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে একটি সুবৃহৎ থলিয়া বা জাম্বেল। কেরামত শাহ "আচ্ছালামো আলায়কুম" বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হজরত আজরাইল প্রত্যভিবাদন করিয়া যথাযোগ্য আসন দানে আপ্যায়িত করিলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনেই শাহ সাহেবের অবাধ গতি ছিল। কাজেই হজরত আজরাইল তাঁহাকে সসম্মানে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শাহসাহেব বলিলেন, "অমুক স্ত্রীলোকটির ৫টী সন্তানের কিরূপ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের পুনর্জ্জীবন দান করিতে হইবে।" হজরত আজরাইল তখন সবিস্ময়ে বলিলেন, "এওকি কখন সম্ভবে? আল্লার হুকুমে জান 'কবজ' করিয়াছি। উহাকে পুনঃ দান করিবার উপায় আছে?"

অনেক অনাবশ্য সাধনার পর যখন হজরত আজরাইল কিছুতেই জান প্রত্যর্পণ করিতে রাজি হইলেন না, তখন তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কেরামত শাহ জানিতে পারিলেন যে আজরাইলের হস্তস্থিত জাম্বিলের মধ্যেই ঐ রমণীর পুত্রগণের রূহ রক্ষিত হইয়াছে। শাহ সাহেব কাল বিলম্ব না করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে সবলে জাম্বিলটী ছিনাইয়া লইয়া সেই মাত্র উহার মুখ খুলিয়া দিলেন, অমনি তন্মধ্য হইতে পাঁচ হাজার রূহ বাহির হইয়া মর্ত্তভূমে পাঁচ হাজার মৃতদেহ জীবিত করিয়া তুলিল। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর পঞ্চপুত্রও জীবন লাভ করিল। এই মহা অঘটন দৃষ্টে হজরত আজরাইল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কেরামত শাহ হাসিতে হাসিতে মর্ত্ত্যের দিকে অবতরণ করিলেন।

এই সমস্ত লোকাতীত কেরামতীর কথা শিষ্যগণের প্রমুখাৎ যতই বর্ণিত হইতে লাগিল, শীকারপুর অঞ্চলের লোকগণ ততই শাহ সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

এই সময় তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু নূরউদ্দিন নামক জনৈক যুবক কেরামত শাহের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিত। নূর উদ্দীন নূতন শিষ্য। সুতরাং দরবেশ সাহেব নির্জ্জনেই তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করিতেন। কিন্তু

অনেক দিন কাটিয়া যায়, নূর উদ্দীনের সিদ্ধি-লাভ ঘটিল না দেখিয়া শিষ্য মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। শিষ্য সকাতরে ইহার কারণজিজ্ঞাসু হইলে গুরু ধ্যান-যোগে নির্ণয় করিলেন তাহার পশ্চাতে একটা পিশাচী আছে বলিয়াই সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। একথা তিনি শিষ্যকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন। আরও বলিলেন যতদিন সেই পিশাচীর অন্তরের কালিমা সম্যকরূপে বিদূরিত না হইবে, ততদিন তাহার তপ জপ কোনই কাজে আসিবে না।

নূর উদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর কে সে?

শাহ—মূর্খ, এখনও বুঝিতেছ না? সে তোমার স্ত্রী। প্রথমে তাহার অন্তর পরিষ্কার করা চাই।

নূর—তবে কি করিতে হইবে?

শাহ—আমার নিকট আনিলেই তাহার ব্যবস্থা হইবে।

নূর উদ্দীন গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল এবং স্ত্রীকে তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিল। কিন্তু সেই সতী সাধ্বী পর্দ্দানশিন রমণী একান্ত পতিব্রতা হইলেও স্বামীর মতে মত দিল না, পরন্তু স্বামীকে সবিনয়ে বলিল, "স্বামী সেবাই নারী জাতির কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। সে পরপুরুষ, আপনি কোন ধর্ম্মমতে আমাকে তাহার নিকট যাইতে বলেন? হউক সে দরবেশ অথবা মহা দরবেশ খোদাতালা কোরাণ সরিফে কি সেরূপ আদেশ দিয়াছেন?" আর এমনত কোথাও শুনি নাই যে বিবির গোনয় স্বামীর দরবেশী হাসিলে ব্যাঘাত হয়? সে নিশ্চয়ই ভণ্ড। আপনি আর কখনও উহার নিকট যাইবেন না। উহার মনে নিশ্চয়ই কোন প্রকার কু-অভিসন্ধি আছে।"

নূরউদ্দীন স্ত্রীর বাক্যে দুঃখিত হইয়া বলিল, "সাবধান, এরূপ কথা বলিও না। দরবেশ—কামেল দরবেশ—আরব তাজিমের সঙ্গে যাওয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা বিপদ ঘটিতে পারে।"

স্ত্রী—"আমি দেখিতেছি আপনি একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। আপনি শিক্ষিত হইয়া কেন যে এরূপ বিকারগ্রস্ত হইলেন, তাহার কারণ বুঝিতেছি না। আমরা স্ত্রীজাতি বুঝিই বা কি, আর জানিই বা কি? আপনারা পুরুষ হইয়া এরূপ পাগল হইলে চলিবে কেন? আচ্ছা বলুন ত দেখি আপনি কি 'মোজেজা' দেখিয়া উহার পিছু লাগিয়াছেন?"

"তোমরা স্ত্রীলোক দুনিয়ার কোন খবরই রাখ না"—এই বলিয়া সে পূর্ব্বোক্ত মোজেজা-গুলি স্ত্রীর নিকট যথাযথ বিবৃত করিল।

স্ত্রী হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই আপনি পাগল হইয়াছেন, নচেৎ এরূপ অসম্ভব কথা আপনার মুখে শুনিতাম না। এখন আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল, এই দরবেশ ভণ্ড বই আর কিছুই নয়।"

নূরউদ্দীন গুরুর প্রতি তাহার স্ত্রীর এই প্রকার কটূক্তি শুনিয়া রাগিয়া বলিল, "রাখ তোমার মাতব্বরি কথা। আমার সঙ্গে এখনই যাইতে হইবে।"

স্ত্রী স্বামীর অতিমাত্র উন্মত্ততা দর্শনে ভাবিল দুই চারি দিন বুঝাইলে হয়ত সুধরাইয়া যাইতে পারে। তাই প্রকাশ্যে বলিল "আজ নয় কয়েকদিন পরে হইবে।"

পরদিন নূরউদ্দীন গুরু সান্নিধ্যে উপস্থিত

হইলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই সে পেত্নীটাকে সঙ্গে আনিয়াছ।" উত্তর হইল "হুজুর! কয়েকদিন পরে হইবে।" গুরু রাগিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "নাফরমান, কমবখত, বেতমিজ, শয়তান, খান্নাচ দূর হ এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। আমি আর তোর মুখ দেখিতে চাই না। এরূপ অবাধ্য শিষ্যের মুখে কেরামত শাহ্ ঘৃণায় পয়জার মারিতেও বিরত হয়। আজ হইতে তোর সঙ্গে আমার আর কোনই সম্পর্ক নাই।"

শিষ্যগণকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরা আজ হইতে এই নাফরমান শয়তান-টাকে আমার হুজুরার চতুঃসীমায় আসিতে দিও না। এখনই ইহাকে কাণ ধরিয়া তাড়াইয়া দাও।"

গুরুর এবম্বিধ তীব্র ভর্ৎসনায় মুরের সমস্ত শোণিত ঊর্দ্ধগামী হইয়া মস্তকে উঠিল এবং বুঝিল তাহার স্ত্রীর জন্যই আজ তাহাকে গুরু-স্নেহে বঞ্চিত হইতে হইল!

তখন সে উন্মত্তবৎ বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

এদিকে স্ত্রী হাফেজা অবগাহন মানসে খিড়-কীর পুকুরে গমন করিয়া জলোপরিস্থ সোপানে অবতরণ করিল এবং দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া স্বচ্ছজলে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল। দেখিতে-ছিল এক অপরূপবিনিন্দিতা নবীনার আবি-র্ভাব। বাসন্তী মলয় সংযোগে তাহার নিতম্ব-চুম্বিত আলুথালু কেশপাশ ইতস্ততঃ আন্দো-লিত। উহা কখন অংসোপরে, কখন সমুন্নত বক্ষঃস্থলে, কখন বা কপোলদেশে পতিত হইয়া যুবতীর একাগ্রতা নষ্ট করিতেছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সুকোমল হস্ত দ্বারা কেশগুলি সরাইয়া দিয়া মেঘবিনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় স্বীয় বদন মণ্ডলের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিতেছিল। এমন সময় একটা বৃহৎ মৎস্য পাখসাট মারিয়া জল আন্দোলিত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর সাধের ছবিখানা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। বোধ হয় সুন্দরীর দেহলতার অপূর্ব্ব বিলাসভঙ্গী দেখিয়া মাছটার ঈর্ষা হইয়াছিল। যাহা হউক হাফেজা মনে মনে বলিল, এ কি করিতেছিলাম। যদি কেহ দেখিতে পায় কি বলিবে? যুবতী স্নান মানসে এক পদ জলে অবতরণ করিতেই পশ্চাদ্দিক হইতে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে শব্দ হইল "শয়তানী, খাড়া রও। তোর জন্যই আমার এত দুর্দ্দশা। চল এখনই তোকে পীর সাহেবের নিকট যাইতে হইবে।" হাফেজা প্রাণবল্লভের উন্মত্ত ভাব দেখিয়া ভয় পাইল এবং নানারূপ কাকুতি মিনতি দ্বারা স্বামীকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হইল। কিন্তু কাণ্ড-জ্ঞানহীন নুরউদ্দীন ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক স্ত্রীকে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথ দিয়া টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া লইয়া চলিল।

এদিকে বাড়ীর কেহই ইহা জানিতে পারিল না। ওদিকে কেরামত শাহ্ প্রেরিত গুপ্তচর যাইয়া গুরুকে বলিল, "নুরউদ্দীন তাহার স্ত্রীকে আনিতেছে।"

গুরুর নির্দ্দেশক্রমে শিষ্যগণ উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে প্রাচীরের বাহির করিয়া দিয়া কেবল মাত্র একটী পথ খোলা রাখিয়া দিল। অতঃপর কেরামত স্বীয় নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে মহাধ্যানে বসিয়া গেলেন।

নুরউদ্দীন সস্ত্রীক আসিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে

হাজির হইল। কিন্তু দরবেশের আর ধ্যান ভাঙ্গে না। তিনি যেন আর এ জগতে নাই।

হুরউদ্দীন সকাতরে পুনঃ পুনঃ গুরুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। অবশেষে গুরুদেব চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক বলিলেন, "আরে বেটা অসময়ে ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিলি কেন্? কই তোর সে পেত্নীটাকে সঙ্গে আনিয়াছিস কি?"

হুরউদ্দীন বলিল, "হুজুর সে আসিয়াছে।"

কেরামত—কোথায় সে?

হুর—হুজুর সে এই কাষরার মধ্যে আছে।

কেরামত—আচ্ছা, তবে তুই এই বেহেস্তের মেওয়াটা খা দেখি, এই বলিয়া তিনি মাদক দ্রব্যমিশ্রিত একটি সুপক্ক পেপে তাহার হাতে দিল। হুরউদ্দীন সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পেপেটা লইয়া উদরস্থ করিল। আর যায় কোথা! খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

এক্ষণে কেরামত স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধির শুভ সময় মনে করিয়া হুর পত্নী হাফেজার নিকট গমন করিল। হাফেজা দরবেশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই দরবেশ তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া অনেকবার তাহাদের বাড়ী গিয়াছে। অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া এক জাল মোকর্দ্দমায় তাহার পিতাকে যে বাধ্য করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। সে এক্ষণে এই মূর্ত্ত শয়তানের হস্ত হইতে স্বীয় অমূল্য সতীত্ব রক্ষা করিতে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় কোথায়? অবশেষে একমাত্র অগতির গতি বিপদের সহায় সেই করুণাময় আল্লাহতালাকে স্মরণ করিতে লাগিল। দরবেশ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া হাফেজা কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। দরবেশ তখন দৃঢ় হস্তে বালিকার গলদেশে চাপিয়া ধরিল। হাফেজা অতি কষ্টে বলিয়া উঠিল, "কেহ আছ আমাকে রক্ষা কর।"

স্ত্রীর চীৎকার ধ্বনি অর্দ্ধসংজ্ঞাপ্রাপ্ত হুর উদ্দীনের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে কম্পিত চরণে ঠেলিতে ঠেলিতে সেই কামরায় প্রবেশ করিল। পাপাত্মা দরবেশ তদীয় কার্য্যের প্রতিকূল ভাবিয়া তাহাকে পদাঘাতে ভূপতিত করিল। দরবেশ গলা চাপিয়া ধরায় ধমবন্ধ হইয়া পরক্ষণেই হাফেজার অমরাত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর হুরউদ্দীন কতকটা সংজ্ঞা লাভ করিল। সে স্ত্রীর মৃতদেহ সন্দর্শনে ভীত ও বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "একি দেখিতেছি।"

কেরামত উত্তর করিল "ইহার আত্মাটা বড়ই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। ছাফ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না দেখিয়া বাধ্য হইয়া তাহার জীবননাশ করিতে হইল। নূতন আর একটি পবিত্র আত্মা ইহার কলেবরে লাগাইয়া দিতে হইবে। তুমি মশারীর মধ্যে এই ছুরি খানা লইয়া উহার পেট ছিড়িয়া অন্ত্রগুলি পরিষ্কার করিতে থাক। আমি নূতন আত্মা আনিবার জন্য "রোজ আজলে" গমন করিলাম। যতক্ষণ আমি না আসি, সাবধান, কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দিও না। অথবা ডাকিলেও নীরব থাকিও।"

এই বলিয়া পাষণ্ড কেরামত দ্রুত গতিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এদিকে নূরের আত্মীয় স্বজন যখন জানিতে পারিল যে সে তাহার স্ত্রীকে দরবেশের নিকট লইয়া গিয়াছে; তখন বাড়ী হইতে কয়েকজন লোক তাড়াতাড়ি দরবেশের হুজুরায় উপনীত হইল। কিন্তু দরবেশ বা নূরউদ্দীনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সেই বিরাট জন-কোলাহল পূর্ণ হুজুরা একেবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। শিষ্যগণের ও খোঁজ নাই।

নূর উদ্দীনের আত্মীয়গণ চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার হুজুরার নিকট গিয়া ডাকিল "নূর উদ্দীন! নূর উদ্দীন!" কিন্তু কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু ক্ষণপরে গৃহ-মধ্যে যেন কাঁহার পদ শব্দ তাহাদের কর্ণ গোচর হইল। কি যেন একটা বিশেষ কাণ্ড হইতেছে ভাবিয়া তাহারা দরজা খুলিতে বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিল। অবশেষে পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াই যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

একজন নিজকে সামলাইয়া রোষ কষায়িত লোচনে বজ্র কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "নূর উদ্দীন একি করিতেছ?" তখন সে রক্তধারা শ্বশুর উন্নয়ন নাড়ী ভুড়ী ধৌত করিতেছিল।

নূরউদ্দীন উত্তর করিল, "গুরু আজ্ঞা পালন করিতেছি।"

"কোথায় তোর সেই গুরু?"

"নিষ্পাপ আত্মা আনয়নার্থ তিনি বেহেস্তে গিয়াছেন; তিনি আসিয়াই ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি ৮২ সিক্কা ওজনের চপেটাঘাত নূরের গণ্ডদেশে পতিত হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। ব্যাপারটার আগা-গোড়া তাহারা একরূপ বুঝিয়া লইল এবং নূরউদ্দীনকে হস্তপদাবদ্ধাবস্থায় সেই স্থানে রাখিয়া অবিলম্বে সেই শয়তান ভণ্ড-দরবেশের উদ্দেশ্যে ছুটিল। নৈশ অন্ধকারে তখন প্রকৃতি আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তত্রাচ ধর্ম্মই যেন তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া বলিয়া দিল যে "এই পথেই দরবেশ পলায়ন করিয়াছে।"

কতদূর অগ্রসর হইলেই তাহারা সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গভীর স্রোতস্বতী দেখিতে পাইল এবং উহার তীর ধরিয়া আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই একটা খেয়াঘাট পাওয়া গেল। তাহারা অনুসন্ধানে দেখিতে পারিল দরবেশ অতিশয় ব্যস্ততাসহকারে নৌকায় উঠিয়া চম্পট দেওয়ার আয়োজন করিতেছে। যেইমাত্র দেখা আর অমনি হস্তপদ বন্ধন এবং বেদম প্রহার—যখন 'খুন খুন' বলিয়া মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল, তখন বহু লোক সেই স্থানে জমায়েত হইয়া সবিস্ময়ে দেখিল দরবেশ শিরোমণি কেরামত আজ রক্তাক্ত ও খুনের দায়ে অপরাধী। দুই তিনজন গ্রাম্য পুলিশও সেই স্থানে আসিয়াছিল। তাহারা বন্ধনাবস্থায় দরবেশকে থানায় লইয়া চলিল। যথা সময়ে মোকদ্দমা রুজু হইল। বহু টাকা খরচ করিয়াও দরবেশ অব্যাহতি পাইল না। বিচারে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া তাহাকে শেষ কেরামতি জাহের করিতে হইল। নূরউদ্দীন খুনের সাহায্যকারী প্রমাণিত হওয়াতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাস দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

সেই হইতে শিকারপুর গ্রামের লোকেরা প্রতিজ্ঞা করিল কোন দরবেশ দেখিলেই তাহারা ঠেঙ্গাইবে।

ওয়ায়েজ উদ্দীন আহমদ

আবদুল লতিফ

মোসলেম উন্নতির সেই গৌরবময় যুগে যখন চতুর্দ্দিকে এসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়া আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করিতেছিল তখন মুসলমানগণ শুধু রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বরং শত শত মহাপণ্ডিত জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু হতভাগ্য আমরা সেই সকল মহাপণ্ডিতের অধিকাংশেরই নাম পর্য্যন্ত অবগত নহি। তাই আজ চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহামতি আবদুল লতিফের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক ও চিকিৎসাদর্শন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আবদুল লতিফ ১১৬২ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক এবনে আবু ওসেবা লিখিত পরিশিষ্ট সম্বলিত তাঁহার স্বরচিত জীবনস্মৃতি হইতে জানিতে পারা যায় তদানীন্তন বাগদাদের উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে প্রধানতঃ ব্যাকরণ, পবিত্র কোরাণ, আরবী কবিতা, ভাষাতত্ত্ব ও আইন শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল বিষয়ে গভীর পারদর্শিতা অর্জ্জন করতঃ আবদুল লতিফ প্রাকৃতিক দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন এবং বিদগ্ধমণ্ডলীর সহবাসসুখ লাভাশায় প্রথমতঃ মোসলে ও পরে দামাস্কাসে গমন করেন।

অতঃপর পণ্ডিত আবদুল লতিফ ক্রুসেড বিজয়ী মহাবীর গাজী সালাহউদ্দিনের উজীরের নিকট হইতে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করতঃ মিশরে গমন করেন। এইখানে তাহার [illegible] খ্যাতিসম্পন্ন মাইমুনাইদ পণ্ডিতগণের (Eagle of Doctors) সঙ্গলাভ ও তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে তিনি একটী বিদ্বজ্জন-সঙ্ঘ গঠন করেন এবং ইহারাই উত্তরকালে গাজী সালাহ উদ্দীন কর্তৃক ফেরজাসায় আহূত হইয়া তাঁহার পরিষদরূপে সৈন্য হইয়াছিলেন। আবদুল লতিফ বহুবৎসর যাবৎ কায়রো ও দামাস্কাসে এবং কিছুদিনের জন্য আলেপ্পো সহরে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বার্দ্ধক্যে ইনি প্রবল দেশ-ভ্রমনেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আর্ম্মিনিয়া ও এসিয়া মাইনরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে ইরাকে পালনার্থে মক্কাভিমুখে রওনী হওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় ১২৩১ সালে বাগদাদ নগরীতেই দেহ-ত্যাগ করেন।

আবদুল লতিফ এক জন প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু ও সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। ওসেবার মতে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহার অধিকাংশ অধুনালুপ্তপ্রায়। এডওয়ার্ড পোকোক (Edward Pocock)

কর্তৃক আবিষ্কৃত হস্তলিখিত "ইজিপ্টের বিস্তৃত বিবরণ" নামক দুই ভাগে বিভক্ত পুস্তক খানি বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত আ'ছে। অল্প-কোর্ডে অধ্যাপক হোরাইট ১৮০০ সালে ফরাসীতে এই গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

এ, মোহানী

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

ঘুরিয়ে গেল 'ফুলের ফসল' 'কুহু-কেকার' সরস গান।
ও'র আসরে নিঝুম হ'ল 'বেণু-বীণা'র মধুর তান।
হোলির মাঝে 'অভ্র আবীর' গভীর শোকে আঁজন-কাল।
সাঁজ না যেতে 'চীনের ধূপ'টী মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।
'হসন্তিকা'র সাদা হাসি প্রাণে আজি দেয় গো ব্যথা।
বুকের মাঝে ওম্‌রে ফিরে 'জন্মদুঃখী'র মর্ম্ম-কথা।
ভগ্ন আজি 'রঙমশাল' সাধের 'মণি-মঞ্জুষা';
কে পরাবে বাণীর অঙ্গে দেশ বিদেশের বেশ-ভূষা?
মক্কা কাশী রোম অলিম্পস্ বেথ্‌লেম আর সিনাই ঘুরে,
সকল তীর্থের 'তীর্থরেণু' আন্‌বে কে আর আঁজল পুরে?
গঙ্গা আর সে নিরঞ্জনা যম্ যম্ আর বর্ত্তন বারি
'তীর্থ-সলিল' নিত্য আনি বিলাবে আর কোন পূজারি?
বিশ্ববাণীর 'হোম্‌শিখা' কে রাখ্‌বে জেলে অতন্দ্রিত?
'তুলির লিখন' আঁক্‌বে কে আর বঙ্গপটে অনিন্দিত।
কাঁদ্‌ছে শোকে বঙ্গমাতা সত্যহারা অন্ধ তার।
শুদ্ধ ছন্দসরস্বতী বক্ষে শত দুঃখ ভার।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

হক্-বিচারী

একদা ছিল এক কৃষক, তার হ'ল প্রথম এক ছেলে। ছয় দিন যায়, মা বলে, ছেলের আকিকা করতে হয় কাল, মোল্লা হবে কে ?"

বাপ কহিল, "মোল্লা হবে সেই, যে দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে হক্-বিচারী ; কাল সকালে আমি মোল্লার খোঁজে বের হব।"

পরদিন খুব সকালে কৃষক মোল্লার খোঁজে বের হল।

কিছুদূর গেলে এক সুন্দর যুবক তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় চলেছ, বাহী ?"

"আমার ছেলের জন্ত একজন মোল্লা খুঁজি।"

"তা' আমি তোমার সে কাজ করে দিতে পারি।"

"আমি এমন মোল্লা চাই যে দুনিয়াতে সব চেয়ে হক্-বিচারী।"

"আমি তেমন মোল্লাই জুটিয়ে দিব।"

"আপনার মোল্লার নাম কি ?"

"আল্লা ; আমি জিবরাইল, আল্লা আমাকে জানতে পাঠিয়েছেন, তাঁকে দিয়ে কাজ চলে কিনা।"

"তবে বুঝি আর হ'ল না"

"কেন ? আল্লা ছাড়ে আসমানে সব চেয়ে হক্-বিচারী নন ?"

"আমার একটু সন্দেহ আছে, ফেরেস্তা সাহেব। দুনিয়ায় যা দেখেছি, ভাল লোককে তিনি দেন কেবল দুঃখ, আর মন্দ লোককে তিনি দেন যত মাল মাত্তা ; কি ক'রে তাঁকে হক্-বিচারী বলি ? বিদায়।" আবার কিছু দূর গেলে আর এক পথিকের সঙ্গে দেখা তার সাদা লম্বা দাড়ি, গায় খেল্লা, হাতে তসবী ; সে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছালাম আলায় কুম, কোথায় চলেছ, ভাই ?"

"ও আলায় কুম আচ্ছালাম, আমার ছেলের আকিকার জন্ত সব চেয়ে হক্-বিচারী মোল্লা খুঁজছি।"

"তবে আমিই ত সেই লোক। আমাকে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও, আমি মোল্লার কাজ খুব খুশী হয়েই করব এখন।"

"আপনি কে হুজুর, কেবলা ?"

"আমি শাহানশাহ তাইমুস ; আমার মত বড় দরবেশ আর কেউ নাই।"

"তবে ত আপনি সে হক্-বিচারী লোক নন, যাকে আমি চাই।"

"কেন—কেন ?"

"আমি চাই সব চেয়ে হক্-বিচারী মোল্লা, আর আপনি বলেন, আপনি দরবেশ তাইমুস।"

"বেশ ত, তাতে কি ?"

"তা'হলে ত আপনি হক্-বিচারী হতেই পারেন না—বদলোক চুরি, ডাকাতি, খুন করে, আপনার পায়ে পড়ে, আপনি দোওয়া ক'রে তাদিগকে বাঁচিয়ে দেন, অথচ ভাল লোকের জন্ত কোন দোওয়া করেন না, আবার কত লোক সারা জীবন তপায় কাজ করেছে, আপনি তোবা পড়িয়ে তাদিগকে বেহেস্তে পাঠিয়ে দেন, আপনাকে হক্-বিচারী বলি কেমনে ? আচ্ছালাম আলায় কুম।"

"ও আলায় কুম আচ্ছালাম" বলে দরবেশ চলে গেল, কৃষক আবার পথে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আবার দেখা হ'ল এক যুবকের সঙ্গে—তার চেহারা অতি ভীষণ, দেখলেই মনে ভয় হয়। সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ কৃষক ভায়া ?"

"হজুর যাচ্ছি এই, আমার ছেলের আকিকার জন্ত একজন মোল্লার খোঁজে। অনেক ক্ষণ হ'তে ঘুরছি, কাউকে পাচ্ছি না।"

"কি রকম মোল্লা তুমি চাও ?"

"যে দুনিয়ার সব চেঁয়ে হক্-বিচারী।"

"তবে আমিই সেই মোল্লা, চল তোমার ছেলের আকিকার আমি মোল্লাকী করব।"

"মনে রাখবেন, হজুর, আমি কিন্তু খোদাকেও পেয়েছিলাম, শাহানশাহ তাইমুরকেও পেয়েছিলাম, আপনি কি তাদের চেয়েও হক্-বিচারী ?"

"চল ভাই, চল, আমি সব চেয়ে হক্-বিচারী।"

"হজুরের এছমে শরিফ ?"

"আমি আজরাইল।"

"তবে আপনি হক্-বিচারী। আপনি ধনীকেও খাতির করেন না—গরীবকেও খাতির করেন না, আপনার তীক্ষ্ণ প্রহারে কুটীরেও দীন হীন, কাঙ্গাল মরে; সোনার শাহী তখ্ত ও সুলতান ঢলে পড়ে, আপনি মা'য়ের কোল হতে দুধের বাচ্চা কেড়ে নেন, আবার সাদা চুল শত বছরের বুড়াকেও ধরে নেন, আপনি সব চেয়ে হক্-বিচারী, আপনি কি আমার ছেলের আকিকা করবেন ?"

"হাঁ, আমি তা করব, চল যাই।"

তখন খুব ধুমধামে আকিকা হ'য়ে গেল। আজরাইল মোল্লাকী করলেন। আকিকা শেষে আজরাইল কৃষককে ডেকে বল্লেন, "তুমি ভাই আমাকে মোল্লা নিযুক্ত ক'রে আমার খুব সম্মান করেছ, কাজেই আমি তোমার একটা উপকার করতে চাই। তোমার একটা সম্মানী পেশা হ'লে ভাল হয় না ?"

"তাত হয় বটে, তবে—তবে—ত—"

"এর মধ্যে তবে টবে নাই, আজেন্সী, আমি যা ইচ্ছা করতে পারি। শোন, আমি ইচ্ছা করলে হীরা জহরতে তোমার ঘর ভরে দিতে পারতাম, আমি কেবল মজেই ওগুলি সব চলে আসত ; কিন্তু নাম কাম ভিন্ন টাকা পয়সা কিছুই নয়। তোমার নাম কাম টাকা কড়ি সবই হবে।"

"কিন্তু আমি যে একেবারে গরীব—চাষা ?

"হাঁ, এই মুহূর্ত্ত মধ্যে তুমি একজন হেকিম—দুনিয়াতে একেবারে সব চেয়ে বড় হেকিম"

"আমি যে কিছুই লেখা জানি না,—কোন দিন মাদ্রাসা মক্তবে পড়ি নাই।"

"তাতে কি আসে যায় ? ধনী সওদাগর এব্রাহীমের খুব অসুখ, তুমি সাহস করে

সেখানে যাও, যা ইচ্ছা তাই একটা বন্দোবস্ত করে, আর আীবন্ত ক'রে বল যে সে ভাল হ'য়ে যাবে। সে মরবে না, ভাল হ'য়ে অবশ্য বলবে যে তুমিই তার জান বাঁচিয়েছ, কাজেই সে তোমাকে বহু টাকা কড়িও দিবে, এদিকে তোমার নামও হবে।"

"কিন্তু অন্য রোগীদের সম্বন্ধে ?"

"যখনই তোমাকে কেউ কোন রোগী দেখতে ডাকে, রোগীর মাথার দিক, আর পায়ের দিক খুব নজর ক'রে দেখে নিও। যদি আমি রোগীর পায়ের কাছে থাকি, তবে বলো যে রোগী মরবে না, আর যদি আমি রোগীর মাথার কাছে থাকি, তবে জানিও রোগীর আর রক্ষা নাই, তখন দেখবে তোমার কোন ঔষধ পত্রেই কাজে আসবে না।"

"তখন কৃষক সওদাগরি এস্রাইলের কাছে গেল এবং যখন সব হেকিমরা যে আর বাঁচবে না বলে হা'ল ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করেছে, তখন সে তাকে ভাল ক'রে ফেল। ওহ! বনের আগুনের মত তখন তার যশ ছাওয়ার আগে আগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—সকলেই তার কথা আলাপ করে আর বলে, "কি তাজ্জব হেকিম, রোগী দেখেই বলে দেয় সে বাঁচবে কি মরবে !"

কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই চাষা হেকিম খুব ধনী ও মানী হয়ে উঠল,—মালদার, সদাগর, জমিদার, কাজী, মুফতী, উজির, এমন কি সুলতান নিজের একটু অসুখ হলেই তাকে ডাকেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়; এমনি ক'রে কত বছর চলে গেল; চাষা হেকিম বুড়া হ'ল, কিন্তু তার যশ তেমনি রয়ে গেল এবং রোজ সে শুকুরগুজারী করত যে কি শুভক্ষণেই সে মোল্লা পোঁজে বের হয়েছিল !

এক দিন সে তার বাগানের একটা বড় জলপাই গাছতলে বসে আছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ?"

"কেন তবে কি তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ?"

"আমার চোখ এখন ঘোলা হ'য়ে এসেছে কি না ?"

"কিন্তু তবু তুমি আমাকে চিনতে পার, যখন তোমার রোগীর কাছে আমি থাকি।"

"অহঃ! হুজুর এসেছেন ? তছলিম গোস্তাকী মাফ করুন। হুজুরের কি হুকুম ?"

"তোমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে, এখন যাত্রার জন্য তয়ের হও।"

"যাত্রা—মৃত্যু—এখন ?"

"হাঁ, এখনই।"

"উহ! মেহেরবাণী করুন, মেহেরবাণী করুন, হজরত! কয়েকটা দিন সবুর করুন। মোটে কয়েকটা দিন—আচ্ছা আগামী কাল।"

এই বলে হেকিম আজরাইলের পায়ে পড়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগল, রুদ্ধ কণ্ঠে বল, "আচ্ছা, ছেলেটা আজিকার আপনি মোল্লাকী করেছেন, তারই মুখ চেয়ে কয়টা দিন সবুর করুন, আমি তার বিয়ে করিয়ে দিন দুনিয়া ছাড়তে চাই। দয়া, দয়া, হজরত একটু দয়া।"

বাজী-খাওয়া সিংহাসনটাকে ঠিক ক'রে বস্‌তে, আর এ দিকে খলিফা-জাদাটী সিংহাসন ছেড়ে একদম দে দৌড়, চাহে ত লিয়াণ্ডিসের মত ঝড়ের রাতেও ডার্ডানেলিস সাতরিয়ে পার হ'য়ে সটান এসিয়া মাইনরে! সেখানে আবার কোন্ হিরোর উদ্দেশ্যে এ অভিযান হ'ল ভায়া?" বুঝিলাম, এ তোরের ঝগড়ার প্রতিশোধ; কিন্তু অকারণে এত লোকের মধ্যে হঠাৎ খেলাফতের কথাটা এমন হাল্‌কা ভাবে সে বলিল, একটু ক্ষুব্ধ হইলাম, গম্ভীর ভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "ছি! তোমার সবখানেই ছেলে-মানুষি, ভবেশ!" সে তাহার স্বাভাবিক শয়তানী হাসির এক ঝলক ছড়াইয়া আরও হাল্‌কা, চড়া সুরে কহিল, "ইস! ইস! বুড়া ভাই সাহেব আমার; তোমরা কাগজে লিখতে পারেন, আমরা বল্লেই ছেলে মানুষ হ'লেম আর কি?" দেখিলাম, সে বুড়া ভদ্রলোক ভবেশের অঙ্গ স্পর্শে একটু উষ্ণ হইয়া সরিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের "মোহাম্মদী"তে রয়টারের খবর বড় বড় হরফে লেখা—"তুর্ক যুবরাজের সিংহাসনের দাবী ছাড়িয়া পলায়ন—ব্রিটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজধানীতে পুনরাগমন।" বুঝিলাম, এ চোরা ঘা আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ভদ্রলোককেই মারা হইতেছে। ভদ্রলোকের দিকে এতক্ষণ চাই নাই; এখন দেখিলাম, ঢিলা পায়জামা, সাদা আচকান পরা একটী সাধারণ বেশধারী লোক, লম্বায় পাঁচ হাতের অন্যূন, মোজাহীন পায়ে বিলাট নাগরাই জুতা, মাথায় অষ্ট্রখানের পশমবহুল টুপী, হাতে একখানি মোটা শুরুভার লাঠী, গাল বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু বয়োমলিন, চিন্তা-বন্ধুর, উন্নত ললাটের নীচে কোটরপ্রবিষ্ঠ চক্ষু দুইটীতে আগুন জ্বলিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি খেলাফতের কথাটা চাপা দিবার জন্য যেন অন্যমনস্কভাবে ভবেশকে বলিলাম, "কি জানি ভাই, ও সব রাজা-বাদশাদের কথা দিয়ে আমাদের দরকার কি?" ভবেশ চক্ষুর কোণে তেমনি ক্রূর হাসির উৎস সৃষ্টি করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এত যদি দরকার নাই, আজ্ঞে মহাশয়, তবে তোরের বেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে গরম চা টা ঠাণ্ডা করা হ'ল কেন, শুনি?" আমি আপোষের সুরে কহিলাম, "আমি ঘাট মানছি, ভাই, আমার জাতির অতীত গৌরব মহিমার স্মৃতি নিয়ে ঝগড়া ক'রে আমার বর্ত্তমান সম্পদ, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ভবেশ হনুমানজীর বন্ধুত্ব-গৌরবের কথা তুলে যাওয়া ঠিক হয় নাই।" ভবেশের উত্তর দিতে দেরী হয় না, কিন্তু ইতিমধ্যে পাশের ভদ্রলোকটী তাঁহার বিশাল বাহুর দশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা আঙ্গুল বিশিষ্ট হাতখানি ভবেশের কাঁধের উপর রাখিয়া, তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাবে, ভাই?" স্বর দূরাগত সমুদ্র-নিনাদের মত গম্ভীর, অথচ কোমল, যেন কণ্ঠ হইতে না উঠিয়া বুকের তল হইতে ধ্বনিত হইল, মর্ম্মের স্নেহব্যথা লইয়া। কাঁধে হাত পড়া মাত্র ভবেশ একটু চঞ্চল হইয়া উষ্ণভাবে কি বলিতে যাইতেছিল; প্রশ্ন শুনিয়া তাহা বলা হইল না, মুখ তুলিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটীর দিকে চাহিয়া ভবেশ যেন একটু অপ্রস্তুত, ভীত হইয়া ধীরে কহিল, "আমরা যাদুঘরে যাব।" ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন, "আমিও যাদুঘর দেখতে যাচ্ছি; তা বেশ কথা ব'লে

যাওয়া যাবে। হাঁ, তোমার ঐ কথাটার জবাব দেই, তুর্ক যুবরাজ সিংহাসন ছেড়ে পলাচ্ছেন কেন যদি কোরাণ শরিফের ভাষায় এর জবাব দেই, তবে বলব, ঘরটায় খাঁটি সংবাদই দিয়াছেন, সিংহাসন আল্লার দান; মানুষ তা ঘুরে ফেলে ভুলে চ'লে যায়, আমরা বলি, তা'রা সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। আল্লার দান র'য়ে যায়, মানুষ তার অবস্থার পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু এই যে তুর্ক যুবরাজ কনষ্টান্টিনোপল হ'তে পালাচ্ছেন, এর মানে অন্যরূপ। আমরা ছোট বেলায় মাদ্রাসায় পড়েছিলাম, এক বাদশার খানসামা ঘর ঝাড় দিতে দিতে বাদশার শয্যার লোভ সামলাতে না পেরে তাতে শুয়ে পড়ে, চাহে কি ঘুমিয়েই পড়ে। পাঁচ মিনিটও ঘুম হয় নাই, বাদশার কাছে সংবাদ গেল, তিনি হুকুম দিলেন, "আভি এছকা লাঙ্গা পিঠপর পচাছ ঘোর্রা লাগাও।" বাদশার সামনে গোলামের পোলা পিঠে জল্লাদের নির্ম্মম কশাঘাত পড়তে শুরু হল— গোলাম যত চাবুক খায় ততই হাসে। বাদশা কৌতূহলী হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বল্ল, "শাহী শুয়্যার পাঁচ মিনিট ঘুমের এই শাস্তি আর হুজুর যে তা'তে চিরদিন ঘুমিয়েও এমন খোশ খেয়ালে দিন গুজরাচ্ছেন, এই পরিণাম-শূন্যতায় দৃশ্যে আমি হাসি সম্বরণ করতে পাচ্ছি না।" সেই দিনই বাদশা তাঁর শাহী পোষাক ছুড়ে ফেলে দিয়ে দরবেশ-বেশে জঙ্গলে গেলেন। তুর্ক যুবরাজ যখন দেখলেন, মিত্রশক্তির অভিভাবকত্বে রাজত্ব ক'রে পাঁচ দিনেই খলিফার এই অবস্থা, তখন তাঁর শাহী পোষাক ছেড়ে এসিয়া মাইনরের জঙ্গলে পলায়ন চেষ্টা কি এতই বিস্ময়কর?" বক্তার স্বর শেষ দিকে গাঢ়, কম্পিত ও বেদনাপ্লুত হইয়া উঠিল। আমি নীরব বিস্ময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিলাম, ভবেশ অপরাধীর মত চুপটী করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। ভদ্রলোক থামিয়া ঢোক গিলিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া যেন ক্ষণিকের দুর্ব্বলতাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিলেন এবং আবার ভবেশের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁ, ভোরে তোমাদের কি নিয়ে ঝগড়া হ'য়েছিল?" ভবেশ নির্ব্বাক্; আমি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "না আমাদের ও বাস্তবিক ঝগড়া নয়, চা'র টেবিলে ব'সে আমরা এই খেলাফত আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করছিলাম; একটা না একটা আলোচনা রোজ ভোরে এমনি ক'রে থাকি।" ভদ্রলোক কহিলেন, "হাঁ তা বেশ, নাস্তার সময় দেশের ধনের কথা নিয়ে একটু আলোচনা করা ভাল, তবে চা'র টেবিলে খেলাফতের আলোচনাটা ভাল মানায় না; তা থাক, তোমাদের তর্ক হচ্ছিল কি নিয়ে?" ভবেশ শেষ কথাগুলির দিকে নজর না দিয়ে একটু অধৈর্য্যের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তা চা'র টেবিলে খেলাফতের কথা উঠাটা এমন দোষের কি, খাঁ সাহেব?" ভবেশ লম্বা চৌড়া জোয়ান মানুষ দেখিলেই সিদ্ধান্ত করে তিনি খাঁ সাহেব; এস্থলেও ভবেশ জানিত না, তিনি খাঁ সাহেব কিনা, বোধ হয় নহেন, কারণ খাঁ সাহেব সম্বোধনে ভদ্রলোকটী একটু মৃদু হাসিলেন। ভবেশের উষ্ণতার কারণ বুঝিলাম। তাহার হাল সভ্যতার এক মুখস্থ আর্য্য এই যে ভোরে চা খেতেই হবে, এবং চা'র টেবিলে সংবাদপত্র নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। এ সত্য যে

সে কেবল নিজেই বহাল রাখতে চেষ্টা করিত, এখন নয়, পরিচিত মহলে দস্তরমত প্রচার করিত। ভদ্রলোক তেমনি গাঢ়, মর্ম্মমাখা সুরে কহিলেন, "চা'র টেবিলে আলোচনায় খেলাফতের কোন হোঁয়াচে রোগের আশঙ্কা আমি করি নাই, ভাই; তবে বলি এই যে যেখানে মেছুয়াবাজারের গুণ্ডাদের ও বড় বাজারের পকেটকাটাদের কীর্ত্তির আলোচনাই বেশী হয়, সেখানে খেলাফতের মত গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয় না।" ভবেশ কহিল, "পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে যে বড় যুদ্ধ, তা'র পাঁচটা বছরের দিনকার খবর দিন আমরা এই চা'র টেবিলে পড়লাম, আর আপনার সামান্য খেলাফত বিষয়টা সেখানে হয় না, এ আবার পৃথিবীতে এক নূতন আবিষ্কার বটে। এই মহাযুদ্ধে যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল, ইসলামের জন্ম হ'তে এ পর্য্যন্ত মুসলমানরা এতগুলি যুদ্ধ করেছে কি? ভবেশের সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে কথা বলার অভ্যাস আছে, তবু তাহার আজকার কথাগুলি শুনিয়া বিরক্তি বোধ করিলাম। ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার অক্ষিপ্রকোষ্ঠে চক্ষু-তারকা দুইটী অগ্নি-গোলকের মত জ্বলিতেছে। ভাবিলাম, এই "খাঁ সাহেব" যদি এখন ভবেশকে পুতুলের মত তুলিয়া এক আছাড়ে হাড় চুরমার করিয়া দেয়, তবে তার সাধের চা'র টেবিলে গল্পবাধ কে প্রচার করিবে? কিন্তু ভদ্রলোক তাহা না করিয়া কেবল মাথা উঁচু করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, টুপিখানা খুলিয়া বাঁহাতে লইয়া একটু পাকাড়া দিলেন এবং বুকে দুই হাত আড়া আড়ি ভাবে রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটী কি যুবক?" আমি কহিলাম "রশিদ।" "রোজ একত্র চা খাও কি ক'রে?" "সি, এম, এস, কলেজ হোষ্টেলে আমরা পাশাপাশি কামরায় থাকি।" "হিন্দু-মুসলমান?" "হাঁ, সেখানে একই বন্দোবস্ত; শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, বৌদ্ধ-খৃষ্টানও আছে।" ভদ্রলোক আবেগ-ভ'রে কহিলেন, "খোদাকা গজব (১) পেয়া হ্যায় (২) ইয়ে জমিন পর! এক মায়ের বুকে বাস করে একই মায়ের স্তন্য পান ক'রে এরা একত্র হ'তে পারে নাই, একত্র করছে এদের কে খৃষ্টান পাদরী! • • • বাইবেলও বুঝি পড়?"

আমি। রোজ আধ ঘণ্টা।

ভদ্রলোক। ইংলণ্ডের ইতিহাস?

আমি। অনেক আগে পড়েছি।

ভদ্রলোক। রামায়ণ, মহাভারত? তাও বুঝি পড়েছ?

আমি। বাংলাদেশে জন্মে এগুলি না পড়া আমি পাপ মনে করি।

ভদ্রলোক। মূর্খ! আর মুসলমান হয়ে মুসলমান জাতির কথাটাকে ভুলে থাকাই তুমি পুণ্য মনে কর! হিন্দু খৃষ্টানের হাত হ'তে আজীবন ভিক্ষুকের মত দান শুধু গ্রহণই করছ, দান করতে শিখ নাই; অথচ তোমরাই একদিন ছিলে জগতের— • • হাঁ, তোমরা না যাদুঘরে যাচ্ছিলে?"

ভবেশ। হাঁ, • • আমি খেলাফতের কথাটা ব'লে অন্যায় করছি, খাঁ সাহেব, আমায় মাফ করবেন।

(১) গজব = অভিশাপ। (২) পেয়া হ্যায় = পড়িয়াছে।

ভদ্রলোক। কিছু অন্যায় কর নাই। চল যাদুঘরে আমি তোমাকে দুই একটা ছবি দেখাব।

ভবেশ। কিসের ছবি স্যার সাহেব?

ভদ্রলোক। ছবি সে নয়, ভবেশ; দেখার মত ছবি এখানে কোথায় পাব? তবে তোমার সঙ্গী বন্ধুর জাতীয় গৌরব-সমাধির দুই একখানা ভাঙ্গা পাথর এখানে ছুটে এসে পড়েছে, তাই তোমাদিগকে দেখাব।

ট্রাম হইতে নামিয়া তিন জন ধীরপাদ-বিক্ষেপে যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম। কাহারও মুখে কথা নাই; ভদ্রলোক যাদুকরের মত শুধু ইসারায় আমাদিগকে চালিত করিয়া যাদুঘরে ঢুকিলেন? অবাক হইয়া বিচিত্র চিত্র-মালা দেখিতে লাগিলাম। সমাধির মত নীরব গম্ভীর ঘর, চারিদিকে দেওয়ালে জীবন্ত মৌন চিত্ররাশি থরে থরে সাজান—বাদশা, আমির, সিপাই, সওদাগর, আলেম, ফাজেল, সব মৌন; সবই এমন নিদ্রার আবেশে অচেতন—যেন প্রতীক্ষায় আছে, কোন্ ইসরাফিল কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর শিঙ্গা ফুকারিয়া ডাকিবেন, 'জাগ, মুসলমান, জাগ', আর অমনি বাদশা তাঁর শূন্য সিংহাসনে উঠিয়া বসিবেন, ওমরাহ-গণ আমরুল কায়েসের কসিদা, হাফেজের গজল, রুমীর মসনবী, গোলেস্তানের বয়েত ঝঙ্কারে মজলিস গুলজার করিয়া তুলিবেন; সিপাহীর দৃঢ়মুষ্টিতে তীর, বল্লম, ঢাল, তলোয়ার নাচিয়া উঠিবে, সওদাগর পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে তাঁর কিস্তিখানা অজানিত দরিয়ার ভাসাইয়া দিবেন, আলেম ফাজেল ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন আলোচনায় মাদ্রাসা মসজিদ গরম করিয়া তুলিবেন। হায়! কবে সে শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে?

ভবেশ আমাকে ইসারায় কাছে নিয়া একটা ছবি দেখাইয়া কহিল, "এই দেখ, আরবের মরুভূমির কি একটা চমৎকার দৃশ্য। মনে হয়, কৃষ্ণ বাবুর সেই কথা 'আরবদেশ প্রকৃতির ভীষণ লীলাভূমি', আর মনে করে দেখ, ট্যালিসম্যানের সেই স্কচ যুবরাজের মরু সাগরের পারে একাকী যাত্রা। উঃ! ইনি দেখছি, আরও ভীষণ লোক, সারে পাঁচ হাত লম্বা জোয়ান, সাধারণ বেশ, বলিষ্ঠ দেহের গর্ব্বে এই অগ্নিবর্ষী সূর্য্যের নীচে অবলীলাক্রমে জলন্ত বালুকার উপর দিয়ে গাধা টেনে নিয়া যাচ্ছেন, গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছেন একটী ছোট মানুষ, বোধ হয় এঁর ছেলে কি ভাই হবে।" ভদ্রলোক বোধ হয়, কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি উৎসাহে কহিয়া উঠিলেন, "তোমরা বড় ভুল করলে, ভবেশ,রমিষ; ছবিটা উপভোগ করতে পেলে না—হাঁ, এ একটা চমৎকার ছবি বটে কিন্তু এ মরুদৃশ্যের জন্য নয়। (গাধাচালকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি কে, জান?—ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরৎ ওমর (রা) (১)। এ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। আজনাদিনের যুদ্ধে রোমক সৈন্য মুসলমান সৈন্য হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেছে; প্যালেস্তাইন এখন মুসলমান সেনাপতি আমরের পদতলে, জেরুজালেম কিছু কাল বাধা দিয়ে সন্ধিপ্রার্থী,

(১) রাঃ—রাজি আল্লাহু তালা আনহু—আল্লা তাঁহার উপর প্রসন্ন হউন।

কিন্তু প্রধান পুরোহিত (১) জেরুজালেম স্বয়ং খলিফা ভিন্ন আর কারো হাতে ছেড়ে দিতে নারাজ ; সংবাদ পেয়ে খলিফা—শান শওকত (২) নাই, ফৌজফরমাঁবরদার (৩) নাই—এই দেখ একটী মাত্র গোলাম নিয়ে জেরুজালেম যাত্রা করেছেন ; পথ মরুকঙ্করময়—পাঁচ শত মাইলের উপর, সঙ্গে একটী মাত্র গাধা, তার পিঠে কখনো নিজে চড়েন, গোলাম টেনে নিয়ে যায়, কখনো গোলাম চড়ে, নিজে টেনে চলেন। পথে জাবেয়াতে সন্ধিপ্রার্থী খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ খলিফার শুভাগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন ; তথায় পৌছাকালে গোলাম গাধায় চড়ে যাওয়া ও খলিফার গাধা টেনে নেওয়ার পালা পড়েছিল, হজরৎ তাই করেছিলেন। জাবেয়াতে পৌছা মাত্র রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণ এসে অভিবাদন করলেন, খলিফার এক হাত গাধার লাগাম ধরা, অন্য হাতে তাঁদেরকে অভয় দিলেন, অথচ ইনিই মিসর, সিরিয়া, পারস্য-বিজয়ী ইসলামের পরাক্রান্ত মহিমান্বিত খলিফা। এঁকেই মদিনার এক খেজুর গাছতলে একা নিরুদ্বেগে ঘুমাতে দেখে রোমক রাজদূত বিস্ময়-ভক্তি-বিনত শীরে বলেছিলেন, "হা, ইনি বিবেকের অভেদ্য বর্ম্মে সুরক্ষিত। আমাদের সম্রাটের মত এর শান্ত্রীর দরকার হবে কেন ? জেরুজালেমে পৌছে খৃষ্টান প্রধান পুরোহিত ও খলিফা এক সঙ্গে জেরুজালেমের অতীত ইতিহাস আলোচনা করতে করতে মগরেবের (৪) সময় কেয়ামত গির্জ্জায় (৫) উপনীত হলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু সেখানেই হজরৎকে নামাজ পড়তে অনুরোধ করলেন, হজরৎ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "না—না, না ; কারণ আজ যদি আমি এই গির্জ্জায় নামাজ পড়ি, তবে আমার অনুকরণে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ সন্ধির সর্ত্ত (৬) ভঙ্গ করতে পারে।" দীর্ঘ মরুপথে খলিফার একাকী যাত্রা শুধু এই একবার নয়। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন উত্তর আরব ও সিরিয়ার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত নরনারীর আর্ত্ত ক্রন্দন খলিফার সুদূর আবাস মদিনায় পৌছে, তখন তিনি সেই ৭০ বৎসর বয়সে আবার একটী মাত্র চাকর সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া যাত্রা করেন এবং স্বহস্তে শুশ্রূষায় অক্লান্ত পরিশ্রমে জনগণের দুঃখ-নিবারণ করেন।

আমি নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের মত ভদ্রলোকের কথা শুনিতেছিলাম ; স্বর আবেগ, তেজ ও গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত হইয়া যেন ঝঙ্কারিয়া ফিরিতেছিল।

তবেশ আর একটী ছবির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার ছবি খাঁ সাহেব ?" শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতক ! বিশ্বাসঘাতক ! ওর নীচে লিখে রাখ, 'ধর্ম্মদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক।' ভদ্রলোক ছবিটীর দিকে তাকাইয়াই উত্তেজিত

(১) প্রধান পুরোহিত—Patriarch. (২) শান-শওকত—ধুমধাম। (৩) ফরমাঁবরদার—আদেশ-পালনকারী ভৃত্য। (৪) মগরেব—সূর্য্যাস্ত, (৫) কেয়ামত গির্জ্জা—Church of Resurrection. (৬) মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে পালন করিতে পারিবে, খলিফা সন্ধি-পত্রে এই সর্ত্ত মঞ্জুর করেন। আরব জাতির ইতিহাস—আমীর আলী—পৃঃ ৩১, ৪০—ইসলামের প্রচার (The Preaching of Islam)— আরনল্ড (T. W. Arnold) পৃঃ ৪১

কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই বৃদ্ধ ইসলামের অন্যতম চিরশত্রু—এই মহাপাপী হজরৎ ওসমানের (রাঃ) আমলে সিরিয়ার শাসনকর্তারূপে অবৈধ উপায়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, পরে খলিফা হজরৎ আলি (রাঃ) তা'র এই পাপ অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করায় সে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয়। (১) এই ধূর্ত্ত ছিফিনের যুদ্ধে বার বার হজরৎ আলীর (রাঃ) নিকট পরাজিত হ'য়ে শেষে বয়সের আগে কোরাণ শরীফ বেঁধে যুদ্ধ নিবারণ করতঃ আশ্রয়প্রার্থী হয়। তারপর?—অবসর পেয়েই, "মার অরি পার যে প্রকারে।" এরই ইঙ্গিতে গুপ্তঘাতকের হস্তে হজরৎ আলী (রাঃ)র জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়, কৌশলে সিংহাসন অধিকার ক'রে এই-ই মৃত্যুকালে ওমরাহদিগকে ডেকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ক'রে। এই দেখ এজিদকে খলিফার সিংহাসনে বসিয়ে যাচ্ছে। হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) (২) যে গণতন্ত্রের (৩) প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছিলেন, যে গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রথম চারি খলিফা নির্ব্বাচিত হ'য়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করেন, ঐ দেখ এ পাপিষ্ঠ ইসলামের সেই বড় সাধের গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করছে। পিতৃপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রে পুত্র এজিদ হজরৎ হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। একা রইলেন হজরৎ হোসেন—জনগণের প্রিয় হজরৎ আলীর (রাঃ) পুত্র, হাসান মাবিয়ার সন্ধিসূত্রে সিংহাসনের অধিকারী, সুতরাং তার রক্ত কারবালার রক্তবন্যা হ'ল। শুধু তাই নয়; মাবিয়া আজ ইসলাম জগতে যে গৃহবিবাদের আগুন জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে এরই শিখায় উত্তর কালে মুসলমানের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হয়েছে।"

ভদ্রলোক উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মাবিয়ার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে-ই আর একটী ছবি দেখাইয়া তিনি কহিল, "এই দেখ রশিদ, রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন।" দেখিলাম, তাই ত! তেজস্বী ঘোর কৃষ্ণ তাজীতে হাতিয়ার বাঁধা আরবীর সওয়ার, এক হাতে লাঙ্গা তলোয়ার, অন্য হাতে দীর্ঘ বল্লম, অশ্বের বক্ষ পর্য্যন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত; সম্মুখে অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে, আটলান্টিকের তরঙ্গের পর তরঙ্গ গর্জ্জিয়া আসিয়া উটভূমিতে প্রহত হইয়া সশব্দে বাষ্পফেনরূপে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। উন্মত্ত তাজী যেন বয়ারোধ ছিন্ন করিয়া অবহেলে ফেনার ধূলি উড়াইতে উড়াইতে তরঙ্গমালার উপর ছুটিয়া যাইতে পরিব্যস্ত। ভদ্রলোক পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ আমাদের নিকট থামিয়া কহিলেন, "হাঁ, এইটা চিত্র বটে, আফ্রিকা-বিজয়ী মহাবীর ওকবা, প্রাচীন কার্থেজের অদূরে বিশ্বাসঘাতক রোমক সৈন্য বিধ্বস্ত ক'রে দুর্দ্ধর্ষ বারবার দমনে রত (৪)। দিগ্বিজয়ী আরব বীর সব বাধা অতিক্রম ক'রে আটলান্টিক দর্শনে ক্ষুণ্ণ মনে ধাবমান অশ্ব সাগর-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিয়ে দুই হাত আকাশের দিকে তুলে বলছেন, "সর্ব্বশক্তিমান আল্লা! এই দরিয়া আজ পথরোধ ক'রে না দাঁড়ালে, তোমার

(১) ৬৫৩ খৃষ্টাব্দ। (২) দঃ—দরুদ, ছাল্লাল্লাহু আলায়হে-ওছাল্লাম—তাঁহার উপর শান্তি হউক।

(৩) গণতন্ত্র - Democracy. হজরতের উপদেশানুযায়ী তাঁহার প্রথম খলিফাগণ আরবের জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। (৪) ৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে আরও দূরতর দেশে প্রবেশ করতাম।" কথার শেষ দিকটা ভদ্রলোক দুই হাত আন্দোলিত করিয়া এমন ভঙ্গিতে, এমন উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন যে, সেই স্বর নীরব প্রকোষ্ঠে শব্দায়মান হইয়া দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্ববৎ পায়চারি করিতে লাগিলেন। আমি নীরব বিস্ময়ে একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া আবার ছবিটার দিকে নজর করিলাম। বোধ হইল, একবার সেই দীর্ঘ বল্লম খানা তুলিয়া ধরিয়াছে যেন বলিতে চায়, "যদি দুনিয়ার শেষজন শেষ হ'য়ে থাকে, তবে আটলান্টিকের অতল গর্ভে মুখ লুকাই"; বোধ হইল, ওকবার হাত দুইখানি তেমনি আকাশের দিকে প্রসারিত, কিন্তু তা যেন আল্লার দরবারে অভিযোগ মোসলেম বীরের শেষ প্রার্থনা, "দীন (১) দুনিয়ার মালীক যদি দুনিয়ায় মুসলমানের স্থান নাই—তার "দীনের" কাজ করবার জন্যেও নয়—তবে এই দুনিয়ার তাকে আশ্রয় দাও।" পাশে ভবেশের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ফিরিয়া শুনিলাম সে উদাস ভাবে হাত দুইখানি বুকে রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছে—

"আরবের পারস্যের কি দশা এখন ?"

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক কাছে আসিলেন, তখন তিনি শান্ত, কিন্তু কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ছিল। ভবেশ একটু যেন ভয়ে ভয়ে তাঁহার দিকে তাহার সুন্দর ছোট মুখের করুণ চক্ষু দুইটী তুলিয়া চাহিল। ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রতিভ হইলেন, এক হাতে রুমালে ললাট মুছিতে মুছিতে অন্য হাতখানা ভবেশের কাঁধের উপর রাখিয়া প্রসন্ন মুখে কহিলেন, 'না ভাই, আর তোমাদিগকে এ ভূতপ্রেতের ছবি দেখিয়ে ভয় দেখাব না।" ভয়ের নামে ভবেশ লজ্জিত হইল; কারণ ভয় সে কিছু পাইয়াছিল, খাঁ সাহেবের ঐ বিরাট আবেগময়ী কল্পিত দেহখানি দেখিয়া—বিশেষ করিয়া, যখন তিনি প্রাচীনকালের সমস্ত রোমাঞ্চ গায়ে মাখাইয়া এন্সেন্ট মেরিনারের (Ancient mariner) মত আসিয়া তাঁহার কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইলেন। ভবেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না—না, এ ভূতপ্রেতের ছবি হবে কেন? এ ত অতি সুন্দর ছবি, এতে ভয়ের কি আছে?" আস্তে ভবেশের পিঠে একটা চাপড় দিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "তবে তোমার খুব সাহস আছে, ভবেশ, আমি স্বীকার করছি। আমি কিন্তু ভাই, এ ভূতগুলি দেখে ভয় পাই; দেখলে ত এখনি কেমন অস্থির হ'য়ে পরেছিলাম। ঐ যে একটা আমার দুর্ব্বলতা, সে আর আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। এই হাতে আমি অনেক মানুষ খুন করেছি—দুই শতের উপর (ভবেশ আবার একটু চঞ্চল হইয়া খাঁ সাহেবের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল) —ভয় নাই, ভাই, আমি ডাকাতি করতে এ খুন করি নাই, যুদ্ধ করতে খুন করেছি—কোন দিন ভয় পাই নাই; আমাকে আমাদের কেল্লার সিপাইরা রহমত খাঁ না ব'লে আজরাইল খাঁ বলে ডাকত; কিন্তু ঐ ছবিগুলির দিকে যখন চাই, তখন আর আমি ঠিক থাকতে পারি না; তোমাদের মানুষ মরলে ভূত হয় শুনেছি, এ ছবিগুলি যেন অতীত মুসলমানের প্রেতাত্মারূপে আমায় ঘিরে ধরে অস্থির করে তোলে।" আমি বিস্ময়ে রহমত

(১) দীন—ধর্ম্ম।

খাঁর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এখনও কি সিপাইগিরি করেন?" খাঁসাহেব কহিলেন, "না ভাই, এ আমি অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি।" ভবেশ পুনরপি জিজ্ঞাসিল, "কেন?" খাঁ সাহেব বলিলেন, "বিশেষ কোন কারণ নাই, তবে ভাল লাগল না। শেষ আফগান যুদ্ধে যখন লড়াই করতে যাই, তখন আমার একটী ভাইও আমার সঙ্গে লড়াই করছিল। পেশোয়ার পার হয়ে গিয়ে আমরা কাবুলের পথে ছাউনি ফেলেছিলাম; রাত্রিতে একদল আফগান আমাদের ছাউনি আক্রমণ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, অনেককে হত্যা করে; ভোরে আমার ছোট ভাই দস্তে খাঁর লাশ ছাউনীর অদূরে পাওয়া গেল। বেলা দশটায় আফগানদের সঙ্গে আমাদের লড়াই শুরু হল। যুদ্ধের আগে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধু এসে আমাকে কি বলতে চাইল, কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় সাহস করল না, শুধু বিদায় নিয়ে গেল; তা'রা বুঝেছিল সেদিন আমি ছাউনিতে জীবন্ত ফিরে আসতে তলোয়ার খুলি নাই। যুদ্ধে বহু পাঠানকে হত্যা করলাম; অবশেষে পাঠান রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নপর হ'ল। একটী পলায়নপর পাঠানের একহাত তলোয়ারের এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেল্লাম, তলোয়ারের ডগা তার উদরে বিঁধে গেল; আমি ভূপতিত পাঠানের বুকে বসে খঞ্জর বের করলাম, ইচ্ছা ছিল, ভ্রাতৃহত্যা প্রতিহিংসা-পিপাসা মিটাতে অনেক রক্ত পান করেছি—এদিনের জন্য এই শেষ চুমুক। কিন্তু ইতিমধ্যে একদল গোরা-সৈন্য এসে আমাকে বাধা দিয়ে বল্ল, "ডাগনে-ওয়ালাকো খুন করনে কা হুকুম নেহি।" অমন খুন যে করতে নাই, তা আমার অজানা ছিল না; কিন্তু ওদিন সে হুকুম আমি তামিল করি নাই, কেন না আবার ছাউনীতে ফিরে এসে ঐ হুকুমের তাবেদার হব, এমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সামনে গোরাসৈন্য অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে নিকট আনন্দে পাঠানের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপভোগ করতে লাগলাম। কয়েকজন গোরাসৈন্য চারদিকে তেমনি দাঁড়িয়েছিল পাঠান আমাকে লক্ষ্য ক'রে বল্ল, "ভাই, হামকো জরা পানি পিলাও।" দুশমনকে পানি? আমি দাঁড়িয়েই রইলাম, একজন গোরা পানির খোঁজে গেল; পাঠান আমাকে তার কাছে যেতে ইসারা করল, আমি একটু ঝুঁকে পড়তেই গোরারা না শোনে এমনিভাবে ফিস ফিস করে বল্ল, 'মরনেকী ওয়াক্ত মেরা ইমানকো কাহে খারাপ করতে হো, ভাই? মুছলমান কী হাতসে মেরা জান গিরা হাজারো শুকোর (১), আভি মুছলমানকী হাতছে মুজকো আখেরী (২) পেয়ালা পিনে দেও।" সেইদিন ছাউনীতে ফিরে কর্ণেল সাহেবকে বন্দুক তলোয়ার বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় হ'লাম; সকলে বলাবলি করল, "রহমত খাঁ ভাই কি গমখারিছে দেওয়ানা বন গিয়া।" আমি ভাবলাম, "মেরেলিয়ে ওহি আচ্ছা থা।" সেদিকে রহমত খাঁর স্বর কাঁপিয়া উঠিল। আমরা নীরবে শুনিতেছিলাম, নীরবই রহিলাম। রহমত খাঁ যেন একটু দম লইয়া বেশ একটু

(১) শুকোর—খোদাকে ধন্যবাদ।　　(২) আখেরী—শেষ।

চেষ্টা করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা তোমরা জোয়ান মানুষ আমার গল্প শুনে যদি এমন চুপ হয়ে যাও, তবে আমি বুড়া মানুষ কি করব, বল দেখি ?" আমি কহিলাম, "আমাদের বাঙ্গালীদের ভাগ্যে এমন লড়াইয়ের গল্প বড় জোটে না, খাঁ সাহেব, তাই অবাক হয়েই শুনতে হয়।" ভবেশ এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি এখন কি করেন, খাঁ সাহেব ?" খাঁসাহেব বলিলেন, "এখন কি করি ? একেবারে খাড়া বেহইনগিরি যাকে বলে। মা বাপ, ভরা বাচ্চা সব একে একে চলে গেছে যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম সহোদর ছিল তার সঙ্গে একত্র কলেজ ছেড়ে বাড়ী হ'তে পালিয়ে বেড়াইয়ে যাই, সেও আর নাই ; কাজেই এখন দেশ ঘুরে বেড়াই ; তবে পেটের ভাতটা জুটিয়ে নিতে কলকাতায় একটা কাবুলী কাপড়ের দোকান করেছি, নিজ দেশ পঞ্জাবে ও কাপড় বিকিয়ে লাভ নাই। ছয়মাস গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কাপড় বিক্রি করি, আর ছয় মাস কলকাতা থাকি, দু একখানা বই নাড়াচাড়া করি, বছরে একবার পেশোয়ারে গিয়ে কাপড় নিয়ে আসি।" ভবেশ বলিল, "আবার সেই ছাউনীর কাছে ? তবে বোধ হয় ভাইয়ের কবর দেখাও একটা উদ্দেশ্য ?" খাঁ সাহেব কহিলেন, "হাঁ, ভাইয়ের কবর জিয়ারত করি বটে ; * * * আর যে পাঠানটা আমার হাতে শহিদ হয়, তার কবরটাও জিয়ারত করি।" খাঁ সাহেব আবার গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। ভবেশ তাঁহাকে প্রফুল্ল করার উদ্দেশে কহিল, "কিন্তু খাঁ সাহেব আপনি আজ যে ছবিগুলি দেখালেন, তা চমৎকার—অতি চমৎকার আনন্দদায়ক ছবি, এমন আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।" রহমত খাঁর মুখটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রতি কথায় তীব্র শ্লেষ ভরিয়া কহিলেন ; "হাঁ, তোমার কাছে এ ছবিগুলি আনন্দদায়কই হবে বটে, বিশেষ করে তুমি যখন মুসলমান, তাতে আবার কলেজে পড়া বিদ্বান ; কিন্তু কোন কোন মূর্খ মুসলমানকে বলতে শুনেছি, এগুলি দেখে নাকি তাদের চোখ ফেটে রক্তের অশ্রুপাত হতে চায়।" আমি অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি সংশোধনার্থে কহিলাম, "মাফ করবেন খাঁ সাহেব ; আমি বলতে চেয়েছিলাম, এ ছবিগুলি আমাদের পরম গৌরবের বিষয়।" খাঁ সাহেব, "দেখ মুসলমান যুবক, তুমি আর যাই কর, এ ছবিগুলিকে এমন করে অপমান করবে, এ কিন্তু আমি সইতে পারব না।" "আমি অপমান করেছি, খাঁ সাহেব ? এগুলি যে আমি মাথায় তুলে নিচ্ছি ; এ যে আমাদের জাতীয় একটা পরম গৌরব ! যাদের পূর্ব্বপুরুষের এমন কীর্ত্তি আছে, তা'রা জগতের যে কোন জাতির সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সে কীর্ত্তি ঘোষণা করতে পারে।" খাঁ সাহেব "হাঁ সে পারে, যাদের বলবার মুখ আছে, তারা পারে, কিন্তু কেবল তারাই পারে ; তোমার কি আছে, মুসলমান, যে তুমিও সে গৌরবগাথা কীর্ত্তনের অধিকারী হবে ? তুমি আজ নিজ কর্ম্মদোষে, হীন, দীন, পথের কাঙ্গাল, সর্ব্বস্বহারা, দুনিয়ার দরবার ভিখারী ; তোমার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই ; জগতের ঘৃণ্যতম জীব হ'য়ে তুমি

কোন্ সাহসে তাঁদের নাম করছ, যাঁদের গৌরব-রশ্মিজালে একদিন সমগ্র জগত আলোকিত ছিল? না, তা হবে না, রশিদ মিঞা, তুমি পরিচয় দিয়ে এমন করে তাঁদের পিতৃত্বের অবমাননা করতে পারবে না; তা যদি কর, তাঁদের মৃত্যু-স্পর্শপাংশু মুখও লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে, তাঁদের অপমানচকিত আত্মা কবরের তল ভেদ করে আরও নীচে সেঁধিয়ে যাবে। আর এ যে মিথ্যা পরিচয়! সে কীর্ত্তিমান দেববংশের কি আর কেউ আছে? নাই—সব সাফ হয়ে গেছে! এখন যারা তাদের নামে চলতে চায়, তারা কপটাচারী, মিথ্যাবাদী, দুরাচার। আরও একটা কথা মনে রেখো ভাই—এ মিথ্যা অহঙ্কারে মুসলমানের আর পোষাবে না। কেবল পিতার নাম নিয়ে একটা মানুষেরই চলে না, একটা জাতির চলবে কি করে? ভেবে দেখ আজ যুগযুগান্তর হতে মুসলমান কেবল "ছিল"র অহঙ্কারেই মেতে আছে; কি হয়েছে সে অনুভূতি নাই, কি হতে পারে, সে উদ্যম নাই। যার চোখ ছানি পড়ে অন্ধ হয়েছে তার সম্বন্ধে শুধু এই একটা আশার কথা আছে যে, সে আবার চোখ ফিরে পেতে পারে; কিন্তু সে যদি ছানি না কেটে কেবলই ব'লে বেড়ায় যে, এক সময়ে তার চোখের সামনে অণুবীক্ষণবিজয়ী জীবাণু ধরা পড়ত, তবে তার কথায় বড় জোর কেউ একটা আধটা, আফ্‌সোসের উহু! আহা! করতে পারে, তা ছাড়া জন্মান্ধের সঙ্গে তার দুঃখের তারতম্য কি?"

ভবেশ সোৎসাহে কহিল, "ঠিক বলেছেন, খাঁ সাহেব, আমাদেরও তাই হয়েছে; একদিন যে ব্রাহ্মণের আশ্রম রাজামহারাজের তীর্থভূমি ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণ সন্তান শুধু পৈতার গোছাই দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ধনীর দুয়ারে দিবে বেড়ায়, অথচ একদিন এই ব্রাহ্মণের তপস্যা বলে স্বয়ং ব্রহ্মার আসনও টলে উঠেছে; একদিন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরনিবদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্তরীক্ষের কক্ষে কক্ষে বিহার ক'রে নব নব জ্যোতিষ্ক, নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা সৃষ্টির রহস্য ভেদ করেছে, আজ সেই ব্রাহ্মণ সন্তানের উন্নত দৃষ্টি অবনত হ'য়ে, অন্তরীক্ষ ছেড়ে মানুষের করতল আশ্রয় করেছে, কর্ণ অর্জ্জুনের বংশধরেরা আর দুর্গদ্বাররক্ষী নহে, এখন তা'রা ধনীর প্রাসাদের দুয়ারী অথচ বুলি হিন্দু মুসলমান দুজনের মুখে একই!

"আমরা অমুক রাজার নাতি,
আমাদেরই দ্বারে বাধা ছিল আগে—
একশত এক হাতী।"

(ক্রমশঃ)

খাজা

হজরত মোহাম্মদের জীবনে প্রাণের প্রতিধ্বনি

মহাপুরুষের জীবন চিরদিন মানুষের নিকটে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বস্তুরূপেই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সত্য-সুমহান জীবন অনন্যসাধারণ ত্যাগমহিমায় উজ্জ্বল কিরণে জ্যোতিষ্মান হইয়া হিমালয়ের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, মানুষ তাঁহার চরণ-তলে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় সম্ভ্রম-ভরে নত হইয়া আছে। তাঁহার অঙ্গ হইতে প্রেম-করুণা ও সত্য-প্রেরণা সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া মানব-জীবনের উষর ভূমি সরস করিয়াছে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জীবন-পোষণ শ্যামল শস্যের সৃষ্টি দিয়াছে, তাপিত কণ্ঠ স্নিগ্ধ করিতে শীতল সলিল দিকে দিকে বিতরণ করিয়াছে, কিন্তু মানুষ কখনও তাহার সংসার-জীবনের ক্ষেত্রে চত্বরে ও বিপনি বাজারে তাঁহাকে একান্তরূপে লাভ করে নাই। সাধনা ও মহিমার বাহিরে সংসারের যে মানব-প্রাণ মাতৃস্নেহে বাৎসল্যরসে বিগলিত হয় প্রবাসগামী সন্তানের জন্য করুণ বেদনায় কম্পিত হয়, কন্যা আত্মীয়ের শয্যা-শিয়রে বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে ও প্রাণ-প্রিয়ের বিয়োগ-ব্যথায় নীরবে অশ্রুপাত করে,—যে প্রাণ আশায় উল্লসিত ও আনন্দে প্রফুল্ল হয়, সুখ-দুঃখের শত স্বরে ওতপ্রোতভাবে মানুষের যে একান্ত নিজস্ব প্রাণ তাহার প্রতিধ্বনি সাধারণতঃ মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

মহাপুরুষের ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি মানুষকে উদ্ধার করিয়া যেন চিরদিন মানব-সংসারের উপরে ও বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে,—তাহা হিমালয়ের মত গম্ভীর, সাগরের মত বিশাল ও আকাশের মত উন্নত; তাহা শুধু সত্য, শুধু ত্যাগ, কেবল সাধনা ও মহিমা।—তাঁহার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ শুধু কৃতজ্ঞতা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অপরিসীম সম্ভ্রম।

মহাপুরুষ বিরাট ভাবে সত্যের মত তুলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মানুষ তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া আপনার গৃহবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার নিভৃত অন্তঃপুরে মহাপুরুষ কখনও প্রবেশ করেন নাই। মানুষ মহা-পুরুষের জীবনের মধ্যে আত্মজীবনের ছবি দেখিবার সাহস পায় নাই। আপনার রস-রক্তের প্রবাহ মধ্যে মহাপুরুষের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিবার অধিকার সে লাভ করে নাই। মহাপুরুষের ত্যাগদীপ্ত ও সাধন-কঠোর বিরাট জীবন মানবোন্নতির সর্ব্বপ্রধান সহায়ক বটে, তাঁহার মহামহিম উন্নত জীবন মানুষকে নিরন্তর উচ্চ স্তরে আকর্ষণ করিতেছে, তথাপি যেন সময় সময় মানুষের দুর্ব্বল প্রাণ তাঁহার একা তার জন্যই ক্রন্দন করে; যেন ধ্যানের মৌনতা ভাঙ্গিয়া শচী-মাতার বিলাপধ্বনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, শুদ্ধোদনের শোক-কাতর মুখ মনের মধ্যে করুণা বেদনা জাগাইয়া দেয়।

সেবা, ত্যাগ, প্রেম ও আত্মদান মানুষের মহামহিম স্বার্থকতা বটে, তথাপি মানুষের মধ্যে একটি করুণ কোমল হৃদয় আছে, তাহাও যে স্রষ্টার দান; তাহাকে যতই

অন্তরালে রাখি, যতই উপদেশ দেই, যতই তাহাকে সাধনায় ফেলিয়া পেষণ করি ও গৈরিক বসন পরাইয়া দেই, তথাপি তাহা আছে,—কিছুতেই তাহা মরিয়া যায় না,—কিছুতেই তাহার স্পন্দন রুদ্ধ হয় না। তাহারই সঙ্গে মহাপুরুষের সম্বন্ধ চাই। নহিলে তাঁহার সহিত মানুষের প্রাণের যোগ নিবিড় ও পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। তাই মহাপুরুষকে নমস্কার করিয়াই প্রাণের তৃপ্তি হয় না; তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার হাস্যধ্বনি শুনিতে চাই, পুত্রের বিয়োগ-ব্যথায় তাঁহার বিষণ্ণ মুখেরও প্রয়োজন আছে।

হজরত মোহাম্মদের জীবন-কথা চিন্তা করিলে মানুষ তাহার সম্ভ্রম-নত নয়ন তুলিয়া কৌতূহলে তাকাইতে পারে। তাঁহার জীবনের মধ্যে মানবপ্রাণের বড় মধুর প্রতিধ্বনি আছে। তিনি সত্যের দুর্জ্জয় সাধনা করিয়াছিলেন, ত্যাগের মহিমায় তাঁহারও জীবন উজ্জ্বল হইয়া আছে; প্রেমে তিনিও মানুষের জন্য অনাহারে রোদন করিতেন। তথাপি কেবল গম্ভীর ও দুরূহ ধ্যান-লোকেই তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধনার সুমহান শৈলচূড় হইতে তিনি মানব-সংসারের সমতলে নামিয়া মানুষের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে দূরন্বিত ধ্যান গম্ভীর সাধকমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের অংশভাগী গৃহবাসী আপন জন, জনগণের আনন্দ ও অশ্রু-জল তাঁহার অশ্রু ও আনন্দের সহিত মিশ্রিত হইতেছে; মানুষের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া তাহার সমুদয় ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে উন্নত জীবনের প্রেরণা দিতেছেন।

হজরত মোহাম্মদ একদিন মণ্ডলী মধ্যে বসিয়াছিলেন, হয়ত তখন কত প্রয়োজনীয় পরামর্শ চলিতেছিল, জীবনের কত গম্ভীর বিষয় তিনি উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা দর্শনে তিনি আকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'মা, আমার মা।" কণ্ঠ তাঁহার স্নেহাপ্লুত, বক্ষ তাঁহার উচ্ছ্বসিত, নয়ন তাঁহার আনন্দোল্লাসে সমুজ্জ্বল।

এই মহিলা তাঁহার ধাত্রী-মাতা হালিমা, মাতৃহারা হইয়া শৈশবে তিনি ইঁহারই প্রাণের পীযূষ পান করিয়া মানুষ হইয়াছিলেন। ইঁহারই ক্রোড়ে শৈশবের ক্রীড়াদল ও এই বক্ষই আতঙ্কানের আশ্রয় ছিল, এই নয়নই কত রজনী বিনিদ্র হইয়া চাহিয়া থাকিত,—মহাপুরুষ বহুদিন পরে সেই পালয়িত্রী ধাত্রী মাতাকে দেখিয়া স্নেহাবেগে আলিঙ্গন করিলেন, আপনার অঙ্গাবরণ বসিবার জন্য বিছাইয়া দিলেন, প্রেমাবেগে বলিলেন, "মা, আমার মা।" সেদিন সেই আশৈশবের মাতৃহারা মহিমান্বিত মহাপুরুষের স্বরে বিশ্বের যুগ যুগ শত শত অনাথ শিশুর কোমল প্রাণের করুণ ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেদিন বুঝি বিশ্বের যত ব্রতধারিণী জননীপ্রাণ সেই স্নেহের স্বরে সন্তানের অধীর মমতার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আনন্দ ভরে দুলিয়াছিল!

মহিমান্বিত মহাপুরুষের এই মাতৃস্নেহ, এই স্নেহের আকুলতা—আকুল অনুরাগ, ইহা কত মধুর! কত মনোহর!—মানব-মনের কি সুধা-মাধুরীরই না এ প্রকাশ! এ মাধুরী তাঁহার জীবনে শত ছন্দে লীলায়িত হইয়াছে,—

নানাভাবে তাঁহার মানব-প্রাণ আপনাকে প্রকাশ করিয়া মানুষের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধের সন্ধান দিয়াছে।

হোনায়েনের রণবাদ্য তখন নিয়াছে। শত্রুদল বিতাড়িত হইয়াছে, ছয় সহস্র শত্রু মোস্‌লেম-হস্তে বন্দী। সহচরমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া হজরত তাহাদের ভাগ্য-বিচারে নিযুক্ত আছেন, মন্ত্রণা-সভা চিন্তা যুক্তি ও পরামর্শের গম্ভীরতায় ছাইয়া আছে। এমন সময় বন্দী-দলের মধ্য হইতে একটি মহিলা বলিয়া উঠিলেন, 'হজরত আমি আপনার ভগ্নী—আপনার ধাত্রী-মাতা হালিমার কন্যা।' মুহূর্ত্তে মন্ত্রণা-সভার গাম্ভীর্য্য মধুরতায় ভাসিয়া গেল, হজরত কোমল কণ্ঠে মধু ঝরিয়া ধাত্রী-দুহিতার নিদর্শন চাহিলেন। তখন সেই মহিলাকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করা হইল, বন্দিনী মহাপুরুষের প্রাণের এক বড় করুণ কোমল পর্দ্দায় আঘাত করিলেন, মধুর এক জীবন-স্মৃতি বন্দিনী-বাকো হজরতের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল: তিনি স্বীয় পৃষ্ঠবস্ত্র তুলিয়া এক ক্ষত চিহ্ন দেখাইলেন, বলিলেন, "শিশুকালে একদিন আপনাকে পিঠে করিয়া রাখিয়াছিলাম, আপনি আমার পিঠে দংশন করিয়াছিলেন,—এই সেই চিহ্ন।"—পলকে রণস্থল মন্ত্রণা-সভা অদৃশ্য হইল, বর্ত্তমান অতীতে ডুবিল, মহা-জীবনের সাধনা ও মহিমা ছাপাইয়া মানব-জীবনের চিরসরল স্বভাবসুন্দর শৈশবজীবন সুখস্মৃতির ইন্দ্রজালে রঙ্গীন হইয়া মনের নয়নে ভাসিয়া উঠিল।

হজরত দেখিলেন সেই শৈশব—সোনার শৈশব—মান অভিমানের শত ছন্দ, রোষ-ক্রন্দন, আনন্দ-লীলা ও কল-গুঞ্জন, কত ভাবে ধাবন-কুর্দ্দন, সোহাগ-বিরাগ—কত স্মৃতি-সুমধুর, কত আনন্দে ভরপুর।—সেই সোনার শৈশব-সঙ্গিনী বিরাগ-ভাগিনী সোহাগকারিণী সম্মুখে,—আদরে তিনি আপন অঙ্গের চাদর বিছাইয়া বসিতে দিলেন, সানুরাগে তাঁহাকে সঙ্গে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন, তাহাতে তিনি অসম্মত হইলে বহু ধন উপহারে তৃপ্ত করিয়া আপন পরিবারে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

মানুষ দেখিল মহাপুরুষেরও শৈশব আছে, মানব শিশুর স্বাভাবিক সোহাগ-বিরাগ ও মান-অভিমান তাঁহারও জীবনে লীলায়িত হয়, শৈশব-স্মৃতির পুষ্প-পরশে তাঁহারও প্রাণের কোমল পর্দ্দায় ঝঙ্কার উঠে। জীবন-ব্যাপী সাধনা-শেষে সিদ্ধার্থ যখন দেশে ফিরিয়া পরিবারবর্গকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তখন বহু কাল পরে শৈশব যৌবনের অঙ্গন দেখিয়া আনন্দের কোন হিল্লোল দুরন্ত বীণাধ্বনির মত তাঁহার প্রাণে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা অথবা নবী পুত্র পরিজনের মুখ দেখিয়া তাঁহার চক্ষু উল্লাসে ক্ষণিকের তরেও উজ্জ্বল হইয়াছিল কিনা তাহা বলিবার উপায় নাই। হয়ত সেই সাধনা সিদ্ধ সত্যাধিকারী মহাপুরুষের প্রাণে এই সমস্ত মানবসুলভ সাধারণ চিন্তা আদৌ প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তাঁহার সত্য সমুজ্জ্বল চিরশান্ত মহিমামণ্ডিত বদন মণ্ডলের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বিরহ-কাতর পরিজনদিগের সহিত মানুষ নিশ্চয় প্রাণের নিভৃত কোণে অতি সঙ্কোচে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে, মানুষের স্নেহ-ক্ষুধাতুর অন্তর ভ্রষ্টা সম্ভ্রমে জ্ঞানের মাণিক লইতে লইতে মুখ ফিরাইয়া গোপনে একবিন্দু অশ্রু মুছিয়াছে। এই জন্য মরুভূমির মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের প্রাণের এই প্রীতি মানব-প্রাণে বড় মধুর প্রতিধ্বনি তুলে, প্রীতির কোমলতা মানব-প্রাণ মধুর ভাবে স্পর্শ করিয়া সত্যের প্রতি উন্মুখ করিয়া দেয়।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

অ-ভূষণা

রূপ দিল ঐ হৃদয়ে পাখী
বসন—আকাশ নীল,
আকাশতরা তারা দিল
চেলীর ঝিলিমিল্।
কেশ দিল মেঘ কাজল কালো
বেণী ভুজঙ্গী,
তনুলতা—তিলোত্তমা
নয়ন কুরঙ্গী।
কুন্দ-চারু দন্তরুচি
অধর—বাঁধুলি,
রূপে দিল জ্যোতির ছটা
সান্ধ্য গোধূলি।
লজ্জা দিল লজ্জাবতী
গতি করেণু,
কণ্ঠে দিল মধুর ভাষা
বাণীর-ই বেণু।
হাসির ভাতি বিভোর পাতি
ভ্রমর—আঁখি-তারা,
বক্ষে দিল ফুলেরি মৌ
প্রেমের মধু-ধারা।
শ্রীমুখ দিল শারদ কমল
ভুরু—কামের ধনু,
শোভার আধার ধারা—শোভা
দিল অণু অণু।
কে গড়িল এই নারীরে
যেন পটের ছবি,
অ-ভূষণার রূপ নেহারে
অবাক্ হয়ে কবি।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার

খেলাফৎ বিবরণ

ইসলাম ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-গুরুগণকে যেমন ইমাম উপাধিতে ভূষিত করা হইত সেইরূপ ইসলাম রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজ-শক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণকে খলিফা নামে সম্মানিত করা হইত। আরবীয় অধ্যাপকগণ যেরূপ খলিফা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে বুঝা যায় উহার অর্থ উত্তরাধিকারী. অর্থাৎ হজরৎ মোহাম্মদের তিরোভাবের পর হইতে পারম্পর্য্যক্রমে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ সর্ব্বপ্রধান ইসলাম রাজ-শক্তি ও ধর্ম্মাচার্য্য-শক্তির যাঁহারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাই খলিফা নামে অভিহিত হইবেন।

যিনি ইসলাম জগতের খলিফা-পদে অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহাকে ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরতিশয় সংযমী হইতে হইবে। ইসলাম ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধানানুসারে দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার তাঁহার থাকিলেও কোন-রূপ ব্যসন-বিলাসের অধিকার তাঁহার আদৌ নাই। ইসলাম ধর্ম্ম-রাজ্য হইতে সংগৃহীত ধনসম্পত্তি তিনি সযত্নে রক্ষা করিবেন এবং তাহার সৎব্যয়ের সুব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার সংসার পরিচালনের জন্য তিনি উপযুক্ত বৃত্তি পাইবেন মাত্র; ইহা ব্যতীত উক্ত রাজকোষের ধন-সম্পত্তিতে তাঁহার আর কোনই অধিকার নাই; ধর্ম্ম-রাজ্যে হিতকর বিধানসমূহ প্রবর্ত্তন করতঃ তিনি সুশাসন দ্বারা অপক্ষ-পাতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। একণে চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ইসলামীয় খেলাফৎ অর্থাৎ ধর্ম্ম-রাজ্যের খলিফাগণের স্কন্ধে কিরূপ গুরুভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। এই খলিফা-রাজত্ব প্রজা-তন্ত্র রাজত্বের রূপান্তর মাত্র। কারণ বংশ-পারম্পর্য্যে খলিফাধিকার আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। উহা নির্ব্বাচনের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। প্রথম খলিফা চতুষ্টয় এইরূপেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরে পঞ্চম খলিফা খেলাফতী পরিত্যাগ করিলে ইসলাম ধর্ম্মরাজ্য নামে খেলাফৎ থাকিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে সুলতনতে পরিণত হইয়াছিল। ইসলামের পতনের ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই খেলাফৎ ব্যাপদেশে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস পৈশাচিক কাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ পরে বুঝিতে পারিবেন। খলিফা ও এমামগণের জন্য কুচক্রিদিগের সুতীক্ষ্ণ ছোরা ও কালকূট সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

হজরৎ মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের রাজধানী সর্ব্ব প্রথমে মদিনানগরে সংস্থাপিত হইয়াছিল। চতুর্থ খলিফা বীর-কেশরী আলির খেলাফতের শেষভাগে উহা কুফা নগরে আনিত হইয়াছিল।

গুপ্ত-ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে হজরৎ আলি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্যাত্মা হাসেন ইসলাম ধর্ম্ম-রাজ্যের খলিফা পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন কিন্তু

ষড়যন্ত্রকারিদিগের কুচক্রে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া হজরৎ মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্য মাবিয়ার অনুকূলে এই সর্ত্তে খেলাফত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে মাবিয়ার অন্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহানুভব হাসান খলিফা-পদে বরিত হইবেন। মহাত্মা হাসান নিরতিশয় ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে খেলাফত আর অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। ইহা অল্প দিনের মধ্যেই ভোগবিলাস-পূর্ণ সুলতানতে পরিণত হইবে। সুতরাং খলিফা-পদ পরিত্যাগ করতঃ তিনি ইসলাম জগতের এমাম পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের পোপ যেমন প্রধান ধর্ম্মগুরু সেইরূপ ইসলাম ধর্ম্ম-জগতে এমাম সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন।

পুণ্যাত্মা হাসান মাবিয়া অনুকূলে খেলাফত পরিত্যাগ করিলে উক্ত মাবিয়া কর্ত্তৃক খেলাফতের রাজধানী শাম প্রদেশের অন্তর্গত দামস্ক নগরে অপসারিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে খেলাফত সুলতানৎ অর্থাৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নামে খলিফা থাকিলেও তৎকাল হইতে পরবর্ত্তী কালের খলিফাগণ সম্রাটের ন্যায় ব্যসনবিলাসে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় হইতে হজরৎ মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র-মূলক ধর্ম্ম-রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। দামস্ক নগরের খলিফাগণকে উম্মীয় বংশীয় খলিফা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

হিজরীর ৪১ অব্দ হইতে ১৩০ অব্দ পর্য্যন্ত দামস্ক নগরে উম্মীয় খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে উহা আব্বাস বংশের হস্তগত হইলে তৎবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা সম্রাট আল মন্‌সুর দামস্ক নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইরাক প্রদেশস্থ বোগদাদ মহানগরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বোগদাদ নগরের খলিফা-গণকে আব্বাসীয় খলিফা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই নগরে বহু কাল যাবৎ খেলাফতের রাজধানী অবস্থিত ছিল।

মুসলমান জাতির পতনের অপরাপর কারণের মধ্যে খেলাফৎ সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব যে একটি প্রধান কারণ তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আরবীয় ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে এই খেলাফৎ লইয়া অনেক সময়ে প্রভূত শোণিতপাত হইয়া গিয়াছে। যেরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে অধিকাংশ খলিফাগণ নিহত হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। শোণিতাঙ্কিত ও বিষাক্ত অক্ষরে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হজরৎ মোহাম্মদের তিরোভাব হইলে হিজরীর একাদশ অব্দে হজরৎ আবুবকর সিদ্দিক ইসলাম ধর্ম্ম-রাজ্যের খলিফা-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরৎ মোহাম্মদের একজন প্রগাঢ় ভক্ত ও প্রধান অনুগামী শিষ্য ছিলেন। ইনিই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী অতুলনীয়া রূপবতী বিবি আয়েশার পিতা ছিলেন। ইনি দুই বৎসর তিন মাস দশ দিন কাল খলিফা-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হিজরীর ত্রয়োদশ অব্দে জমাদিওল সানির দ্বাবিংশতি দিবসে তেষট্টি বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। হজরৎ মোহাম্মদের তিরোভাবের দুই বৎসর পরে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে কোর-আন শরীফের সুরা

সকল একত্রিত করতঃ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। (১) হজরৎ মোহাম্মদের সমাধি পীঠের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল। এই সময়ে খেলাফতের রাজধানী মদিনা নগরে ছিল।

প্রথম খলিফার লোকান্তরের পরে হিজরী ত্রয়োদশ অব্দের শেষ ভাগে হজরৎ ওমর খলিফা-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বের একত্রিত কোর-আন শরিফ হজরৎ মোহাম্মদের পত্নী বিবি হাফজার নিকটে পেটিকাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি দশ বৎসর আট মাস চারি দিবস কাল খলিফা ছিলেন। ইঁহার সময়ে ইসলাম ধর্ম্মের বহুল প্রসার ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইনি একজন প্রভূত শক্তিশালী খলিফা ছিলেন। হিজরীর ত্রয়োবিংশতি অব্দের শেষ ভাগে উপাসনা কালে ফিরোজী নামক একজন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে ইনি নিহত হইয়াছিলেন। ইনিও তেষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খলিফার হত্যার পরে হজরৎ ওসমান গণি খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে হজরত মোহাম্মদের প্রচারিত মূল কোর-আন শরীফ নানারূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাস্থানে ব্যবহৃত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে তিনি বিবি হাফজার পেটিকায় সংরক্ষিত কোর-আন শরীফ অবলম্বনে তাহা বিশুদ্ধ ভাবে সঙ্কলনপূর্ব্বক উপযুক্ত লোক দ্বারা তাহার সাতখানি অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া সমস্ত মুসলমান রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত প্রমাদপূর্ণ কোর-আন সমূহ সংগ্রহ করতঃ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কোর-আন শরিফের বিশুদ্ধ সঙ্কলন করায় ইনি "জামেউল কোর-আন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় একাদশ বৎসর কাল খলিফা থাকিয়া হিজরীর ৩৪ অব্দে জিলহজ্জ মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে শুক্রবার প্রায় বিরাশি বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার শাসন কার্য্যে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা নিহত হন।

তৃতীয় খলিফা নিহত হইলে, হজরৎ আলি ইসলাম ধর্ম্মরাজ্যের খলিফা-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সুস্থিরচিত্তে খেলাফতের কার্য্য করিতে পারেন নাই। কারণ সেই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রবল শত্রু বর্ত্তমান হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বিবি আয়েশা, তালহা, জোবায়ের ও আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়া সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

হজরৎ মোহাম্মদের প্রিয়তমা কন্যা বিবি ফাতেমার সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের প্রতি বিবি আয়েশা কখনই সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরে হজরৎ মোহাম্মদের তিরোভাব হইলে তিনি প্রকাশ্য ভাবেই শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা আলি খলিফা পদে নির্ব্বাচিত হইলে উপরি উক্ত তালহা ও জোবায়ের নামক দুই প্রধান ব্যক্তি কুফা ও বসোরার শাসন কর্ত্তৃত্ব তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলে মদিনা হইতে মক্কায় গমনপূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া বীর-কেশরী

১। Gibbon's "Decline and Fall of the Roman Empire".

আলি সসৈন্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বসোরায় গমন-পূর্ব্বক স্বীয় দল পুষ্টি করতঃ খলিফা-সৈন্যের সম্মুখীন হন। এদিকে বিবি আয়েশা মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া তালহা ও জোবায়েরের সহিত যোগ দেন। বসোরার নিকটবর্ত্তী খোরাইল নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বিবি আয়েশা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক হজরৎ আলির বিরুদ্ধে স্বয়ং সৈন্য-চালনা করিয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত যুদ্ধ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক "উষ্ট্র-সমর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে তালহা ও জোবায়ের নিহত এবং বিবি আয়েশা বন্দিনী হন। কিন্তু মহাত্মা আলি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অসদ্ব্যবহার করেন নাই। মাত্র তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে মৃদু ভৎর্সনা করতঃ বিদায় দিয়াছিলেন। মোহাম্মদ নামে উক্ত বিবির এক ভাই ছিলেন, তিনি এ সুযোগে ভগ্নীকে ধরিয়া বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও পুরুষ রক্ষী দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টিত করতঃ স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। (১)

হজরৎ আলি যে সময়ে খেলাফত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়া শাম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি স্বয়ং খলিফা-পদ প্রাপ্তির আশায় মহাত্মা আলির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সিফিন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। কথিত আছে এই যুদ্ধে হজরৎ আলির পক্ষীয় পঁচিশ সহস্র এবং মাবিয়ার পক্ষীয় পঁয়তাল্লিশ সহস্র লোক নিহত হইয়াছিল। মহাত্মা আলি যুদ্ধে জয়লাভ করায় মাবিয়া পরাজিত হইয়া এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় সৈনিক পুরুষগণের হস্তস্থিত বর্শার অগ্রভাগে কোর-আন শরিফের আয়েত বন্ধনপূর্ব্বক কতকগুলি সৈন্যসহ পুনরায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মপরায়ণ আলি কোর-আন শরিফের সম্মান রক্ষার জন্য পুনরায় মাবিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছিল। আবু মুসা আন্‌সারী ও আমর্ যথাক্রমে হজরৎ আলি ও মাবিয়ার পক্ষের প্রতিনিধি মীমাংসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমর একজন অত্যন্ত কৌশলী লোক ছিলেন। তিনি আবু মুসার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে উভয়ের মধ্যে কাহারও আর খলিফাপদে নিযুক্ত করা হইবে না। এ জন্য আবু মুসা সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—"আমি আলিকে খলিফা-পদ হইতে বিচ্যুত করিলাম।" পরে আমর দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—"আমি এই প্রস্তাবনা স্বীকার করিলাম এবং মাবিয়াকে খলিফা-পদে নিযুক্ত করিলাম।" কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে আবু মুসা হজরৎ আলির সহিত বাহ্যিক বন্ধুত্ব দেখাইলেও তিনি আন্তরিক তাঁহার শত্রু ছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইরূপ চাতুরী-মূলক মীমাংসায় যুদ্ধের অবসান না হইয়া পুনরায় উহার আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময়ে মাবিয়ার ষড়যন্ত্রে হজরৎ

১ Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire Voll v.

আলীকে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল, সুতরাং মাবিয়া বীয় উদ্দেশ্যসাধনে যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন।

মাবিয়ার সহিত প্রথম যুদ্ধে হজরৎ আলী শত্রুগণকে এককালে ধ্বংস না করায় এবং মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া মীমাংসায় সম্মত হওয়ায় তাঁহার পক্ষীয় বারশত সহস্র অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরে আট সহস্র লোক পুনরায় তাঁহার দলবদ্ধ হইয়াছিল। অবশিষ্ট চারি সহস্র লোক নহরেওয়ান প্রদেশে গমনপূর্ব্বক তত্রত্যবাসিদের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদিগকেই খারিজী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

নহরেওয়ান প্রদেশে খারিজিদিগের অত্যাচারের সংবাদ অবগত হইয়া হজরৎ আলি সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়াছিলেন। মাত্র নয় জন পলায়ন করিয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতেই হজরৎ আলি ইসলাম ধর্ম্মের এমাম পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে হিজরির ৩৪ অব্দে খলিফা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি নিরতিশয় পরার্থপরায়ণ ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদারতা ও ত্যাগস্বীকার তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তাঁহার চরিত্রে কখনই কোনরূপ বিকৃত ভাব দৃষ্ট হয় নাই। তিনি সমাজ মধ্যে অতীব বিনীত হইলেও সমরক্ষেত্রে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় রণ-কুশল সেনাপতি আর দ্বিতীয় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রণ-ক্ষেত্রে তাঁহার অমিত পরাক্রম দৃষ্টে ইসলাম সম্প্রদায়ের জনসাধারণ অতীব বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে "বীর-কেশরী" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

তিনি হজরৎ মোহাম্মদের বংশ সম্ভূত নিকট জ্ঞাতি ছিলেন; এবং সম্পর্কে জ্ঞাতি-ভ্রাতা হইলেও দশবৎসর বয়ক্রম হইতে তাঁহার শিষ্য ও পুত্ররূপে একই সংসারে প্রতিপালিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু স্বীকার করতঃ পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং আজীবন ছায়ারূপে গুরুদেব ও পালক পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব কার্য্যেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। গুরুর জন্য তিনি স্বীয় প্রাণ বলি দিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা আলীর অসাধারণ চরিত্রগুণে প্রীত হইয়া হজরৎ মোহাম্মদ তাঁহার প্রাণাধিকা গুণবতী ও রূপবতী দুহিতা বিবি ফাতেমাকে তাঁহার করে সমর্পণ পূর্ব্বক নবদম্পতিকে পুত্র ও কন্যা জ্ঞানে সস্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত কারণে হজরৎ মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে, তাঁহার তিরোভাবে মহাত্মা আলির যে সর্ব্বাগ্রে ন্যায্য অধিকার ইহা তৎকালিক বহুসংখ্যক লোকে স্বীকার করিতেন; এই জন্যই শিয়া সম্প্রদায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাত্রয়কে অন্যায়াধিকারী বিবেচনায় তাঁহাদিগের খলিফাত্ব স্বীকার করেন না। হজরৎ আবুবকরের খলিফা-পদ প্রাপ্তির সময়ে হজরৎ আলি যদি কিঞ্চিৎ মাত্র আপত্তি উত্থাপন করিতেন তাহা হইলে হয়ত তৎকালেই খেলাফত লইয়া একটা ভীষণ বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কিন্তু চরিত্রগত ত্যাগাতিশয্য-হেতু তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন। কোন কোন লোকে তাঁহাকে উত্তেজনাপূর্ণ পরামর্শ দিলেও তিনি তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করেন নাই।

পরে হজরৎ ওমর ও হজরৎ ওসমান ক্রমান্বয়ে খলিফা পদে নিযুক্ত হওয়ার কালেও তিনি নীরব ছিলেন। কারণ উক্ত খলিফাদ্বয় বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং আত্মত্যাগে তিনি বৃদ্ধের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র আলোচনায় অনুমান হয় যে তিনি অনেকটা সংসারবিরাগী পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে হিজরীর ৪০ অব্দে উপাসনা মন্দিরে মাবিয়া প্রেরিত গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে তিনি অকালে নিহত হন।

হজরৎ আলীর শোচনীয় তিরোভাবের পরে, সাধারণের সম্মতিক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা হাসান খলিফা পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি কয়েক মাস পরেই মাবিয়ার চক্রান্তে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পদ-ত্যাগের সময়ে এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, বর্ত্তমানে মাবিয়া খলিফা থাকিবেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনান্তে মহাত্মা হোসেন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। (১)

মহাত্মা হাসান খলিফা-পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে লইয়া সপরিবারে কুফা হইতে মদিনায় যাইয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মসমাজের এমাম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অল্প কাল মধ্যেই মাবিয়া ও তৎপুত্র এজিদের ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে অকালে নিহত হইতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইসলাম ধর্ম্ম-রাজ্যের খলিফাকে একান্ত সংযমী হইয়া রাজ্য ও সমাজ শাসন করিতে হইবে। বিলাসিতা তাঁহাকে এককালে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত পথে বিচরণ করিতে হইবে। খলিফা উপাধিও কোন বংশগত নহে। উহা সাধারণের অভিমত সাপেক্ষ এবং সাধারণতন্ত্র রাজত্বের নিয়মানুমোদিত। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিতে হইলে মাবিয়ার রাজত্বকাল হইতে খেলাফত সোলতানতে পরিণত হইয়াছিল।

আমাদিগের অনুমান হয় যে ইসলাম ধর্ম্ম জগতের পরবর্ত্তী নেতৃবৃন্দ যদি স্বার্থ, ঈর্ষা ও নৃশংসতার বশবর্ত্তী না হইয়া হজরৎ মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত খেলাফৎকে বজায় রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুসলমানের কখনই পতন হইত না। বরং অধুনা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ যেরূপ পার্থিব উন্নতির চরম চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। এমন কি হয়ত সমগ্র ভূমণ্ডলে তাঁহাদেরই সার্ব্বভৌমিক তেজ প্রচারিত হইত। কিন্তু কালের কুটীলা গতিকে বাধা দিবার কাহারও সাধ্য নাই। এক্ষণে তাঁহাদেরই পরিত্যক্ত মূলমন্ত্র অবলম্বনে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ অমিত বলশালী হইয়াছেন। সংসারবিরাগী মহাত্মা ইসা এই শক্তিশালী বীজমন্ত্রের প্রবর্ত্তক নহেন; ইহা একেশ্বরবাদ প্রচারক সমাজ ও সাম্রাজ্য নির্ম্মাতা হজরৎ মোহাম্মদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম নেতৃগণের অবিমৃশ্যকারিতায় সুচতুর ইসা শিষ্যগণ ইহাকে তাঁহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সমগ্র মানব জগতের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইয়া বসিয়াছেন। ধন্য ইউরোপীয় ইসা শিষ্যগণ! তোমরাই ধন্য!! তোমাদের বুদ্ধি ও কৌশল ধন্য!!!

চারুচন্দ্র মিত্র

১ বার্ষিক বৃত্তি ১৫০০০ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। Bagster's Universal History Voll III. Amir Ali's History of the Saracens.

মুসলমান সমাজের শিক্ষা

১। শিক্ষায় দেশীয় ভাষা

গত কল্য (২৭শে আগষ্ট, ১৯২২) সন্ধ্যাকালে মোসলেম ইনষ্টিটিউট গৃহে যে সভা আহূত হইয়াছিল সেই সভায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এখন হইতে বালক-দিগের শিক্ষা এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেশীয় ভাষায় প্রচলিত হইবে বলিয়া যে অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদসূচক একটি মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। বঙ্গবাসী মুসলমানগণের অধিকাংশ লোক যে উক্তরূপ প্রতিবাদের স্বপক্ষে, আমার এরূপ মনে হয় না। প্রতিবাদের জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল, কলিকাতার মত বহুজন-পূর্ণ মহানগরীতেও সেই সভায় যখন আড়াই-শতের অধিক লোকের সমাগম হয় নাই, তখন সেই সভা যে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং নগণ্য তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার এই ক্ষুদ্র সভাতেও যখন মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল তখন প্রতিবাদকারীদের সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প, তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে সর্ব্ব প্রথম এবং প্রধান বিবেচ্য কথা এই যে, মাতৃক্রোড় হইতে অর্থাৎ একান্ত শৈশবাবস্থা হইতে যে ভাষায় শিশু অভ্যস্ত, সেই ভাষায় অথবা ইংরাজী—যাহা আমাদিগের পক্ষে বিদেশীয় ভাষা এবং যাহা বহু বৎসর পরি-শ্রমের পরও সম্যকরূপে আয়ত্ত হয় না, এমন কি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগের ভিতর অধিকাংশেরই যে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিমাণ নিতান্ত অল্প—সেই ইংরাজী ভাষা আমাদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত কি না? শিক্ষা যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, মাতৃভাষায় প্রদত্ত হইলে তাহা যেমন সহজে ও দৃঢ়ভাবে শিশুর হৃদ্‌গত এবং আয়ত্ত হয়, অন্য কোন ভাষাতেই তাহা হইতে পারে না। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। সুতরাং মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা যে অবৈজ্ঞানিক এবং অনুচিত তাহা বলাই বাহুল্য। বোধ হয়, কোন সভ্য দেশেই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষার বাহন বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় না। এতদিনের পর আমাদের দেশবাসিগণও ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মহীশূর এবং হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল প্রাথমিক নহে, পরন্তু উচ্চ শিক্ষাও মাতৃভাষায় প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও ব্যবস্থা ঐরূপ। মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অন্য ভাষায় শিক্ষাদান যে ফলোপধায়ক নহে, তাহা সহজেই বোধ-গম্য। আমার বিবেচনায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্যকভাবে সমীচীন হইয়াছে।

বঙ্গদেশবাসী মুসলমানগণের কোন

সাহিত্যিক মাতৃভাষা নাই বলিলেও চলে। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরি লিখিত সিদ্ধান্তের ফলে তাঁহাদিগকে যে কতকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে হয়, এ অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে অনিবার্য্য। তবে এই অসুবিধা যত শীঘ্র দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। আরও পূর্ব্ব হইতে এই অসুবিধা দূর করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদিগের এত দূর শোচনীয় মানসিক অবনতি সংঘটিত হইত না। মাতৃ-ভাষায় উত্তমরূপ অভ্যস্ত বলিয়া হিন্দু বালকগণ পরীক্ষায় মুসলমান বালকগণের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক নম্বর পাইয়া থাকে। মুসলমান বালকগণ যত দিন না মাতৃভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, ততদিন অবস্থা যে এইরূপ চলিতে থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। সদ্য সদ্য এই অসুবিধা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে মুসলমান বালকগণের ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রকার সহজাত শক্তি ও প্রবণতা আছে তাহাতে আমি আশা করি যে, সামান্য চেষ্টার দ্বারা সহজে অচিরে এই বাধা বিদূরিত হইতে পারে। যখন স্বীকার করিতেই হইতেছে যে মাতৃভাষার প্রদত্ত শিক্ষাই সর্ব্বদা সম্যকভাবে ফলপ্রদ, তখন বৈদেশিক ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহ যে অবৈধ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তৎসত্ত্বেও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা-লাভের জন্য জিদ করিলে উহাতে মুসলমান বালকদিগের সহিত হিন্দু বালকদিগকে সমান অসুবিধায় ফেলার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। আমার অভিপ্রেত না হইলেও বরং যতদিন মুসলমান বালকগণ মাতৃভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারেন ততদিন তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন করুন।

কলিকাতা
২৮শে আগষ্ট, ১৯২২।

২। জ্ঞানচর্চ্চায় বাঙ্গালী মুসলমানের পশ্চাদ্বর্ত্তিতা

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে পারসী ভাষাই রাজভাষা বলিয়া গণ্য ছিল এবং বিদ্যালয়সমূহে আরবী ও পারসীর সাহায্যেই শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তখন মুসলমানদের মধ্যে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। সরকারী চাকুরী এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়গুলিতে তাঁহাদেরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড মেকলের পরামর্শে ইংরেজী শিক্ষাদানের অনুকূল সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্য গ্রহণ করেন এবং পরে পারসী ও দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজীর প্রচলন করেন। কিন্তু মুসলমানেরা সময়ের এই পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীই শ্রেষ্ঠ। এই ভাবিয়া বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রাচীন পন্থায় বিদ্যানুশীলন করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে হিন্দুরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রথম হইতেই ইংরেজী শিক্ষায় রত হইলেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালী মুসলমানেরা অর্থে ও প্রভাবে ক্রমশঃ হীন এবং হিন্দুরা উন্নত ও শক্তিশালী হইতে

লাগিলেন। কিছু কাল পরে দেখা গেল, মুসলমানেরা সরকারী চাকুরী ক্ষেত্র হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন এবং বিদ্যালয়-গুলি মুসলমান ছাত্রশূন্য হইয়াছে। তখন এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকারার্থ বিহিত উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইল, তাঁহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল, আরবী পারসী ভাষার শিক্ষক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন এবং শিক্ষাদান ও পরিদর্শন বিভাগে উপযুক্ত মুসলমান কর্ম্মচারী গৃহীত হইলেন। ইহাতে আশানুরূপ ফল ফলিল; স্কুল ও কলেজে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

তথাপি কিন্তু বাঙ্গলার হিন্দুরা জ্ঞানচর্চ্চার যতটা উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছেন, মুসলমানেরা তাহার কিছুই পারেন নাই। ইহা অবশ্য সত্য যে, মুসলমানদের মধ্যে মসি-জীবীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাও সত্য যে, কতকগুলি গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া একটা প্রাণহীন সন্তোষের জীবন অতিপাত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানেরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য কিছুই দান করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চচিন্তার লোক, উচ্চশ্রেণীর লেখক অথবা উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মী একজনও নাই। সৈয়দ আহমদ বা সালার-জঙ্গের কথা দূরে থাকুক, হালী, শিবলী, ইকবাল, নজির আহমদ বা সৈয়দ আলী বিলগ্রামীর সহিত তুলিত হইতে পারেন, এমন একজন লোকের নাম লইয়াও তাঁহারা গৌরব করিতে পারেন না। বাঙ্গলা দেশের রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জগদীশ বসু দূরে থাকুন, বিদ্যা-সাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা আশুতোষ মুখার্জ্জীর ন্যায় একজন ব্যক্তিও তাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহা কি জ্ঞান-বৃত্তির শোচনীয় অধঃপতনের চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? একদিকে মুসলমানদের ত এই শোচনীয় দুর্গতি। কিন্তু অন্যদিকে হিন্দুদের অবস্থা কি? তাঁহাদের মধ্যে সু-উচ্চ মনীষীসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতেছেন; সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া তাঁহাদের যশোমহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? বাঙ্গালী মুসলমানেরা কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান অপেক্ষা অথবা তাঁহাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী হিন্দুদের অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন? আমি এই প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বলিতে প্রস্তুত নহি। আমার বিবেচনায়, অধ্যয়ন ও গবেষণার সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী মুসলমানেরা অন্যান্য স্থানের মুসলমানের ও এদেশের হিন্দুদের সহিত সমান পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারেন। তবে তাঁহাদের এই প্রকার হীনতার কারণ কি? এই সমস্যার সহিত সমাজের জীবন-মরণ-সমস্যা বিজড়িত রহিয়াছে। কারণ কোন সমাজের জ্ঞানো-ন্নতির উপরেই তাহার বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং সমাজের মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা,
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২২।

৩। জ্ঞানচর্চ্চায় বাঙ্গালী মুসলমানের পশ্চাদ্বর্ত্তিতার কারণ

(ক) 'সাহিত্যিক' মাতৃভাষার অভাব

আমার বিবেচনায় দুইটী প্রধান কারণে বাঙ্গালী মুসলমানের জ্ঞানবৃত্তির এইরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। প্রথম, সাহিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে এমন মাতৃভাষার অভাব। দ্বিতীয়, তাঁহাদের বিশিষ্ট বিদ্যালয়-গুলির শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটী। কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য দুই একটী শহরের অধিকাংশ মুসলমান অধিবাসী (ইঁহাদের সংখ্যা মোট বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যার শতকরা দশ হইবে কিনা সন্দেহ) এক প্রকার ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন। এই ভাষাকে তাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন। আর অন্যান্য (শতকরা ৯০ জনেরও অধিক) বাঙ্গালী মুসলমান তাঁহাদের হিন্দু প্রতিবাসীদের ন্যায় বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহেন। হিন্দুদের কথিত ভাষার সহিত মুসলমানদের কথিত ভাষার প্রভেদ মাত্র এই যে, মুসলমানেরা তাঁহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে হিন্দুদের অপেক্ষা কতকগুলি আরবী ও পারসী শব্দ অথবা কতকগুলি আরবী ও পারসী শব্দের অপভ্রংশ বেশী করিয়া যোগ করেন। সুতরাং যদি চীনা বাজারের দোকানদারেরা যে ভাষায় তাঁহাদের ইউরোপীয় ক্রেতাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহাকে ইংরেজী ভাষা বলিতে আপত্তি না হয়, তবেই বাঙ্গালী মুসলমান-দের কথিত ভাষাকে উর্দ্দু বলিয়া পরিচিত করা যাইতে পারে। ইহা সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্র-ভাবে উর্দ্দু শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারা আরবী ও পারসীতে পারদর্শী হইলেও উর্দ্দু ব্যাকরণের নিতান্ত সাধারণ নিয়মকানুন ভঙ্গ না করিয়া (উর্দ্দুতে) কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন না। বস্তুতঃ বাঙ্গলায় কথিত এই উর্দ্দুর কোন সাহিত্য নাই। আদর্শ উর্দ্দু—অর্থাৎ দিল্লী ও লাখ্‌নৌয়ের উর্দ্দু—না শিক্ষা করা পর্য্যন্ত এই ভাষায় কেহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা আরবী ও পারসী অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ উর্দ্দু শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইহাতে দেখা যায় যে, যে সকল বাঙ্গালী মুসলমান উর্দ্দুকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া প্রচার করেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের এমন কোন "সাহি-ত্যিক" মাতৃভাষা নাই, যাহার সাহায্যে তাঁহারা চিন্তা করিতে, কথাবার্ত্তা কহিতে বা লিখিতে পারেন।

বাঙ্গলা-ভাষী মুসলমানদেরও সাহিত্য নামের যোগ্য কোন মাতৃভাষা নাই। অবশ্য মুসলমানী বাঙ্গালা নামে অভিহিত এক প্রকার সাহিত্য তাঁহাদের আছে। কিন্তু এই ভাষা শব্দসম্পদে একান্ত দরিদ্র এবং ইহার ব্যাকরণ একান্তই অসম্পূর্ণ। উচ্চ গুণাত্মক চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক ভাবনিচয় প্রকাশ করিতে পারা যায়, এমন শব্দ এই ভাষায় অধিক নাই। সুতরাং ইহাকে সাহিত্য নামের যোগ্য একটী ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অধুনালুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে এই মুসলমানী বাঙ্গলা ভাষার একটী আদর্শ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সুতরাং এ কথা বলিতে

হইবে যে, কি উর্দ্দুভাষী কি বাঙ্গলাভাষী কোন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী মুসলমানেরই সাহিত্য নামের যোগ্য একটা মাতৃভাষা নাই। এই অভাবের জন্যই জ্ঞানানুশীলনে তাঁহারা উন্নতি করিতে পারেন নাই। চিন্তা, ভাব, ধারণা প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারা যায়, এমন ভাষা যে সমাজের নাই, তাঁহারা জ্ঞানানুশীলনে উন্নতি করিতে পারে না ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাঙ্গলার হিন্দুরাও প্রায় তাঁহাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের কথিত ভাষাতেই কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় লাভ করেন। এবং সেই ভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা আদর্শ বাঙ্গলা শিক্ষার দিকে মনোযোগ প্রদান না করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব বাঙ্গলা লিখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; অথচ এই বাঙ্গলাকে সাহিত্য বলিলে সাহিত্য নামের অপব্যবহার করা হয়। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রায় সকল গ্রন্থই (বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকও ইহার মধ্যে) অ-মুসলমানদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। এই কারণে, স্বাভাবিকভাবে, বাঙ্গলা সাহিত্য লেখকদের স্বজাতীয় ধ্যানধারণায়, স্বজাতীয় ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থের চরিত্র-চিত্রে এবং স্বজাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের বিবৃতি—উদ্ধারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান বালকেরা এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া অ-মুসলমান চিন্তা ও ধারণার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহাদের আচার, ব্যবহার ও স্বভাবে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা এই প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একথা ভাবিয়া দেখেন না যে, এরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী স্বয়ং তাঁহারাই। কেননা, তাঁহারা যদি বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া নিজেদের ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উপাদানসংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গলা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা কখনই এমন হইত না। যাহা হোক, ইতঃপূর্ব্বেই এদিকে মুসলমানদের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; এবং কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক (ইঁহাদের মধ্যে একজন মহিলাও আছেন; তাঁহার নাম মিসেস আর, এস, হোসেন) বাঙ্গলায় কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলায় এখনও ইসলামী-সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। তাহা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। আজকাল সংস্কৃত ভাষার কবল হইতে বাঙ্গলাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং একটু মনোযোগ দিলেই আধুনিক বাঙ্গলা আয়ত্ত করিয়া লওয়া কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না।

যাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু নহে, এমন অনেক লোকেও যে উর্দ্দুর পক্ষপাতী, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার কারণও আছে। আরবের পয়গম্বর তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে যেরূপ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছিলেন, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মুসলমানের নিকট শিক্ষার অর্থ প্রথমতঃ ধর্ম্মশিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ নীতি-শিক্ষা এবং শেষতঃ ব্যবসায়গত বা পার্থিব শিক্ষা। সুতরাং মুসলমান বালকেরা বিদ্যালয়ে গমন করিবার পূর্ব্বে মসজিদে প্রদত্ত (ধর্ম্ম) শিক্ষায় শিক্ষিত

হইয়া থাকে। যদি বাঙ্গলা ভাষায় 'দিনিয়াৎ' (ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাবলীর) সম্বন্ধে পুস্তকাদি থাকিত, তাহা হইলে সিংহল, জাভা, চীন, এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা যেমন তাঁহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া থাকেন, তেমনই বাঙ্গলা-ভাষী মুসলমানেরাও মাতৃভাষার সাহায্যে ধর্ম্মশিক্ষা পাইতেন। এইরূপ বাঙ্গলা পুস্তক রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত উর্দ্দুর চাহিদা থাকিবেই। ইহা ভিন্ন উর্দ্দু ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ ভাষা। সুতরাং যাহার সাহায্যে অন্যান্য স্থানের মুসলমানের সহিত কথাবার্ত্তা চালানো যায়, এমন একটা ভাষা শিক্ষা করিতে বাঙ্গালী মুসলমানদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। অনেকে বলেন, উর্দ্দু সম্ভ্রান্ত সমাজের ভাষা। আমি এরূপ কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। এক সময়ে পারসীও এই ভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ সমাজের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যাঁহারা পারসীতে অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত উর্দ্দুতে কথা কহিতেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হইত। সুসময়ের এমন একটা অস্বাভাবিক মাপকাটী টিকিতেই পারে না। সুতরাং কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিলোপ ঘটিয়াছে। উর্দ্দুর দশাও কালে এইরূপ হইবে। ইহা ভিন্ন, বাঙ্গলা দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের জননী, ভগিনী এবং সহধর্ম্মিণীরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহাকে অভদ্র সমাজের ভাষা বলিয়া মনে করা ঘোর অন্যায়।

বাঙ্গলাভাষী মুসলমানের পক্ষে বাঙ্গলা সাহিত্য আয়ত্ত করা উর্দ্দু সাহিত্যের সহিত পরিচয় লাভ করা অপেক্ষা অনেক অধিক সহজ। কেননা উর্দ্দু তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যতঃ একটা বৈদেশিক ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য ম্যাট্রিকুলেশনে মুসলমান পরীক্ষার্থীদিগের বিরাটতম অংশ ~~উর্দ্দু~~ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশনে ২৬১ জন বঙ্গদেশবাসী মুসলমান পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৫২জন (অর্থাৎ শতকরা ২০ জনেরও কম) উর্দ্দু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর, পনের বৎসর পরে গতবারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৩৮১১ জন মুসলমান পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৩৭২ জন (অর্থাৎ শতকরা ১০জনেরও কম) উর্দ্দু লইয়াছিলেন। সুতরাং যে সকল মুসলমান ছাত্রের মাতৃভাষা উর্দ্দু নহে, তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু লইতে বাধ্য করিলে ঘোর অন্যায় করা হইবে। অবশ্য উর্দ্দুকে দ্বিতীয় ভাষারূপে তাঁহারা অধ্যয়ন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে মুসলমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীরা পারসী গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পারসী তাঁহাদের কোন কার্য্যেই আসে না। সুতরাং পারসীর পরিবর্ত্তে তাঁহাদের উর্দ্দু অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত কোন শিক্ষকেরও প্রয়োজন হইবে না। যাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু নহে, এমন ছাত্রগণকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় ভাষারূপে উর্দ্দু পড়িবার অনুমতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন। যাহাতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও উর্দ্দু দ্বিতীয় ভাষারূপে অধ্যয়ন করা যায়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে উর্দ্দু ভাষা সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যোপযোগী পুস্তক

উর্দ্দু সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে না।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলাই আদালতের ভাষা। সুতরাং এদেশবাসীদের পক্ষে বাঙ্গলায় জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। কারণ এই ভাষাতেই সমস্ত জমিদারী, মহাজনী কাজ চলিয়া থাকে এবং ব্যবসায়ের হিসাবপত্র ও দলিলাদি লিখিত হইয়া থাকে। আমি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ গ্রামেই গমন করিয়াছি। দেখিয়াছি, বাঙ্গলার মুসলমান জমিদারদের বাঙ্গলা ভাষায় অজ্ঞতার জন্য ভীষণ ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিবার সুযোগ আমার যতটা হইয়াছে, অন্য অত্যল্প সংখ্যক লোকেরই তাহা হইয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গলা না জানায় স্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বর্ণিত জমিদার-সরকার-গুলিতে প্রবেশ করিতে পারেন না। ফলে মুসলমান জমিদারদের প্রায় সকল আমলাই হিন্দু হইয়া থাকেন। ইহাতে অর্থ এবং প্রভাবের দিক দিয়া মুসলমান সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২।

কলিকাতা।

(খ) শিক্ষাপ্রণালীর দোষ

পূর্ব্বের পত্রে আমি 'সাহিত্যিক' মাতৃ-ভাষার অভাবের কথা একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের জ্ঞানবৃত্তির অধঃপতনের দুইটী মুখ্য কারণের অন্যতর কারণ হইতেছে, তাঁহাদের অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটী। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বয়সেই মুসলমান বালকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ সে মিঞাজীর নিকট আরবী বর্ণমালা ও স্বরাত্মক জেরজবরাদি শিক্ষা করে। কিন্তু মিঞাজীদের অনেকেই কোরআন পাঠ করিতে পারা ভিন্ন আরবীর আর কিছুই জানেন না। তারপর, তাহাকে (মুসলমান বালককে) মক্তবে কিংবা গৃহে কিছু উর্দ্দু এবং কখনও কখনও বা কিছু পারসীও শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পরে আসিয়া সে পাঠশালা বা ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একজন হিন্দু বালক যে বয়সে বৈষয়িক বা পার্থিব (secular) শিক্ষা আরম্ভ করে, মুসলমান বালক তাহা অপেক্ষা অধিক বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

বর্ত্তমান শিক্ষাদান-প্রণালীতে যে সকল গবেষণা ও উন্নতি হইয়াছে, মুসলমান বালক-বালিকাগণের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ সে বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন বাঁধা-ধরা নিয়মেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতে হয়। বস্তুতঃ বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া কঠিনতর কার্য্য। যে বিষয় যেমন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিশুর মস্তিষ্কও তদনুযায়ী গঠিত হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার পদ্ধতির সহিত শিশুর জ্ঞান, ধারণা ও আকাঙ্ক্ষার মিল না থাকিলে তাহার মনোযোগ বা কৌতূহল কিছুই আকৃষ্ট বা উদ্রিক্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগিতা বা চিত্তদ্রোহিতা (repulsion) প্রধানতঃ শিক্ষকের দক্ষতা ও শিক্ষাপদ্ধতির উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং

যোগ্য শিক্ষক একদিকে যেমন গভীর জ্ঞান, স্বাভাবিক উপযুক্ততা, সংযম, ত্যাগ, শিশু-চরিত্রে অভিজ্ঞতা, শিশুদের ও তাহাদের চিন্তাধারার সহিত সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী হইবেন, অন্যদিক তেমনি আবার প্রফুল্লচিত্ত এবং সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করিবার মত মধুরস্বভাব হইবেন। সৎ শিক্ষকের এই সকল গুণ মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির ক্রীড়াসামগ্রী এবং বস্তুশিক্ষার চিত্রাবলী পাঠ্যবিষয়কে শিশুদের নিকট একান্ত সরল ও মনোজ্ঞ করিয়া তোলে। কিন্তু তাহাদের শিক্ষায় এ সকল দ্রব্যের ব্যবহার হয় না। এই ধরণের শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া শিশুদের যে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা অতিশয় ভীষণ। শিক্ষাদানের ব্যবসায় সমাজের ন্যাস-স্বরূপ। ইহাকে ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিতে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। সত্যই উক্ত হইয়াছে যে, জননী এবং শিক্ষকেরাই পৃথিবীর সমস্ত ভাল মন্দের বীজ বপন করিয়া থাকেন। কারণ যাঁহারা বালকবালিকাগণের নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি বা নীতিতে কোন বৃহৎ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং (দেখা যাইতেছে), সমাজ-নিয়ন্ত্রণের সূত্র শিক্ষকদের হস্তেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। এবং তাঁহারা ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ যতটা উন্মুক্ত বা রুদ্ধ করিতে পারেন, তেমন আর কেহই পারেন না।

যে অসমীচীন প্রণালীতে (মুসলমান শিশুদিগকে) কোর-আন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মিক্তাবীদের অনেকে পাঠ-শেষ হইলে পাছে তাঁহার চাকুরীটী চলিয়া যায়, এই ভয়ে শিক্ষা-কাল অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করিয়া থাকেন। অত্যন্ত কঠিন একটী বৈদেশিক ভাষা এই প্রকার অসঙ্গত ও অ-সন্তোষজনক ভাবে শিক্ষা দেওয়ায় শিশুদের অপুষ্ট মস্তিষ্ক পীড়িত হয় এবং সাধারণ শিক্ষার প্রতিই তাহাদের একটা বিরাগ জন্মে। উপরন্তু শিক্ষার প্রারম্ভেই এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর অত্যাচার সহ্য করিতে হওয়ায় বালকদের জ্ঞান অগভীর থাকিয়া যায় এবং তাহারা স্বাধীন চিন্তা করিতে অসমর্থ ও পরবর্ত্তী জীবনে অধিক গভীর জ্ঞান সঞ্চয়ে অশক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কিঞ্চিৎ মাতৃভাষা এবং আবশ্যক হইলে, কিঞ্চিৎ উর্দ্দু পড়িয়া লইবার পূর্ব্বে বালকগণের কোর-আন শিক্ষা বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা সাবধানে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ন্যূনাধিক আট বৎসর বয়সে যখন তাহারা নামাজ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন প্রয়োজনানুযায়ী কতকগুলি 'সুরা' শিক্ষা করিয়া পরে সমস্ত কোর-আন পাঠ করিতে পারে।

উর্দ্দু এবং পারসী শিক্ষাদানের প্রণালীতেও একই প্রকার ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে তাহাতেও বালকগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন হওয়া দূরে থাকুক, তাহা বরং চাপা পড়িয়া থাকে। বালকেরা উর্দ্দু শিক্ষা করিতে গিয়া শব্দের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি না করিয়াই তাহার অর্থ মুখস্থ করিয়া যায় এবং পারসী শিক্ষা করিতে যাইয়া তাহার উর্দ্দু অনুবাদ

মুখস্থ করে। এইরূপ একটী বৈদেশিক ভাষা অন্য একটী বৈদেশিক ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষা করায় বালকদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ না থাকিয়াই পারে না। ইহার উপর আবার পাঠ্য পুস্তকের অনেকগুলি কেবল অনুপযুক্ত নহে, বরং আপত্তিজনক। পাঠশালার ছাত্র অপেক্ষা মক্তবের ছাত্রেরা যে সাধারণ জ্ঞানে, কর্ম্মপটুতায় এবং নৈতিক বলে হীন হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, মক্তব অপেক্ষা পাঠশালায় উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বালকেরা পাঠশালায় চারি পাঁচ বৎসর পড়িয়া মোহরের, গোমস্তা বা দোকানদার হইতে পারে। কিন্তু মক্তবের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা তাহার দ্বিগুণ সময় অধ্যয়ন করিয়াও প্রায়ই এই সকল কার্য্যের যোগ্য হয় না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় গুলি একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে; আর মুসলমানেরা—অনেক স্থলে মক্তবের শিক্ষায় অন্ধ অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়ায়—কোণ-ঠাসা হইয়া রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন, মক্তবের দোষসম্পন্ন শিক্ষাপ্রণালী উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায়-স্বরূপ।* কেননা, ইহার পাঠ্য পুস্তক-গুলি পাঠে বালকগণের মনে বিরক্তি ও দূরে পলায়নের ভাব জাগে; পক্ষান্তরে, পাঠশালার পাঠ্য তালিকার ছাত্রের মনে শিক্ষার প্রতি একটা অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য এই পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের অভাব জ্ঞানচর্চ্চায় মুসলমান সমাজের পশ্চাদ্বর্ত্তিতার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। যদি বাঙ্গলার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের মত বিপুল জ্ঞান, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যোৎসাহী বিশিষ্ট মুসলমান শিক্ষাবিদ্ থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এখন-কার মত দুরবস্থা বাঙ্গালী মুসলমানদের হইতে পারিত না। যাঁহারা আপনাদিগকে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের অনেকেরই শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য। বস্তুতঃ, মুসলমানদের শিক্ষার গতি এই প্রকার অভিজ্ঞম্মন্য লোকদের দ্বারাই রুদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, আমি আশা করি, আমার পত্রগুলি উদ্দিষ্ট ফল প্রসব করিবে এবং বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্যকরূপে আলোচিত হইবে।

আবদুল করিম

---

* মাতৃভাষার সাহায্যে বাঙ্গলাদেশে শিক্ষাদান হইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সব চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। মৌলবী আবদুল করিম সাহেব দীর্ঘকাল শিক্ষাবিভাগের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতামত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণযোগ্য।

কৃষকের দুর্দ্দশা

চাষার দুর্গতির কথা যখন মনে পড়ে তখন ওপারের কলের কৃতিত্বের কাতরানি ও গোঙানি চোখের সামনে ভেসে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে কল যে সম্পদ ও কল্যাণ জগতের বুকে এনেছে তা দেখে বাহবা দিচ্ছে না এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁরা বড় বড় সহরের বড় বড় অট্টালিকা, কলের হাওয়া, কলের আলো দেখে মুখে বলেন বাহবা! পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কি সভ্যতাই না সৃজন করেছে! এতে তাঁরা মেতে উঠে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশটাকে সেই দিকে অগ্রসর করাবার জন্য কত না প্রয়াস পান। "এই দেশ কলে ছেয়ে যাবে। সকল পল্লী সহর হয়ে উঠ্‌বে। মানুষ কত সুখের সামগ্রী ঘরে বসে' পাবে।"—এই হল তাঁদের স্বপ্ন। কিন্তু আমি যখন ঐ কথা ভাবি তখন আমার প্রাণ আঁতকে ওঠে। ভবিষ্যৎ মানুষের বিনাশ সাধনই এই কল বুদ্ধির অন্যতম ফল। মানুষের পরিধেয় ও বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য কলের প্রবর্ত্তন আবশ্যক। এই আবশ্যকতাকে মান্‌তে রাজি আছি যদি এতে ক'রে মানুষের আত্মা ও আস্ত মানুষটা কলের মুখে ব্যয় হয়ে না যায়। কিন্তু তা সম্ভবপর নয়। কলও বাড়বে মানুষেরও দরকার হবে। কল এসে মানুষের শ্রম কমায়নি বরং বাড়িয়েছে। ওঁরা বলেন কল হচ্ছে মানুষের শ্রম লাঘব করবার জন্য। কিন্তু কার্য্যতঃ শ্রম কমেনি। মানুষের শ্রম বেড়েই চলেছে। এই শ্রম বেড়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে তার সকল স্ফূর্ত্তি সকল স্বাধীনতা কলের পাকে নিহত হয়েছে। সে কলে ঢুকবার আগে নিজে খাটত ও পল্লীর নগ্ন-উদার প্রকৃতির কোলে অবসরের আনন্দে খাটুনির ক্ষুদ্র সাফল্যকে উপভোগ করতে পারত। আজ তার মাথার উপর কলের কাল ছাউনি, পাশে কলের কলরব ও কলনিমুক্ত মানুষের অশান্ত-কোলাহল তাকে মুহুর্মুহুঃ অবসন্ন করে ফেল্‌ছে। প্রতিদিনই সে একটুখানি ক'রে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করেই বলি।

পূর্ব্বে দেখান হয়েছে, বর্ত্তমান শিল্প-প্রসূত সভ্যতার (Industrial civilisation) গোড়া কোথায়। ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইংলণ্ডে এই সভ্যতার উৎস। ক্রমশঃ সমস্ত জগৎ এই সভ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ঐ সভ্যতার প্রধান কারণ হল ধন-সম্পদ বর্দ্ধন শক্তির অপরিসীম আতিশয্য। বাষ্প ও তড়িৎ; উৎপাদনের প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন ও শ্রমলাঘবকারী কল; অধিকতর শ্রমবিভাগ ও বহুল-উৎপাদন-প্রকরণ এবং সুদূর দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও শিল্পজ পদার্থের বিক্রয়ের জন্য জলস্থলে নানাবিধ আশ্চর্য্য সুযোগ আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের শ্রম নিরতিশয় কার্য্যকরী হ'য়ে পড়েছে। এই সমস্ত কারণে বস্তুতঃ সকলেরই ধারণা

হল, "শ্রম বাস্তবিক লঘু হ'বে—শ্রমীর অবস্থা ফিরবে—এই প্রকাণ্ড ধন বর্দ্ধন-শক্তি দারিদ্র্যকে অতীতের 'উপকথায়' পরিণত করবে। সৌরকিরণ-হাস্যও আবার মধুর হ'য়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরবে—চতুর্দ্দিক সম্পদের স্ফূর্ত্তি গর্ব্বিত হ'য়ে জীবনের অবকাশকে সরগরম করিয়া তুলবে।" অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে কে এই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করতে পেরেছিল? পাল তোলা জাহাজকে সরিয়ে দিয়ে বাষ্পপোত দেশ বিদেশে ঘুরে আস্‌ছে—বাষ্পসকট মানুষকে মুহূর্ত্তে দূর দূরান্তরে রেখে আসছে—কল মানুষের সামান্য ইশারায় কত কি সৃষ্টি ক'রে তার সহস্র ইচ্ছাকে পূর্ণ করছে যা নাকি শত শত মানুষ, শত শত বর্ষ শত দিনেও সম্পন্ন করতে পারত না। ভীষণ সাগর তরঙ্গ, গিরিপর্ব্বত, নদনদী উল্লঙ্ঘন ক'রে কত অসমসাহসিক কার্য্য কলের সাহায্যে ঘটবে তা কে ভেবেছিল? এই কল এসে দরিদ্রতম শ্রমীকে ছুটী দিয়েছে। সে অবকাশের আনন্দ সুখে উপভোগ করছে। মানুষ অভাবকে আর চোখে দেখ্‌ছে না। শান্তি ও নির্ভাবনা সকল দিক নিবিড় ক'রে ভ'রেছে। এই হ'ল কলভক্তদের রায়। এঁরা আরও স্বপ্ন দেখছেন। এঁরা বলেন,—এই সম্পদের মধ্যে মানসিক সম্পদ ও নৈতিক কল্যাণ জেগে উঠ্‌বে। সোণার যুগ আবার ফিরবে। সকলেই অবকাশ উপভোগ করবে। মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। যুবা আর বুভুক্ষু থাকবে না, খর্ব্ব হবে না; লোভ আর মানুষকে পাপাসক্ত করতে পারবে না, সকলেই অভাবের ওপরে উঠ্‌বে। শিশু শার্দ্দূলের সঙ্গে খেলা করবে। আস্‌মানের নক্ষত্র ও শশীর কিরণসুধা পানে বিভোর হ'য়ে মানুষ নশ্বর পৃথিবীকে দেবগণের শাশ্বতভবনে পরিণত করবে। যত আবিলতা দূরে সরে যাবে; নিষ্ঠুর কঠোরতা কোমল হ'য়ে উঠ্‌বে এবং সকল অশান্তি মনোরম শান্তি ও মনোহারিত্বে ফুটে সুরভি সঞ্চার করবে। তা হ'লে দারিদ্র্যসম্ভূত পাপ, অজ্ঞতা পাশবিকতা ও নৈতিক দুর্ব্বলতা কি ক'রে তিষ্ঠাতে পারবে? দারিদ্র্য লোপ পাবে ও দারিদ্র্যের ভয় আর থাক্‌বে না। কে তাহ'লে অধীন থাক্‌বে? কে তাহ'লে উৎপীড়িত হবে? সকলেই সেখানে স্বাধীন ও সকলেই সেখানে ধন-সম্পদশালী রাজাধিরাজ হ'য়ে দাঁড়াবে।

কলের মরীচিকা এই স্বপ্ন সমাজের স্তরে স্তরে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আলাউদ্দীনের প্রদীপের মত কত না আশ্চর্য্য আবিষ্কারে এই আধুনিক যুগ অতীতকে ডিঙিয়ে জলজীবন্ত মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে! আর ঐ আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি অভিনব প্রক্রিয়া এসে অর্থকে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করে ঐ স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলবার আয়োজন করেছে। এই স্বপ্নজাত দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষা প্রত্যেককে এরূপ ভাবে অভিভূত করেছে যে, সমাজ গতি দিক্ পরিবর্ত্তন ক'রে বিভিন্ন চিন্তাধারায় ও বিভিন্ন নীতিতে মানুষকে দীক্ষিত ক'রে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন সকল জ্ঞান-শাখাতে বিস্ময়কর বিপ্লব এনেছে। প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারা, সংস্কার ও জীবনের উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মকর্ত্তব্য সমস্তই বিকৃত হয়ে গেছে। সমস্তই ওলট পালট হ'য়ে গেছে। মানুষ নিরন্তর কর্ম্ম-

প্রচেষ্টা ও নিদারুণ বাস্তবতাকে জীবনের মূল্য উদ্দেশ্য করে তুলেছে। এই অবিরাম কার্যাকঠোরতা আজ সভ্যতার মাপকাটি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একে ওঁরা বলেন কাজ (Business)। যে এই উদ্বিগ্ন কর্ম্ম-কাঠিন্যকে ঘৃণা ক'রে নিবির নিরিবিলি জীবন শিশিরসিক্ত সমীরণের মধ্যে খেলিয়ে রাখ্‌তে চায় সে অকেজো—এটা একটা গালি আজকের দিনে। প্রাণের বহু বিকাশ ও হৃদয়ের উন্মীলন, সমাজ ও ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারে প্রকটিত হ'তে আজ আর পারে না। সকলেই গৃহ-পল্লীর শান্তনিবিড় জীবনকে অপদস্থ ক'রে সহরের ভাড়াটে সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করতে খুবই আনন্দ মনে করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দিন দিন বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ ঘট্‌ছে। স্বপ্ন ও দুরাশা যে কি অঘটন ঘটিয়ে তুলেছে তাই আজকার দিনে মানবের আকৃতি ধ'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। সে ক্রমেই আস্‌মান ধরতে চাচ্ছে। সে ভুল থাক্‌বার নয়। স্বপ্নভঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে। অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ উঠেছে বেশী। কল এসেছিল সুখ ঘটাতে কিন্তু সে যে কি দিয়েছে তার অভিযোগ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মর্ম্মান্তিক ও নিদারুণ নিনাদে নির্ঘোষিত হচ্ছে। কলের গর্ব্ব খান খান হ'য়ে শ্রমীর সঙ্ঘকে বিপুল ক'রে তুলেছে।

শ্রমীর করুণ অভিযোগ বিশ্বপ্রভু খোদার আসন টলিয়ে দেওয়ার যোগাড় করেছে, সে ইতিহাস এখানে বলার দরকার নাই। আজ সকলেই "নিদারুণ সময়ে" (hard times) এসে পৌঁছেছে। যেখানে মানুষ গণতন্ত্রের আওতায় স্বাধীনতা পেয়েছে, আবার সেখানে মানুষ রাষ্ট্রতন্ত্রের শতজালে জড়িত হয়ে শাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, যেখানে ব্যবসায় সচল, সেখানে বিপুলবাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব'সেছে। সে দেশে মাত্র কাগজ অর্থের জ্ঞাপক হ'য়ে গিয়েছে। যেদেশে স্বর্ণ রৌপ্যের ছড়াছড়ি সে দেশেও ঐ "নিদারুণ সময়ের" হাহাকার নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর ভিতর একটি সাধারণ হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। দেশকাল পাত্র ভেদে কলের প্রভাব বিভিন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তবু কতক-গুলি কারণ সর্ব্বত্র এবং তার ফলও এক। এই কলের প্রধান কীর্ত্তি হচ্ছে পার্থিব সম্পদের প্রভূত বৃদ্ধি (material progress) যাকে 'সংসারের উন্নতি" বলা যেতে পারে। ঐ উন্নতির জন্য কতকগুলি কারণ একত্র মিলিত হওয়া আবশ্যক। যেখানে যে সহরে নগরে এই কারণ সমূহ সম্পূর্ণ সমাবিষ্ট হয়েছে সেখানে তত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ঐ উন্নতির বুক চিরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে রক্তনদী প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে তা আর কেহ লক্ষ্য করছে না। তাই দেখা যায় যেখানে লোক সংখ্যা খুব বেশী, ধনসম্পদ প্রচুর, উৎপাদনের কল ও বণ্টনক্রিয়া (Exchange Distribution) পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রেছে সেখানেই গভীরতম দারিদ্র্য, জীবনযাত্রার কঠোরতম প্রয়াস, এবং নিরুপায় অলসতা কর্ম্মাভাবকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। মানুষ পেটের জ্বালায় রাস্তার উপর ভীড় ক'রে কলের কারসাজিকে অভিশাপ ও তিরস্কার করতে করতে অনিবার্য্য মৃত্যুর কোলে আশ্রয়

লাভ করছে। ধনী ধন গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে যেমন তেমনি অবিচলিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। পল্লীর বুক শূন্য হয়েছে সহরের এক ইঞ্চিও শূন্য নাই। শ্রমীর দল হারিয়ে ভিক্ষুকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে। যেখানে কল এখনও শিশুর মত দুর্ব্বল ও স্ফূর্ত্তিলাভ করতে পারেনি সেখানে এখনও দারিদ্র্য ও কর্ম্মহীন আলস্য পুরা বৃদ্ধিলাভ করেনি। কিন্তু কলের চরম স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অত্যুরন্ত প্রাচুর্য্যের মধ্যে হৃদয়বিদারক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। কল যেখানে এখনও ধনীর ঘরে প্রচুর আরাম ও বিলাসকে এনে দিতে পারেনি সেখানে তাকে কাজ করতে হয় ও সাধারণ মানুষও খাটে সুতরাং সেখানে দরিদ্র ও ভিক্ষুকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। সহরে ভিক্ষুক, রোগী ও দুরবস্থাপন্ন অসহায় নারী পুরুষ বালক বালিকার সংখ্যা যত বেশী, পল্লীতে তত নয়। কলের উপর কল বেড়ে গিয়ে শ্রম কমাবার ছল ক'রে যতই উন্নতি ক'রে যাচ্ছে ততই দারিদ্র্য ভীষণ মূর্ত্তি ধরেছে। সমাজের মুষ্টিমেয় একশ্রেণী অনিন্দ্য সুখে কাল যাপন করছে আর অধিকাংশ এক মুষ্টি অন্নসংগ্রহ করতে প্রাণপাত ক'রে দিচ্ছে। এই সত্য ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হচ্ছে। কল যে গতি ধ'রেছে তাতে ধনেরই বৃদ্ধি হচ্ছে বটে কিন্তু দারিদ্র্য কমছে না এবং কমবারও আশা করা যায় না। শ্রমীর শ্রম লঘু হচ্ছে না বরং শ্রমীর ভার ক্রমশঃ গুরু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ধনী নির্ধন এর মধ্যে পার্থক্যের রেখা ক্রমশঃ বৃহত্তর হয়ে উঠ্‌ছে। কলের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কারখানার (factory) পর কারখানা ক'রে পৃথিবীর খোলা বাতাস ও মুক্ত আকাশকে ঢেকে ফেলা আর রাশি রাশি ধনে ধনীর গৃহপ্রাঙ্গন ভ'রে দেওয়া। কিন্তু তারই মাঝে মানুষ ক্ষুধায় প্রাণ হারাচ্ছে। ক্ষুদ্র শিশু কর্ম্মরত জননীর শুষ্ক বুক টেনে নিসাড় হ'য়ে থাকছে আর চতুর্দ্দিক অর্থগৃধ্নুতা ও ধনপূজা তাণ্ডব নৃত্য করে অভাবের নিষ্ঠুরতার হাত হ'তে পরিত্রাণ-তৃষ্ণা আরও প্রখর ক'রে তুল্‌ছে।

সত্য বল্‌তে, ধন বর্দ্ধিত হয়েছে বিষম। কল শ্রমীর অবসর ও পরিচ্ছন্নতাও এনেছে কিন্তু অনেকের পক্ষে উহার বিন্দুপরিমাণও জুটে ওঠেনি। যারা সমাজের তলে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ যারা সমাজের নিম্নস্তরে প'ড়ে উচ্চস্তরের চাপে প্রাণ হা'রাতে ব'সেছে তারা ঐ সুখ শান্তির কণা পরিমাণও চোখে দেখ্‌তে পায় না। কল ঐ উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে যে দাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে তা আর মুছ্‌তে চায় না। নীচে যারা পড়েছে তারা ধ্বংসের মুখে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সমাজ অনুন্মেষের ঔদাসীন্যে উপরের স্তরকে বাহবা দিচ্ছে।

দারিদ্র্য ও ধনোন্নতি (Poverty and Progress) আজকার জগতে কল-সভ্যতার দুইটী যমজ সন্তান। এদের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রভাব অতীব ভীষণরূপে দেখা দিয়েছে। এই সভ্যতা কেন্দ্র ক'রে বর্ত্তমান যুগের সকল চিন্তা—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—ভবিষ্যতের সমস্যা মীমাংসা করতে ব'সে গেছে। কল যতই বাড়বে ততই তার যমজ সন্তানের মধ্যে বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হবে। উভয়ই বিপরীত মুখে চল্‌ছে। একে অপরকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছে। এ দ্বন্দ্ব কবে থামবে তা খোদাই জানেন। একটা

অভাবকে প্রবল ক'রে তুলবে—আর একটা কয়েক জনের ক্ষুধা নিবৃত্তি ত করবেই তা ছাড়া তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে থাকবে; অবশেষে প্রতিঘাত সুরু হবেই। দ্বিতল ত্রিতল যতই বাড়ছে ততই সমাজ শেষ প্রলয়ের ও ভয়ঙ্কর বিপ্লবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কলের "দরিদ্র"-সন্তানকে ভীষণ বিপ্লব আবাররুদ্ধ ও ঘনীভূত ক'রে তুলছে।

পূর্ব্বকালে সকলকে কাজ করতে হ'ত। সকলেই স্বাধীন জীবন যাপন করত। ভিক্ষুকের শ্রেণী হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। ধনেরও প্রচুর বৃদ্ধি হ'ত না। সকলই স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকৃত। তারপর ক্রমশঃ গৃহ-শিল্পের উন্নতি হ'ল, পরিবার ক্রমে বেড়ে গেল। তখন লোক গৃহত্যাগ ক'রে আয়ের সন্ধানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময়ে মানুষের আত্মস্বার্থ বিপুল হ'তে লাগল সুতরাং অক্ষমেরা গোটা সমাজের ওপর চেপে বস্‌ল। দারিদ্র্য ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু প্রবল বেগে এই দারিদ্র্য বাড়ে নি।

চাষার জীবন মাটির ওপর নির্ভর করছে। তার গৃহশিল্প পশ্চিমের কল বিনষ্ট ক'রে দিয়েছে। কেমন ক'রে তা কথঞ্চিৎ 'ইন্‌-ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌' প্রবন্ধে বলা হ'য়েছে। তাই বলি আমাদের চাষার শিল্প গেছে; সব তার যোগাতে হচ্ছে ঐ মাটী খুঁড়ে খুঁড়ে। মাটি আর কত পারে? তার ত শক্তির একটা সীমা আছে। সে ত আর কল্পতরু কামধেনু নয় যে যেমমাহাত্ম্যে যত ইচ্ছা ততই তার নিকট পাওয়া যাবে। মাটির উর্ব্বরতা কমে গেছে। প্রতি বৎসরই মাটি খেটে খেটে চাষার হাতে দিচ্ছে কিন্তু প্রতি বৎসরই মাটি কিছু কম ক'রেই দিতে পারছে। চাষা কম পাচ্ছে তার অভাব বেড়ে যাচ্ছে। মাটির ফল দিয়ে তার সকল অভাব পূরণ করতে হচ্ছে। সে যে ফল পায় তার আবার অংশীদার কত জন—সেটা দেখা আবশ্যক। একা চাষা খাটছে আর তার কাঁধে চেপে কতজন সে খাটুনির ফলটা উপভোগ কচ্ছে তা দেখলে বুঝা যাবে চাষার দুর্গতি ঊর্দ্ধগামী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কল তৈরী কচ্ছে আর কয়েকটী লোকে তার ফলে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখছে আর সাধারণে বুভুক্ষু জীবন ল'য়ে ব্যস্ত। এখানে চাষা তৈরী কচ্ছে আর সকলে এসে তার সব ভাগবাটরা ক'রে তিল তিল ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চাষা যেমন তেমনি শূন্য পেটে টোকা মাথায় নিড়ানি হাতে মাটির আতপতাপে দগ্ধ হ'তে রয়েছে।

চাষা যা জমি খুঁড়ে পেল তা সব জমিদার ও মহাজন ভাগ করে গ্রাস করল। চাষা একেবারে অন্নহীন বস্ত্রহীন হ'ল। এখনও চাষা মহাজনের আশ্রয় পেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগল। এবার তার আর উপায় নাই। মহাজনের ঘরে যে দেনা জমেছে তার পরিমাণই ভয়ানক—তখন আর কে তাহাকে সাহায্য করবে? এইবার জমি ছেড়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বেঁধে সহরমুখে ছুট্‌। পুত্রকন্যা পরিবার যে যেখানে পারে সেখানে অন্নের জ্বালায় বের হ'য়ে পড়ল। জমি ক্ষেত সব মহাজন জমিদারের ঘরে উঠ্‌ল। পৈত্রিক ভিটা একেবারে বন জঙ্গলে ভরে গেল। এই জমিহীন অবস্থা চাষাকে কাঙ্গাল ক'রে ছাড়ছে। এ অবস্থা স্থানে স্থানে এসে গেছে।

বহু লোক বাস্তহীন হ'য়ে জমি ছেড়ে দেউলিয়া সেজে গ্রাম কি গ্রাম উজাড় ক'রে তুলেছে। শতকরা ২।৩টী পরিবার বৎসর বৎসর জমি-হীন হচ্ছে এ কথা এখন বলা যায়।

আর উদাসীন হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে জাতীয় মহামৃত্যু অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌বে। জাতির জীবনীশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হবে। চাষার মৃত্যু অর্থে জাতির মৃত্যু একথা দিবালোকের মত সত্য। আমাদের এম্ এ, বি এ, পাশ ক'রে চাষা হ'তে হবে—জমির নষ্ট শক্তিকে সঞ্জীবিত ও পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুল্‌তে হবে—চাষার অস্তিত্ব যাতে রক্ষা পায় তার চেষ্টা পেতে হবে। জমিদার ও মহাজন ব্যবসায়দারদের অংশ কমাতে হবে। মহাজনের লাভ ও ব্যবসায়দারদের মুনাফা চাষার হাতে দিতে হবে। মহাজন ও ব্যবসাদারদের টাকা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকল্পে খাটাতে হবে। চাষার অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অসহায়তার সুযোগ যাতে তারা না নিতে পারে তার যথাসাধ্য প্রয়াস করতে হবে। চাষাকে জ্ঞানী ও সংঘবদ্ধ ক'রে তার নিজের অধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তারা শ্রম ক'রে যাতে নির্ব্বোধ হ'য়ে নিঃসহায়ের মত না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির শক্তিকে ফিরাতে পারলে চাষার চাষের খরচও কমে যাবে।

চাষা মনে করে জমি যত চষা যাবে ততই ফসল উঠ্‌বে; জমি একেবারে অক্ষয়। একথা ভুল, তা তাকে প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে। নতুবা সে বিশ্বাস ক'রবে না। এর জন্য দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির দায়িত্ব বেশী। যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে দিয়েই দেশের সেবা ক'রে আস্‌ছেন; শুধু হয় সরকারকে না হয় আর কাউকে নিন্দা ক'রেই কর্ত্তব্য শেষ মনে করছেন—তাঁদের প্রতি আমার বল্‌বার কিছু নেই। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত হ'য়ে চাষার জীবনকে ঘৃণা মনে কচ্ছেন অথচ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী জীবনকে ধন্য ধন্য ক'রে বরণ ক'রে নিচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার এই অনুরোধ। তাঁরা যদি আগ্রহ ক'রে এই চাষার জীবনকে বরণ করতে পারেন আর উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধীরে ধীরে উন্নয়ন করতে প্রস্তুত হন আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি তাঁরা সহজে ধর্ম্ম ও অর্থে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবেন। আমি এই প্রবন্ধেরই শেষে কয়েকজন বিলেতি চাষার নাম করব। তাঁরা বিলেতের কৃষি ব্যবসায়কে কত উন্নত করেছিলেন এবং নিজেরাও কত অর্থ উপার্জ্জন ক'রে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে গেছেন সেই কথাই আমি সংক্ষেপে বলবার আশা করি।

জমিদার ও সরকারের প্রাপ্য অনেক প্রকারের। জমির বার্ষিক খাজানা ত আছেই তার সঙ্গে আরও অনেক বেশী দিতে হয়। যথা :—

(ক) পেয়াদার রোজ। খাজনার তাগাদার জন্য লোক (সাধারণতঃ পাইক) পাঠান হয় তার খোরাকী ও শ্রম বাবদ চার্জ্জ।

(খ) হিসাবানা। জমিদারের গোমস্তা বা নায়েবের নজর ধার্য্য খাজানার প্রতি টাকায় এক আনা হইতে তিন আনা।

(গ) পথকর অর্থাৎ সেস ধার্য্য খাজানার প্রতি টাকায় তিন পয়সা হইতে ছয় পয়সা।

(ঘ) কিস্তি খেলাপী সুদ। টাকায় ২ পয়সা হইতে এক আনা।

(ঙ) নজরানা। জমিদার কি ম্যানেজার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন প্রজাদের কল্যাণ কুড়িয়ে আনতে মফঃস্বলে অভিযান করেন তখন প্রত্যেক প্রজাকে হুজুরে হাজির হ'য়ে এক টাকা হইতে দশ পাঁচ টাকা সম্মানের চিহ্ন প্রদান করিতে হয়।

(চ) এছাড়া মোকদ্দমা খরচ ত আছেই। প্রজা সময়মত খাজানা দিতে পারে না ক'জেই কোর্টে মোকদ্দমা রুজু হ'য়ে যায়। এটা অন্যূন শতকরা ৬০ জনকে বহন করতে হয়।

(ছ) এবার সরকারের দাবী পূরণ করতে হয়। চৌকিদারী ট্যাক্স্ ত বাঁধা আছেই।

মহাজনের প্রাপ্য দুই প্রকারের। বলা হয়েছে চাষাকে টাকাও কর্জ করিতে হয় আর ধানও ঋণ করিতে হয়। উভয়েরই জন্য তাকে বাড়তি বহন করতে হয়। মহাজন আসলের উপর সুদ ও ধান্যের উপর বাড়তি আদায় করে। আসল ত থাকেই। এই বাড়তি বৎসর বৎসর বেড়ে চলে কাজেই আসলে আর হাত পড়ে না। মহাজনের চিরদিনকার আয়ের সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসাদারদের রক্তশোষণ ক্রিয়া কম নয়। তারা অল্পমূল্যে চাষার ঘর থেকে তার কাঁচা ফসল ক্রয় ক'রে সহরে বড় ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় ক'রে মোটা লাভ করে। এ লাভটা বস্তুতঃ চাষারই প্রাপ্য কিন্তু চাষার দুর্বুদ্ধির জন্য সে কিছুই পায় না। অনেক সময় ব্যয় যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক অল্পে বিক্রয় করিতে হয় কারণ মহাজন ও পাইকের তাগাদা তাকে আধমরা ক'রে তোলে। তাকে নিরুপায় হ'য়ে যা পায় তাই নিয়ে নিজের রক্ত ব্যয় ক'রে তৈরী করা ফসলকে ঘর থেকে বের করতে হয়। এমনি ক'রেই চাষার দিন, সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রভাত হ'য়ে যাচ্ছে। এই কঠোর নিঃসহায়তা হ'তে চাষাকে মুক্ত না করতে পারলে জাতির মুক্তি অসম্ভব।

সকলেইত বড় বড় অংশ অধিকার ক'রে বস্‌ল। চাষার ভাগে যে অংশটুকু পড়েছে তার আকার কত ক্ষীণ। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্য হইতে তার নিজের শ্রম ও পরিবারের আহার ও পরিধের সংগ্রহ করতে হয়। এই সামান্য আয়ে তার সব কিছু কিনতে হয়। আজকার দিনে সরকারের ট্যাক্স্ যতই বাড়ছে, চাষার নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য ততই মহার্ঘ হ'য়ে উঠ্‌ছে। ওদিকে জমির ফসলও দিন দিন কমে যাচ্ছে। দুদিক হ'তেই সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হচ্ছে। ঐ সামান্য উদ্বৃত্ত দিয়ে তাকে দুর্লভ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হবে। দুর্গতির চরম সীমায় তাকে পৌঁছতে হবে। এই উদ্বৃত্ত যত কম হয়ে যাবে ততই বর্ত্তমানের দুরাচার পাপ, মিথ্যা ও সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য শত মুখে ব্যাপ্তি লাভ করবে। এই ক্ষুদ্র উদ্বৃত্তই আজকার সকল দুর্বৃত্তির মূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্বৃত্তকে বৃহত্তাকার করতে হবে। গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সরকারের ক্ষুধাবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আর এ ক্ষুধার শান্তি করতেই হবে নতুবা পাশবিক শক্তির খেলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌বে। কাজেই এই ক্ষুধাকে

শান্ত করবার যত শক্তি পেতে হ'লে চাষাকে বলবান্ হ'তে হবে। তাকে পরিপুষ্ট হতে হবে কারণ সামাজিক সকল ভার তার স্কন্ধে চেপে বসবে। তাকে ধনশালী ও বলশালী হ'তেই হবে তা না হলে গণতন্ত্র অচল হবে এবং অবশেষে ভেঙ্গে পড়বে। তখনই উভয় সঙ্কট—ভেঙ্গে পড়লেও পুরাতন অশান্তি দুর্জ্জয় হয়ে উঠবে আর টিকে থাকলেও চাষা ভেঙ্গে পড়বে। সমাজের খেলা ঘর চুরমার হয়ে যাবে।

এস্থলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী কয়টী তাহা দেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রধানতঃ আমাদের দেশবাসীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধনী। কিন্তু ধনীর সংখ্যা এত কম যে এদেশবাসীকে সাধারণতঃ মোটামুটি কৃষকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে ও কোনরূপে জীবন টেনে চলেছে। আয়ের পরিমাণ হিসাবে ও ধনশালী দেশের তুলনায় আমি আমাদের দেশবাসীকে মাত্র দুইটী শ্রেণীভুক্ত করেছি। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষক শ্রেণীর উপর চেপে বসেছে। (ক্রমশঃ)

আবুল হাসান

অশ্রুর নিমন্ত্রণ

অশ্রু আমার, বন্ধু আমার, তোমায় ভালবাসি।
চাই না আমি সুখের স্বপন, চাই না হাসি-রাশি॥
এস আমার হৃদয় ছেয়ে
এস আমার নয়ন বেয়ে
দীর্ঘ দিনের গৃহ-ছাড়া ওগো পরবাসি!
বন্ধু, তুমি প্রথম যেদিন এলে নয়ন-কোণে,
অকল্যাণের মতই তোমায় ভেবেছিনু মনে।
নিত্য তোমার আসা-যাওয়ায়
নিত্য তোমার দেখা-পাওয়ায়
গভীর দুখে চিত্ত আমার হ'ত যে উদাসী॥
যেদিন আমি কেঁদেছিলাম তোমায় দেখা পেয়ে,
আজ যে আমি কেঁদে মরি তোমারি পথ চেয়ে।
এস আমার ব্যথার গানে
থেকো না আর অভিমানে,
নীরস হৃদয় সরস কর বিপুল ধারায় আসি।

গোলাম মোস্তফা

বিদায়-গ্রহণ

(১)

পৌষের দারুণ কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। দুই দিন হইতে আকাশ খুব মেঘলা করিয়া আজ বৈকাল হইতে বর্ষণ সুরু করিয়াছে। তীক্ষ্ণ শৈত্য-শিহরণ ভরা কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস মানুষের হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত নির্ম্মম কম্পন জাগাইয়া হু হু শব্দে বহিতেছে। রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় নাই বলিলেই হয়।

বছর পনের ষোল বছরের একটি বালক ছিন্ন-মলিন ফ্লানেল শার্ট গায়ে, ছেঁড়া চটি পায়ে, এবং তদ্রূপ অবস্থায় একটি পুরানো ফুটা ছাতা মাথায় দিয়া, দ্রুতপদে পথ হাঁটিয়া চলিতেছে। ছাতাটা সে মাথায় দিয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট হইতে নিজকে বাঁচাইবার দিকে যে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ছাঁটের ঝাপ্টায় ছাতার আবরণ সময় সময় তার মাথা ডিঙাইয়া অনেক তফাতে ছটিয়া যাইতেছে, বৃষ্টিতে ঘাড় মাথা ভিজিয়া যাইতেছে, অন্যমনস্ক ছেলেটির সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঘাড় গুঁজিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ ঠাহর করিতে করিতে, সে চলিয়াছে ত চলিয়াছেই!

কয়েকটা কর্দ্দমাক্ত অলি গলি পার হইয়া অন্ধকারে ইঁটপাটকিলে হোঁচট খাইতে খাইতে ছেলেটি একটি অধিকতর অপ্রশস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির মধ্যে আসিয়া একটা একতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিল "স্যার, মাষ্টার সাহেব, বাড়ী আছেন?"

মুহূর্ত্তে দুয়ারের অর্গল খুলিয়া গেল। পূর্ণ ছয় ফুট লম্বা, সুদৃঢ় পেশী সবল বলিষ্ঠদেহ গম্ভীরমূর্ত্তি মাষ্টার সাহেব দুয়ারটা টানিয়া খুলিতে খুলিতে স্নেহময় স্বরে বলিলেন "কে অনুপম নয়?"

মাষ্টার সাহেবের দিকে না চাহিয়াই, ভিজা ছাতাটা সাবধানে মুড়িতে মুড়িতে অনুপম উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ। আজ শুনলুম আপনি এসেছেন তাই তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি। কোথায় গেছলেন স্যর্?—" কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া সহসা সবিস্ময়ে বলিল, "একি স্যর্ আপনার চোখে রুমাল বাঁধা?"

মাথার পিছনে দু হাত উঠাইয়া চোখে বাঁধা রুমালটার ফাঁশ খুলিতে খুলিতে মাষ্টার সাহেব সস্মিত মুখে বলিলেন, "চোখে বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল বাবা। ঘরে এস তুমি।"

চোখের রুমাল খুলিয়া ক্লেশভরে চোখ চাড়িয়া চাহিবার চেষ্টা করিতে করিতে মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "এত বৃষ্টিতে ভিজে এলে কেন? কপাট বন্ধ কর, ছাট আস্‌ছে নয়?"

দুয়ারে খিল আঁটিয়া অনুপম ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভিজা ছাতাটা জল ঝরিবার জন্য এক কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া শিক্ষকের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন স্যর্?"

"কল্‌কাতায়। চৌকিটা কোথা আছে দেখে নাও, বস। এখানে এই.....কি

এটা ?" ডাহিনে ঘাড় কাৎ করিয়া ক্ষীণ দৃষ্টির উপর জোর খাটাইয়া দেখিতে দেখিতে মাটীর উপর ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিয়া মাষ্টার সাহেব বলিলেন "এটা আমার ট্রাঙ্ক বোধ হয় ? চৌকীটা কোথা ?"

"খাটের পাশে রয়েছে। আমি নিচ্ছি। আপনি বসুন।" "তুমি ভিজেছ কি ?" তিনি হাতড়াইয়া খাটে বসিলেন। "বিশেষ কিছু নয়।" অনুপম চৌকী টানিয়া লইয়া খাটের নিকটে বসিল।

ছোট ঘর। সজ্জন উপবেশনের সামান্য আসবাব ছাড়া সেখানে বিশেষ কিছু ছিলিল নাই। দেয়ালের গায়ে দেশ বিদেশের জন কতক বিখ্যাত মল্লবীর ও কর্ম্মবীরের সুদৃশ্য ছবি টাঙানো। ঘরে ঢুকিলে ঘরের এই বিশেষত্ব টুকুই সকলের আগে চোখে পড়ে।

ঘরের এককোণে একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অনুপম সেই ম্লান আলোকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মাষ্টার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কণেক চুপ করিয়া রহিল। কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া সামলাইয়া লইল। সসঙ্কোচে বলিল, 'স্যর্ আপনি কিছু অসুস্থ রয়েছেন কি ?"

চোখ বুজিয়া কপালের উপর হাত ঘসিতে ঘসিতে মাষ্টার সাহেব বলিলেন "হাঁ বাবা। তারপর তোমাদের খবর কি ? সবাই ভাল আছ ত ?"

"আজ্ঞে হাঁ স্যর্। আপনার অসুখ করেছে ?"

"মুখের উপর দু হাত ঢাকিয়া ম্লান হাস্যে মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "সেটা পরে শুনতে পারবে। আগে তোমাদের খবর বল। ছুটিতে পড়াশুনা হয়েছিল ? না আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়েছ ?"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া অনুপম বলিল, "না স্যর্, মাপ করুন। এবার আমরা ভয়ানক আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়েছি। আমাদের মধ্যে বিষম দলাদলি সুরু হয়ে গেছে।—"

মাষ্টার সাহেব হাসিলেন। সুমিষ্ট বিদ্রূপের সুরে বলিলেন "তোমাদের মধ্যে দলাদলি সুরু হয়েছে ? বেশ ! বেশ ! তুমিও দল গড়তে সুরু করেছ না কি ?"

অনুপম অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "হাঁ স্যর্ আপনাকে সেই কথাই বলিতে এসেছি। আপনি আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আমরাও এবার যথারীতি দল গড়তে সুরু দেব। আমরাও এবার মিথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই কর্ত্তে সুরু দেব।"

মাষ্টার সাহেব স্মিতহাস্যে বলিলেন, "সে কথা ভাল। কিন্তু মিথ্যাটা, সত্যিকার-মিথ্যা কি না সেটা বুঝে—তবে তাল ঠুকো। আর দল গড়বার কথা বলছ ? দল শুধু গড়লেই হয় না বাবা, মানুষের বুকের বল চাই সকলের আগে।"

অনুপম অন্তরে অন্তরে কিঞ্চিৎ বিপন্নতা অনুভব করিল। এই সদানন্দ প্রসন্নস্বভাব শিক্ষকটির মধ্যে একটা আশ্চর্য্য বিশেষত্ব সে লক্ষ্য করিয়াছিল,—এ লোকটি সংসারের কোন কিছুতেই দু চক্ষু ভরিয়া দেখেন না। অথচ সকল কিছুরই অন্তর্নিহিত ভালমন্দ দুটা দিকই যেন নিজের মুঠার মধ্যে পুরিয়া বিচারকের নিপুণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সে দেখাটা এত বেশী তীক্ষ্ণ যে, স্থান কাল পাত্র ভেদে অনেকের পক্ষেই সেটা অসহ্য ও

অস্বস্তিকর হইয়া পড়ে, এবং অনুপম হেন ভক্ত শিষ্যের অন্তরেও সময় সময় বেদনাতঙ্কের সৃষ্টি করে !

বিচলিত অনুপম নড়িয়া চড়িয়া বসিল। গলায় আওয়াজ খাটো করিয়া নম্রভাবে বলিল, "বুকের বল চাই স্যর্, কিন্তু দল না গড়্‌লে বুকের বল জাগ্‌তে পারে না।"

"ভুল মাষ্টার চক্রবর্ত্তী ! তুমি আজও নিতান্ত ছেলে মানুষ !—" শিক্ষক সস্নেহে হাসিলেন !

অনুপম অধৈর্য্য হইয়া, বলিল "আগে সমস্ত কথাগুলা শুনুন স্যর্। আমাদের দলাদলির কারণ কি জানেন ? আপনাকে নিয়ে কতক গুলা যাচ্ছে-তাই আন্দোলন চলছে।"

প্রশান্ত হাস্যে শিক্ষক বলিলেন, "আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। প্রদীপটার তেল ফুরিয়ে গেছে। ওই মোমবাতি দেশলাই সেলফে রয়েছে, বাতিটা আগে জ্বালো বাবা।"

(২)

প্রদীপটা ধপ্ ধপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। বাতি জ্বালিয়া সামনে রাখিয়া, অনুপম বলিল, "আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রথমেই অভিযোগকারীদের নাম বল্‌ছি,—নামগুলো শুন্‌লেই আপনি বুঝ্‌তে পারবেন,—"

বাধা দিয়া শিক্ষক বলিলেন, "তাহলে আগে অভিযোগ গুলা শুন্‌তে দাও ;—"

উত্তেজিত হইয়া অনুপম বলিল, "না স্যর্ তাদের নাম—"

দৃঢ়স্বরে উত্তর হইল, "না। তাদের নাম শুন্‌লে আগে থেকেই তাদের ওপর আমার একটা মন্দ ধারণা হয়ত এসে পড়বে, নিজের ওপর ঠিক বিচার কর্‌তে আমি হয়ত ভুল কর্‌ব। আমি কোনখানে সত্য অপরাধী আগে আমায় দেখ্‌তে দাও। অভিযোগগুলা বল।"

অনুপম বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া, এই অদ্ভুত লোকটির মুখের দিকে চাহিল। দূরে প্রদীপের আলোয় সে মুখ এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, সামনের উজ্জ্বল বাতির আলোয় এবার তাহা সুস্পষ্ট দেখিল। কি প্রশান্ত নির্ব্বিকার সে মুখ ! কি উজ্জ্বল স্থির সে দৃষ্টি ! সে উজ্জ্বলতা, সে কঠিন স্থিরতা যেন অনুপমের চোখের উপর সহসা চাপড় বসাইয়া দিল ! অনুপম দৃষ্টি নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "অভিযোগ ? অভিযোগ সেই 'বল' হারানো আপনার মনে আছে বোধ হয় ? আর কি মীমাংসা হয়েছে শুনবেন ? একদল ছেলে রটনা করছেন, আপনি স্কুলের সেই বল চুরি করে বাজারে বিক্রী করেছেন ! অথচ—" কথার সঙ্গে সঙ্গেই মহা উত্তেজিত হইয়া প্রায় উচ্চ চীৎকারেই অনুপম বলিল, "সে বলটা আসলে যে চুরি করেছে, তাকে রুমাল সমেত আমরা ধরেছি, আস্‌ছে শনিবারের ডিবেটিং ক্লাবে আমরা তাকে—"

"কে সে ?"

"যদু, সেবের ক্লাশের ছেলে।"

মাষ্টার সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যমনস্কতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনুপম নিজমনেই বলিয়া চলিল, "তার চুরিটাও ঠিক চুরি নয়। আষাঢ় মাসের সেই ম্যাচ খেলার পর সকলে যখন বরফ লেমনেড্ খাচ্ছিল, সে তখন আনমনে বল্‌টা পকেটে রাখে। তাহার বলের কথা

মনে নেই, সে বাড়ী চলে যায়। তার পরদিন থেকেই ছুটি, সে খুব অসুখে পড়ে। আর স্কুল আস্‌তে পারে নি। বল ফিরিয়ে দেবার সময় পায় নি।"

শিক্ষক চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

অনুপম বলিতে লাগিল, "সেদিন খেল্‌তে খেল্‌তে আপনার বড় মাথা ধরে গিয়েছিল। জিনিস মিলিয়ে নিয়ে ঘর বন্ধ করবার ভার আপনি শচীশের ওপর দিয়েছিলেন, আপনার মনে আছে বোধ হয়?"

"আছে। তারপর বল।"

"শচীশ অবিশ্বাসী নয় স্যর্। কিন্তু সে ভয়ানক অমনোযোগী অসাবধান ছেলে। সে জিনিসগুলা মিলিয়ে না নিয়েই দুয়ার বন্ধ করে দেয়। শচীশ যদি সেই সময়—"

বাধা দিয়া মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "সে ভুলের জন্যে দায়ী আমি। থাক, তারপর বল—"

"সেই ঘড়ু ছেলেটিকে পর্শ্ব ধরেছি। এক দল বড় ছেলে সেই ছেলেটিকে হস্তগত করে ইতিমধ্যেই তাকে কতকগুলি মিথ্যে কথা শিখিয়েছে।—কথাগুলা এমি ভীষণ যে শুন্‌লে মরা মানুষেরও রাগ চড়ে ওঠে!—"

ঈষৎ হাসিয়া মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "তাহলে জীবন্ত মানুষ আমরা, আমাদের পক্ষে সে রাগটা পায়ের নীচে চেপে দাঁড়ানই উচিত। বল তারপর—কথাটা কি?"

অসহিষ্ণু হইয়া অনুপম বলিল, "আপনি সমস্তই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন স্যর্। যে সব গুরুতর বিষয়ের সঙ্গে আপনার সম্মান জড়িয়ে রয়েছে, সে গুলোকেও আপনি অবহেলার চোখে দেখ্‌ছেন! আপনি অদ্ভুত!"

প্রসন্ন-স্মিত মুখে শিক্ষক বলিলেন, "তোমার কথাটা অনুযোগই হোক আর অভিযোগই হোক,—নিজের জীবনেতিহাসের প্রত্যেক পাতার দিকে তাকিয়ে এটাকে আমি বর্ণে বর্ণে সত্য বলেই স্বীকার করছি। পয়সার জন্য নামটাই যেমন খরচ, সম্পদের অন্য দিকটাই তেমি নির্ম্মম অপমান মাত্র! ও আপদগুলোকে যে যত অবহেলার চোখে দেখ্‌তে পারে, সে তত স্বচ্ছন্দে দুনিয়ার দুঃখকে এড়িয়ে চল্‌তে পারে।"

একটু থামিয়া সুগভীর নিঃশ্বাসসহ তিনি পুনশ্চ বলিলেন, "তা বলে তোমার মনুষ্যত্ব-সম্মানকে তুমি ভুলে যাও, একথা আমি বল্‌ছি নে। আমি বলছি তোমার বাইরের সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে তোমার অন্তরটাকে মায়া-মমতাহীন করে দাও। কিন্তু সাবধান, ন্যায় ও সত্যের পথে তুমি প্রাণপণ শক্তিতে খাড়া থেক।"

অভিমান-রুদ্ধকণ্ঠে অনুপম বলিল, "সেটা থাক্‌তে গেলেই অন্যায় থেকে নিজেকে আর পরকে বাঁচাবার পথ দেখ্‌তে হয়, আর সে পথ দেখ্‌তে গেলেই দলাদলির মধ্যে পড়তে হয়। তারপর বল গড়ার জন্যে আপনিই সকলের আগে বকুনী খেবেন!—"

শিক্ষক সস্নেহে হাসিলেন। বলিলেন, "ও সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ত পরে দেব। আগে আমার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগগুলার কথা বল।"

অনুপম এক সুদীর্ঘ কাহিনী বলিয়া গেল। স্কুল সংলগ্ন কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে জন কতক বড় ঘরের বখা ছেলে পড়ে। সমস্ত পৃথিবীটাকে

বিদ্বেষ করিয়া—স্কুলের শিক্ষকগুলিকে তাহারা নিতান্তই তৃণজ্ঞান করিয়া চলে। যে শিক্ষক যখন তাহাদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন, অন্তত গ্রহের মতই সে শিক্ষকের চরম অনিষ্ট সাধনে তখন তাহারা প্রবৃত্ত হয়। এই স্কুলের কত শিক্ষক যে ওই শ্রেণীর ছেলেগুলির অনুকম্পায় কত রকমে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অপবাদগ্রস্ত ও পদচ্যুত হইয়াছেন, তার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ দুর্ঘট। তবে এটা সত্য যে অনেক শিক্ষকের অদৃষ্টেই এ পর্য্যন্ত অনেক দুর্ভোগ ঘটিয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই প্রতিপত্তিশালী সুবিখ্যাত ছেলেগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-বর্গের আত্মীয় স্বজনদের বংশধর। সুতরাং বিদ্যালয়টা তাঁহাদেরই! অতএব বিদ্যালয় হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিবার সাহস কোন শিক্ষকেরই নাই।

এই দলের একটি বালকের ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে কিছু শাসন প্রয়োগ করায়, সম্প্রতি ক্রীড়া-শিক্ষক মাষ্টার সাহেব তাহাদের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন।

(৩)

মাষ্টার সাহেব শান্তভাবেই সমস্ত অভিযোগ-গুলা শুনিয়া গেলেন। উপসংহারে অনুপম বলিল, "মাষ্টার সাহেব, বল চুরির অভিযোগ আপনার ওপর পড়েছে, আবার শীঘ্রই ব্যাট্ চুরির অভিযোগ উপস্থিত হবে। আজ যড়যন্ত্র হচ্ছিল, আমি নিজ কর্ণে শুনেছি। আমার কথা হচ্ছে কি জানেন? আপনি খেলার কিছুই জানেন না, বল ধরতে বল কীক্ করতে আপনি প্রায়ই মিস্ করেন।"

মাষ্টার সাহেব সহসা উৎফুল্ল হাস্যে বলিলেন, "এতগুলা কথার মধ্যে এই একটি কথা সম্পূর্ণ সত্য। তোমার বন্ধুরা বাস্তবিকই আমার একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরেছে। বেয়াদুব চোখ বুজেই আমি এতদিন এই ভুলটি করে যাচ্ছিলুম। আমি নিজেও জানতে পারি নি আমার অবস্থা কি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া অনুপম বলিল, "কেন স্যর্! আপনার কি হয়েছে?"

মাষ্টার সাহেব সে কথার জবাব দিলেন না। বাহিরের দিকে কাণ খাড়া করিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টায় ক্ষণেক নীরব রহিলেন। তারপর বলিলেন, "বৃষ্টি থেমে গেছে। অনুপম, আজ তুমি বাড়ী যাও।"

"যাচ্ছি স্যর্, বৃষ্টিটা ভাল করে থামুক—"

"ভাল করেই থেমেছে। ওর বেশী থামা সম্ভব নয়। তোমরা চক্ষুষ্মান্, কাণের খবরের ওপর তোমরা মনোযোগ দাও না। ভাল করে শোন, বৃষ্টি একেবারেই থেমেছে। বাড়ী যাও এখন।"

অনুপম বলিল—"আপনার কথাগুলা আগে বলুন।"

মাষ্টার সাহেব উত্তর দিলেন, "আজ নয়। কাল স্কুলের ছুটির পর সকলের সামনে বলব।"

ক্ষোভের স্বরে অনুপম বলিল, "তা হবে না স্যর্। আমি আজই শুনতে চাই।"

দুহাতে দৃঢ় বলে নিজের প্রশস্ত উন্নত ললাট চাপিয়া ধরিয়া মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "আমার ধৈর্য্য শেষ সীমায় উপস্থিত হয়েছে এবার! অনুপম তুমি জান না, কি অসহ্য যন্ত্রণা সবলে দমন করে আমি এতক্ষণ মাথা তুলে বসে আছি। চোখের যন্ত্রণায় আমার

মাথার শিরা উপশিরাগুলা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, কাণে তালা ধরে গেছে,—ঘাড় থেকে চিবুক পর্য্যন্ত যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় হয়ে পড়েছে! তবুও এতক্ষণ কথা বলেছি আর পার্‌ছি নে অনুপম, এবার বিদায়! বিশ্রাম করতে যাও।—আমার জিভ্ এবার অবশ হয়ে আস্‌ছে।"

বিস্মিত অনুপম সমবেদনাপূর্ণ স্বরে বলিল, "আপনার এত কষ্ট হচ্ছে? কদিন থেকে এ অসুখ হয়েছে?"

"বহুদিন থেকে অনুপম, বহুদিন থেকে!"

"কই আপনি ত আমাদের কিছুই বলেন নি।"

যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে উত্তর হইল, "বলবার সুবিধা হয়নি, অনুপম। কাল তোমাদের সমস্ত খুলে বল্‌ব, আজ যাও।"

অনুপম বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। সকাতরে বলিল, "আপনার বাসায় তো চাকর ছাড়া কেউ নেই। যদি কোন সাহায্যের দরকার হয়—"

"অন্ধকার আর নির্জ্জনতা ছাড়া কোন সাহায্যের আবশ্যক এখন নাই।"

"তবুও স্যর্, যদি কোন সাহায্য—"

"অনর্থক তর্ক আর জেদের উৎপীড়ন থেকে আজ আমায় অব্যাহতি দাও। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর কথা বল্‌তে পার্‌ছি নে, বিদায়—"

"নমস্কার স্যর্।"—অনুপম ক্ষুণ্ণচিত্তে বিদায় হইল। যতক্ষণ সে গলীর মোড় পর্য্যন্ত চলিল, মাষ্টার সাহেব দুয়ার ধরিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনুপম গলির মোড় পার হইতেই তিনি দুয়ার বন্ধ করিলেন।

পরদিন পূজার কলেজ ও তৎসংলগ্ন কলেজিয়েট স্কুল খুলিল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া স্কুল কলেজের কর্ত্তব্য যথানিয়মে সম্পাদন করিলেন।

যথাসময়ে টিফিনের ছুটি হইল। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা বাহিরে আসিয়া মাঠে জটলা করিতে লাগিল।

একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কতকগুলি বয়স্ক ছাত্র কি একটা গোপন পরামর্শে নিযুক্ত ছিল। গোটাকতক অলস সিপাহী তাহাদের হাত ঘুড়িয়া ফিরিতেছিল। উগ্রগন্ধী সিগারের ধূম এবং অট্ট হাস্যপূর্ণ পরামর্শের ধূমে স্থানটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেগুলি উল্লসিত ভাবে এদিক ওদিকে হেলিয়া দুলিয়া পা ঠুকিতেছিল।

হঠাৎ একদল ছেলের সঙ্গে অনুপম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরামর্শকারীর দল পরামর্শ স্থগিত রাখিয়া উৎসুক হইয়া চাহিল। অনুপম বলিল, "আপনাদের মধ্যে কে কে গেমস্ মাষ্টার সাহেবের বল চুরির সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে প্রস্তুত আছেন আসুন। হেড্ মাষ্টার ডাক্‌ছেন।"

বয়স্ক ছেলের দল পরস্পরের মুখ চাহিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমরা সবাই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। চল।"

সকলে হেড্ মাষ্টারের বসিবার ঘরে উপস্থিত হইল। বয়স্ক বালকের দল দেখিল শুধু হেড্ মাষ্টার নয়, স্কুলের সকল মাষ্টার, কলেজের সকল অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ সেখানে উপস্থিত। হেড্ মাষ্টারের টেবিলের এক পাশে পূর্ব্ব পরিচিত মাষ্টার সাহেব প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। নিকটে

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র যদু একটি টেনিস্ বল হাতে করিয়া অপরাধীর মত নত শিরে দাঁড়াইয়া আছে।

ছেলেরা ঘরে ঢুকিতেই, কলেজের অধ্যক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা কলেজের ছেলে। সুতরাং তোমাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিবেদনের ভার আমার ওপর পড়েছে। শুনে দুঃখিত হলুম, স্কুলের একটি বল হারাণের জন্যে তোমরা একজন ভদ্রলোকের ছেলের ওপর চুরির অভিযোগ উপস্থিত করেছ। তোমরা শুনে সুখী হবে, তোমাদের অভিযোগটা ব্যর্থ বলেই আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, এই যদু ছেলেটির কাছে সত্য ঘটনা শুনতে পার। তোমরা শুনতে চাও?"

শুষ্ককণ্ঠে কলেজের ছাত্র কয়টি উত্তর দিল, "না"।

অধ্যক্ষ বলিলেন, "তাহলে তোমাদের অভিযোগটা তোমরা প্রত্যাহার করছ?"

আবার উত্তর হইল, "হাঁ"।

অধ্যক্ষ বলিলেন, "উত্তম। এবার তোমরা বিদায় হ'তে পার।"

এই অদ্ভুত ভাবের সাক্ষ্যদানের জন্য ছেলেগুলি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্নদিক হইতেই সাক্ষ্য দিবার জন্য মতলব আঁটিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাতরঙ্গ এমন আশ্চর্য্য সাংঘাতিকভাবে তাহাদের মতলবটাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল যে বেচারাদের সদ্যঃ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহারা সত্য স্বীকার করিল। কেন স্বীকার করিল, তা কেহই বুঝিল না, কিন্তু এই স্বীকারটা তাহাদের অন্তরে যথেষ্ট পরিমাণেই লজ্জা ও ক্ষোভের আন্দোলন জাগাইয়া দিল। সে আন্দোলনটা অন্তরালে ভিন্ন প্রকাশ করা চলে না।

বিদায়ের আদেশ পাইয়া ছেলেগুলি সশব্যস্তে প্রস্থানোদ্যত হইল। হঠাৎ মাষ্টার সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও আমার তরুণ বন্ধুগণ,—অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা কর। আমার বিরুদ্ধে তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে বল।"

বিচলিত ছাত্রগণ একযোগে মাথা নাড়িল—"আর কোন অভিযোগ নাই।"

মাষ্টার সাহেব বিনীতভাবে বলিলেন, "একটা অভিযোগ আছে। সেটা বাস্তবিকই সত্য অভিযোগ। তোমরা স্মরণ করে দেখো।"

ছাত্রগণ অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

হেড মাষ্টার সপরিহাসে বলিলেন, "মশা মারবার জন্যে যথেষ্টই কামান দাগা হয়েছে, আর কেন? এবার ওদের খেলার জন্য বিদায় দিন খান্ সাহেব।"

মাষ্টার সাহেব সবিনয়ে বলিলেন, "না মহাশয়, আমি সত্যই বলছি। বালকগণ, তোমরা সঙ্কোচ ত্যাগ কর, সত্য বল,—কিছু দিন থেকে আমি খেলার গ্রাউণ্ডে ক্রমাগতই অকৃতকার্য্য হচ্ছি, নয় কি?"

ছেলেরা চুপ করিয়া রহিল। দলের ভিতর হইতে একজন অস্ফুটস্বরে বলিল, "সেটা বোধ হয় আপনার চোখের দোষ।"

"সাহসী বন্ধু আমার! তোমায় ধন্যবাদ!" কথাটা বলিয়াই মাষ্টার সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বুক পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া হেড মাষ্টারের সামনে

টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, "অনুগ্রহ করে এবার আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন।"

হেড মাষ্টার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনার ইস্তফা? সে কি? না খান্ সাহেব, তা আমি গ্রহণ কর্‌তে পারব না।"

স্মিত মুখে মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "এই দেখুন, আমার মেডিকেল সার্টিফিকেট। আমার ডান চোখ একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, আমার বাঁ চোখের অবস্থা অত্যন্ত ক্ষীণ। আমি এতদিন যা কিছু কাজ করেছি, শুধু এই একটা চোখের জোরে করেছি। আশ্চর্য্য অন্ধ আমি! আমি জানতুম না, আমার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। এতদিনের পর—এই ছুটির অবকাশে চোখ মেরামত কর্‌তে গিয়েছিলুম, একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরীক্ষায় এই অন্ধত্বের রহস্য প্রকাশ হোল!"

প্রকাণ্ড ঘরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা বিস্ময়োত্তেজিত সহানুভূতি-গুঞ্জন বহিয়া গেল। হেড মাষ্টার ঝুঁকিয়া চিকিৎসকের অভিমত পাঠ করিতে লাগিলেন। পলায়নব্যগ্র বালকের দল স্তম্ভিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

চিকিৎসকের অভিমত পাঠ শেষ করিয়া হেড মাষ্টার বেদনার্দ্র দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলেন। মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "আমার চিকিৎসকের বক্তব্য বুঝ্‌তে হোল?"

দুঃখিত স্বরে হেড মাষ্টার বলিলেন, "এ মন্তব্যকে নামঞ্জুর করবার সাধ্য কারুর নাই। কিন্তু এই বয়সে এরকম হওয়ার—কারণ কি?"

"ধন্যবাদ। এবার আমি শিক্ষাদানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত।"—মাথা তুলিয়া মাষ্টার সাহেব সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। ছাত্রদের উদ্দেশে চাহিয়া বিনয়-কোমল স্বরে বলিলেন, "প্রিয় স্নেহের বন্ধুগণ, তোমরা আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলে, সে অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। এ অভিযোগে আজ আমিও যোগদান কর্‌ছি,—নিজের অন্ধত্ব সম্বন্ধে আমি বাস্তবিকই অজ্ঞ ছিলাম। আজ বিদায়ের সময় অন্ধের অসামর্থ্য-ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি। আমার অজ্ঞতা অপরাধের উপলক্ষে তোমাদের মধ্যে যে দলাদলির অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, আশা করি অতঃপর সেটা চির নির্ব্বাণ লাভ কর্‌বে।"

ছাত্রগণের ভিতর একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ জাগিয়া উঠিল? দলের ভিতর হইতে কে একজন প্রতিবাদের সুরে বলিল, "দলাদলির কথা আপনাকে কে বল্‌লে স্যর্?"

ঈষৎ হাসিয়া মাষ্টার সাহেব বলিলেন, "যাদের চোখ নষ্ট হয়, তাদের মনের জোর স্বভাবতই কিছু বেড়ে যায়। আমি তোমাদের মুখ ভাল দেখতে পাইনে, কিন্তু কথা প্রায় সমস্তই শুন্‌তে পাই। হতে পারে তার মধ্যে ভুল কথাও কিছু হয়ত শুনে থাকব।—কিন্তু যাক, এ নিয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। বন্ধুগণ, অকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস হওয়ার সম্বন্ধে তোমাদের একটা কৈফিয়ৎ জানাতে চাই, তোমরা অনুগ্রহ করে শোন। অনুপম চক্রবর্ত্তী এখানে উপস্থিত আছ কি?"

উত্তর হইল "হাঁ স্যর।"

"উত্তম। হেড মাষ্টার মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমায় দশ মিনিট সময় দিন্। শোন বন্ধুগণ, ষোল বছর আগে, যখন এ স্কুল কলেজিয়েট স্কুল ছিল না, মাত্র হাই স্কুল ছিল,—তখন এই

স্কুলের প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানীয় ছাত্র ছিলাম—আমি। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্কুলের সকল শিক্ষকই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কেন না, সকলের নীচু ক্লাশ থেকে সুরু করে, আমার নাম বরাবরই প্রথমে স্থান লাভ করেছিল।

আমি খুব দরিদ্রের সন্তান ছিলাম। আমার সে দরিদ্র ছাত্রজীবনের ইতিহাস অতি করুণ মর্ম্মন্তুদ। সংসারে অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ পিতা ছাড়া আমার কেউ ছিল না। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাবর্গের অনুগ্রহে, শিক্ষকদের সুপারিশে আমি বিনা বেতনে স্কুলে পড়তাম, আর পিতার সঙ্গে অর্দ্ধ অনশনে অতিকষ্টে দিন কাটাতাম।

আমাদের প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট যখন আসন্নপ্রায়, একদিন হঠাৎ আমাদের ক্লাসে একটা মহা গোলমাল হোল! স্কুলের কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আমাদের ক্লাসের কতকগুলি ছেলে খাপ্পা হয়ে উঠল। আর কতকগুলি ছেলে দাঁড়াল তাদের বিরুদ্ধে,—অর্থাৎ শিক্ষকের স্বপক্ষে।

দলাদলির গোলমালে যোগ দেবার সময় আমার ছিল না, কারণ নিজের পড়া আর অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধবাপের সেবায় আমার সমস্ত সময় খরচ হোত। সুতরাং এবারেও আমি নিস্তব্ধ রইলাম। কিন্তু শিক্ষকের বিরুদ্ধদলের একটী ছেলে এসে আমার উপর জুলুম করে বসল, "শিক্ষকের নামে কতকগুলি মিথ্যাকুৎসা অপবাদের ফর্দ্দ তৈরী করে স্কুলের দ্বারে টাঙ্গিয়ে রাখবার ভার নিতে হবে।"

দরিদ্র জীবনের ঋণ-পরিশোধের জন্য এ দুনীয়ায় অনেকের কাজেই আমায় ভিক্ষা করতে হয়েছিল। এই ছেলেটীর বাপ ছিলেন —আমার সেই ভিক্ষাদাতাদলের একজন। কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইনি,—কিন্তু এ অন্যায় আদেশ পালনে স্বীকৃত হতে পারলুম না। তর্ক, ভেদ, উৎপীড়ন ভয় সমস্ত গুন্‌লাম, কিন্তু অটল রইলাম।

আমার বাড়ীতে বসেই ক্রোধান্ধ ছেলেটী আমার চোখের উপর প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিলে। মুহূর্ত্তে চোখের স্নায়ু শিরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন প্রবল জ্বর, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, রক্তাক্ত চোখে সমস্ত পৃথিবীর মূর্ত্তি ঝাপ্সা!—

এ পৃথিবী চিরদিনই দরিদ্রের ওপর, দুর্ব্বলের ওপর অন্যায় জুলুম করেছে। দরিদ্র দুর্ব্বল তার কোন প্রতিকার করতে পারে নি, প্রতিকার-চেষ্টা তার জন্যে শুধু অধিকতর শাস্তিকে বহন করে এনেছে। সবল অত্যাচারী এখানে চিরদিনই দেবতার আসন দখল করে বসে আছে।

যাক সে কথা। আমার কৃতজ্ঞতার মান রাখলুম। ভিক্ষাদাতার সন্তানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করলুম না। ছয় মাসের পর সুস্থতালাভ করলুম, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি সেই থেকে চির অস্পষ্ট রয়ে গেল। ছাত্র জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে হত্যা করে, বিষাদ অন্ধকার ভরা অন্ধ ভবিষ্যৎ দেখা দিল। পড়াশোনার সামর্থ্য আর রইল না।

বলেছি, আমি দরিদ্র পিতার সন্তান। অর্থাভাবে সার্কাসের দলে বাঁশী বাজানোর চাকরী নিলাম। ক্রমে সেখান থেকে কমিক প্লেয়ার, তারপর মল্লক্রীড়ক,—তারপর বিশ্বস্ত

কোষাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হলুম। আমার ক্ষীণদৃষ্টি পৃথিবীর অধঃপতনের প্রলোভন থেকে আমায় রক্ষা করেছিল, কিন্তু উন্নত আনন্দভোগের অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করে নাই।—

ভদ্রতা-সম্মত হাস্যোদ্দীপক অভিনয়-দক্ষতায় উচ্চ সমাজে সম্মানিত হলাম। প্রচুর পুরস্কার লাভ করলাম। দুর্ভাগ্য আমার!—সহধর্ম্মীগণের মধ্যে ঈর্ষ্যার চাঞ্চল্য উদ্বেলিত হয়ে উঠল।—সার্কাসের দলের মধ্যে একটা বিষম দলাদলির উত্তেজনা জেগে উঠল। একদিন তারা আমার কমিক প্রেয়ারী ইহ-জন্মের মত ঘুচিয়ে দিলে,—শ্বাসনালীর ওপর এই স্যাখো সেই অস্ত্রঘাতের চিহ্ন।"

জামার উঁচু কলার খুলিয়া মাষ্টার সাহেব নিজের গলায় সুদীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন দেখাইলেন। তারপর কলারের ক্লিপ আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন, "সার্কাসের স্বত্বাধিকারীর বিপুল যত্নে সে যাত্রা বাঁচলুম, কিন্তু বেঁচে ওঠাটা মোটেই সুবিধাজনক হোল না। জীবিকা নির্ব্বাহের শ্রেষ্ঠ উপায়,—স্বর-পরিবর্ত্তন ক্ষমতা, শ্বাসসঞ্চালন শক্তি, একেবারে লোপ হয়ে গেল। যে শরীর বহুদিনের যত্নে বলিষ্ঠ-সবল করে তুলেছিলাম, সে শরীর ওই একদিনের আঘাতে ভেঙ্গে পড়ল। স্বত্বাধিকারী মোটা সাহায্য রজনীর প্রচুর পুরস্কার দিয়ে আমায় অবসর দান করলেন।

দেশে ফিরে আবার পুরাণো ভিটায় নূতন ঘর তৈরী করালুম। পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু হয়েছিল, সুতরাং সংসার বলতে কোন বালাই আমার ছিল না। অর্থ যা সংগ্রহ হয়েছিল, তাতে নিজের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে না হলেও চলত। কিন্তু তবুও যখন শুনলাম—এখানকার স্কুলের জন্যে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রয়োজন,—তখন চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব হোল। বিশেষতঃ দৃষ্টিশক্তিটা সে সময় অস্থায়ী রকমে বিশেষ সুস্থ বোধ হোল।

এই বিদ্যালয়ের চিরঋণী, অকৃতী ছাত্র আমি।— আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা মনে রেখো এখানে শিক্ষকের গর্ব্ব নিয়ে আমি আসি নি,— আমার সেই পুরাণো প্রিয় ছাত্র জীবন—" হঠাৎ অব্যক্ত বেদনাবেগে মাষ্টার সাহেবের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবল চেষ্টায় আত্ম দমন করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার অসমাপ্ত বক্তব্যের উপসংহার আজ এই খানেই এই বিদ্যালয়ের ষোল বছর আগের সে সব শিক্ষক, সে সব ছাত্র, কেউ আজ এখানে উপস্থিত নাই। কিন্তু ষোল বছর আগের সমস্ত স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল রয়েছে। সেই আনন্দময় ছাত্রজীবনের আনন্দের ঋণ কিছু পরিশোধ করবার ইচ্ছায় এখানে এসেছিলাম, কিন্তু এক বৎসরেই আমার আহত দৃষ্টিশক্তি অকালে ইহলীলা সম্বরণব্যস্ত,—পীড়িত মস্তিষ্কে কিপ্ত বেদনার রণবাদ্য ঝঙ্কার অকালেই মুখরিত। অতএব এই খানেই বিদায়! বন্ধুগণ, যদি আমার কথা কখনো তোমাদের স্মরণ হয়, তাহ'লে সেই সঙ্গে অনুগ্রহ করে এই কথাটি স্মরণ কোর,—এই বিদ্যালয়ের অনুগ্রহেই একটি অধ্যবসায়শীল দরিদ্র বালকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ একদিন সূচিত হয়েছিল, আর এই বিদ্যালয়েরই কতকগুলি

দৌরাত্ম্যপ্রিয় অসংযত উদ্ধত বালকের ঘনাঘনি উত্তেজনার দ্বন্দ্বসংঘাতে সে ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে ! খোদার করুণাকে ধন্যবাদ—এই নিদারুণ আহত দৃষ্টি আজ ষোল বৎসর আমায় আশাতিরিক্ত কাজ দিয়েছে, কিন্তু এ দৃষ্টি যদি আহত না হোত, তা হ'লে ..... ?"

মাষ্টার সাহেব থামিলেন। সমস্ত গৃহ নিস্তব্ধ। শুধু ঘর ভরা সম্মিলিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যেন একটা বিরাট আর্ত্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইয়া, হায় হায় করিয়া উর্দ্ধে ভাসিতে লাগিল !

একটু নীরব থাকিয়া মাষ্টার সাহেব প্রসন্ন সহাস মুখে বলিলেন, "পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য বিশেষ কোন কাজই করতে পারলুম না, এইটেই—আমার ব্যর্থজীবনের একমাত্র বেদনা ! ছাত্রগণ, তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমায় ভালবেসেছিলে, কেউ কেউ আমার ওপর বিরক্তও হয়েছিলে—আজ সে সকল উপচারই আমি সমান স্নেহে গ্রহণ করে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় হচ্ছি। তোমাদের ভিতরের একটি ছাত্রের গতকল্যকার একটা প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমার শেষ বক্তব্য জানাচ্ছি,—ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের সংঘাতে যে বর্ব্বর উত্তেজনা সৃষ্ট হয়,—সে উত্তেজনা এ পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সম্ভাবনাকে হত্যা করে, অনেক প্রত্যক্ষ মঙ্গলকে ধ্বংস করে। এ সত্য, তোমরা চরিত্র-গঠন ব্যাপারে স্মরণ রেখো। আমার অন্ধ দৃষ্টির স্নেহ এবং ছিন্ন কণ্ঠের বাণী তোমাদের জন্য চিরদিন মঙ্গলময়ের চরণে মঙ্গল প্রার্থনা করবে। বিদায় !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

প্রেমহীন প্রাণ

যুগ যুগান্তর ধরি সিঞ্চিলে শীতল বারি
ঐ যে দাঁড়ায়ে দেখ শুষ্ক তরু মূলে ;
কভু নাহি মুঞ্জরিবে, কোমলতা না আসিবে
পথিক না পায় শান্তি বসি' তার তলে।
প্রেমহীন প্রাণ যার শুষ্ক তরু দেহ তার,
ঘৃণার-শোনিতে সিক্ত করিলে তাহায়।
কোমলতা না আসিবে, কঠিনতা না ঘুচিবে
জানি না কি দিয়ে বিধি গড়েছে তাহায়।
বিহঙ্গিনী ভুল্ল মনে, আনি তৃণ প্রাণ পণে,
নাহি বাঁধে বাসা আর কাকলি করিয়া।
নাহি আসে অলি আর লুটিবারে মধুভার
বসিতে পায় না হায় সোহাগে চলিয়া।

শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়

ইসলাম গৌরব

আব্বাসীয় সভ্যতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উমিয়াবংশীয় খলিফাগণের সময়ে শুধু আরবের অধিবাসীগণই সকল প্রকার সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু আব্বাসবংশীয়গণের সময়ে আরবগণ অপেক্ষা অন্যান্য দেশীয় বিশেষতঃ সিরিয়ার মুসলমান অধিবাসীসমূহ উচ্চপদ এবং ক্ষমতার অধিকারী হইতেন। যে কোন দেশবাসীই হউক না কেন সকল মুসলমানই এই সময়ে সমান অধিকার পাইত। এই নিমিত্ত আব্বাস বংশ জন সাধারণের প্রিয় ছিল এবং অনেকদিন শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

খলিফা এই সময়ে শুধু শাসন বিষয়েই প্রধান ছিলেন না ; তিনি প্রধান পুরোহিত ও ছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়েও তিনি প্রধান ছিলেন। এক আধারে তিনি রোমের পোপ এবং সিজার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ প্রায়শঃ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া যাইতেন। কিন্তু জনসাধারণ তাহাকে খলিফা বলিয়া না মানিয়া লইলে তাহার পক্ষে খলিফার আসন গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। মুসলমানগণ সমবেত হইয়া খলিফার নিকটে বশ্যতার প্রতিজ্ঞা করিত। খলিফাই সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মে বাধা দিবার শক্তি কাহারও ছিল না। কিন্তু মামুনের সময় হইতে একটা মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছিল। আব্বাসের ষড়লাট এবং গভর্ণরদিগের যেমন একটী মন্ত্রণাসভা আছে খলিফারও ঐরূপ একটী মন্ত্রণাসভা গঠিত হয়। সকল প্রকারের লোকই ঐ সভায় তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত।

শাসনকর্ত্তৃগণ কোনও প্রদেশে অধিক দিন থাকিতে পারিত না। এবং প্রত্যেক প্রদেশে খলিফার বিশেষ গুপ্তচরগণ অবস্থান করিয়া দেশের অবস্থা ও কর্ম্মচারীবর্গের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। কোন কোন সময়ে পোষ্ট আফিস বা ডাক বিভাগের কর্ত্তা প্রধান গুপ্তচরের কার্য্য করিত। এমন কি দূর দেশে ও অন্তরাজ্যে খলিফাগণের গুপ্তচরগণ থাকিত।

সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করাই আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ; এই নিমিত্ত তাঁহারা বিদেশ জয়ের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্ত মনে শাসন সৌকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের শাসনপ্রণালী অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান সভ্য জগতের শাসনপ্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল সন্দেহ নাই। রাজকার্য্যে কোনও জাতি বা ধর্ম্মের বৈষম্য করা হইত না।

উজির খলিফার প্রধান সহায় ছিলেন। শাসনকার্য্য নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা কর বিভাগ, আয়-ব্যয় বিভাগ, ডাক বিভাগ, সৈন্য বিভাগ, পত্র বিভাগ ইত্যাদি।

আবার ইহার ভিতরে স্বায়ত্বশাসনও ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এবং সহরে জনসাধারণ নিজেদের শাসনকার্য্য নিজেরাই চালাইতে পারিত। যেখানে রাজকর্ম্মচারীগণের সাহায্য প্রয়োজন হইত শুধু সেই স্থানেই তাঁহাদের সাহায্য করা হইত। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীগণ কৃষিবিষয়ক সকল কার্য্যেরই সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন। যেখানে জলাভাব হইত সে স্থানে আবশ্যক মত তাঁহারা খাল কাটাইয়া দিতেন।

ডাক বিভাগ অতিশয় উন্নত ছিল। অশ্ব দ্বারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সরকারী এবং বেসরকারী সংবাদসমূহ বহন করিয়া লওয়া হইত।

তৎকালে মুসলমানগণ শিল্প বাণিজ্যেও সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কাচ, সাবান, কাগজ, রেশম, জরীরকার্য্য কোন বস্তুরই তখন অভাব ছিল না। দেশে প্রচুর পরিমাণে বার্লি, ধান্য এবং অন্যান্য সহস্র প্রকার ফসল জন্মিত। বস্তুতঃ মুসলমান জগত এই সময়ে ধন ধান্যে পূর্ণ ছিল।

সৈন্য বিভাগের উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তখন সভ্য জগতে যত রকম রণকৌশল প্রচলিত ছিল মুসলমান রণবিদ্‌গণ তৎ সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রণক্ষেত্রে হাঁসপাতালের বন্দোবস্তও ছিল।

রণতরীরও তখন অভাব ছিল না। রণপোতের অধ্যক্ষকে আমীর উল্-মা বলা হইত। তাহা হইতেই ইংরেজী অ্যাডমিরাল্ (Admiral) শব্দের উৎপত্তি।

সহরগুলি অতিশয় সুন্দর ছিল। প্রসিদ্ধ বোগ্দাদ নগরীর বর্ণনা করিতে এ ক্ষুদ্র লেখনী অক্ষম। বিশ লক্ষ লোক এই নগরীতে বাস করিত। সুবিস্তৃত ময়দানের মধ্যস্থানে খলিফার প্রাসাদ শোভা পাইত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অমাত্যদিগের বাগান বাড়ী সকল অবস্থান করিত। কলিকাতার চৌরঙ্গী অপেক্ষাও প্রশস্ত শত শত রাস্তা ছিল। তাহার প্রত্যেকটী রাস্তা এক জন কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে থাকিত। নগরীর চারিদিকে প্রাচীর ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীর সংলগ্ন কতকগুলি ফটক দিয়া লোকে বাহিরে যাতায়াত করিত। সেই প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদরাশি, নদীবক্ষে সুসজ্জিত তরণীবাহিনী ও নগরবাসীগণের মণিখচিত পোষাক পরিচ্ছদের শোভা বর্ণনা করা যায় না।

কলেজ এবং হাঁসপাতালের অভাব ছিল না। নানা রকম বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। মুসলমানগণ জ্ঞান জগতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা আলোচনা না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। রসিদ এবং অন্যান্য আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ শিল্প এবং বিজ্ঞান সাহিত্যের নিমিত্ত কিরূপ যত্নপরায়ন ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরবগণ সামুদ্রিক কম্পাস আবিষ্কার করেন। তাঁহারা দূর দূরান্তর প্রদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক নানা দেশ আবিষ্কার করতঃ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং মালয়ার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এমন কি চীনদেশেও আরব-বণিকগণের অবাধ গতি ছিল।

কি ইতিহাস কি বিজ্ঞান কি সাহিত্য, কি দর্শনশাস্ত্র আরবগণ সকল বিভাগেই প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন সমস্ত মুসলমান-জগৎ জ্ঞানা-

লোকে উদ্ভাসিত হইতেছিল তখন তাতার দেশ হইতে ধ্বংসের ভীষণ ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইয়া মোসলেম জগত প্লাবিত করিয়া দিল—সেই বিরাট সভ্যতার চিহ্ন-মাত্র রহিল না।

স্পেনীয় মুসলমানগণের ইতিহাস

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মোস্‌লেম-সভ্যতা একেবারে বিনষ্ট হইল না। স্পেনে যে সকল মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেছিলেন তাহারা মুসলমান-গৌরব বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে ইয়োরোপীয়গণ সেই আলোক প্রাপ্ত হয়।

মুসলমানজয়ের পূর্ব্বে স্পেনের অধিবাসীগণ গথজাতির কঠিন শাসনে নিষ্পেষিত হইতেছিল। যখন মুসলমান সেনাপতি মুসা আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন স্পেনে রডারিক নামে এক রাজা ছিল। এই রডারিক তাহার জুলিয়ান নামক এক কর্ম্মচারীর কন্যার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া জুলিয়ান আফ্রিকার মুসলমানগণকে স্পেন অধিকার করিতে আমন্ত্রন করেন। মুসা এ সুযোগ ত্যাগ করিল না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী তারেখ স্পেনে গমনপূর্ব্বক রডারিককে নিহত করতঃ স্পেন অধিকার করেন। মুসলমানগণের শাসনাধীনে স্পেন দেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। কৃষির উন্নতিবিধান করিবার নিমিত্ত মুসলমানগণ অতিশয় যত্ন করিতেন। কর কমাইয়া দেওয়া হয়। প্রজাগণ আপন আপন ধর্ম্ম অনুসারে চলিতে পাইত। অনেকে মুসলমান ধর্ম্মও অবলম্বন করিয়াছিল।

এইরূপে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ উম্মিয়া বংশীয় খলিফার অধীনে কিছুদিন স্পেনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা প্রায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন আব্বাস বংশীয়েরা উম্মিয়াবংশ সমূলে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল তখন উম্মিয় বংশীয় খলিফার আব্দুর রহমান নামক এক পৌত্র আফ্রিকায় পলায়ন করেন এবং তথা হইতে স্পেনের মুসলমানগণের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তিনি যখন সমুদ্র পারে হাঁটু গাড়িয়া আল্লার নাম করিতেছিলেন তখন তাহার দূত শুভ-সংবাদ লইয়া আইসে। অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া আব্দুর রহমান স্পেনদেশ জয় করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন এবং বোগ্দাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

স্পেনের রাজধানী কয়ডোভা অধিকার করিলেও আব্দুররহমানের সমস্ত দেশ অধিকার করিতে অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। বোগ্দাদের খলিফা মন্‌সুর এক-দল সৈন্য স্পেনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অমিতবিক্রম আব্দুর রহমান সেই সৈন্যদলের নেতাকে নিহত করতঃ তাহার ছিন্ন মুণ্ড একজন মক্কাযাত্রীর হাতে বোগ্দাদে প্রেরণ করেন। মন্‌সুর সেনাপতির ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, "ভাগ্যবশতঃ আমার ও তাঁহার ভিতরে মহাসমুদ্র রহিয়াছে।" এ দিকে ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া স্পেনের সকল সহরই আব্দুর রহমানের হস্তগত হইতে লাগিল। বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত তরুণ-আব্দুর রহমানের কোমল হৃদয় ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি নিজে জনসাধারণের সহিত সুখে

দুঃখে মিশিতেন; সামান্য প্রজার দুঃখেও ক্রন্দন করিতেন। কিন্তু বিদ্রোহ-বহ্নি তাঁহার হৃদয় পাথরের মত কঠিন করিয়া দেয়। একটী তালবৃক্ষ তিনি আরবদেশ হইতে আনিয়া স্পেনে রোপণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি সেই বৃক্ষটীর গাত্রে এই একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি যেমন আমারই মত একাকী বিদেশে পড়িয়া আছ, তেমনই আমারই মত তুমি বন্ধুহীন।"

আব্দুর রহমানের পর তাঁহার বালক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; এই নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিকরূপে জীবন যাপন করিতেন এবং সদয় ভাবে প্রজা পালন করিতেন।

তাঁহার পর হাকাম খলিফার পদ প্রাপ্ত হন। হাকাম অতিশয় চতুর ছিলেন। একবার তাঁহার সমস্ত প্রজা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু হাকাম তখন নিশ্চিন্ত মনে বেশবিন্যাস করিতেছিলেন। তখন তাঁহার অনুচরবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইল। কিন্তু হাকাম গোপনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া প্রজাদের গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রজাগণ পশ্চাতে যখন অগ্নি শিখা দেখিল তখন প্রাসাদ ছাড়িয়া গৃহের দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই অবসরে হাকামের প্রাসাদের সৈন্যগণ তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু হাকাম তাহাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা না করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন।

মুসলমানগণ স্পেনের প্রায় সকল স্থান অধিকার করিলেও প্রান্তভাগে কতক স্থানে খৃষ্টানগণ স্বাধীনভাবে বসবাস করিত। এবং তাঁহাদের রাজ্যেও ঐ খৃষ্টান সন্ন্যাসীগণ বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা মৃত্যুকে ভয় করিত না এবং দলে দলে ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিত।

হাকামের পরবর্ত্তী খলিফাগণ দুর্ব্বল ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে চারিদিকে বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন খ্যাতনামা খলিফা স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন স্থানে স্থানে শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছিল। খৃষ্টানগণ নানা উপদ্রব করিতেছিল। কিন্তু তৃতীয় আবদর রহমান এই সকল বাধা অতিক্রম করিলেন। তাঁহার এরূপ প্রতাপ ছিল যে স্পেনের কোন কোন খৃষ্টান রাজা তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আবদর রহমানের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আব্দর রহমান বহুদেশ জয় করিয়া অমিতবিক্রমে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাহার দরবারে কনষ্টেন্টিনোপলের সম্রাট, ফরাসীদেশের নৃপতি, জার্ম্মানী এবং ইটালীর রাজা দূত পাঠাইয়াছিলেন। "কি এশিয়া কি ইয়োরোপ সর্ব্বত্র-তিনি শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার নিমিত্ত খ্যাত ছিলেন।

তৃতীয় আবদর রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকাম পুস্তকের কীট ছিলেন বলিলেই হয়। তিনি সর্ব্বদাই লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পুস্তকাগারে লক্ষ পুস্তকেরও অধিক সংগৃহীত করা হইয়াছিল। যখনই সংবাদ আসিত কোন দেশে কেহ উত্তম পুস্তক রচনা করিতেছে, তখনই খলিফা তাঁহার নিকট

হইতে সেই পুস্তক ক্রয় করিয়া লইতেন। কিন্তু হাকামের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হিশাম বালক ছিল। এই সময় তাহার মাতার অতিশয় প্রভুত্ব ছিল। তিনি আলমনজুরনামক এক জন যুবককে অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। এই যুবকের ইতিহাস বিস্ময়জনক। সামান্য কর্ডোভা বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে এই যুবক উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন সে বিদ্যালয়ে পাঠ করিত তখন তাহার বন্ধুগণকে সে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে কি কি পদ প্রদান করিবে তাহা আলোচনা করিত। বস্তুতঃই ক্রমে সে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া শিশু-কালের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। শাসনের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সে অদ্বিতীয় ছিল। তাহার অবাধ্য পুত্রকে আঘাত করিতে করিতে সে নিজহস্তে হত্যা করিয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন তাহার অদম্য সাহস ছিল, রাজসভায় তেমনই তাহার বুদ্ধি এবং সহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইত। এক দিবস আলমনজুর যখন দরবারে বসিয়া বিচার কার্য্য করিতেছিলেন তখন সকলেই একটী উগ্র গন্ধ অনুভব করিত। অনুসন্ধানে জানা গেল যে আলমনজুরের পাদদেশে একটী ক্ষত হওয়ায় উহা কষ্টিক দ্বারা দগ্ধ করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টানগণ বার বার পরাজিত হইয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিত। ১০০২ খৃষ্টাব্দে যখন আলমনজুরের মৃত্যু হইল তখন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী-গণ লিখিয়া রাখিয়াছিল যে আলমনজুর ১০০২ খৃষ্টাব্দে নরকে গমন করিল। ইহা হইতেই তাহাদের ভয়ের পরিমাণ কতকটা অনুমান করা যায়।

আলমনজুরের মৃত্যুর পর স্পেনীয় মুসলমান-গণের পতন হইতে লাগিল। একজন প্রবল পরাক্রান্ত নায়ক ব্যতীত স্পেনীয় মুসলমানগণ চলিতে পারিত না। এই সময়ে আত্মকলহ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং অন্য দিকে খ্রীষ্টান রাজগণ চারিদিক হইতে মুসলমানগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। খলিফার পর খলিফা পুতুলের ন্যায় আসনে বসিতে এবং হত হইতে লাগিল। পরিশেষে তৃতীয় হিশামকে কারাগারে অন্ধকারে এক টুকড়া রুটীর নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে হইয়াছিল।

কর্ডোভার জন সাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিল। এই সময়ে খৃষ্টান রাজগণও আক্রমণ করিলেন। তখন স্পেনের মুসলমান-গণ আফ্রিকার মুসলমানগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিল। আফ্রিকা তখন আলমোরাইদ্ বংশীয়দের অধীনে ছিল। তাহাদের নায়ক ইউসুফ স্পেনে আগমন করিয়া খৃষ্টানগণকে বিতাড়িত করিয়া গ্রাণাডায় প্রবেশ করিলেন। কিছুদিন পরে আলমোহাদিস্ বংশীয়গণ আলমোরাইদ্গণকে আফ্রিকা এবং স্পেন হইতে বিতাড়িত করিয়া আফ্রিকা হইতে স্পেন দেশ শাসন করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে স্পেন হইতে তাহারাও বিতাড়িত হইয়াছিল। এদিকে খৃষ্টানগণ একটী একটী করিয়া দেশ জয় করিতেছিল। এই সময় গ্রাণাডার অধি-পতি বণীনসর মুসলমানগণের নায়ক ছিলেন। তাঁহার সিংহ বিক্রমে খৃষ্টানগণ সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিত। কিন্তু তাহার পুত্র বুয়াবদিলই তাঁহার বংশের ধূমকেতু স্বরূপ হইল। এক-বার বোয়াবদিল খৃষ্টানগণের হস্তে বন্দী হয়।

পরে সে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করে। খৃষ্টানগণ তাহাকে গ্রাণাডা ফিরাইয়া দেয় বুয়াবদিল গ্রাণাডার রাজা হইয়া তাহার খুল্লতাতকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তাহার সঙ্গে খৃষ্টানগণের এরূপ চুক্তি ছিল যে যখন তাহারা অন্য সমুদয় দেশ অধিকার করিবে তখন বোয়াবদিল তাহাদিগকে গ্রাণাডাও ছাড়িয়া দিবে। ক্রমে অন্য সমস্ত দেশ খৃষ্টানগণ জয় করিল। বোয়াবদিল রমণীর ন্যায় গ্রাণাডা শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়া দেশ ত্যাগ করিল। তৎপর একটী পাহাড়ে উঠিয়া গ্রাণাডার দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মাতা বলিয়াছিলেন যাহা তোমার পুরুষের মত রক্ষা করা উচিত ছিল তাহা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আর রমণীর মত করিও না। আজিও সেই পাহাড় "মুসলমানগণের শেষ দীর্ঘনিশ্বাস" নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপে স্পেন খৃষ্টানগণের হস্তে নিপতিত হইল। তবু সহস্র সহস্র মুসলমানগণ স্পেনে খৃষ্টান রাজগণের অধীনে বাস করিতে লাগিল। তাহারাই দেশের স্তম্ভস্বরূপ ছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির মূলে তাহারাই অবস্থিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় ফিলিপ যখন স্পেনের রাজা ছিলেন তখন তিনি সমস্ত মুসলমানদিগকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। এইরূপে স্পেনের মহা সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। কারণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন দেশের কৃষির উন্নতির লোপ পাইল। তাই জনৈক ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন যে ফিলিপ বুঝিতে পারে নাই যে সে স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংসের বিনাশ করিয়া দেশের কি ক্ষতি করিল।

স্পেনে মুসলমান সভ্যতা

তৃতীয় আবদর রহমানের সময় রাজধানী কর্ডোভা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর, ভিতরে শত সহস্র প্রাসাদ লইয়া কর্ডোভা সগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া থাকিত। সমস্ত ইয়োরোপ এবং এশিয়া হইতে বিদ্যার্থিগণ কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিত। এই নগরী ১০ মাইল দীর্ঘ ছিল। খলিফের প্রাসাদ-সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। পঞ্চাশৎ সহস্র অমাত্যের প্রাসাদ, এক লক্ষ সাধারণ লোকের আবাসস্থান, সাত শত মস্‌জিদ এবং নয় শত সাধারণ স্নানাগার যে স্থানে অবস্থান করিত তাহার শোভা কল্পনারও অতীত। স্নান করা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা মুসলমানগণের প্রকৃতিগত অভ্যাস। এক বেলা উপবাস করিয়াও তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত। কর্ডোভার সান্নিধ্যে আজ-জোহরা নামে তৃতীয় আবদর রহমান একটী সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সাজাহান যেমন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর নামানুসারে তাজমহল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, আবদর রহমান তাঁহার পত্নীর নামানুসারে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে প্রত্যহ দশ সহস্র লোক খাটিত। চারি সহস্র স্তম্ভ এবং ১৪০০ দ্বার লইয়া এই প্রাসাদ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সদা সর্ব্বদাই এই প্রাসাদ লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকিত। ১৩৭৫০ জন পুরুষ ভৃত্য সর্ব্বদাই কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকিত। এমন কি পুকুরের পালিত মৎস্যের নিমিত্ত রোজ ১২০০০ রুটী লাগিত।

কথিত আছে, যে দিন দরবারে তৃতীয় আবদর রহমান খ্রীষ্টীয় রাজা সাঞ্চোকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন সেই দিন দুই দুই জন সভাকবি বক্তৃতা করিতে গিয়া সেই গম্ভীরভাবপূর্ণ দরবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন!

যেমন বহিঃসম্পদে কর্ডোভা অতুলনীয় ছিল, তেমনি জ্ঞানালোকেও এই নগরী অদ্বিতীয় ছিল না। প্রত্যেক বিষয় কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইয়োরোপের নানা দেশ হইতে ছাত্র আসিয়া এই স্থানে জ্ঞান লাভ করিত। শিল্প বাণিজ্যেও এই নগরী বিখ্যাত ছিল। ১৩০০০০ তন্তুবায় এক কর্ডোভাতেই বাস করিত। কাঁচ, হাতির দাঁত, মণিমুক্তা প্রভৃতির কারখানারও অভাব ছিল না। সেভিল, মারসিয়া, গ্রাণাডা অস্ত্র শস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

গ্রাণাডা শহরও অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই নগরে সকল প্রকার জিনিষই প্রস্তুত হইত।

সীসার নল যোগে পাহাড় হইতে সুপেয় জল শহরের সকল স্থানে আনয়ন করা হইত। বিদ্যা শিক্ষারও অতিশয় উন্নতি বিধান হইয়াছিল। রমণীগণ বিদ্যায় ও জ্ঞানে পুরুষগণের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগকে সকলেই সম্মান করিত। ইয়োরোপে যাহাকে শিভাল্‌রী অর্থাৎ যাহার প্রধান চিহ্ন স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাহা মুসলমানগণই প্রথমে জগতকে শিক্ষা দিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

স্পেনদেশের মুসলমান সভ্যতার আলোক ক্রমে ফরাসীদেশে প্রবেশ করে এবং সমস্ত ইয়োরোপ আলোকিত করে।

আফ্রিকায় মুসলমান জাতি

উম্মিয়াগণই আফ্রিকা জয় করিয়াছিলেন। আব্বাস বংশের তৃতীয় খলিফার শাসন পর্য্যন্ত আফ্রিকা আব্বাস বংশীয়দের অধীনে ছিল। কিন্তু চতুর্থ খলিফা হাদির সময় প্রথম হাসানের একজন বংশধর উত্তর আফ্রিকায় একটী স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে। তাহার বংশধরেরা কিছু দিন ঐ স্থানে রাজত্ব করেন।

ক্রমে আফ্রিকায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তখন অগ্লাব নামক একজন সেনাপতি বোগদাদের খলিফার নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া বংশানুক্রমে আফ্রিকা শাসন করিতে থাকেন।

এদিকে উত্তর আফ্রিকায় আর একটী বিদ্রোহের উৎপত্তি হয়। শিয়াগণের প্রধান ওবাইদুল্লার সহচর আবদুল্লা একজন চতুর এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল্লার কৌশলে ওবাইদুল্লা আগ্লাবের রাজ্য আক্রমণ করিয়া খলিফার পদ গ্রহণ করেন। এই বংশ ফতিমিয় বংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সমস্ত আফ্রিকা ক্রমে ফতিমিয় বংশীয়দের হস্তগত হইয়াছিল। ওবাইদুল্লার পরে তদীয় পুত্র বীরবর কাসেম খলিফার আসন গ্রহণ করেন। তিনি এক বৃহৎ রণপোত বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইটালীয় দস্যুগণ তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিত বলিয়া তিনি সমুদ্র পথে গমন করিয়া দক্ষিণ ইটালী আক্রমণ করিয়া তথাকার অধিবাসীগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ

সিসিলি জয় করিয়াছিল। এই সময় মিসরের অধিবাসীগণ তথাকার শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া চতুর্থ ফতিমিয় খলিফা মুইজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। মুইজ মিসর অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন এবং কায়রোতে বিশাল নগর নির্ম্মাণ করেন। মুইজের পুত্র আজিজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফতিমিয় গৌরবরবি অস্তমিত হইল। আজিজের পুত্র হাকিম একটু অস্থিরমতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই একাকী সাধারণ পোষাক পরিধান করিয়া গাধার পৃষ্ঠে নগরী ভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি একাকী একটী পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল না।

ফতিমিয়বংশের শেষ খলিফার সময় তাঁহার মন্ত্রী সাওয়ার বিতাড়িত হয় এবং সুলতান নুরুদ্দিনের সাহায্য ভিক্ষা করে। কিরূপে ক্রমে সালাদিন মিসরের কর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কেইরো ফতিমিদ শাসন সময়ে অতিশয় সুরম্য পুরী ছিল। এই নগরী অসংখ্য প্রাসাদ, বাগান এবং মস্‌জিদে পরিপূর্ণ ছিল। শত শত বিদ্যালয় এবং পুস্তকাগার শিক্ষা বিস্তার করিত। কেইরোতে একটী অদ্ভুত গৃহ ছিল। তাহাতে নানারকম দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করা হইত।

ফতিমিদগণের শাসন প্রণালী অতিশয় উন্নত ছিল। সৈন্য সামন্ত রণপোত প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। সর্ব্বস্থানেই শৃঙ্খলা বিরাজ করিত।

এই সময় তুরস্কদেশের মুসলমানগণ রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। ওদিকে তাহাদের রাজ্যের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। গজনীর রাজাগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। গজনীর পর ঘোর বংশ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মহম্মদ ঘোরীর পর তাহার দাস কুতবুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দাসবংশ হইতে ক্রমে পাঠানগণ মোট ৩২০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময় তৈমুরলঙ্গ পাঠানবংশ ধ্বংশ করিয়া যায়। মোগলগণ তাতারের অসভ্যজাতি ছিল। ক্রমে তাহারা মুসলমান হয়। তাহাদের এবং তৈমুরলঙ্গের বংশ হইতে বাবরের জন্ম হয়। বাবরের বংশধরগণ কিরূপে সগৌরবে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন।

পরিশিষ্ট।

অসভ্য তাতার আক্রমণই প্রকৃত আরব-সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়াছিল। ইউরোপে যে মুসলমান-সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল তাহারও শেষ আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু যে অটোমান তুরস্কজাতি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিল তাহারা এক নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। এ দিকে গজনী ও ঘোরদেশবাসীগণ স্বাধীনভাবে দেশ জয় করিতে লাগিল। কিরূপে পাঠানগণ ও পরিশেষে মোগলগণ ভারতে মুসলমান-সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল তাহা এ স্থানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

উমিয়া শাসন সময়ে আরব-সভ্যতা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ ছিল। চারিদিকে সরলতা বিরাজ করিত। কিন্তু যখন আব্বাসাইদ-

গণের সময়ে আরব ছাড়া অন্য জাতির মুসলমানগণ আধিপত্য লাভ করিল তখন সভ্যতার আকার অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ের সভ্যতাকে পারসিক সভ্যতা বলে কারণ পারস্যই এই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই নিমিত্ত কেহ কেহ পারস্যকে মুসলমান-জগতের ফরাসীদেশ বলেন। চারিদিকে যেরূপ সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হইল তেমনি বিলাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর ওমার কার্য্যব্যতীত আলো জ্বালাইতেন না কারণ তাহা হইলে সাধারণের ধনের অপব্যয় হইবে। কিন্তু শত শত উষ্ট্র হারুণ-আলরসিদের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রসদই বহন করিত।

যাহা হউক এই সভ্যতা জগতের একটী গৌরব। এমন ধর্ম্মপ্রবণতা পৃথিবীতে বিরল। বর্ত্তমান যুগে ঐহিক সুখেই সমস্ত জগৎ মত্ত কিন্তু মুসলমানগণ ধর্ম্মের নামে পাগল কারণ এই সভ্যতার জন্ম ধর্ম্মে।

মুসলমান সভ্যতার আর একটী বিশেষ প্রশংসা করিবার জিনিষ ইহার উদারতা। মুসলমান নগরীগুলিতে ইহুদিগণ তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে উপাসনা করিতে পারিত। আর অনেক সভ্য দেশে এক ধর্ম্মাবলম্বীগণ পরাক্রমশালী হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইত কোথায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আছে এবং তাহাদের আগুনে হত্ত করিতে-ও দ্বিধা বোধ করে নাই। স্কটের আইভান হো পড়িলে একটী সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ইউরোপে ইহুদিগের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল তাহার তুলনা হয় কি না জানি না।

পরিশেষে এশিয়াকে প্রণাম করিব। এই এশিয়ায় খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই এশিয়া আত্মার সন্ধান পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইউরোপের "পেটরা" বুঝি নিঃশেষ হইল; কিন্তু অমর এশিয়ার জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। এশিয়া ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাত ধরিয়াছে। কে জানে এশিয়া জগতকে কি শিক্ষা দিবে?

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভারতে মোস্‌লেম নৌ-শক্তি

মরুভূমির আরব-সন্তান দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় নৌ-বিদ্যাতেও যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, স্পেন, পর্টুগাল ও অন্যান্য সাগরপারের দেশ-বিজয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরবের রণতরী সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে বিজয়-উল্লাসে ঘুড়িয়া বেড়াইত। এমন কি তাঁহারা আমেরিকা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। সিংহল হইতে জেনোয়া-ভেনিস পর্য্যন্ত জল-পথে আরব-জাতির যে বিপুল ব্যবসা চলিত, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। বস্তুতঃ জল-পথে পরিভ্রমণ করা মোস্‌লেম জাতির একটা বিশেষত্ব। আজ পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের মুসলমানগণ এই বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মুসলমানদিগের এত ভৌগলিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে যে শুনিলে অবাক হইতে হয়।

এই প্রবন্ধে আমি শুধু ভারতীয় মুসলমানদিগের নৌ-শক্তিরই পরিচয় দিব।

ভারতের প্রথম আরব-অভিযান হইতেই আরম্ভ করা যাউক। ৭১২ খৃষ্টাব্দে আরবেরা প্রথম সিন্ধুদেশ জয় করে। সিংহল হইতে ১খানি জাহাজ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া হেজাজের খলিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। উক্ত জাহাজ সিন্ধুর উপকূলভাগে কতিপয় জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। খলিফা সিন্ধুরাজের নিকট ইহার ক্ষতিপূরণ দাবী করেন, কিন্তু সিন্ধুরাজ তাহা দিতে অসম্মত হওয়ায়, খলিফা মহম্মদ ইব্‌নে কাসিমের অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করেন। কাসিম রণতরীর সাহায্যে সদলবলে দেওয়ান বন্দরে আসিয়া উপনীত হন। একখানি রণতরী এত প্রকাণ্ড ছিল যে উহা চালাইবার জন্য ৫০০ লোক-লস্করের প্রয়োজন হইত! সিন্ধুদেশের নদনদী পার হইবার জন্যও তাহাকে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

বোগ্দাদের খলিফাদিগের শাসন-সময়ে আরবদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। তৎকালে তাহারা মিশরদেশ জয় করে এবং আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে ইউরোপীয়দিগের প্রবেশ নিষেধ করিয়া নিজেদের ভিতরে একচেটিয়া করিয়া লয়। এই সময়ে তাহারা আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বসোরা নগরী স্থাপন করে। প্রসিদ্ধ সিন্দবাদের সমুদ্র-ভ্রমণ খৃঃ নবম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। বোগ্দাদের প্রসিদ্ধ ভৌগলিক মাসুদী (৮৯০—৯৪৬) এই সময়ে ভারত ভ্রমণ করেন।

একাদশ শতাব্দীতে নিজামুদ্দিন আহমদের "তবাকতী-আকবরী" মতে সুলতান মাহমুদ জাট্‌দিগের বিরুদ্ধে তীব্র সপ্তদশ অভিযান আরম্ভ করেন। এই অভিযান একটা ভীষণ সামুদ্রিক যুদ্ধ, উহার বর্ণনা তাবাকতী-আকবরীতে এইরূপ আছে :—

"সুলতান মাহমুদ যখন সসৈন্যে মুলতানে উপস্থিত হন, তখন তিনি ১৪০০ নৌকায় এক বহর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। প্রত্যেক

নৌকায় তিনটী করিয়া মজবুত লোহার দণ্ড স্থির, একটী সম্মুখভাগে দুইটী দুই পার্শ্বে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহা কিছুই নৌকার সংস্পর্শে আসুক না কেন, তাহাই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। প্রত্যেক নৌকায় ২০জন ধনুর্ব্বাহী সৈনিক (archers) ছিল। এই উপায়ে সুলতান জাট্‌দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। জাটেরা এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত পরিবারবর্গ বিভিন্ন দ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহারাও ৪০০০ নৌকায় (কাহারও মতে ৮০০০ হাজার) এক বহর প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাট্‌দিগের যে নৌকাই সুলতানের নৌকার সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল, তাহাই উপরোক্ত বর্দ্ধিত লৌহদণ্ডের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে অধিকাংশ জাট্‌সেনা জলমগ্ন হইল; আর যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা তরবারির দ্বারা নিহত হইল।*

একাদশ শতাব্দীতে ভারতের সামুদ্রিক কার্য্য-কুশলতা এবং শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আল-বেরুণী অনেক উপাদেয় কথা বলিয়া গিয়াছেন। গুজরাট এবং মালাবার তৎকালে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এখান হইতে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য এবং মণি-মুক্তা ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, রুম এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি হইত। এই ব্যবসা পরিচালন উদ্দেশ্যে জাঙ্ক (Junks) নামক এক প্রকার সুবৃহৎ জাহাজ ব্যবহৃত হইত। এই জাহাজ যখন পাল তুলিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া ধাবমান হইত তখন ইহাকে পর্ব্বতের মত দেখাইত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গিয়াস্-উদ্দিন বলবন্ (১২৬৬—৮৬ খৃঃ অঃ) বাঙ্গলার শাসন-কর্ত্তা তুগ্রাল্ খাঁর বিরুদ্ধে এক বিখ্যাত নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন, কারণ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাকে দমন করিবার জন্য দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয়বারে সুলতান নিজেই যুদ্ধ-যাত্রা করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে গঙ্গা ও যমুনা নদীতে অসংখ্য নৌকা সংগ্রহ করিতে আদেশ দেন। অযোধ্যায় পৌঁছিয়া তিনি প্রায় দুই লক্ষ সেনা সংগ্রহ করেন। অসংখ্য নৌ-বহর প্রস্তুত করিয়া সরযূ নদীর উপর দিয়া তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হন। তোগ্রল লক্ষণাবতী (Lakhnauti) হইতে বঙ্গাগড়ে (Jajnagarh বর্ত্তমান ত্রিপুরার কাছাকাছি) পলাইয়া যান। বলবন লক্ষণাবতী হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং সোণারগাঁয়ে উপস্থিত হন। তথাকার রাজা বঙ্গজরায়ের সহিত বলবনের এই সন্ধি হয় যে তোগ্রাল যাহাতে জলপথ দিয়া পলায়ন করিতে না পারে, তিনি সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এই অভিযানের ফলে তোগ্রালের মৃত্যু হয় এবং তাহার সেনাদল সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

এই যুগে যে সমস্ত বৈদেশিক পরিব্রাজক এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দামেস্কের আবুলফেদা এবং মার্ক পলো বিখ্যাত। আবুলফেদা মালাবারের মরিচ এবং করমণ্ডলের বস্ত্র-শিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। মার্ক পলো 'কয়লান' (Quilan) বন্দর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আদা, লঙ্কা, এবং নীল তথায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, আরব এবং পারস্যদেশীয় বণিকেরা জাহাজে করিয়া তথায় আসেন।"

মার্ক পলো ভারতীয় জাহাজ সমূহের নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সমুদ্রগামী জাহাজ সমূহ দেবদারু কাষ্ঠে প্রস্তুত হইত; দো-ছারা তক্তা থাকিত এবং তাহার তলদেশে চূণ এবং এক প্রকার গাছের তৈল দ্বারা (সম্ভবতঃ গাব গাছ) প্রস্তুত একরূপ মিশ্র উপাদান লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে তলদেশ খুব মজবুত থাকিত।

নির্ম্মাণ-প্রণালী ছাড়া জাহাজের আকৃতি, মেরামত এবং পরিচালনা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি এত বড় বড় জাহাজ দেখিয়াছিলেন যে একখানা চালাইবার জন্য ৩০০শত লোক-লস্করের দরকার হইত। এই সমস্ত জাহাজ ২০০০ হইতে ৬০০০ বস্তা মরিচ টানিতে পারিত। উহাতে বড় বড় দাঁড় থাকিত এবং এক একটী দাঁড়ে চারজন করিয়া লোক লাগিত। উহাদের সঙ্গে সচরাচর ২।৩খানা বজরা বাঁধা থাকিত। তদ্দ্বারা বহুবিধ কার্য্য সাধিত হইত। তা ছাড়া আরো ১০।১২ খানা ডিঙ্গি সঙ্গে থাকিত। বড় জাহাজে সাধারণতঃ একটীমাত্র ডেক (Deck) থাকিত। ডেকের নীচে ৬০।৭০টী কামরা (Cabin) থাকিত; প্রত্যেক কামরায় এক এক জন বণিক থাকিতে পারিত। জাহাজ মেরামতের দরকার হইলে, সাধারণতঃ তালি দেওয়া হইত, অর্থাৎ আসল তক্তার উপরে পুনরায় তক্তা লাগান হইত। এইরূপে ছয় স্তর পর্য্যন্ত তালির কাজ চলিত। তারপর ধরিয়া লওয়া হইত যে সেই জাহাজ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত দেশ-পর্য্যটক ইব্নে বাতুতা দেশভ্রমণে বাহির হন। তিনি চব্বিশ বৎসর ধরিয়া (১৩২৫—১৩৪৯ খৃঃ) বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। মহম্মদ তোগলক তাঁহাকে দৌত্যকার্য্যে চীনদেশে পাঠান। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ক্যাম্বে (Cambay) বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া বহু বাধা-বিঘ্নের পর কালিকট, সিংহল এবং বাঙ্গালাদেশ হইয়া সুমাত্রায় পৌঁছেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি মালাবার হইতে সোজাসুজি মাস্কাট (Muscat) এবং অরমুজে (Ormuz) পৌঁছেন।

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে এবং ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে লক্ষণাবতীর বিরুদ্ধে সুলতান ফিরোজ শাহ দুইবার অভিযান করেন। প্রত্যেকবারই "কিশ্তিহা-ই-বান্দকুশা" (বাঁধভঙ্গকারী জাহাজ) নামক জাহাজ ব্যবহৃত হয়। উক্ত জাহাজ সমূহে প্রায় ১লক্ষ সৈন্য লইয়া তিনি "একদালা" ও "সোণার গাঁ" নামক দ্বীপদ্বয়ের সংলগ্ন নদীসমূহ পার হন। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে থাটা (Thatta) অভিযানে তিনি সিন্ধুনদীর উপর দিয়া ৫০০০ নৌকায় একবছরে ৯০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৪৮০টি হস্তীসহ অগ্রসর হন।

১৩৮৮ খৃঃ তৈমুর মাত্র দুইদিন সময়ের মধ্যে প্রকাণ্ড এক নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া সিন্ধুনদী অতিক্রম করেন। অতঃপর তিনি ঝেলাম নদী-মধ্যস্থ সাহাবুদ্দিনের একটি দ্বীপ অধিকার করিবার জন্য তথায় যাত্রা করেন। সাহাবুদ্দীন ২০০শত নৌকায় এক বহরে পলায়ন করেন। কিন্তু মুলতানের নিকটে তাহার নৌ-বহর তৈমুর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। গঙ্গানদীতেও তৈমুরকে অনেকগুলি নৌ-যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি

হিন্দুদিগের ৪৮ নৌকায় একটী ক্ষুদ্র বহর হস্তগত করেন।

মার্কপলোর পরে চীনবাসী মুসলমান "মাহুং" এর নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখ যোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চেং-হো যখন সমুদ্র-পথে ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন তিনি (মাহুং) দোভাষীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তৎকালে (১৪০৯) কালিকট বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে বিভিন্ন দেশ হইতে বণিকেরা সমবেত হইত। চীন হইতে যখন কোন বাণিজ্য-জাহাজ কালিকটে উপনীত হইত, তখন রাজকীয় ওভারসিয়ারগণ জনৈক "চিটি" বা মহাজনসহ জাহাজে আসিয়া যাবতীয় দ্রব্যের একটি মূল্য-নিরূপক খসড়া প্রস্তুত করিতেন এবং একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে মূল্য পরিশোধ করিতেন।"

বাংলা দেশের সহিত যে চীনদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাও তাহার বিবরণীতে পাওয়া যায়। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার (Pang-kola) শাসনকর্ত্তা গিয়াস-উদ্দিন (Ai-ya-sci-ting) চীনরাজকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তদ্‌পুত্র সয়েফউদ্দিনও (Saifuting) স্বর্ণ-পত্রে একখানি চিঠি লিখিয়া চীন-রাজকে কয়েকটী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ইহার বিনিময়ে চীনরাজও যুবরাজ সি-চাঁও (Tsi-chao) এর তত্ত্বাবধানে বাংলার রাজাকে বহুবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা এবং চীনদেশের মধ্যে যথেষ্ট সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল।*

(ক্রমশঃ)

গোলাম মোস্তফা

---

* শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পি, আর, এস লিখিত "A history of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest times" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে —লেখক।

বোগ্‌দাদ নগরীর ধ্বংস-সাধন

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শৈব অংশের মধ্যে অক্সাস নদীর পর পার হইতে তিনটী যাযাবর জাতি ক্রমাগত পশ্চিম এশিয়ায় আগমন করে। প্রথম সেলজুক তুর্কী, দ্বিতীয় চেঙ্গিজ ও হালাকুর অধীনে মঙ্গোল এবং তৃতীয় তৈমুরের সঙ্গে তাহার তুর্কী যোদ্ধৃগণ। সেলজুকের পৌত্র-দ্বয় তুগ্রল ও দায়ুদ ১০৪০ খৃষ্টাব্দে গজনিরাজের নিকট হইতে মার্ভ জয় করিয়া লন এবং অল্প দিনের মধ্যেই গজনি-রাজের ক্ষমতা লোপ পায়। তুগ্রল খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সমস্ত পারস্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। দুর্ব্বল বোগ্‌দাদাধিপতি তাঁহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া নিজ কন্যাকে তাঁহার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। ১০৬২ খৃষ্টাব্দে তুগ্রলের মৃত্যু হইলে তৎপর আলপ আরদালান ও মালিকশাহ ১০৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মালিক শাহের সময় সিরিয়া, মিসর, বোখারা ও সমরকন্দও তাহার রাজ্যভুক্ত হয়। ইঁহাদেরই সময় রাজনীতিজ্ঞ নিজামুলমুল্‌ক, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ও কবি ওমর খাইয়াম, এবং শায়খুল জবল (পার্ব্বত্য দলপতি) হাসান সাবাহ জীবন অতিবাহিত করেন। এই সেলজুক তুর্কীদের একশাখা এশিয়া মাইনরে কোনিয়া বা রুমে একটী রাজ্য স্থাপন করেন। বর্ত্তমান তুর্কিগণ ইহাদেরই বংশধর। তৈমুর চেঙ্গিজ খাঁর বংশসম্ভূত। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সঅক্সিয়ানা প্রদেশে তাহার জন্ম হয়। ২০ বৎসর বয়স হইতে তিনি রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সমস্ত পারস্য, সিরিয়া, এশিয়া মাইনরের কিয়দংশ, তুর্কীস্থান, কিপচাক বলগা প্রদেশ (রুশিয়া দেশের কতক অংশ) জর্জ্জিয়া, মেসোপটামিয়া এবং উত্তর ভারত তিনি জয় করেন। বহু মস্‌জিদ, প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতি দ্বারা রাজধানী সমরকন্দ সুশোভিত করেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন দেশ জয় করিতে যাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। শাহরুখ, উলুগবেগ, আবুসাইদ ও সুলতান হোসায়েন মির্জ্জা হিরাতে রাজত্ব করেন। হোসায়েন মির্জ্জা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও কলা-বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী আলি শের একজন সুদক্ষ কবি ছিলেন। অমর কবি আবদুর রহমান জামী ও ঐতিহাসিক মিরখান্দ ও খান্দমির তাঁহার সভায় ছিলেন। আবুসাইদের পুত্র বাবর ভারতে আসিয়া মোগলরাজ্য স্থাপন করেন।

চেঙ্গিজ খাঁ ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার তাতার দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া কারা-কোরাম নগরীতে খাকান উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমস্ত তাতার ও চীন অধিকার করিয়া খিবা দখলের জন্য তাঁহার দুই পুত্র ওকতাই এবং জগ্‌তাইকে প্রেরণ করেন। খিবাধিপতি জালালুদ্দীন

পরাস্ত হইয়াও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। রাণা প্রতাপের ন্যায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। জালালুদ্দীন প্রথমে বলখ, তৎপর নিশাপুর, সিস্তান ও গজনীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চেঙ্গিজের সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উক্ত স্থানগুলি অধিকার ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে নিহত করে। জালালুদ্দীন অতঃপর ভারতবর্ষে আগমন করিলে চেঙ্গিজ সিন্ধু নদী তীরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। এখানেও জালালুদ্দীন পরাজিত হইয়া নদী সাঁতরাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানাদি চেঙ্গিজের হস্তে পতিত হইয়া দাসদাসীরূপে বিক্রীত হন। মঙ্গোলেরা তৎপর কান্দাহার, মুলতান, আজরবাইজান ও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত জয় করিয়া ১২২২ খৃষ্টাব্দে তাতারে প্রত্যাগমন করে। ইত্যবসরে অদম্য জালালুদ্দীন ভারত হইতে পুনরায় পারস্যে গমনপূর্ব্বক তাব্রিজ হইতে মঙ্গোলদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কিন্তু ১২২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় পরাস্ত হন এবং চারি বৎসর পরে কালগ্রাসে পতিত হন। চেঙ্গিজ ১২২৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র ওকতাই তাতারের শাসনকর্ত্তা হন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কারাকোরামের নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা পারস্য শাসিত হয়। এই সময়ে চেঙ্গিজের পুত্র টুলি খাঁর পুত্র মাঙ্গু খাঁ পারস্যের অধিপতি হন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা হালাকু খাঁকে পারস্য শাসন ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করিতে প্রেরণ করেন। মাঙ্গুর অন্য ভ্রাতা কুবলায় খাঁ চীন দেশের সম্রাট হন এবং ইউয়েন বংশ স্থাপন করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতা বাতু খাঁ মস্কো ও হাঙ্গেরি জয় করেন, এবং তাঁহার বংশধরগণ বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সেখানে নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখেন। বাতু খাঁর অন্য ভ্রাতা শায়বানি খাঁ সাইবেরিয়া দখল করেন এবং ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেখানে রাজত্ব করেন।

মধ্য এশিয়া হইতে এই যে তিনটী প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি বাহির হইয়াছিল, ইহাদের প্রভাব সমস্ত পুরাতন পৃথিবীতে লক্ষিত ও অনুভূত হইয়াছে। মানব জাতির ইতিহাসে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাতার জাতির সঞ্চার করিয়াছে তন্মধ্যে এই তিনটী শক্তি কোন অংশে কম নহে।

১২৫৩ খৃষ্টাব্দে হালাকু তাঁহার খৃষ্টান স্ত্রী দুকুস খাতুন সমভিব্যাহারে অক্সাস নদী অতিক্রম করিয়া পারস্যে উপনীত হন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সেই সময়ে মঙ্গোলদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ইটালি, গ্রীস, ফ্রান্স এমন কি ইংলণ্ড হইতে বহু পাদরি মধ্য এশিয়ায় উপস্থিত হন। মঙ্গোল আমিরদিগকে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করিতে তাঁহারা যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী এই যে, তাঁহারা কেহ কেহ আপন আপন কন্যা বা তদ্রূপ অন্য কোন রমণীকে তাঁহাদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতেন। কিন্তু বড় কেহ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু তাঁহারা কালক্রমে সকলেই ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দুইটী উদ্দেশ্যে হালাকু কারাকোরাম হইতে ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ আলামুত পর্ব্বতের হাসান সাবাহ কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত করা ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয়তঃ বোগদাদের খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন করা। চীন দেশীয় অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়ার ও গোলন্দাজ সৈনিক যুদ্ধ ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে ছিল।

হালাকু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১২৫৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তুর্কীস্থানে অতিবাহিত করিয়া ১২৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ সমরকন্দে অতিবাহিত করিলেন। কেশ নামক স্থানে পারস্যের নবনিয়োজিত শাসনকর্ত্তা আর গুন খাঁর সঙ্গে ১২৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হালাকু প্রথমে এছমাইলীয় শিয়াদের আলামুত পার্ব্বত্য কেল্লা দখল করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আলামুতে তখন হাসান সাব্বাহের শেষ উত্তরাধিকারী রুকনদ্দীনের প্রাধান্য ছিল। তিনি তাঁহার এসলাম-বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপ দ্বারা মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। হালাকু প্রথমে কোহস্থানে তাহাদের লুন ও খাক নামে দুইটী দুর্গ অধিকার করেন এবং দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক বালিকা ছাড়া আর সকল অধিবাসীকেই সংহার করেন। রুকনদ্দীনের যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল না তাই তিনি অনেকগুলি দুর্গ হালাকুকে সমর্পন করিয়া এই সন্ধি করিলেন যে দুর্গস্থ সৈন্য ও অধিবাসীদিগকে বধ করা হইবে না। হালাকু নির্ম্মমভাবে তাহাদিগকে, এমন কি শিশুদিগকে পর্য্যন্ত নিহত করেন। তৎপর ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আলামুত দুর্গ লুণ্ঠিত ও অগ্নিসাৎ করা হয়। হালাকুর সেক্রেটারী আতামালিক জুইয়ানি আলামুত পুস্তকাগার হইতে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ ও মানমন্দির হইতে বহু যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখেন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহাকে প্রহরী সমভিব্যাহারে কারাকোরামে মঙ্গোল সম্রাট মাঙ্গুখাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে তাঁহাকে নির্য্যাতিত হইতে হয়। মাঙ্গু খাঁর নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি তাঁহার প্রাণবধের আদেশ দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অনর্থক এতগুলি লোক ও অশ্বকে পরিশ্রান্ত করা হইয়াছে। তিনি হুকুম প্রচার করেন, যেন তাঁহার অবশিষ্ট অনুগামীদিগকে অচিরে বিনাশ করা হয়। এইরূপে বহুসংখ্যক বালককে বধ করা হয়। কিন্তু পারস্য, জাঞ্জিবর ও সিরিয়াতে তাহাদের বহু লোক এবং ভারতবর্ষে খোজা ও চিত্রাল নামে দুইটী সম্প্রদায় এখনও বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন, হিজ হাইনেস দি আগা খাঁ আলামুত অধীশ্বরের বংশ সম্ভূত।

এছমাইলীয় শিয়াদের পতনে অনেক গোঁড়া মুসলমান সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপর হালাকু যে কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহা অতীব ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক। হতভাগ্য রুকনদ্দীনের প্রাণদণ্ডের পর হালাকু হামদানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে বোগদাদাধিপতি খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাকে আত্মসমর্পণ করিতে এবং পাঁচশত বর্ষব্যাপী এসলামের রাজধানী বোগদাদকে মঙ্গোলদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে সংবাদ পাঠাইলেন। ইহার দুই মাস পরে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হালাকু স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন, :— (১) আবুবকর বিন সাদ জঙ্গি, ইনি সিরাজ নগরের আতাবক শাসন কর্ত্তা

করিতে চান এবং তৎপর দেশে ফিরিয়া যাইতে চান। খলিফা হইতে কোন রূপ সন্দিহান না হইয়া পুত্র ও সভাসদ-সমভিব্যাহারে হালাকু সমীপে উপনীত হইলেন। সেখানে যাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে বিবাহের ভাণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেখানে হাজির করা হইয়াছে। সেখানে খলিফা ব্যতীত সমস্ত লোকের তরবারি দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয় এবং খলিফাকে হস্তী পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া নিহত করা হয়। তৎপর তাতারেরা দলে দলে নগরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন ও অধিবাসীদের প্রাণ সংহার করিতে থাকে। এই সময় ৩৪ দিন পর্য্যন্ত তাতারীদের হস্তে তরবারি উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া ১৮ লক্ষ লোকের জীবন-লীলা শেষ করে।

১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাগদাদ লুণ্ঠন আরম্ভ হইয়া এক সপ্তাহকাল প্রবলবেগে চলিতে থাকে। ন্যূনকল্পে ৮লক্ষ লোক নিহত হয়। পাঁচশত বৎসরব্যাপী আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে বাগদাদে যে সমস্ত অমূল্য ধনরত্ন, শিক্ষা, শিল্প ও বিজ্ঞানের সম্পদাদি সংগৃহীত ও একত্রীভূত হইয়াছিল অত্যল্পকালের মধ্যেই সে সমস্ত লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হইল। অধ্যয়ন ও গবেষণানিরত যে জ্ঞান তপস্বী মুসলমানগণ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার এমন ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইল যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এমন কি কল্পনাতেও আসে না। মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞান আজ পর্য্যন্ত সে পূর্ব্বগৌরব পুনরায় লাভ করিতে পারে নাই। সহস্র সহস্র অমূল্য গ্রন্থরাজি যে কেবলমাত্র ধ্বংস পাইয়াছিল তাহা নহে, অসংখ্য পণ্ডিত ও বিদ্বানগণ—যাঁহারা নষ্টগ্রন্থ পুনঃ প্রণয়ণ করিতে সক্ষম হইতেন এবং যাঁহাদের দ্বারা গবেষণার স্রোত অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত তাঁহারাও নিহত হন। "এমন গৌরবময় ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন সভ্যতা ইতঃপূর্ব্বে বোধ হয় আর কখনও এত শীঘ্র অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত এবং রক্তদ্বারা নির্ব্বাপিত হয় নাই।" কেতাবুল ফখরিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "এমন সার্ব্বজনীন হত্যা ও অবাধ লুণ্ঠন এবং বর্ব্বর অত্যাচার উৎপীড়ন সংঘটিত হইয়াছিল যে উহা শ্রবণ করাই অতি-শয় দুঃসাধ্য। এমন ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয় যে উহা আমি উল্লেখ করিতে চাই না, তোমার যাহা ইচ্ছা অনুমান করিতে পার কিন্তু আমাকে ওসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।" লেখক বাগদাদ ধ্বংসের কয়েক বৎসর পরেই নিজ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য।

বোগদাদের পতন সম্বন্ধে খলিফার শিয়া মন্ত্রী ইবনুল আলকামি কি কার্য্য করিয়াছেন, সে বিষয়ে লেখকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। সুন্নি লেখক তাহার তাবকাতে নাসিরি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, খলিফার জ্যেষ্ঠপুত্র শিয়াদিগের যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধগ্রহণের নিমিত্ত উক্ত মন্ত্রী-প্রবর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন এবং খলিফাকে আত্মসমর্পণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শিয়া লেখক ইবনে তিক্‌তিক তাঁহার কেতাবুল ফাখরিতে এই দোষ প্রক্ষালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বোগদাদ সমর্পণের পর নাসির উদ্দিন তুসি মন্ত্রীবরকে হালাকু সমীপে উপস্থিত করেন।

হালাকু তাঁহার চেহারা ও কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং বাগদাদের ধ্বংসাবশেষ শাসন করিবার ভার আলি বাহাদুরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া মন্ত্রিকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন। যে নাসির-উদ্দীন তুসি ধর্ম্মহীন হালাকুর অনুগ্রহ-লাভের জন্য স্বীয় জাতীয় ভ্রাতা ইসমাইলির-দিগকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনিও ইব্‌নুল আলকামির ন্যায় শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে মন্ত্রিদ্বয় হালাকুর মিথ্যা অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়া-মির জন্য সুন্নিদিগের উপর প্রতিশোধ লইতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তৎপর নব-নিয়োজিত হালাকুর মন্ত্রী তাঁহার স্বধর্ম্মী নাসির উদ্দীনের সহায়তায় বাগদাদ ও খলিফাকে মোগলদের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ হালাকু তাঁহাকে বহুবিধ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধার করিবার দরকার ছিল ততদিন পর্য্যন্ত উহা করিয়া অবশেষে পুরাতন জুতার ন্যায় তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং খলিফার মৃত্যুর তিন মাস মধ্যেই ইব্‌নুল আলকামি প্রাণত্যাগ করে।

ইহাও কথিত আছে যে হালাকু কনষ্টান্টি-নোপল অধিকার করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া-ছিলেন কিন্তু নাসিরউদ্দীন তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য হইতে বিরত করিয়া বাগদাদ আক্র-মণের জন্য উৎসাহিত করেন। নাসির একজন নামজাদা জ্যোতির্ব্বিৎও ছিলেন, তিনি হালাকুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে নক্ষত্রাবলী তাঁহার স্বপক্ষে আছে এবং আব্বাসি বংশ চেঙ্গিজের বংশের দ্বারা বিলুপ্ত হইবে। নাসি-রের কয়েকটী ভবিষ্যদ্বাণী ইতিপূর্ব্বে সার্থক হইয়াছিল বলিয়া হালাকু তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বাগদাদ অভিযান করেন। ইব্‌ন্ খালাক্বন, আবুল ফেদা, মাকরিজি ও জালালুদ্দিন সুয়ুতি প্রভৃতি আরব ঐতি-হাসিক সকলেই মন্ত্রী আলকামির বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মিরখন্দ ও ওস্‌সাফ এই দুইজন লেখক মন্ত্রীদ্বয়েরই অধীনে কার্য্য করিতেন। ইহাঁরাও মন্ত্রীর ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক হালাকু কর্ত্তৃক ইস্‌লাম সভ্যতা এরূপ ভয়ঙ্করভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে উহার পূর্ব্ব গৌরব যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এরূপ আশা নাই। সে ধ্বংসলীলার বর্ণনা করিতেও অনেকেই অসমর্থ হইয়াছেন। সৈয়দ আমির আলী বলেন যে বোগদাদ ধ্বংসের বর্ণনা করিতে গিবনের মত ওস্তাদের দরকার। সে অত্যাচার কাহিনী শুনিলে পাষাণ ব্যতীত সকলের চক্ষুতেই অশ্রু দেখা দিবে। নিঃসহায় স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ যখন কোরাণ হস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাণভিক্ষা করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে পদতলে পিষিয়া হত্যা করা হইয়াছিল! কত ভদ্রমহিলা—যাঁহারা আজীবন সুখে লালিত পালিত হইয়া কখনও কষ্টের মুখ দেখেন নাই—কত অমানুষিক নিগ্রহ সহ্য করিয়া জীবনত্যাগ করেন, শত শত বৎসর ধরিয়া যে অমূল্য শিল্প ও অধ্যয়নলব্ধ ধন-রত্নাদি সংগৃহীত হইয়া-ছিল, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনদিন পর্য্যন্ত রাস্তায় রক্তস্রোত

প্রবাহিত হইয়াছিল এবং টাইগ্রিস নদীর জল কয়েক মাইল পর্য্যন্ত লাল হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য, মস্‌জিদ ও কবর তাহাদের স্বর্ণ নির্ম্মিত গুম্বজের জন্য ভূমিসাৎ করা হইয়াছিল। পাঠাগারে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থাদি ভস্মীভূত এবং নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ২০লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে ১৬লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ইব্‌নুল আসির এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বিষয়টী এত ভয়াবহ যে আমি উহা উল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছি। একবার একপদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় সরিয়া আসিয়াছি কারণ এমন মুসলমান কে আছে যে এস্‌লামের প্রতি এই মারাত্মক আঘাতের কথা খোশমেজাজে লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে!

যাহা হউক পৃথিবীতে মানুষের উপর, বিশেষতঃ মুসলমানের উপর যত বিপদ ও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলে যে হজরত আদমের সৃষ্টির পর হইতে এরূপ বিপদ আর কখনও হয় নাই তবে তাহার কথা সত্যই বিবেচিত হইবে। কারণ ইতিহাসে এমন কোন দুর্ঘটনার উল্লেখ নাই যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। নেবুচাদনজর কর্ত্তৃক বনিএস্রাইল ও জেরুসালেমের ধ্বংস সাধন অতিশয় ভয়ঙ্কর হইলেও তাহা ইহার তুলনায় কিছুই নহে। বোধ হয় মনুষ্য জাতি এমন বিপদে আর কখনও পড়িবে না।

হুলাকুর বাগদাদ ধ্বংসের ফল মুসলমান সাহিত্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান রাজ্যে আরবি রাজকীয় ভাষা ছিল। ব্যবসায়, রাজনীতি, ও সাহিত্যে আরবি ভাষাই ব্যবহৃত হইত। আজকাল সমস্ত ভারতে যেমন উর্দ্দু প্রচলিত, সেকালে আরবি ভাষা তেমনই সমরকন্দ হইতে স্পেন পর্য্যন্ত মুসলমান শাসিত দেশে প্রচলিত ছিল। তখন আরব ও পারসিক সকলেই আরবি ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিতেন। কিন্তু বাগদাদ ধ্বংসের পর হইতে আরবি আর সার্ব্বজনীন ভাষা রহিল না। পারসীকেরা মাত্র দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় লিখিবার জন্য আরবি ব্যবহার করিতে লাগিল। অন্যান্য বিষয়ে প্রাদেশিক ভাষার প্রচলন হইল। তবুও সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি দেশে আরবির প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিল। রাজনীতিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় যে বাগদাদের খেলাফত বিলুপ্ত হইল। এবং বাগদাদের খলিফা ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন। এক্ষণে বাগদাদ হইতে খেলাফত মিসরে স্থানান্তরিত হইয়া মাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী থাকিল। মুসলমান সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইল। (বিশেষতঃ পশ্চিম এশিয়াতে) ওসমানিয় তুর্কীরা এশিয়া মাইনরে গমন করিল এবং ধীরে ধীরে ইউরোপে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। ইহার ফলে ইউরোপের পুনরভ্যুদয় হয় এবং রুশিয়া মঙ্গোলাধীনে থাকিয়া খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

মোহাম্মদ সানাউল্লা

সমিতি-সংবাদ

(

গত ৩রা আশ্বিন বুধবার অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় সমিতিগৃহে এক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্টার মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বি, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি,এল্, খানবাহাদুর মৌলবী সৈয়দ আবদুল লতিফ বি, এল, মৌলবী গোলাম মোস্তফা, ডাক্তার লুৎফর রহমান মৌলবী সেখ হবিবর রহমান, মৌলবী মঈন উদ্দীন হোসেন, মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ, মৌলবী আমিরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস গাঙ্গুলী, মৌলবী ও,আলী, মৌলবী আকবর আলী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় মৌলবী এয়াকুব আলী চৌধুরী কর্তৃক তদীয় "হজরত মোহম্মদের শক্তিলাভ ও মানবের অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইবার কথা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নিজে উপস্থিত হইতে না পারায় মৌলবী গোলাম মোস্তফা সাহেব উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটী অতি সারগর্ভ হইয়াছিল। লেখক বলেন,—হজরত মোহাম্মদ মানুষের পরম আত্মীয়, তিনি অতি মানুষ নন ; তাঁর সাধনা মানুষের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই স্বাভাবিক ভাবে ক্রম বিকাশ লাভ করিয়াছে, দুঃখদৈন্যের ভিতর দিয়া, জীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় সাধনাবলে তিনি দিনে দিনে আধ্যাত্ম-জগতে উন্নীত হইয়াছিলেন। দেবত্বের স্থান লইয়া তিনি সৃষ্টি ছন নাই। এই স্বাভাবিকত্বই তাঁহাকে আমাদের নিকট পরম আত্মীয় করিয়া রাখিয়াছে। আধ্যাত্ম-জগতে সে মানুষের কতখানি অধিকার আছে, তাহা তিনি মানুষের বেশে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন ; বস্তুতঃ তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধি মানুষেরই বিজয় ঘোষণা। এই কারণে তিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শও বটেন। কেন না তাঁহার চরিত্রে অতি মানবতার কিছু নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে "বন্ধু" বলিয়া আদর করিতে পারি—"দেবতা" বলিয়া দূরে থাকিয়া শুধু ভয় ও ভক্তি করি না।

প্রবন্ধটী পঠিত হইলে সভাপতির আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উঠিয়া বলেন,—"প্রবন্ধটী অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আমি তাঁহার 'মানবতায় হজরত মোহাম্মদ' প্রবন্ধও পড়িয়াছি। তিনি হজরত মোহাম্মদকে যেরূপভাবে আঁকিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। হজরত মোহাম্মদ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ এ কথা আমি বিশ্বাস করি, আর তিনি যে হেরাপর্ব্বত গুহার ঐশীবাণী শুনিতে পাইতেন, তাহাও আমি বিশ্বাস করি।"

তৎপর ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেব হজরতের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া একটী চমৎকার বক্তৃতা দেন। হজরতের চরিত্রমাহাত্ম্য আমাদের জীবনে প্রতিভাত হইতেছে না, তাহার মত আমরা অন্যায় অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে

মাথা তুলিতেছি না, শুধু তাঁহার নামের উপর "হুরুদ" পাঠ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি ; ইহা ভক্তি নয়, ইহা ভণ্ডামি,—ইহাতে তাঁহাকে আরো খাটো করা হইয়াছে। আজ হজরতের মত আমাদের প্রাণে প্রাণে সত্যের আগুন জ্বালাইতে হইবে, উৎপীড়িত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিতের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে, সত্য প্রচারের জন্য বীরের মত শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে,—তবেই তাঁহাকে চেনা হইবে।

সমিতির সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব হজরতের চরিত্র প্রসঙ্গে বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং হজরতের একটী হাদিস উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রায় কেহই আজকাল খাঁটি মুসলমান নহি।

খানবাহাদুর মৌলবী সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব বলেন,—"বর্ত্তমান সময়ে মুসলমান জাতি বাস্তবিকই হজরতের আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে ; তাহাদের ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই আমাদের জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে ; ধর্ম্মকে আবার নতরূপে বুঝিতে হইবে। প্রকৃত সত্যকে না চিনিয়া শুধু ধর্ম্মের খোলস পড়িলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না।"

অবশেষে সভাপতি মহোদয় তাঁহার সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—"ইস্‌লামের ন্যায় স্বাভাবিক ধর্ম্ম জগতে আর নাই। ইস্‌লামে যে সকল বিধি নির্দ্দেশ আছে, তাহার প্রত্যেকটীর ভিতর যুক্তি ও জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। হজরত চরিত্র সম্বন্ধে লেখক কয়েকটি বিষয় ঠিক ভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। বড় সুন্দর ভাবে তিনি হজরতের চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আরো অনেক বলিবার আছে।" মোটের উপর তিনি প্রবন্ধটীর খুবই প্রশংসা করেন।

অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্তব্য-গ্রহণের সময় আসে। মৌলবী গোলাম মোস্তাফা সাহেব অল্প কয়েক কথায় মাতৃভাষার আবশ্যকতা বুঝাইয়া বলিয়া প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় মধ্যস্থতায় শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির এই সভা তাহা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতেছে। ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেব উহার সমর্থন করেন এবং উহার বিরুদ্ধে কথা বলা যে বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়, এই কথা বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া বলেন। এই প্রসঙ্গে শরৎ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের মত মানবাত্মার প্রতি এত বড় অবিচার আর হইতেই পারে না। আজ ৫০ বৎসর হইতে এই অত্যাচার ভারতবাসীর বুকের উপর হিমালয়ের মত চাপিয়া বসিয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ন্যায়সঙ্গত পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধেও যে আপত্তি উঠিতে পারে ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দাস মনোবৃত্তি কতদূর গড়াইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে কয়েক জনের কথা এই যে মুসলমানের পক্ষে বাংলা সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা বড় দুরূহ ব্যাপার। এ কথা ভুল। আমি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষক ; আমি জানি মুসলমান

ছেলেদের বাংলা রচনা ব্রাহ্মণ ছেলেদের চেয়েও ভাল হয়। আর সংস্কৃত না জানিলে যে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা যায় না ইহাও ভুল কথা। সংস্কৃত বই আমি অনেক পড়িয়াছি, কিন্তু তবুও আমি ভাল বাংলা বলিতে পারি না। কিন্তু এই যে ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেব সংস্কৃত ভাষা না পড়িয়াও কি সুন্দর বাংলাই না বলিলেন! তা ছাড়া মৌলবী ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাঃ লুৎফর রহমান, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল অদুদ প্রভৃতি অতি সুন্দর বাংলা লেখেন, ইহারাও ত আমার মত কেহই সংস্কৃত বই পড়েন নাই।

খান বাহাদুর মৌলবী সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব বলেন, বাংলা ভাষা যে আমার মাতৃভাষা একথা আমি গৌরবের সহিত বলিতেছি। আমাদের ভিতরে কেহ কেহ বলেন, আমরা যদিও বাংলা ভাষা ব্যবহার করি, তবুও তাহা খাঁটী বাংলা নয়। একথা একদম ভুল। দুই একটা উর্দু পার্শী শব্দ ব্যবহার করিলেই বা প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করিলেই যে তাহা স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হয় ইহা হইতেই পারে না। তাহা হইলে ত এই বাংলা দেশেই অসংখ্য ভাষা আছে। বরিশালে একরূপ কথা বলে, যশোহর খুলনায় একরূপ বলে, নোয়াখালী চট্টগ্রাম অন্যরূপ বলে, আবার এক এক সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া কথা বলে। ইহাতে কি বলিতে হইবে যে প্রত্যেকের ভাষা বিভিন্ন তাহা কিছুতেই নয়। বস্তুতঃ উর্দু পার্শী শব্দ থাকিলেও আমাদের ভাষা যে বাংলা ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে যে বিজাতীয় ভাবের কথা বলা হয়, তার জন্য দোষী কে? আমরা আমাদের কোরাণ হাদিস, দর্শন বিজ্ঞান জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদি কিছুরই ত অনুবাদ করি নাই। এ বিষয় প্রথমেই হিন্দু ব্রাহ্মণগণ পথ দেখাইয়াছেন। এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তিনি প্রস্তাবটী সর্ব্বান্তঃকরণে অতিশয় আগ্রহের সহিত সমর্থন করেন।

মৌঃ সৈয়দ আকবর আলী সাহেব বলেন, আমরা এ বিষয়ে কোন উকিল, মোক্তার বা বড় বড় হোমরা চোমরার কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নই। যাহারা শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন বা সাহিত্যিক তাহারাই এ বিষয়ে কথা বলিবার উপযুক্ত লোক। আমি একজন শিক্ষক। আমি জানি ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা কত অনিষ্টকর।

অতঃপর সভাপতি সাহেব বলেন, এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা কয়েকটী সভায় এবং বিভিন্ন পত্রিকায় আমি ব্যক্ত করিয়াছি। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলে সকলে বিশদভাবে আমার মন্তব্য জানিতে পারিবেন। তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৎপর মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেবের প্রস্তাবে এবং ডাঃ লুৎফর রহমান ও মৌলবী আমিরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী সাহেব দ্বয়ের সমর্থনে মৌলবী গোলাম মোস্তফা সাহেব সমিতির সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

তখন সভাপতি মহোদয়কে তাঁহার উদ্যম, উৎসাহ, ও কষ্ট স্বীকার করিবার জন্য অশেষ ধন্যবাদের পর রাত্রি ৯ ঘটিকায় সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(২)

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, সমিতি-গৃহে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির এক সাধারণ অধিবেশন হয়। প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্সী মোঃ রেয়াজউদ্দিন আহমদ সাহেব, ডাঃ লুৎফর রহমান, মৌঃ গোলাম মোস্তফা, মৌঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, "মোসলেম জগতের" সম্পাদক মৌঃ আবুল কালাম সামসুদ্দিন সাহেব, মৌঃ আজাহারুল ইস্‌লাম, বি, এ, কবিবর শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত পঙ্কজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মৌঃ গোলাম ফরুর, মৌঃ সৈয়দ আকবর আলি প্রভৃতি সাহিত্যিক-বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুন্সী মোঃ রেয়াজউদ্দিন আহমদ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় মৌঃ গোলাম মোস্তফা, বি, এ, বি-টি, স্বরচিত "ইস্‌লাম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত :—

ডাঃ লুৎফর রহমান :—"বন্ধুবর মৌঃ গোলাম মোস্তফা সাহেব আজ যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহা সহজ নহে; এটা খুব মূল্যবান।" তিনি আরো অনেক কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করেন।

বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র :—"কবিভ্রাতা গোলাম মোস্তফা সাহেবের এই প্রবন্ধই এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম। মুসলমান ধর্ম্মের দিক হইতে বিশ্ব-কবির কাব্য সম্বন্ধে ইহাই প্রথম আলোচনা। তিনি রবিবাবুকে ঠিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। কোরাণ হইতে তিনি যে সমস্ত বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার লেখায় ইস্‌লাম সম্বন্ধেও অনেক কথা জানিতে পারিলাম। বিশ্ব-বরেণ্য কবিবরের এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার জন্য হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে আমি তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

বাবু নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :—"গোলাম মোস্তফা সাহেব যে ইস্‌লামের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, ইহা ভালই হইয়াছে। বিশ্ব-কবির লক্ষণ হইতেছে—সব ধর্ম্মাবলম্বীই তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। Thompson বলেছেন—"Is Gitanjali a Christian lore?" আজ মুসলমান বলছেন—"ইহা ইস্‌লাম।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন সত্যেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন।"

মৌলবী মোজাম্মেল হক সাহেব :—"পৃথিবীর সকল দিক হইতে আজ রবীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি উঠিতেছে। এ হেন কবির প্রাণের কথা ইস্‌লামের দিক হইতে আজ আমারই এক ভাই সমালোচনা করিতেছেন, এ গৌরবে আমি কবিকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

সভাপতির মন্তব্য :—

"প্রবন্ধটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া যায়, ইহা সুখের বিষয়। কবিবরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম ইস্‌লামের যত কাছাকাছি, জগতের আর কোন ধর্ম্মই সেরূপ নহে। রবীন্দ্রনাথ পিতার উপযুক্ত পুত্র। মুসলমান-সমাজ অবশ্য তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন।" তিনি আরো অনেক কথা বলিয়া মুসলমান সাহিত্যিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন।

সমিতি সংক্রান্ত আলোচনা

সমিতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া মৌঃ মোজাম্মেল হক সাহেব সমিতি পরিচালন সম্পর্কে একটী গুরুতর বিষয়ের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—"শান্তিপুরের কবি মৌঃ মোজাম্মেল হক সাহেবের পুত্র মৌঃ আফজালউল্ হককে মাসিক ২২৲ টাকা হিসাবে বিগত ১৯শে বৈশাখ, ১৩২৭ সালে সমিতির একটী কামরা ভাড়া দেওয়া হয়; তাঁহার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল তিনি সমিতির কোন প্রকারের অসুবিধা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, এবং তিনি সমিতির নিয়মাধীন হইয়া থাকিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার দ্বারা সমিতির প্রভূত অপকার হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার নিকট ৬।৭ মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। তাহার ভাড়া দিবার সামর্থ্যও নাই, অথচ তিনি স্থানান্তরিতও হইতেছেন না। তাঁহার পিতা এই ব্যাপার মিটাইয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও এযাবত কিছুই করেন নাই। অতগুলি টাকা না পাওয়ায় নিয়মিত ভাবে সমিতির কার্য্য পরিচালন করিতে পারা যাইতেছে না। আফজালউল হক্ সাহেবকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে অথবা তাঁহার নিকট হইতে বাকী টাকা ও মাসিক ভাড়া নিয়মিত ভাবে না পাইলে সমিতি পরিচালন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। একটী মাত্র লোকের অবিবেচনা ও কর্ত্তব্যহীনতার জন্য যে বহুকষ্টে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী মুসলমানের সাধারণ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আফজালউল্ হক্ সাহেব খ্যাতনামা সাহিত্যিক পিতার পুত্র এবং স্বয়ং একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকার পরিচালক হইয়া যে এইরূপে মুসলমান-সাহিত্য সমিতির ধ্বংস করিবার আয়োজন করিতেছেন ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা।

অতঃপর সকলের বিতরেই একটা চাঞ্চল্যের ভাব আসে এবং এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়:—

মৌঃ আফজালউল হক সাহেবের নিকট ভাড়া বাবদ ১৫১৲ টাকা বাকী আছে। তিনি উহা বর্ত্তমানে দিতে অসমর্থ হওয়ায় এবং নানাকারণে তাঁহার অবস্থান সমিতির অস্তিত্বের পক্ষে বিষম অন্তরায় বোধ হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে তাঁহার দেয় টাকার জন্য তিনি হাণ্ডনোট দিবেন, উক্ত টাকা তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন এবং ৭ দিনের মধ্যে ঘর খালি করিয়া দিবেন।

প্রস্তাবক :—মৌঃ গোলাম মোস্তফা, বি-এ।

সমর্থক :—ডাঃ লুৎফর রহমান।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

ত্রুটী স্বীকার

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, উপরিউক্ত কারণ সমূহের জন্য বর্ত্তমান সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আশা করি গ্রাহক ও সদস্যবৃন্দ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন এবং

পত্রিকাখানিকে পূর্ব্বের মত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবেন।

লাইব্রেরী

সৎসাহিত্যের প্রচার কল্পে ও সাহিত্য-সমিতির পাঠাগারের উন্নতির জন্য আমাদের একটি স্বতন্ত্র পুস্তক বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এই বিভাগের আয় সম্পূর্ণ রূপে সমিতির পাঠাগারের পুষ্টির জন্য ব্যয়িত হইবে। বহু নূতন নূতন তথ্যপূর্ণ বই বঙ্গ সাহিত্যে নিত্য নিয়ত বাহির হইতেছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে সরস রস ও জ্ঞান এখনও আমরা সাহিত্যপ্রিয় মুসলমান পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সুবিধা পাই নাই। এক্ষণে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্ববিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ আমাদের পাঠাগারকে একটী শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত করিতে মনস্থ করিয়াছি। পুস্তকবিভাগের আয়ে আমরা এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য পাইব বলিয়া আশা করি। ভরসা করি আমাদের এই উদ্যম সফল করিবার জন্য সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণ এখন হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য আমাদিগের পুস্তকবিভাগে অর্ডার দিবেন।

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের অভিমত

"আপনাদের পত্রিকায় 'ইস্‌লাম ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক লেখাটী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি আমার মনে কিছুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখায় কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই।" ২রা মাঘ, ১৩২৯।

বিনামূল্যে উপহার

যথেষ্টসংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যাহারা বর্ত্তমান বৎসরে পত্রিকার নূতন গ্রাহক ও সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবর্ষের মধ্যে গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন এক বৎসরের পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। উপহারের ডাকব্যয় স্বতন্ত্র লাগিবে।

পুস্তক-পরিচয়

অগ্নি-বীণা (কাব্য-গ্রন্থ) কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। প্রকাশক আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিদ্রোহীর বীর-কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাংলা দেশে সুপরিচিত। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকাতেই কাজী সাহেবের "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। আমরা কাজী সাহেবের "অগ্নি-বীণা" পাইয়া তাই আজ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। এই কবিতা-গ্রন্থে (১) প্রলয়োল্লাস (২) বিদ্রোহী (৩) রক্তাম্বর-ধারিনী মা (৪) আগমনী (৫) ধূমকেতু (৬) কামাল পাশা (৭) আনোয়ার (৮) রণ-ভেরী (৯) শাত-ইল-আরব (১০) খেয়াপারের তরণী (১১) কোরবানী (১২) মোহররম এই বারটি বাছা বাছা কবিতা আছে। এক-বিন বাংলার কাব্যকুঞ্জে প্রেমের কবিতাই অজস্র ফুটিত, বীর-বীণার ঝঙ্কার ক্বচিৎ শুনা যাইত। কিন্তু "অগ্নি-বীণার" প্রত্যেকটি কবিতাই বীরত্বব্যঞ্জক—মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। মৃত্যুছন্দোল ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গিমা বিকাশে কবি অপূর্ব্ব ওস্তাদী দেখাইয়াছেন। কবি বাঙ্গালী পাঠকের হাবিলদারীর ভার লইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, "কামাল পাশা" কবিতায় তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে,—বাংলা সাহিত্যে ইহা একেবারে অভিনব জিনিষ। কবির এই বীর ভাব অনেক কবিতাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান পাত্র-পাত্র গ্রহণ করিয়া কবি যে সব অনুপম উপমা সংযোজন করিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। জাতীয় জাগরণের দিনে অগ্নি-বীণার বীরোদাত্ত বাণী বাঙ্গালী জাতি আদরের সহিত গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে। কবি-শিল্পী অবনীন্দ্র নাথের পরিকল্পিত প্রচ্ছদপট খানি পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। কবি নজরুলের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি আছে।

স্বপ্নেলাভ্যন্তর—(নাটক) শ্রীযামিনী কান্ত সোম প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

সুবিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার হেনরীক ইবসেনের "A Doll's House" নাটিকা অবলম্বনে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে এই নাটক খানি রচিত হইয়াছে। পাত্র পাত্রীর নাম, কথাবার্ত্তা বা ভাবভঙ্গীতে ইহাকে অনুবাদ বলিয়া আদৌ মনে হয় না। লেখক বিশ্বস্ততার সহিত সাহিত্যিক কলা কৌশল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুস্তকখানি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ কাল এ দেশে নারী জাতির ভিতর যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে এই নাটক খানিতে পাঠক পাঠিকা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। সংসারে নারী অসহায়া-ভীত মূগ হইতে পুতুলের মত পুরুষের শোভা বর্দ্ধন করিয়া আসিয়াছে। পুতুল লইয়া যেমন ছেলেরা খেলা করে, পুরুষেরা ও নারীকে লইয়া সেইরূপ খেলার সাধ্যায়, কখন বা আদরে আপ্যায়িত করে কখন বা পদাঘাতে বিমূর্ত্তিত করে। কিন্তু নারীরও প্রাণ আছে, সে-শুধু আদরের সঙ্গিনী নয়। তাহারও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগে, হৃদয়ে বাসনার বুদ্বুদ্ ফোটে। নারীর এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা যখন দুর্নিবার হইয়া উঠে তখন সে কেমনে সমাজের মায়া কাটাইয়া খেলার ভাগিয়া সত্যিকার জীবনের জন্য আপনার পথ খুঁজিয়া লয় তাহাই এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকখানি সমাজোপযোগী হইয়াছে বলিয়াই বাঙ্গালা দেশে বিশেষ আদৃত হইবে।

শান্তি-প্রবাহ—(২য় সংস্করণ) মৌলবী এনামুল আলী চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান পুস্তকখানি বোধহয় বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'ইসলামের স্বরূপ' 'ইসলামের ধারা' 'রমজান' 'আজান' 'উপাসনা' ও 'নামাজ'—এই ছয়টী প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ছয়টী প্রবন্ধ যেন ছয়টী অদৃশ্য ধারা, একই সুধা-রসের উৎস হইতে বাহির হইয়া বৃহৎ-বঙ্গের বীথি-তলে দিকে দিকে বহিয়া চলিয়াছে! এই হিসাবে পুস্তকের "শান্তিধারা" নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। "শান্তিধারা" বাস্তবিকই শান্তির (ইসলামের) ধারা—সমস্ত ধারার উৎস-মুখই ইসলাম। প্রত্যেক ধারাই নিজ নিজ গতি-পথকে সরস করিয়া শান্তি বিলাইয়া চলিয়াছে। ইহার সংস্পর্শে যিনিই আসিবেন, তাঁহারই আত্মার ধাত্রী উন্নত হইবে, তিনিই শান্তি পাইবেন। বস্তুতঃ শান্তিধারা এই অবহেলিত আত্ম-বিস্মৃত মুসলমান-জাতির শীর্ষে বেহেস্তের দূত কল্যাণ ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। ইসলামকে সরল করিয়া চিনিবার, সুন্দর করিয়া দেখিবার, গভীর করিয়া জানিবার ইহাই বঙ্গ-সাহিত্যের একমাত্র পুস্তক। প্রত্যেক প্রবন্ধেই গভীর সত্যের তীব্র অনুভূতি দিয়ে লেখা। মনে হয়, লেখক যেন দার্শনিকের সত্যানুরাগ লইয়া, সাধকের তন্ময়তা লইয়া, ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তি-রস লইয়া নিবিষ্ট মনে ইসলামের স্বরূপ আঁকিয়াছেন, সর্ব্বোপরি কবির তুলিকা লইয়া নিপুণ হস্তে তাহাতে রং ফলাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা সত্য, শিব ও সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ। ইহাতে সত্য আছে, মঙ্গল আছে, সৌন্দর্য্য আছে। ইসলাম সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এত আনন্দ দিয়া এত সুন্দর করিয়া আর কেহই ইসলামের স্বরূপ আমাদিগকে দেখান নাই।

এই পুস্তক হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই পাঠ করা উচিত। মুসলমান পাঠ করিবেন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য, হিন্দু পাঠ করিবেন উহাদের পরিচয় ও বন্ধুত্বকে নিবিড়তর করিবার জন্য। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সেই দিন আসুক যেদিন লেখকের মতই হৃদয় ও চক্ষু লইয়া আমরা ইসলামকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারিব।

পুস্তকে আর দুইটী প্রবন্ধ স্থান পাইলে আমার মতে উহা আরও সর্ব্বাঙ্গীন হইত—'হজ' ও 'জাকাত'। কারণ তাহা হইলে ইসলামের মূল অনুষ্ঠানের সবগুলির সহিতই আমাদের পূর্ণ পরিচয় হইয়া যাইত। আশা করি, লেখক এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

নূরুন্নবী—(২য় সংস্করণ) প্রণেতা—মৌলবী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৯০ নং বেচুবাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানিও চৌধুরী সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি। ছাপা, কাগজ অতি সুন্দর। মহা মানুষ হজরত মোহাম্মদের পবিত্র জীবনকথা-সহজ সরল ঘরোয়ার ভাষার রূপ-কথার মত মধুর করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা শিশু-সাহিত্য। মুসলমানদিগের শিশু-সাহিত্য একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেখক এই অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্য যে জাতীয় জীবন গঠনের জন্য মস্ত বড় দরকারী জিনিস, আমাদের দেশের লোকেরা তাহা জানে না। এ বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তথাকার শিশু-শিক্ষার প্রণালীই হইতেছে—আনন্দের ভিতর দিয়া জ্ঞান-দান। শিশুদের এই মনস্তত্ত্বের সহিত এই প্রণালীর গভীর সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ছেলেরা প্রথমভাগ পড়িতে গিয়াই "লেখাপড়া" কে কুইনাইনের মত তিক্ত বলিয়া বোধ করে। আনন্দ পাওয়া তফাতের কথা, বাড়ীতে অভিভাবকদিগের কড়া শাসন এবং পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের হুঙ্কি দেখিয়া অনেক ছেলেরই জীবন নিরানন্দময় হইয়া উঠে। অভিভাবকের কড়া শাসন না থাকিলে, আমার মনে হয়, এদেশের অতি অল্প ছেলেই আগ্রহের সহিত স্কুলে যাইত। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া কোন বাজে বই পড়িতে বা ছবি দেখিতে তাহাদের বিবেকে। হিন্দু সমাজপতিগণ এ বিষয়ের অনেকটা প্রতিকার করিতে পারিয়াছেন। "ছেলেদের রামায়ণ" "ছেলেদের মহাভারত" 'গীতা' সাবিত্রী ইত্যাদি অসংখ্য শিশুপাঠ্য বই তাহাদের আছে। কিন্তু মুসলমানদের এ বিষয়ে কিছুই নাই বলিলেও চলে। মৌলবী এয়াকুব আলী চৌধুরী

সাহেব সেই অভাবেরই কণামাত্র পূরণ করিয়াছেন। তবে তিনি যেটুকু করিয়াছেন, তাহা যে সুন্দর ভাবে করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মোহম্মদের মাথায় মণি, সারাজীবনের আদর্শস্থানীয় হজরতের মধু মাখা জীবন-কথাই তিনি প্রথম আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। তিনি হজরতকে অতি মানুষ রূপে আঁকেন নাই। উর্দ্দু কেতাব সমূহের মত হজরতের 'মাহেজা' বা অলৌকিকত্ব দেখাইয়া তাহাকে বড় করিতে চান নাই। আদর্শ মানুষ রূপে তিনি তাঁহাকে আমাদের নয়ন সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। লেখক বাস্তবিকই বলিয়াছেন:—

"মানুষের চেয়ে মানুষ বড়
সবার বড় মানুষ সে,
মানুষ হইবে কেমন মানুষ
সকল মানুষে শিখাল সে।"

এই ভাবেই তিনি হজরতের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সংসারের সকল বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া, শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের অধীন হইয়া হজরত যে আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, লেখক সেই আদর্শকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহাতে আমরাও সকল অবস্থাতে তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারি। বস্তুতঃ শিশুদের চরিত্র গঠন করিবার জন্য, তাহাদের কোমল হৃদয়ে মানবীয় আদর্শের রেখাপাত করিবার জন্য, নূরনবী শ্রেষ্ঠ পুস্তক। আশা করি, এই জাতি গঠনের দিনে কোন অভিভাবকই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ হজরতের জীবনকথা সন্তানদিগের হাতে তুলিয়া দিতে ভুলিবেন না। প্রাইজ, লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

পূর্ণিমার গান

মাতাল হ'ল ঝিক্-ভোলা পিক
নিশুতিতেই উঠ্‌চে কান,
চৈত্র শেষের শুক্ল রাতি
গাইচে গো আজ নূতন গান।
গাছতলাতে নৃত্য চপল
ছায়াপরীর উড়্‌চে আঁচল,
বাজ্‌চে বাঁশী জ্যোৎস্নারি
বনভূমির মাতিয়ে প্রাণ!
পূর্ণিমেরি পৌর্ণমাসী
স্নিগ্ধ-কিরণ বাহুর ডোরে,
নিভৃতে আজ জড়িয়েছে গো
বর্ষটিরে নিবিড় ক'রে;
অশ্রু-কোটা গণ্ডে দুলে
লুকাচ্চে তাই হাসির ফুলে—
হাসি-চাপা অশ্রুজলে
বর্ষবিদায়কালীন তান!

শ্রীচণ্ডী চরণ মিত্র

জাতীয় উৎসবে

ওম্ সত্যম্ হরি ওম্—
সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়, বৈর্য্যের জয় জয়,
মুক্তির এই মহাবাণী আজ
পূর্ণ করেছে ব্যোম।
ওম্ সত্যম্ হরি ওম্।

চারি দিকে মার্ মার্,
শুধু হানাহানি, মহারণ রণি অস্ত্র ঝনৎকার,
কলহীনে ঐ পিশিয়া ফেলিছে
পাশব অত্যাচার।
আর্ত্তকণ্ঠে উঠেছে ধ্বনিয়া মৃত্যুকাতর রব,
শুধু হা হা হাহাকার।

ন্যায়ের আসন তাই—
টলমল আজ,—বিশ্ব আসন আজ আর স্থির
নাই,
মহা মানবের মহান্ কণ্ঠে,
কি ধ্বনি শুনিতে পাই।
মুক্তি ভিখারী নর নারী তোরা ছুটে আয়,
ছুটে আয়,
যে যেথা আছিস্ ভাই!

এই ভারতেরি বুকে—
রাজার পুত্র ত্যাগী বৈরাগী কহিল শান্ত মুখে
মহা অহিংসা বাণী,
চরণ-চিহ্ন অনুসরি' তাঁর এসেছিল কত জ্ঞানী।
আজি নব মহিমায়,
নব শান্তির, নব মুক্তির মহা গান শুনা যায়॥
মহামানবের মহামুক্তির গান,
নির্জ্জীব এই ভারতের বুকে জাগাইল নব প্রাণ॥

ওম্ সত্যম্ হরি ওম্,
সত্যের জয়, বৈর্য্যের জয়, ধর্ম্মের জয় জয়,
মুক্তির এই মহাবাণী আজ
পূর্ণ করেছে ব্যোম্॥

ওরে সে দিনের কথা,
বুক ফাঁটা দুঃখে
গুমরিয়া কবি প্রকাশিল মনোব্যথা,
"গিয়েছে সে দিন, আর,
আসিল না যে গো এ জনমে হায় শিখ, জাঠ,
মারহাট্টা।"

ওগো কবি মেল আঁখি,
দেখ দেখ চাহি, স্বরগ হইতে নব উৎসব একি।
"নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্"
এ নহে কাহিনী স্বপ্ন এ শুধু নয়,
ভারত আজিকে জাগ্রত যে গো
আজি সে জীবনময়॥

বন্দে মাতরম্,
মিলিতকণ্ঠে এই মহাবাণী পূর্ণ করেছে ব্যোম্।
বন্দে ভারতমাতা,
শিখ্, পারসীক্, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ উচ্চারে
জয়গাথা,
হিন্দুমুসলমান,
মারাঠা, বাংলা, সুরাট, উৎকল সারা
হিন্দুস্থান,
সব আজ এক প্রাণ,
রচিত হেথায় মহামানবের মিলন প্রতিষ্ঠান॥

নাই নাই ভয় নাই,
পোহাল রাত্রি নবীন যাত্রী আগে চল্
চল্ ভাই!
ঐ সম্মুখে স্বর্ণ তোরণ দ্বার,
চল্ চল্ সবে এক প্রাণ হয়ে মুক্তির অভিসার।
চরণের তলে নত হবে সব বাধা,
লক্ষ্যের পানে লক্ষ নয়ন এক সুরে রবে সাধা॥

ওম্ সত্যম্ হরি ওম্,
সত্যের জয়, বৈর্য্যের জয়, ধর্ম্মের জয় জয়,
মুক্তির এই মহাবাণী আজ
পূর্ণ করেছে ব্যোম্!
ওম্ সত্যম্ হরি ওম্॥

গাহ তাঁর জয় গান,
যে মহাপুরুষ ত্যাগী-বৈরাগী দিলা এই নব দান;
নব যুগে নব বাণী
শুনায়ে বিশ্বে, অমলিন মুখে কারাবাস
নিলা যিনি,
সেই মহাত্মার জয়,
নমো নমঃ সেই সত্য সাধকে, জয় গান্ধীর জয়।

শ্রীসরসীবালা বসু

Printed by The Oriental Printers and Publishers, Ltd.
40, Machua Bazar Street, Calcutta.
Published by Dr. Md. Lutfar Rahman, 32, College Street, Calcutta.

বঙ্গীয়
মুসলমান-সাহিত্য
পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫ম বর্ষ	মাঘ, ১৩২৯	৪র্থ সংখ্যা

কবিবর নেজামী

কবিবর নেজামীর প্রকৃত নাম আবু মোহাম্মদ বেনে ইউসফ্ বেনে মুয়ীদ। তিনি সুধীমণ্ডলীর নিকট নেজামুদ্দীন (ধর্ম্মের নিয়ামক) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার রচিত কবিতাসমূহের ভণিতায় তিনি আপনাকে "নেজামী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পারস্যের 'কুম্' প্রদেশস্থ একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ১১১৬ খৃষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবনের অধিকাংশ সময় 'গাঞ্জা' নামক একটী ক্ষুদ্র নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছিল; অধিকন্তু এই স্থানটী তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের লীলাভূমি ছিল; তাই সুধীসমাজে তিনি "নেজামী গাঞ্জাভী" (গাঞ্জানগরীর অধিবাসী) বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

পারস্য কবিদের মধ্যে কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব বিষয়ের বর্ণনায় লেখনী পরিচালনা করিতে ইনিই প্রথম পথপ্রদর্শক, এজন্য অনেকে তাঁহাকে কল্পনারাজ্যের প্রথম সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কল্পনা-চাতুর্য্যে অবাস্তব বিষয়ের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত না হইলে কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারা যায় না, কবিবর নেজামীর ইহাই অভিমত ছিল। তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রকে উপদেশস্থলে বলিয়াছেন—

দার্ শের্ মাপেচ্ ও দার্ কানে য়ূ
কাহ্ সানে য়ুস্ত আক্‌জাবে য়ূ
দার্ শের্ মাতালাব্ বোলান্ধ নামী
কী খাত্‌ম্ শোআরা বর নেজামী।

অর্থাৎ হে প্রিয়তম, কাব্যালোচনা ও

ও কবিতা-রচনার পথে ঈষাচ প্রদর্শন করিও না, নিশ্চয় জানিও অলীক কল্পনাই কাব্য-জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। কদাচ কল্পনারাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিও না, নেজামীই এ রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট।

ঐতিহাসিকমণ্ডলী কবিবর নেজামীকে সাহিত্য-সৌধের একটী বিরাট স্তম্ভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহাদির বর্ণনায় অমর কবি ফেরদৌসী, বিষয় বৈচিত্র্যে ও সজীবভাব প্রকাশে মৌলানা রুমী এবং সরল ও সহজ ভাষায় কবিতা লিখিতে মহাকবি সাদীর সমতুল্য ছিলেন, যুগপৎ এরূপ বিভিন্ন শক্তির অধিকারী হওয়া কবিবর নেজামী ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

কবি চিরদিন আড়ম্বরশূন্য ছিলেন। রাজা, রাজমন্ত্রী, আমীর, ওমরাহ, এমন কি সাধারণ ধনী সম্প্রদায়ের সংস্রব হইতে সর্ব্বদা তিনি দূরে থাকিতেন। মহাত্মা নেজামী বলিতেন —পার্থিব ধনসম্পত্তি ও ধনবান লোকের সংস্রব মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি পথের কণ্টকস্বরূপ। এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত ও ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত মানবের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে। সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন সন্তোষই সকল সুখের মূল।

জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে কবি একস্থানে লিখিয়াছেন—নেজামী চু হামী দানী কে রোজে মার্গ দামুপেশাস্ত গামে রোজে কারামাৎ খোর্ চে চান্দী কেসরা মিথানী।

অর্থাৎ নেজামী, জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও মৃত্যু সুনিশ্চিত বলিয়া যখন তোমার দৃঢ়বিশ্বাস তখন আর বৃথা সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া থাকিও না, একমাত্র পারলৌকিক মঙ্গলচিন্তায় তোমার জীবনের অবশিষ্ট দিন-গুলি কাটাইয়া যাও।

কবি সত্য সত্যই সংসারের মায়া বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জন বাসে ভগবদারাধনায় নিরত থাকিতেন। ধনবান সম্প্রদায় এমন কি পারস্যাধিপতি সোলতান নোস্রাতুদ্দীন পর্য্যন্ত অনেক সময় সাক্ষাৎ কামনায় তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। তিনি কাহারও প্রতি দৃক্‌পাৎ ও করিতেন না। দুঃখ দারিদ্র্য-নিপীড়িত চির অভাবগ্রস্ত জনমণ্ডলীকে কবি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তৎসাময়িক পারস্য-রাজ সোলতান নোস্রাতুদ্দীন কবিকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কবির সহিত সকল সময় সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ না ঘটিলেও তিনি নিয়মিতরূপে সময় সময় কবির কুটীর দ্বারে উপনীত হইতেন, মহাত্মা নেজামীর এই সংসার-বিমুখ ভাব এমন কি তাঁহার প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শনে উদাসীনতা দেখিয়াও কখন স্বীয় সম্মানের হানি হইল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি সকল সময় সমভাবে কবিকে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। সোলতানের এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া কবি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি স্বরচিত অনেক কবিতায় রাজার প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশে বহু আশীর্ব্বচন প্রয়োগ ও বহু উপদেশাবলী প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্বিজয় মানসে মহাদ্যুতব আলেক্ জাণ্ডারের (সেকেন্দার) নানা দেশে যুদ্ধাভিযান ও রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে " সেকেন্দার নামা " নাম দিয়া কবি এক খানি বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি পারস্যরাজ নোস্রাতুদ্দীনের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কবি এক স্থানে গাহিয়াছেন :—

আলেক্ নোস্রাতুদ্দীন কে আজ্ জামে য়ু
খোরম্ হার্ কাসে বাদা বার্ ইয়াদে য়ু
চু আজ সাখ্তান্ বাজ্ পারদাখ্তাম্
য দাস্তান্ হ য়ু পেশ্ কাশ্ সাখ্তাম
বাকা বাদশাহ্রা বনামেরুই বাখ্ত
বদো বাদ সাদ্ সাবাশিয়ে তাজ্ ও তাখ্ত্

অর্থাৎ পারস্যরাজ নোস্রাতুদ্দীনের ন্যায় বিচারে সকলেই মুগ্ধ, দেশবাসী সকলেই তাঁহার নামে স্বাস্থ্য পান করিয়া থাকে। আমি এই বিরাট গ্রন্থ খানি সমাপ্ত করিয়া তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। তিনি চিরজীবী হউন, তাঁহার চির সংসর্গ লাভ করিয়া সিংহাসন ও রাজ মুকুটের মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

কবি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

মান্ আঁ বোল্বোলাম্ কাজ্ এরাম্ তাখ্তাম্
ব বাগে চু আরাম গাহ্ সাখ্তাম্
বাওয়ারে সারাইয়াম জে অনইয়াবে চু
কে মানাদ্ বারো সাল্হা নামে চু
মারা পীল্বার্ আজ্ তো মাকসুদনেস্ত
কে পীলে তো চু পীল মাহ্মুদনেস্ত
মারা বাদ তাওফিক্ গোফ্তান্ খোদায়
তোরা বাদ পায়ান্দা কাম্রাজ ও রায়

এক্ষণে উড়িয়া আসিয়া তোমার বাগানে আশ্রয় লইয়াছি, দেখিবে অচিরে আমার কণ্ঠনিঃসৃত গানের পীযূষ-ধারায় সাহিত্য জগৎ প্লাবিত হইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে তোমার নামও যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, আমি (ফেরদৌসীর ন্যায়) তোমার নিকট হস্তী পৃষ্ঠে বোঝাই দেওয়া স্বর্ণ মুদ্রার প্রার্থী নহি; পক্ষান্তরে তোমার হস্তীও সোলতান মাহমুদের হস্তীর ন্যায় (কবিকে পদদলিত করিবার আজ্ঞাপ্রাপ্ত) নহে। আমাকে সর্ব্বশক্তিমান অসাধারণ কবিতা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট, আমি অন্য সম্পদের ভিখারী নহি। হে রাজন্, তুমি এই প্রকার সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার সহিত চিরজীবী হইয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের হিত সাধনে রত থাক।

জীবনে ও মরণে কোন অবস্থায় কবি যশঃলাভে বঞ্চিত হন নাই, তাঁহার যশ-সৌরভে দিগন্ত আমোদিত ও তাঁহার খ্যাতি প্রতি-পত্তি ও প্রশংসা-গীতিতে সভ্য জগৎ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবি-ভাগ্যে জীবিতা-বস্থায় এরূপ যশোলাভ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। কবিবর নেজামী নিজেই এক স্থানে গাহিয়াছেন—

নেজামী বাসা সাহেব্ আওয়াজায়ী
কোহান্ গাস্তী ও হাম্চোনা তাজায়ী।

হে নেজামী, তোমার যশঃদুন্দুভি পৃথিবী-ময় বাজিয়া উঠিয়াছে, তুমি বয়সে প্রবীণ; কিন্তু তোমার কবিত্ব-রসপূর্ণ প্রেমপ্রবণ হৃদয় চিরনবীন।

পারস্য দেশে একবার একটী বিরাট সাহিত্য সম্মিলনী হইয়াছিল, ঐ সভায় পর-

• অর্থাৎ আমি স্বর্গোদ্যানের সুকণ্ঠ বুলবুল,

লোকগত পারস্য কবিদের কবিতার বিচার ও কবিতার হিসাবে তাঁহাদের পদ গৌরবের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে অনেকে একমত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

দার্ক শের্ সে কার্ পায়াদারানাস্ত
হাম্চাস্ত কে লা 'নেযিয়া বাদী'
আওসাফ্ কাসীদা ও গাজাল্রা
ফেরদৌসী ও আন্ওয়ারী ও সাদী

অর্থাৎ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের পর আর কোন তত্ত্ববাহক আবির্ভূত হইবেন না, ইহা এসলাম ধর্ম্মের সর্ব্ববাদীসম্মত বিধি, তবুও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পদগৌরবের হিসাবে অমর কবি ফেরদৌসী, আনওয়ারী ও সাদী এই তিন মহাত্মাকে কাব্য জগতের প্রেরিত মহাপুরুষ না বলিয়া উপায় নাই। এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, —মহোদয়গণ, আশ্চর্য্যের বিষয় আপনারা কেহ মহাকবি নেজামীর নাম লইলেন না। তদুত্তরে তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন,—নেজামীর কথা ছাড়িয়া দিউন, " য়ু খোদায় সাখোনাস্ত" অর্থাৎ অন্যান্য কবিদিগকে প্রেরিত মহাপুরুষের আসন প্রদান করিলে কবিবর নেজামীকে কাব্য জগতের ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অসংখ্য কবিদের মধ্যে প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে কবিবর নেজামী কিরূপ বিজয় মালা লাভ করিয়া অমরজগতে অমর হইয়া গিয়াছেন, উল্লিখিত ঘটনা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তিনি একজন মহাতাপস ও আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী ছিলেন।

তাঁহার রচিত মাখ্জানুল্ আসরার্, খোস্রো সিঁরী, হাফ্ত পায়কার্ এবং বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ সেকেন্দার নামা সাহিত্য জগতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কবিবর নেজামী ১১৮০ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে এই পাপ তাপময় নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চিরশান্তি নিকেতনে চলিয়া গিয়াছেন, পারস্য দেশের গাঞ্জা নগরীতে মহা সমারোহে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছে।

কাজী নওয়াজ খোদা

ন'কার

সংযোগ ও বিয়োগ আমার কার্য্য। শব্দের শেষাংশে থাকিয়া সংযোগ এবং প্রথমাংশে থাকিয়া আমি বিয়োগ ঘটাই, আমি ন'কার। নর-নারীর নামকরণে আমিই কল্যাণ সংযোগের সোপান। নর-লিঙ্গক নামের অন্তে আমিই কল্যাণদায়ক নারী-লিঙ্গক নামের গঠন করি। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে আমার সম্পর্ক না থাকিলে কল্যাণ হয় না। আমার প্রসাদে ইন্দ্রের কল্যাণী পত্নী ইন্দ্রাণী; বরুণের রাণী বরুণাণী; ব্রহ্মার গৃহিণী ব্রহ্মাণী; রুদ্রের ঘরণী রুদ্রাণী; শক্রের রাণী শক্রাণী; মৃড়ের সঙ্গিণী মৃড়াণী। ইহারা সকলেই কল্যাণদায়িণী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী গৃহিণী ও পত্নী। ভবানী, ক্ষত্রিয়ানীর, মাতুলানীর সমাদর মাতুলী অপেক্ষা অনেক বেশী, কারণ মাতুলানী আমার সম্পদে সম্পন্না। আচার্য্যা, পণ্ডিতা বা উপাধ্যায়া স্ব স্ব গৌরব-মণ্ডিতা স্বয়ং প্রধানা হইলেও স্বামী-বিচ্ছিন্না বলিয়া কল্যাণদায়িনী নহেন। আচার্য্যানী উপাধ্যায়ানী ও পণ্ডিতানী আমার প্রসাদে স্বামী-সোহাগিনী। ললনা, অঙ্গনা, সীমন্তিনী, নিতম্বিনী, রমণী, ভামিনী, কামিনী, প্রভৃতি আকারে একটু স্বাধীনা হইলেও ইঁহারা আমার সম্পর্কে সকলেই স্বামীর আদরিণী। আর আমার অভাবেই দার বা দারা এবং কলত্র অলক্ষণা। বামনী ডুমনী গয়লানী, মেথরানী, কামারণী, ধোপানী, নাপিতিনী, বা নাপতিনী, কলুনী, মুসলমানী, চামারণী, যবনী এমন কি সিংহিনী ব্যাঘ্রিনী পর্য্যন্ত সকলেই আমার গৌরবে গরবিনী। রজনী, যামিনী, কাহিনী, জীবনী, নলিনী, প্রদর্শিনী, সম্বিদনী, এমন কি হিমানী, অরণ্যানী, যবনানী, নির্জ্জীব হইলেও নয়ন-শ্রবণ-মনোহারিণী। তপস্বিনী, অভিমানিনী, মায়াবিনী, নন্দিনী, বন্দিনী, সকলেই চিত্ত-বিমোহিনী। জায়া অপেক্ষা জননী, ভার্য্যা অপেক্ষা গৃহিণী আরামদায়িনী। ইন্দুবদনী বা ইন্দুবদনা আমার বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীনা হইলেও প্রকারান্তরে আমারই অধীনা তাই শোভনা। সেইরূপ ত্রি-নয়না, গজেন্দ্র-গমনা, নীল-বসনা, সৌম্যমাত্রভূষণা সকলেই সুলক্ষণা। আলোচনা গবেষণা, অর্চ্চনা, বন্দনা, বীণা, বাণী, রসনা, রশনা, ঘটনা, ঘটনা, জ্যোৎস্না প্রভৃতিতে আমারই প্রভাবে রমণীত্ব-কল্পনা। আমারই প্রভাবে কবিগণ ব্যাকরণের শাসনের অবমাননা করিয়াও উদাসিনী, প্রেমাধীনী, সুকোশনী ও রঙ্গিনীর সম্মাননা করিয়াছেন। এমন কি ব্যাকরণ দুষ্টপথের দ্বারা থাকিয়া নালোপদার উদাহরণ দিয়াছেন—

যথা চাতকিনী ক্ষুত্কিনী ঘন বরষণে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে।

কেবল হস্তিনী ও শঙ্খিনী নিতান্তই মন্দ-ভাগিনী। কালিনী ফণিনী, সাপিনী, তাপিনী, দুখিনী ইহারাও লোকরঞ্জিনী নহে। আমারই প্রভাবে বিশ্বামিত্রের নন্দিনী গাভী হইয়াও সেনা-প্রসবিনী। আমারই অভাবে শচীমাতা

চৈতন্য জননী হইয়াও পুত্রহারা। কপিল-বস্তুর রাণী মায়া দেবীও অভাগিনী। আমারই অভাবে ইংরাজেরা সহজে courtship ও divorce লইয়া জীবনের আলায় অস্থির সতত সশঙ্ক। আমিই রমণীর হাতের নোআ বা বো। আমার অভাবেই অকল্যাণ। তবে হাতের নোআ থাকিতে যাঁহাদের কষ্ট, তাঁহাদের ভাগ্যে নিতান্তই সধবার একাদশী।

আমিই সকল ক্রিয়ার সাধন-প্রত্যয়, করণের কারণ। জীবন-যাপন, প্রাণধারণ, স্নান-ভোজন, মরণবাঁচন, ভজনপূজন, দর্শন-স্পর্শন, মনন-নিদিধ্যাসন, যারণ-ধারণ, করণ-কারণ, চলন-চালন, ঝলন-পোড়ন, নড়ন চড়ন্-(চরণ), পানভোজন, ধানধান, ধানবাহন, লেন দেন, বীজবপন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ, গর্ভাধান, অন্নাধান, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ, নামকরণ, উপনয়ন, অধ্যয়ন, পাণিগ্রহণ, অধ্যাপন, বিজ্ঞান, দর্শন, ঔষধ-সেবন, ব্রতধারণ, নামগ্রহণ, শবদাহন, পিতৃতর্পণ—সকল কার্য্যের আমি সাধন। ছাউনি, পাউনি, লেখনী, হাঁটুনি, জানানি, শুনানি, বাঁধুনি, করণি, ধরণী, তরণী, কাঁদুনি, চালুনি, ঝাড়ুনি, কাঁদুনি, বকুনি, চাহুনি, চাখুনি, নাচুনি, উঠুনি, ছাকনি, চিকণি, ধুচুনি, দর্শনী, পেষণি, আমারই সৃষ্টি। কল্পনা, জল্পনা, লালনা, ছলনা, ভর্ৎসনা, গঞ্জনা, অর্চনা, প্রার্থনা, উপাসনা, আরাধনা, উন্মাদনা, সম্বর্দ্ধনা, আলোচনা, গবেষণা, সম্মাননা, অবমাননা, গণনা, ধারণা, পারণা, বাসনা, লক্ষণা, বেদনা, বন্দনা, যন্ত্রণা, যাতনা, যাপনা, কামনা আমারই রচনা। সম্মার্জ্জনী, বিশল্যকরণী, অজীবণি, অধিরোহণী, অবতরণি, দর্শনী, সুদর্শন, অশনি, তরণি, ধরণি, গ্রহণী, তরণী, ধরণী, পাণি, পেষণি, বহ্নি, প্রকৃতি আমারই নির্ম্মাণ। আমিই ক্রিয়ার সাধন, আমার অভাবেই কার্য্যহানি।

ক্রিয়ার সহিত আমার আর একটা সম্পর্ক আছে—সম্পূর্ণতা বিধান। আমার যোগে ক্রিয়া পূর্ণ হয়। আমি past participle গঠন করি। তার সাক্ষী—অন্ন, ঋণ, ঈর্ণ, আসীন, কীর্ণ, ক্লিন্ন, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ, খিন্ন, গীর্ণ, গ্লান, ঘ্রাণ, চূর্ণ, ছন্ন, ছিন্ন, জীর্ণ, ডীন, তীর্ণ, ত্রাণ, তূর্ণ, দূন, দীন, দীর্ণ, ধূন, নুন্ন, পন্ন, পূর্ণ, পান, পীন, ভিন্ন, ভূয়, ভগ্ন, মিন্ন, যীন, ম্লান, রুগ্ন, লীন, শূন, বিন্ন, বিন্ন, বূর্ণ, শন্ন, শীর্ণ, সন্ন, সিন, স্তীর্ণ, হীন, হ্রীণ। মুসভা ইংরাজী ভাষায় past participle সৃষ্টি করিয়াছি দেখ—arisen, born, borne, begotten, bidden, bitten, bounden, blown, broken, chosen, chidden, drawn, drunken, driven, eaten, fallen, flown, forborne, forgotten, forsaken, frozen, gotten, given, gone, grown, hidden, lain, known, ridden, risen, seen, shaken, shrunken, sunken, slain, slidden, smitten, spoken, stolen, stridden, stricken, striven, sworn, taken, torn, thrown, trodden, worn, woven, written, beaten, cloven, crown, done, graven, hewn, laiden, molten, mown, proven, riven, rotten, sawn, sodden, sewn, shapen, shaven, shorn, sown, strewn, strown, swollen, thriven, washen, written, আনা, শুনা, কাণা, ঘুনা, যানা, খানা,

দেনা, ছানা, টানা, কেনা, লেনা, বেনা, বোনা, তানা, শোনা, আনা, প্রভৃতিতেও আমার গন্ধ আছে। তিরশ্চীন, সাংমুখীন, মামকীন, তাবকীন, অবরীণ, বিশ্বজনীন, সর্ব্বজনীন, নূন, নূতন, প্রত্ন, পুরাতন, পারীণ, পারাবারীণ, সর্ব্বাঙ্গীন, সাপত্নীন, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, উদীচীন, প্রতীচীন, প্রাচীন, বৈয়ংগবীন, অন্তর্বীন, সর্ব্বকর্ম্মিণ, অরণীন, আত্মনীন, প্রাতস্তন, সায়ন্তন, দোষাতন, দিবাতন, পুরাতন, চিরন্তন, সদাতন, সনাতন, অধুনাতন, ইদানীন্তন, তদানীন্তন, প্রাহ্ণেতন, প্রগেতন, পূর্ব্বাহ্ণেতন, অপরাহ্ণেতন, উর্দ্ধতন, উপরিতন, অধস্তন, প্রাক্তন, পূর্ব্বতন, চিরন্ত, পরন্ত, পরাত্রিন্ত,—আমারই নিপাতনে সিদ্ধ।

সংস্কৃত করণের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনে, কর্ম্মণি দ্বিতীয়ার বহুবচনে ও ষষ্ঠীর বহুবচনে আমার কৃতিত্ব আছে। সাক্ষী—গজান্, নরান্, ধর্ম্মান্, ধনানি, কর্ম্মাণি, মরণানি, জননানি, মাতৃন্, পিতৃন্, মুনীন্, সাধূন্, নরেন্, গজেন, ধনেন, জনেন, কর্ম্মণা, মুনিনা, সাধুনা, নরাণাং গজানাং, ধনানাং, জনানাং, পিতৃণাং, মাতৃণাং নৃণাং, সাধূনাং, মুনীনাম্।

ইংরাজী ভাষায় noun হইতে verb, adjective ; adjective হইতে verb প্রভৃতি গঠন করিতে আমার নিয়োগ হইয়া থাকে। পদাদি ও পদান্ত উভয় স্থলেই প্রয়োগ হয়। তার সাক্ষী, verbs—fatten, lengthen, gladden, blacken, thicken, darken, shorten, hasten, liken, enclose, endorse, entrust, enquire, entwine, encircle, endear, enrich, enlarge, enslave, entitle, endanger, etc.

adjectives—wooden, brazen, earthen, silken, waxen, golden, silvern.

নিষেধে 'ন্' আমি। "যাইও না" বলিতেও আমি, "আসিও না" বলিতেও আমি। "ন গচ্ছেৎ" "নাগচ্ছেৎ" আমরাই সংস্কৃত রূপ। নক্ত, নাদত্ত, নাক, নসংহত, নপাং, নগ, নাতি, নস্তা, নকুল, নকূট, নভস, নভস্ত, নভাক নাস্তিক,

নাধীয়ীতাশ্বমরূঢ়ো ন বৃক্ষং নচ হস্তিনং।
ন নাবং ন খরং লোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ॥
মনু ৪-১২০

ন চন পরিচিচ্যো ন চাপাগম্যঃ।
ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্ণাতি। শকু ১।

এই সমস্ত আমারই নিষেধে, বা আমারই বিধানে। নাতিদূর, নাতিনীতোষ্ণ, নাতিবাহ, নাতিচর, নৈক প্রভৃতি শব্দ এবং নিম্নলিখিত ইংরাজি শব্দ সমূহ আমারই সৃষ্টি।

no-one none, enemy, neither, never, nor, untruth, un-real, unwise, untold, unripe, untie, undo, unlock, infirm, infant, infrequent, instable, unstable, nefarious, neglect, negative, nonsense, nonexistent, non-compliance, non-cooperation, anarchy, anomalous. নিম্নলিখিত শব্দগুলিও আমারই সৃষ্টি। তবে নিষেধ অর্থে নহে। Diminutive—chicken, kitten, maiden, agent, citizen, captain, guardian, librarian. adj—human, humane, certain, Pagan, Roman, Indian, Christian, divine, infantine, leonine,

canine, clandestine, northern, eastern, southern.

আমার এই বিয়োগের কার্য্যে দুইজন assistant আছেন—ই এবং অ। সংযোগ কার্য্যেও ইঁহারা আমার assistants. কিন্তু তখন তাঁহারা যেন আনন্দে আটখানা হইয়া দীর্ঘ ঈ ও দীর্ঘ আ হইয়া যান। বিয়োগের কালেও তেম্‌নি তাঁহারা সমবেদনায় হ্রস্ব হইয়া পড়েন। তার সাক্ষী—নিষেধ বা বিয়োগের কালে আমি ইঁহাদের লইয়া অন্ বা নি কিম্বা ইংরাজীতে an, en, in, un, ne, বা nom ; কিন্তু সংযোগের কালে ইঁহাদের সহায়তায় আমি ঈন, নী, না, বা আনী, ইংরাজী en air, ian, তাহা হইলেও বুঝিতেছ যে আমি যাহা করি তাহার মধ্যে একটা principle আছে। আমি un-principled নহি। আমি যে আইনী কিছুই করি না। ভাঙ্গা ও গড়া যদিও আমার কার্য্য, তথাপি ভাঙ্গিবার সময় আমি সমবেদনায় শীর্ণ হই। কাজটা ভাল লাগে না। কিন্তু যখন ভাঙ্গা জোড়া দিয়া মিলন ঘটাইয়া দিই তখন বেশ ভাল লাগে আনন্দে আটখানা হই। বাড়িয়া কাঁপিয়া যাই। কিন্তু কি করি বিয়োগ কর্ম্মও আমারই কাজ, শব্দের প্রথমাংশে বসিলেই আমাকে ঐ কার্য্য করিতে হয়। কথাতেই বলে—"স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশাঃ নখাঃ নরাঃ।" তাই আমার স্থান পদান্তে সেখানে আমি কেবল মিলন সম্পাদন করি। প্রথমে আমি নহি। কিন্তু মুনি ঋষিদের অনুরোধ এড়াইতে পারি নাই। নাচার বিয়োগ কার্য্যও করিতে হইতেছে। কিন্তু "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।" আমি দিন দিন সেয়ানা হইয়া পড়িতেছি কি না? তাই এখন আমার assistant দের দিয়াই অধিকাংশ সময়ে ঐ না-পছন্দ ভাঙ্গার কাজটা করিয়া লই। এই বিষয়ে আমাদের আন্তর্বর্ণ খুব সুপটু। বহুকাল এই কাজ করিয়া করিয়া তাহার স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া গিয়াছে তাই এখন তিনি এ কাজটা বেশ পছন্দ করেন। এবং দীর্ঘাঙ্গ হইয়া আকারে পরিণত হয়েন। তার সাক্ষী আকাল, আমান, আকাজ, আগাছা, আলিকুলী। আর বেচারাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছি, রাজাদরুণ ত করিতেই হইবে। তা সেখানে আমার সুযোগ্য assistant ই মহাশয় অনেক ir-regular, ignominious, irresistible, illusion রচনা করেন। সম্প্রতি পারস্য দেশ হইতে আমার একটী নূতন assistant মুসলমানদিগের সাহায্যে আমদানি করিয়াছি। তিনি নামে বড় মধুর, বিবাহ শব্দের অপভ্রংশ "বে"র (ে) সমতুল্য। ইনি দেখিতে সুন্দর হইলেও কাজে ভারি চটপটে। বেহারা, বেহদ্দ, বেশরম্ প্রভৃতি ইঁহার সৃষ্টি। ইহার কার্য্য দেখিলে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সুগম হয়। পণ্ডিতেরা বলেন ইরানীয়গণ ও ভারতীয়গণ এককালে (প্রাগৈতিহাসিক কালে) একত্র বাস করিতেন। কিন্তু পরে বিবাদ হওয়াতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তরজাতি উভয় দেশে যাইয়া বস-বাস করিলেন। কি কারণে বিবাদ হইয়াছিল তাহা পণ্ডিতগণ এখনও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু অনুমানটা অতি সোজা! তাঁহাদের বিবাদের কারণ আমার assistant এর সন্তান "বে" লইয়া। হিন্দুরা "বে"কে মিলনের হেতু বা সাধন করিয়া লইলেন।

ইরানীয়গণ বলিলেন—"নাঃ, তাহা হইতেই পারে নাঃ। "বে" বিচ্ছেদের হেতু। বে না হইলে বিচ্ছেদ হয় না। তাহাকে না থাকিলে "বে"র সুখ কি ?" তাই তাঁহাদের মত ও হিন্দুদের মতের মিল হইল না, একত্র বাস বা এক সম্প্রদায়ভুক্ত তাও হইল না। কারণ ইরানীয়গণ চাহিলেন "বিবাহ বিচ্ছেদ" আর হিন্দুগণ চাহিলেন "এক ছেড়ে দ্বিতীয়"। তাই ইরানীয়গণ ইরাণের পথ ধরিলেন আর হিন্দুগণ ঘরপোষা হইয়া রহিলেন। পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করেন "সুর-অসুর" "দেব দানব" লইয়া। তা তাঁদের এতটুকু আক্কেল নাই যে গৃহ-বিচ্ছেদ বা সামাজিক কলহের কারণেই হইল "বে"। সংস্কৃত ভাষায় "বে" শব্দ সংস্কৃত হইয়া হইয়াছে "বিবাহ"। কিন্তু মূল "বে"।

"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" যোগাড় করিয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া দিলাম যে পদের প্রথমাংশে যেন কেহ আমাকে আসন গ্রহণ করিতে না হয়। কারণ বিচ্ছেদ কাজটা আমার নিতান্তই না পছন্দ। তা এখন ভারতীয়গণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা, ক্রিয়াপদের পরে আমার আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আমার দ্বারা বিচ্ছেদ কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। ইঁহারাও এখন নিত্য নূতনের ভক্ত। তাই ইঁহারা বলিলেন, "ভাল মহাশয়! আপনার যদি আসন পদের প্রথমে অভিমত না হয়, তবে সর্ব্বশেষে আসন পরিগ্রহ করুন; কিন্তু ক্রিয়া পদের শেষে বসিলেই আপনাকে বিচ্ছেদের কার্য্য করিতেই হইবে।" আমি কি করি ? "দশচক্রে ভগবান ভূত।" তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বৃদ্ধ বয়সে চাকরী বজায় রাখিতে হইল।

অনেক কারণে আজ তোমাদিগকে আমার দুঃখের কাহিনী শুনাইতে হইল। চিরকাল বাসত্ব আমার জীবিকা ছিল না। আমার বংশ অতি উচ্চে। তোমরা সকলে সঙ্গীত-প্রিয় কি না তাহা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে প্রকাশ্যে গান করিতে বলিলে অনেকেই ব্রীড়া বশতঃ রাজী হয় না বটে। কিন্তু অপ্রকাশ্যে বা অপরিচিত স্থানে দুই একটা পদ যে না আওড়াইয়াছেন এমন মনুষ্য এ সংসারে বিরল। যদিও কোথাও সে প্রকার মনুষ্য থাকে তবে তাঁহাকে ভগ্ন করিতে হইবে। কারণ সে ব্যক্তি যে অতি সাংঘাতিক লোক হইবে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক তোমরা বোধ হয় সকলেই "সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি" জান। এখানে দেখ আমার স্থানে কত উচ্চে—একেবারে সপ্তমে, বা সর্ব্বশেষে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহারা গ্রামোফোন ("কলের গান") আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বোধ হয় তোমরা কেহই অবিশ্বাস করিবে না। আর যদি অবিশ্বাস করই তবে ভবানীপুরের General Hospitalএর দক্ষিণ পশ্চিমাংশে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। সুতরাং সাবধান! সেই ধ্বনিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের কথা বলি শুন। তাঁহারা আমাকে মস্ত বড় certificate দিয়াছেন। ইঁহারা বলেন আমি (ন) অতি সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বপ্রকার ধ্বনি অপেক্ষা উচ্চ। পুরুষদিগের কর্কশ আওয়াজ গম্ভীর হইলেও স্থূল। সুতরাং রমণীগণের কণ্ঠেই আমি সাধারণতঃ বাস করি। সুতরাং বংশমর্য্যাদায় আমি কত উচ্চ তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। আর দেখ "এক, দুই, তিন,

চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, অনেক।" এ স্থানেও আমার আসন সর্ব্বশেষে। আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অথচ আমি সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। তোমরা এই স্থূল জড় জগতে ব্যস্ত, আমার মর্য্যাদা কি বুঝিবে? সূক্ষ্ম পরমাত্মা বা নিরাকার চৈতন্য স্বরূপকেও চিনিবে না। রমণীগণ কিন্তু আমাকে চিনেন। তাই তাঁহারা হাতের নোআর এত সমাদর করেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বা সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যার প্রতিই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ। তাই তাঁরা চির মিলনের সাধনভূত আমার সাহায্যে তাঁহাদের নাম রাখিয়াছেন—"নু ছেলে" বা "নু মেয়ে।" তবে তোমরা এটা অবধান করিবে যে আট আটটা ছেলে মেয়ের চেয়ে বেশী ছেলে মেয়ে সাধারণতঃ তাঁহাদের কামনার অতীত। তাই তাঁহাদের গণনায় আমি "চতুর্থ" বা "প্রিয়তম।"

তোমরা materialistic জড় জগতের লোক। সেখানে আমি কিরূপ কল্যাণের হেতু তাহা তোমাদিগকে তোমাদিগের চোখে হাত দিয়া না বুঝাইয়া দিলে ত তোমরা বুঝিবে না। মেপ্, ইংলণ্ড, লণ্ডন, ফ্রান্স, বার্লিন, নিউইয়র্ক, চীন, জাপান, টোকিও, পিকিন্ প্রভৃতি যে সকল স্থানে আমার কল্যাণ বর্ষিত হয়, হাজার দোষ থাকিলেও সেখানের লোকের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অভাবেই কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, ভারতবর্ষ তথা আফ্রিকার এত দুরদৃষ্ট। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সুমতি হউক—মিলন-সূচক আমার ভজনা করিতে শিখ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দয়া

(মালিক মোহাম্মদ জায়সী)

মহত্তেরে—দয়া, লাভের ব্যাপার অতি,
সাধারণে—প্রীতি জমকে,
নীচজনে—নাহি ঘোষে,
স্বাতী-বারিকণা ঝিনুকেতে হয় মোতি,
পদ্মের পাতে চমকে,
মৃত্তিকা টেনে শোষে।

শ্রীচণ্ডী চরণ মিত্র

প্রেমের প্রতীত্যসমুৎপাদ

সূর্য্য যে শক্তির প্রভাবে পৃথিবীকে স্বীয় পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না, পৃথিবী যে শক্তির প্রভাবে চন্দ্রকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে দেয় না, অণু যে শক্তির প্রভাবে পরমাণুকে টানিয়া রাখে তাহার নাম আকর্ষণ শক্তি। বস্তুতঃ যদি এই আকর্ষণ শক্তি সংসারে না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবী একটি বিশৃঙ্খল বস্তু (chaos) হইত এবং তাহার ফলে জগতের যাবতীয় জিনিষ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে তড়িৎতরঙ্গের যে বিষম সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহাও আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে। গ্রহ যদি উপগ্রহকে টানে, শরীর যদি শরীরকে টানে তাহা হইলে মনও মনকে না টানিবে কেন? মনের প্রতি মনের এই টানের নাম প্রেম এবং প্রেম আকর্ষণের রূপান্তর মাত্র।

মনের প্রতি মনের যে টান তাহাকে যদি আমরা প্রেম বলি, তাহা হইলে দেখা যায় তাহারও প্রকারভেদ আছে। যে আকর্ষণে মানব অজ্ঞাতসারে মহাপুরুষগণের নিকট আকৃষ্ট হয় তাহার নাম ভক্তি; দম্পতীর হৃদয়-নির্য্যাসভূত যে আকর্ষণ আনন্দ গ্রন্থিরূপে সন্তানকে বাঁধিয়া রাখে তাহার নাম স্নেহ। অনেক সময়ে প্রেম শব্দটীতে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ আরোপ করা হয়, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রেমকে শুধু দম্পতীর ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু বলিব না।

মানব মাত্রেই একটা সৌন্দর্য্যলালসা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভগবান অনন্ত সুন্দর বলিয়াই বোধ হয় মানবের এরূপ অদম্য এবং অপরিসীম সৌন্দর্য্য লালসা। মানব তাহার জীবনের যাহা কিছু ইচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তন করিতেছে অথবা প্রিয়জনকে যাহা কিছু উপদেশ দিতেছে তাহা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এবং মঙ্গল সৌন্দর্য্যের নামান্তর মাত্র। মহামতি গেটে এমন কি সৌন্দর্য্যকে মঙ্গলের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"The Beautiful is higher than the Good; the Beautiful includes in it the Good,"—অর্থাৎ সৌন্দর্য্য মঙ্গল অপেক্ষা উচ্চতর; সৌন্দর্য্যের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। বস্তুত পৃথিবীর আত্মা যদি সৌন্দর্য্য-ময় না হইত তাহা হইলে তাহা কিছুতেই ফুল, প্রজাপতি অথবা ইন্দ্রধনুর ন্যায় একটী জিনিষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না।

সুন্দর শব্দটীর নানারূপ ব্যাখ্যা ও প্রকার-ভেদ আছে। আমাদের দেশে প্রধানতঃ ইহা রূপ অর্থাৎ শরীরের বর্ণ বুঝায়। রূপ আকর্ষণের চিরন্তন সামগ্রী বলিয়া বোধ হয় না। ইহা প্রেম-মন্দিরের সিংহদ্বারস্বরূপ। যদি কেহ ইহাদ্বারা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায় তাহা হইলে ইহার আকর্ষণ শক্তি একেবারে থাকে না। ইহা নিজে একটি চিরন্তন মোহের কারণ নহে কিন্তু প্রেমের অঙ্গীভূত কারণ। ফলে দেখা যায় অধিকাংশ লোক এইরূপ দেহের বর্ণের সৌন্দর্য্যের জন্য

পাগল। আমাদের দেশে উপন্যাস নাটক প্রভৃতির নায়ক নায়িকাকে এই জন্য ছধে আলতায় মিশ্রিত দেহের বর্ণ আরোপ করা হয়। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের শরীরের বর্ণ বর্ণনা করিতে করিতে কখনই ক্লান্তিবোধ করেন নাই।

সৌন্দর্য্য অথবা আকর্ষণের দ্বিতীয় বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব। পুরুষের আকৃতি "ব্যূঢ়রস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" ইত্যাদি রূপ এবং স্ত্রীলোকের আকৃতি "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ" ইত্যাদি প্রকার কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে গ্রন্থকারগণ চক্ষু, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি লইয়া পদ্মপলাশ, বংশী, সর্প প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানব দুর্লভ বলিয়াই হউক অথবা শরীরের কোনও একটী বিশেষ অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গ নির্ব্বিশেষে প্রণয়ীর চিত্তাকর্ষক বলিয়াই হউক, দেখা যায় যে একটী বিশেষ অঙ্গ অথবা দুই তিনটির সমবায়ও আকর্ষণের সামগ্রী।

আকর্ষণের যতপ্রকার বস্তু আছে তাহার মধ্যে চক্ষুর আকৃতি ও ভাব প্রধানতম। আমরা জানি মুখই কথা বলে কিন্তু চক্ষুও কথা বলে। লজ্জা প্রথমতঃ চক্ষুতে উৎপন্ন হয় এবং লজ্জা হইতে প্রেমের সঞ্চার হয়। এই জন্য সেক্সপীয়র বলিয়াছেন —

Tell me where is fancy bred
It is engendered in the eyes,
By gazing fed.

প্রেমাকুল বধূর ভাবাকুল লোচনের ভাষা ও অভিব্যক্তি মানব মাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন। এরূপ ভাবময় চক্ষুর সম্মুখে অন্যান্য সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি কালো মেয়েকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কালো তা' সে যতই কালো হোক
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ।"

রূপ ও গঠন ব্যতীত সৌন্দর্য্যের আরও একটি বিষয় আছে তাহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন। বেকন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—"In beauty that of favour is more than that of colour, and that of decent and gracious motion more than that of favour." স্ত্রীলোকের ধীরমন্থর গতি একটি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ, এই জন্য কালিদাস লিখিয়াছেন, "শ্রোণীভারা-দলসগমনা" এবং বিদ্যাপতি "গতি গজরাজক ভানে।" যদিও একজন উদ্ভ্রান্তপ্রেমিক, প্রেমিকার প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে একটা মধুরত্ব দেখিতে পান, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে চলন চালনেও একটা মধুরত্ব থাকে।

ভগবান সৌন্দর্য্যময় বলিয়া লোকে সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভগবান গুণময় তাই গুণও আকর্ষণের একটি এবং একটি প্রধানতম বিষয়। রূপ নয়নের অভিরাম জিনিষ কিন্তু গুণে মন বিভোর থাকে।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

রবার্ট ব্রাউনিং ব্যারেট ব্রাউনিংএর চেহারা না দেখিয়া তাঁহার রচিত কবিতামাত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এরূপ ঘটনা অসাধারণ নহে। যদিও রূপ ও গুণ

উভয় বস্তুর দ্বারা প্রেম লাভ হয় তথাপি ইহাদের বাহ্য সম্বন্ধটা কতকটা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ন্যায়। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য নয় যে একাধারে রূপ ও গুণ পাওয়া যায় না, তবে সাধারণভাবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যিনি রূপোন্মাদ তাঁহার গুণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হওয়া বৃথা। পক্ষান্তরে যদি গুণ ও সৌন্দর্য্যের বিষয় না হইত তাহা হইলে বাহ্য-সৌন্দর্য্যরহিত গুণসম্পন্ন নরনারীগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া যাইত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে একটী বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে শেষোক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃই প্রথমটির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা বিপরীত জাতি অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ হইলে অবস্থা বিশেষে বিবাহ বন্ধন কৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রতিদান হইয়া দাঁড়ায়। রূপ ও গুণ ইহাদের মধ্যে কোনটি ভাল তাহা নির্ণয় করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে অথবা আমরা তাহার উত্তর দিতে পারিব না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে গুণ যদি বাঞ্ছনীয় হয়, রূপের মোহিনীশক্তি অধিক।

অনেক স্ত্রীলোক এবং কোনও কোনও জাতির সমস্ত স্ত্রীলোকই পুরুষের শারীরিক শক্তিতে মুগ্ধ হয় এবং না হওয়াও বিস্ময়ের বিষয়। শক্তি পুরুষের গৌরবের বস্তু এবং শক্তিহীন হইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। সার্কাসে একজন বীরপুরুষের কার্য্যকলাপ দেখিয়া শত শত দর্শকপুরুষও যদি মুগ্ধ হইতে পারে তবে ভাব-প্রবণ স্ত্রীলোক যে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে তাহা আর বিচিত্র কি? ওথেলো এবং ডেসডিমনার রূপমাত্র তুলনা করিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই কিরূপে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ওথেলোর অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা আরও অবাক্ হইয়া যাই কিরূপে ভালবাসার সঞ্চার না হয়। এমন কি ওথেলোর বিচারকর্ত্তাও বলিয়া উঠিলেন—Such a tale would win my daughter too. অর্থাৎ এরূপ একটি কাহিনী শুনিয়া আমার কন্যাও মুগ্ধ হইবে। বলহীন ব্যক্তি কিরূপে জয় লাভ করিবে?

অসামান্য শক্তিসম্পন্ন সরলতার আধার ওথেলো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অকপটভাবে বর্ণিত তাঁহার বিপদসঙ্কুল জীবনের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়া ডেসডিমনা আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ওথেলো পরিশেষে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার মধ্যে বিদগ্ধশুনিত রহস্যপূর্ণ মধুরালাপের একেবারে অভাব, কারণ তিনি একস্থলে বলিতেছেন,—

"Happy, for I am black
And have not those soft parts
of conversation
That chamberers have.....

একজন ইংরাজ গ্রন্থকার ইংরাজী উপন্যাসের ইতিহাস লিখিতে গিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন, "All the world loves a story as it does a love." আমরা এই বাক্যটীর উপমাটি পরিবর্ত্তন করিয়া একটি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। আমরা বলিতে চাই পৃথিবী গল্প ভালবাসে বলিয়াই প্রেমিককে ভালবাসে। বস্তুতঃ প্রিয়-জনের পরস্পর আলাপ এক প্রকার গল্প, যদিও দম্পতির আলাপের অধিকাংশস্থলে অর্থ খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। অতএব শুধু গল্প কেন, যে কোনও ভাব মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে তাহা পরিশেষে প্রণয়ের সহযোগী হইয়া উঠে, তাই কোল্‌রীজ বলিতেছেন—

"All thoughts, all passion, all delights
Whatever stirs this mortal frame
Are but ministers of Love
And feed his Sacred flame."

কোল্‌রিজ এইরূপে একটি কল্পিত গল্প বলিয়া তাঁহার প্রণয়িণীকে লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার সহিত আরও একটি জিনিষ মিশ্রিত ছিল তাহা সঙ্গীত। সঙ্গীত যে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিষ তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীতদ্বারা যদি ভগবানকে লাভ করা যায় তবে প্রেমিককে লাভ করা না যাইবে কেন? সেক্‌পীয়র তাঁহার একখানি গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছিলেন, "If music be the food of love, play on." সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তি এরূপ যে প্রেমিকের আকৃতি না দেখিয়া তাহার শুধু গান শুনিয়াই প্রাণ দিতে পারা যায়। গান না শুনিলে বোধ হয় অন্য কোন কারণে তাহার উপর ভালবাসা জন্মিত কি না সন্দেহ। শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা কিরূপ ব্যাকুল হইতেন এবং তাহার বংশীবাদককে দেখিবার বাসনা কিরূপ বলবতী হইত এই ভাবগ্রহণে যতগুলি বাঙ্গালা ও হিন্দীগান রচিত হইয়াছে শুধু সেই গুলির যদি সমষ্টি করা যায় তাহা হইলে বোধ করি মহাভারতের মত একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে। সাধারণের ইহা বিদিত, কাজেই আমরা বহুল দৃষ্টান্ত না দিয়া দুই একটি গানাংশ উদ্ধৃত করিব। "এখনও তারে চ'খে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি, মন প্রাণ যা' ছিল তা' দিয়ে ফেলেছি।" "যমুনা পুলিনে কালা বাঁশী বাজালে কেমনে গৃহেতে রব জ্বালা বাধালে;" "যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে;" "আকাশে পাতিয়া কাণ শুনেছি তোমার গান, তোমারে সঁপেছি প্রাণ" ইত্যাদি।

সঙ্গীত বলিলে যে কেবল গান বাদ্য ও নৃত্য বুঝায় তাহা নহে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতিতেও ইহা প্রকাশ পায়। সঙ্গীতের বিষয় ধ্যান করিতে করিতে আচার, ব্যবহার, চিন্তা, কর্ম্ম সমস্তই সঙ্গীতময় হইয়া উঠে। সঙ্গীতের গভীরত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের গভীরত্ব অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নয়। এই জন্য কারলাইল্ লিখিয়াছেন—

"Musical how much is in that! A Musical thought is spoken by a mind that has penetrated into the inmost heart of the thing; the inward harmony of coherence which is its Soul. The meaning of song goes deep. Who is there that in logical words, can express the effect music has on us? A kind of unfathomable speech which leads us to the edge of the Infinite and lets us for moments gaze into that"

সম্মোহনের এইরূপ প্রকারভেদ দেখিয়া য়ুরোপের কোনও কোনও জাতি এগুলি কৃত্রিম উপায়ে সাধনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বাল্যকাল হইতে লোকদিগকে

দর্পণের সম্মুখে কথা বলিতে অভ্যাস করান হয় কারণ তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইঙ্গিত-গুলি মধুর হইতেছে কিনা জানা যায়। স্ত্রী-গণকে চড়া সুরে কথা বলিতে ও গান গাহিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এরূপ কৃত্রিমতার মূল্য আমাদের দেশে যত কমই হউক, পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত অধিক। সেখানকার লোক-গণের মধ্যে প্রেম বিষয়ে এইরূপ কৃত্রিমতার প্রতিযোগিতা চলে এবং যিনি ইহাতে জয়ী হন তিনি প্রেমলাভ করিতে সমর্থ হন। এই কৃত্রিমতাগুলি ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে কতকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ ইহা বজায় থাকে ততক্ষণ অতি মধুর লাগে, কিন্তু ধরা পড়িলেই তাহা অতি হেয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সহিত ক্রমশঃ চাটুকারিতা এবং বৃথাড়ম্বরপ্রিয়তা আসিয়া যোগদান করে। পাশ্চাত্য দেশে কৃত্রিমতা ও বৃথাড়ম্বর সম্মোহনের প্রধান লক্ষণ কারণ তাহা না হইলে বায়রণ কখনও "women like moths are caught by glare এরূপ একটি বাক্য লিখিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক স্বাভা-বিক সৌন্দর্যের উপাসক, তাঁহারা যুবতীর ইঙ্গিতকৃত বঙ্কিম কটাক্ষ অপেক্ষা ঋজু দৃষ্টির অধিক আদর করেন। তাই আমরা ভট্টি কাব্য পড়িতে পড়িতে "আহার্য্যশোভারহি-তৈরলঙ্কারৈঃ" এরূপ একটী কথা পাই অথবা মেঘদূত কাব্য পড়িতে পড়িতে "স্বযায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূ লোচনৈঃ পীয়মানঃ" এরূপ একটি বাক্য পাই।

আমাদের দেশে কৃত্রিমতার দ্বারা একে-বারেই যে কোনও ফল হয় না একথা বলা যাইবে কি করিয়া? এরূপ ঘটনা প্রায়শঃ দেখা যায় যে একজন পুরুষ তাঁহার রূপসী স্ত্রীর স্বাভাবিক অব্যক্ত প্রেম ত্যাগ করিয়া কুৎসিত বারাঙ্গনার কৃত্রিম ব্যক্ত প্রেমে আকৃষ্ট হন। তাঁহার স্বভাব সুন্দরী স্ত্রীর অপরাধ এই যে সে ইচ্ছাকৃত "বচনক চাতুরী লহ লহ হাস" দ্বারা স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই।

আমরা প্রেমের নানাবিধ গৌণ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছি এবং কেহ বাধা না দিলে বয়স, অর্থ, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি বাধাটি নিদান নির্দ্দেশ করিয়া যাইব। কিন্তু ব্যাপারটি যত সহজ বোধ হইতেছে তত সহজ নহে। বিভিন্ন মানবের রুচি বিভিন্ন রকমের এবং একজন যাহাকে কুৎসিত বলিয়া প্রত্যা-খ্যান করে অপর একজনের চক্ষে সে পরম সুন্দর। আরও দেখা যায় একজন আর একজনকে যে কারণে কুৎসিত বলি-তেছে অপর একজন তাহাকে ঠিক সেই কারণে সুন্দর বলিতেছে। সৌন্দর্য্য প্রেমি-কের উপহার মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রেমের কোনও মুখ্য কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না অথবা যাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ের কারণ না জানিলে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন না তাহাদিগকে বলিতে হয় প্রেমই প্রেমের কারণ। আমি একজনকে ভালবাসি কিন্তু কেন ভালবাসি জানি না। সে কি রূপ? তাহার অপেক্ষা অধিক রূপসী আছে তাহাকে ভালবাসি না কেন? তবে কি গঠন? তাহাও নহে কারণ অষ্টা-বক্র মুনিও তাহার অপেক্ষা দেখিতে সুশ্রী।

তবে কি যৌবন ? তাহাও নহে, দৃষ্টান্ত মোহম্মদ, সেক্সপীয়র, জন্‌সন্। তবে বোধ হয় প্রেম। কিন্তু ইহা কি ? কোথা হইতে আসিল ? ভবভূতিও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, বর্ত্তমান লেখক কোন ছার। ভবভূতি বলিতেছেন,

ভূয়সা জীবেধর্ম্ম এবঃ যন্ত্ররমময়ী কস্যাচিৎ কচিৎ প্রীতিঃ, যত্র লৌকিকানামুপরক্তারাত্মৈত্রকং চক্ষুরাগ ইতি তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমানমামনন্তি।

অহেতুঃ পক্ষপাতো যত্তত্র নাস্তি প্রতিক্রিয়া। স হি স্নেহাত্মকস্তন্ত্র রক্ত মর্ম্মানি বীব্যতি।

আমরা প্রেমের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অবশেষে কোনও কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না দেখিয়া পাঠক পাঠিকা হাসিতে পারেন, কিন্তু ভগবান সে "অবাঙ্মনসগোচরম্" এরূপ সহজ কথাটি বুঝাইতে আমাদের মুনিঋষিগণ কত কাঠ খড় জুড়িয়াছিলেন সে কথাটি স্মরণ করিয়া তাঁহারা আমায় মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

অচিন্ তরুণী

তোমার বাড়ীর ধারে
আজকে মোদের পরিচয়
আঁখির অভিসারে।
পুলকভরা হরষ মনে
সরম মাখা নয়নকোণে
কইলে কথা আমার সনে
নীরব নদীর পারে।
ফুটল দূরে বেলা
গাছে গাছে ছুটল খবর
শেষ হল তার খেলা।
নীথর পানে তরুল বুক
ছড়িয়ে গেল গভীর সুখ ;
করলে মোরে বধির, মূক
ঘিরে আঁখির ঠেলা।

সীমা হারার মাঝে
ওপারে ওই, ঐরে বুঝি
তোমার বাঁশী বাজে।
পবন সনে ধীরে ধীরে
বেড়ায় শুধু আমায় ঘিরে
তরীর বগছে আসে ফিরে
মলিন মুখে লাজে।
ঐ ওগাছের পাতে
কাঁদন ধরে করুণ সুরে
আজকে গভীর রাতে।
ঠোঁটের কোণে মিলায় বাণী,
বুক থেকে যা মুখে আনি
তার-ই মাঝে পরাণ খানি
সঁপি তোমার হাতে।

শ্রীবন্দে আলী মিয়া

"ক্ষণিকা"

পূজার ছুটী, মেস্ বন্ধ হয় হয়। আমরা সকলেই আপন আপন বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। সে কি অপার আনন্দ! বাঙলায় বোধ হয় তেমন ভাষা সম্পদ নাই যাতে করে সে আনন্দের একটুও বুঝাতে পারি। সকলেই আপন আপন বিছানা পত্র বাঁধা বাঁধিতে ব্যস্ত। আমিও বইগুলি একটা পেটরার মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বিছানা গুলো বেঁধে নিচ্ছিলুম, এমন সময় আমার এক "মেস্ সহচর" এসে জিজ্ঞাসা করলে "সরোজ কিহে! কখন যাবে, ঠিক করলে?" "সাড়ে বারটা—আর তুমি" বলতেই সে আমার কাছায় এক টান মেরে গলায় জড়িয়ে অভিনব অভিনয় ভঙ্গিতে বলে উঠল,—"চাঁদ, তোমারই সাথে।"

ষ্টেশনে গিয়ে দেখি পূবের গাড়ীর তখনও দেরী আছে। সুজনাতে প্লাটফরমের উপর বেড়াতে লাগলুম। টিকিটের ঘন্টা পড়ল, আমরা দুখানা বর্দ্ধমান ষ্টেশনের টিকিট নিলুম। বর্দ্ধমানে নেমে আমাদেরে বাড়ী যেতে হয়। গাড়ী এল, একখানা 'থার্ডক্লাসের' গাড়ীতে উঠেই দেখলুম বেশ ফাকা। মোটা দু তিন জন যেহারী ভদ্রলোক রয়েছেন। একজন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপ্লোক কাহা যায়েগা?" "বর্দ্ধমান।" গোটা কতক ষ্টেশন পার হয়ে একটা ছোট খাট ষ্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীর দরজা খুললেন। সঙ্গে তার স্ত্রী ও একটী বার তের বছরের মেয়ে, পরিচয়ে বুঝলুম ভদ্রলোক নিজের দেশে যাবেন। এখানেই কোন এক অফিসে চাকরী করেন। পূজোর ছুটী উপলক্ষে বাড়ী চললেন।

তারা গাড়ীতে বসতে না বসতেই আমার মনের মাঝে কি এক ভাবনা এসে জুটল। মনটাকে জোর করে বাঁধতে লাগলুম কিন্তু মন যে মানে না। ভাবলুম, চোখ দুটো বুজে থাকি। কিন্তু চোখও ত ছাই বন্ধ হয় না। নিতান্ত কাঙালের মতই তার বুভুক্ষু দৃষ্টি সেই অনিন্দ্য সুন্দর অনূঢ়া বালিকার দিকেই ছুটে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, বালিকার পিতা কি আমার মনের কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন? মাথা নীচু হয়ে এল, বন্ধু একটা খবরের কাগজ পড়ছিল তার কাছ থেকে কাগজটা চেয়ে নিলুম। কিন্তু পড়া আর হল না। পড়বেই বা কে? মনের ভিতর তখন জগতের মস্ত পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। কাগজ বেঞ্চের উপর ফেলে দিয়ে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম হরিৎক্ষেত্রে শ্যাম শোভা আর মাঝে মাঝে চকিতের চোরা চাহনি। একবার দেখলাম বালিকা আমার পানে চেয়ে এক মনে কি ভাবছে, মনে হোল আমারই কথা বুঝি!—তা না হয় সলজ্জ দৃষ্টি কেন! আমি মস্ত এক ভাবনায় পড়ে গেলুম, সেখান হতে উঠে উপরে একটা বাঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আনমনা হয়ে কত কি ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছি।

একটা গোলমালে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখি বালিকা তার মার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে। ভদ্রলোকটী উড়ুনি দিয়ে মাথায় বাতাস কচ্ছেন। শুনলুম অধিক গরমের জন্য ওর "ফিট" হয়েছে। শুনে আমার মনটা কেঁদে উঠল আর বসে থাকতে পারলাম না। ওদের নিকটে গেলাম। ভদ্রলোকটী বল্লেন, "বাবা, বড় বিপদ। এখন জলই বা কোথা পাই অথবা গাড়ী ষ্টেশনে পৌছাতে এখনও অনেকটা দেরী।" তাই শুনে আমি বাক্সটা হতে একটা সোডার বোতল এনে ভদ্রলোকটীর হাতে দিলুম। ডাক্তার মানুষ কাজেই হাতে হাতেই সরঞ্জাম। পকেটে একটা "স্মেলিংসল্টের" শিশি ছিল সেটা দু একবার মেয়েটীর নাকের কাছে ধরলুম। পরে বালিকা চোখ মেলল। হঠাৎ আবার চোক দুটী বুজে ফেল্লে। বুঝতে পেরে আমি নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লুম। গাড়ী যত বর্দ্ধমানের নিকট হতে লাগল আমার মন তত নিরাশায় ছেয়ে আসতে লাগল। কিসের নিরাশা!— মনকে বুঝাই, কিন্তু কিছুতেই মন মানল না। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটী বল্লেন, "বাবা তুমি আজ আমার যে উপকার কর'লে তার কিছুই প্রতিদান দিতে পারলুম না।" বালিকা পিতার এই কথা গুলি শুনে জানাল যেন সে আমায় তার স্মৃতি টুকু দিয়ে গেল। ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা তুমি কোথায় যাবে?" বল্লুম বাঁকিপুর মেডিকেল কলেজে পড়ি, পূজায় ছুটীতে বাড়ী চল্লুম। বর্দ্ধমান থেকে আমাদের বাড়ী তিন মাইল। এরূপ কথা বার্ত্তা কইতে কইতে গাড়ী বর্দ্ধমান এসে পড়'ল। কত লোক উঠল, কত লোক নামল —তার আর ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা কিছুক্ষণ গাড়ীর ভিতর বসে রইলুম, পরে ভীড়টা একটু কমলে বন্ধু দরজাটা খুলে একটা কুলিকে ডাক দিল। কুলি এসে আমাদের মোট গুলো নামিয়ে নিল। কি করি! অগত্যা আমাকেও নামতে হল। গাড়ীর বাহিরে এসে যখন প্লাট ফরমের উপর দাঁড়ালাম, তখন আর পা উঠে না। কেবলই মনে হতে লাগল আমি এক মস্ত ভুল করে যাচ্ছি। যাবার সময় উপরো উপরি গাড়ী খানার ভিতর তাকিয়ে নিলুম। মনে হল কোথাকার এক বহুদিনের পরিচিতকে ফেলে চল্লুম। আমার বন্ধুটী আগে আগে আর আমি পিছনে। ভয় হ'ল বুঝি— বন্ধু আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে তাই তাড়াতাড়ি এ যায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছে। যখন আমরা ওভার ব্রীজের উপর এলুম তখন গাড়ী খান ছেড়ে গেল, মনে হল একবার ছুটে গিয়ে আমার সেই অচীনসাথীকে মনের বেদনার কথা শুনো একবার বলে আসি। উপর হতে সেই কামরাটার দিকে চেয়ে রইলুম। বালিকা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন বলে গেল আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমি সেই ভরসা টুকু নিয়ে বন্ধুর পিছনে পিছনে ষ্টেশনের বাইরে আসে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলুম। কিছু দূর গেলে বন্ধু গাড়ী হতে নেমে তার বাড়ী চলে গেল। আর আমি সেই নির্জ্জন গাড়ীটার ভিতরে বালিকার কথা ভাবতে লাগলুম। গাড়ী ঘ্যাম্ ঘ্যাম্ করে বাজারের মধ্য দিয়ে চল্‌ল। পরে গাড়ী আমাদের গাঁয়ের ভিতরে এসে পৌছিল। আমি তাকে ডান দিকের মোড় ধরে গাড়ী

হাকাতে বল্লুম। গাড়ী আমাদের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঘরে গেলুম।

এর ছবছর পরে আমি বাঁকিপুর মেডিক্যাল কলেজ হতে পাশ করে কল্‌কাতার শ্যাম বাজারে একখানা বড় বাড়ী ভাড়া করে "প্র্যাকটিস্" করতে লাগলুম। সে আজ ছবছরের কথা তবু তার কথা আমি ভুলতে পারি নি। কয়েক মাস কেটে গেল। কল্‌-কাতার বাজারে আমার পশার একটু একটু ছড়িয়ে পড়ল। এখন রোজ চার পাঁচটা "কল" আছেই আছে। একদিন সন্ধ্যার আগে দাওয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি। বার হতে একজন লোক "ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন" বলে ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে তাড়াতাড়ি পোষাকটা নিয়ে বেরিয়ে এলুম। লোকটা বল্লে, "ডাক্তার বাবু এখনি আপনার গ্রেষ্টীট যেতে হবে।" আমি তাড়াতাড়ি চাকরটাকে গাড়ী ঠিক করতে বললুম। তারপর আমরা গ্রেষ্টীটের দিকে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলুম। লোকটা একটা দোতালা বাড়ীর পাশে গাড়ী দাঁড় করাতে বল্লে। চাকরটাকে গাড়ীর কাছে রেখে উপরে গেলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। দেখি—রোগী আর কেও নয়—আমার বহুদিনের পরিচিত। অবস্থা দেখে প্রাণ উড়ে গেল। বোধ হয় দুই এক ঘণ্টার মধ্যেসর্ব শেষ হয়ে যাবে।

মনের মাঝে তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিদানের ব্যাকুল সন্ধান আরম্ভ হ'ল! ব্যর্থ। সব ব্যর্থ! চাকরটা ঘরের এককোণে একটা ষ্টোভে জল গরম করছিল। ষ্টোভের শব্দটা আমার কাণে তখন বড় বেসুরা মনে হচ্ছিল, বল্লাম নিবিয়ে দাও দরকার নেই। ষ্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যার আঁধার ঘরে প্রদীপ তখনও মিট্ মিট্ করে জলছে। বাইরে ট্রামের ঠন্ ঠন্ শব্দ কাণে আসছিল। জানালার পথে দেখা যাচ্ছিল দূরের একটা দোতালা বাড়ীর খোলা জানা-লায়একটি মেয়ে অর্গ্যান্ নিয়ে বসে। আমার সেই একটা দিনের কণিকের স্মৃতি বার-বার ভেসে আসছিল। শরতের আগ-মনীর আনন্দ—বাকীপুরের ট্রেণে দুইটি কাল চোখের চাহনী—আর পরক্ষণেই বিজয়ার কলরোল। বাইরের বাতাস হু হু করে ঢুকে পড়ল।

মেয়েটীর মুখপানে চেয়ে দেখলুম সব শেষ। বালিকার বৃদ্ধ পিতা হয়ত তখন ডাক্তারের "ভিজিটের" মুদ্রার সন্ধানে অন্তঘরে মহাব্যস্ত। এদিকে সব শেষ। তখন পর্য্যন্ত আমি ভিন্ন কেও কিছু জানে না। "আমার অচীন সাথী"—আঃ দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণের ব্যথা ঢেকে রাখলুম। বুকের শব্দ নায়েগ্রার জলপ্রপাতের মতই আমার কাণে এসে বাজছিল।

আবার হু হু করে বাতাস এল কোথাকার কোন্ অনন্ত বিরহীর আকুল কান্না নিয়ে। ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে চাকরটাকে বল্লুম বেরিয়ে যাও। পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এলাম, গৃহস্বামী হাতটা ধরে জিজ্ঞাসা করেন কেমন দেখলেন? বল্লুম-বেশ। আসুন আমার সাথে। বাইরে গাড়ী দাড়িয়ে ছিল "ভিজিটের"-টাকা দিতে এলেন যেমন নিয়ে পাঁকি, হাতে করে সেই 'মৃত্যুদান' নিলুম।

জলন্ত অঙ্গারের মতন সেই টাকা কয়টা হাতের মুঠিতে সজোরে চেপে রেখে গাড়ী ছাড়তে বল্লুম।

কিছুদূরে রাস্তার ধারে একটা ভিক্ষুক আঁচল পেতে বসেছিল। গাড়ী থামতে বলে সেই জলন্ত অঙ্গার তারই আঁচলে নামিয়ে দিলুম। গাড়োয়ানকে বল্লুম—"গাড়ী নিয়ে যা, আমি হেঁটেই যাব।"

সব চলে গেল। সে কোলাহলময়ী নগরীর ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আমার মনে হতে লাগল একে একে সব নিভে যাচ্ছে—নিস্তব্ধ! আঃ! আকাশে যে কি বিরাট রক্ত পাথার! আগুন! আগুন! চারিদিকে সারি সারি চিতা সাজান আর সেই চিতার উপর জীবনের সর্ব্বস্ব দুটি কাল চোখের করুণ চাহনী। পাশের বাড়ীর উপর থেকে একটী বালিকার কণ্ঠ শুনলুম—

'কোলাহল ত থামল হ'ল
এবার কথা কানে কানে'।

আঃ! অনমনে কতদূর চলে এসেছি। জানতে পারিনি সুমুখে কাশী মিত্রের শ্মশান-ঘাট। চিতার আলো গঙ্গার জলে চিক্ চিক্ করে পড়ছে। দূরে মাঝিদের একটা নৌকা চলছে। আকাশে চাঁদের আলো।

বড় গাছটার নীচে এসে শুনতে লাগলুম দূরে এক মাঝি তার নৌকা থেকে গাচ্ছিল—

'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ঊর্ণনাভ

হৃদয়-ঊর্ণনাভ!
নিতি জাল বুনে তোর কি হয় লাভ?
আশার সতেজ শাখে
জড়াস্ হাজার পাকে,
তুই মন-রেশমে দিস্ কি ভাব?
মোহন ইন্দ্রজাল!
দেখি তোর বোনা' এই নিখুঁত জাল
কেন্দ্র ধরি' চিতে
ওরে কালের পরিধিতে
কোন্ স্বপ্নলোকের এ কিংখাব!

শ্রীচণ্ডী চরণ মিত্র

ইন্দ্রধনু

(ইংরাজী হইতে)

বিজয় তোরণ ! কবে লক্ষিত
ঝঞ্ঝা পলায় দিগ্‌বিদিকে - -
জাগো তুমি নহে ; কি যে তুমি তা'ত
শুধাব না রূঢ় বৈজ্ঞানিকে ।
আজো তোমা জানি বাল্যেরি মত,
স্বর্গে মর্ত্যে রঙিন সেতু
ধরণীর পরে দেবতাগণের
রুচিত্ব গমনাগমন হেতু ।
তোমার মাঝারে মণি-রত্নের
স্বপন হেরি যে উন্মাদনা
জগতের শত ছগ্ বিজ্ঞানে
দিতে পারে তার একটী কণা ?
দৃষ্টিমোহন স্বপ্নমায়ারে
সৃষ্টির মুখ হইতে টানি
বিজ্ঞ বিরস বৈজ্ঞানিকেরা
কি যে সুখ লভে নাহি গো জানি ।
ওগো প্রেমধনু, নহে উপকথা
এ যে বিধাতার পরম বাণী
আছে শুধু তাঁর মহিমার বেদে
কেমনে লভিলে ও তনু খানি ।
প্রথম যেদিন উদিলে গগনে,
বিধাতার স্নেহ উত্তরীয় !
কেমনে মোদের বীরপুরুষেরা
বরিল তোমায় বল না প্রিয় ?
যখন প্রথম পীত জ্যোতি তব
পড়িল বিজন গিরির পরে
আশিস লভিতে জননীরা বুঝি
শিশুগুলি হাতে তুলিল ধরে ।
কুসুমের ধূপ ধরণী যোগায়
আগমনী গায় ডাহুক চয়া
তোমার মহিমা গ্রামে মাঠে গায়
জয়গান শিখী, তোমার সুখা ।
তব মহিমায় রাজে রমণীয়
গিরি, মরু, তরু, তটিনী সরি,
রতন মাণিক রচে অম্বুধি
তোমায় বিশ্ব বক্ষে লভি ।
হয়েছে পুরান সকলি নিখিলে,
তেমনিটি আছ হে চিরনব,
প্রথম যেরূপে যৌবন রাগে
জাগিলে উজলি উষর ভব ।
একই রূপ তুমি ধরো যুগে যুগে
বিভুর সোহাগে আত্মহারা,
প্রথম মানব হর্ষ যে দিল
পুরাণো কি হয় তাহার ধারা ?

শ্রীকালিদাস রায়

বাংলা সাহিত্যে অনুদারতা

একজন জার্ম্মান সাহিত্যিক বলিয়া গিয়াছেন, "It is literature which can command the whole Nation" অর্থাৎ সাহিত্যই সমস্ত জাতিকে শাসন করিতে পারে। আমাদের আচার ব্যবহার বা সংস্কারের যা পরিবর্ত্তন হইয়াছে সবই একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া। আমাদের অন্যায় আচরণ বা কুসংস্কার আছে তাও ত্যাগ করিয়া থাকি তখন যখন দেশের লেখকগণ গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া নানা ভাবে তার সমালোচনা করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই। অনেকে বলেন "লা মিজারেবল্" যদি প্রকাশিত না হইত তবে হয়ত ফ্রান্সে এত বড় বিপ্লব আসিয়া দেখা দিত না। ইউরোপের লোক যখন অসভ্য ও কুসংস্কারাপন্ন ছিল তখন তাহারা ক্রীতদাসের উপর কে কিরূপ অত্যাচার করিত তা Uncle Tom's cabin পড়লেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থই হতভাগ্য ক্রীতদাসদের দুরবস্থা দূর করিয়া দিয়াছে। আমাদের এদেশেও তাই। সাদামুখো নীলকর প্রভুদের দল যখন নিরীহ ও দরিদ্র কৃষকদিগকে অমানুষিক ভাবে অত্যাচার করিতেছিল তখন দীনবন্ধু মিত্র তাহার "নীলদর্পণ" প্রকাশ করেন। উক্ত নাটিকা রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলে পর দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। তার ফলে নীলকরদের অত্যাচারও অনেকটা কমিয়া যায়। কারো কারো মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বঙ্কিম বাবুর "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার কতক গুলি ছেলে বোমার সৃষ্টি করে। সামাজিক ও নৈতিক বিষয়েও তাই। আমি সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা-সাহিত্য নিয়া তোলপাড় করিতে চাহি না। এই বাংলা সাহিত্য বিষয়ে দুই একটা কথা বলিব। বাহিরে বাংলা সাহিত্যের একটু নাম হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশকে চালিত করার প্রধান অন্তরায় আমাদের বিভিন্ন জাতীয়তা অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান। কোন বিদেশী হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আজ তোমাদের সাহিত্যের এত নাম শুনছি কিন্তু হিন্দু মুসলমানে এত কাটাকাটী মারামারী কেন এই আচার ব্যবহার নিয়া?" এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। কেন যে সাধ্যাতীত তাও বলছি। পুরাকালে বাংলা ভাষাকে একটা ভাষা বলিয়াই কেহ মনে করিতেন না। ক্রমে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের কৃপায় বাংলা সাহিত্যের আদর বাড়িয়া যায়। ক্রমে হিন্দুদের মধ্যে দুই চার জন ভাল লোকে দাঁড়াইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও বাংলার মুসলমান সমাজ উর্দ্দুর মোহে মোহিত। আর তখন কেন, এখনও মুসলমান্ যাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে নিজ মাতৃ-ভাষাকে তুচ্ছ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিতেছে। এমন অনেক বাঙ্গালী মুসলমান আছেন যাঁদের বিশ্বাস

উর্দুতে কথা না বলিলে আর ভদ্রতা থাকে না। অধিকে হিন্দুরা বাংলা সাহিত্যের উপর একচেটে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাদের না ইহা তাই লিখিয়া যাইতেছে। কোন কোন লেখক মুসলমানদের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অতিতীর লেখক ছিলেন বটে কিন্তু তাহার হৃদয়েও সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা ছিল। মুসলমান যুবতী হিন্দুযুবকের জন্য পাগল হইয়া যায় এবং হিন্দু যুবক সেই পাগলিনীর প্রেমকে শিবের ন্যায় অচল অটল থাকিয়া প্রত্যাখ্যান করে ইহা তাঁহার যেন মজ্জাগত বিশ্বাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষের চরিত্র অতি সুন্দর করিয়াছেন এবং মুসলমান বিশেষতঃ মুসলমান স্ত্রীলোকের চরিত্র এত বিশ্রী করিয়াছেন যে কোন মুসলমানই তা স্বীকার করিয়া লইতে চাহিবে না। হিন্দুর কাছে আয়েসার চরিত্র ভাল হইতে পারে কিন্তু মুসলমানের কাছে তত ভাল হইতে পারে না। অন্য সমাজ বা জাতির যুবকদের ন্যায় নিজের সমাজ বা জাতিতে যে পর্য্যন্ত বীরযুবক দেখা যাইবে ততদিন কোন রমনীই বিধর্ম্মীকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। জগৎসিংহ যেমনি বীর ওসমানও ঠিক তাই। ওসমান প্রাণ দিয়া আয়াসাকে ভাল বাসিল কিন্তু তার ভালবাসাকে অবহেলা করিয়া আয়েসা জগৎ সিংহের জন্য পাগল হইয়া গেল।

কবির কল্পনায় জগতে নারী প্রেমের জন্য এত অপমান সহ্য করিতে পারে কিন্তু বাস্তব জগতে তা হয় না বা হইতে পারে না। যাক সাহিত্যে আর কিছু হউক আর নাই হউক হিন্দু মুসলমানে বেশ বিরোধ বাধান যায়।

এদিকে শৈলবালা ঘোষজিয়ার "লেখ আম্মু" যখন বাংলা সাহিত্যিক মহলে আসিয়া দেখা দিল তখন হিন্দু লেখকদের মধ্যে এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হিংসায় তাদের বুক দুই খান হইয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বনাশের কথা। হিন্দুমেয়ে ভালবাসিল কিনা একটা মুসলমান গাড়োয়ানকে। শুধু কি তাই, সেই গাড়োয়ান যুবতীর ভালবাসাকে একটুও সম্মান করিল না। একি সহ্য হয়! "লেখ আম্মু"র প্রকাশে অনেক হিন্দু সাহিত্যিক তেলে বেগুনে লাল হইয়া বেচারী ঘোষ-জায়াকে কাগজে কলমে গাল দিতে লাগিলেন। বাপুহে এই "লেখ আম্মু" যদি তোমাদের কাঁটা পায়ে সুনের ছিটার মত লাগে তবে আর আয়েসার চরিত্র মুসলমানের কাছে তেমনটি হইবে না কেন?

যাক্ অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানের কথা বলি। আজকাল হাটে মাঠে লেখক আসিয়া দেখা দিয়াছেন। অর্থাৎ তাদের অনেকেই বটতলার লেখক। সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও "মুখ রক্ষার" লেখক অজ্ঞাত শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে আমি সেই দলের লোক মনে করি। সুরেন বাবুর "মিলন মন্দির" আর শরৎ বাবুর "মুখ রক্ষা" আমি বটতলার উপন্যাস মনে করি। সে দিন "বিপথা" বলিয়া একখানা উপন্যাস দেখিলাম। এই বইখানি সম্বন্ধে প্রবাসী বলেন, "মানুষ টাকা খরচ করিয়া কেন যে এসব বই ছাপে।" সুরেন বাবু মিলন মন্দিরে একটী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা মহিলার চরিত্র এমনি করিয়া সৃষ্টি

করিয়াছেন যে তা দেখিলে মনে হয় সুরেন বাবু কোন দিন কোন শিক্ষিত সমাজে বা শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে মিশেন নি। তা না হইলে মানুষের চিন্তা প্রবৃত্তি এত হীন হইতে পারে না। "মুখ-রক্ষার" শরৎ বাবু একটী ব্রাহ্ম পরিবারের যে আদর্শ দিয়াছেন তা কোন শিক্ষিত লোকই স্বীকার করিয়া লইবে না। ব্রাহ্ম পরিবার যে কি রকম তা বোধ হয় শরৎ বাবু কোন দিন স্বপ্নেও দেখেন নি। অথচ ব্রাহ্মদের একটু আঘাত দেওয়া চাই। আমাদের আসল শরৎ বাবু অর্থাৎ তিনি বিরাজ-বৌ শ্রীকান্ত, দত্তা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনিও "গৃহদাহে" অচলার চরিত্রের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মদের অনর্থক গালাগালি দিয়াছেন।--শরৎ বাবুর "পল্লীসমাজ," "বিরাজ বৌ" যেমনই উদারতাপূর্ণ "গৃহদাহ" ঠিক তার বিপরীত। তিনি ব্রাহ্মদের যেমন গাল দিয়া থাকেন, হিন্দুদেরও ক্ষমা করেন না।--অর্থাৎ তিনি একচোখো লেখক নন।

আমার মনে হয় এসব ঝগড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় সাহিত্যের ভিতর দিয়া উদার ভাব বিস্তার করা। কোন সমাজকে অনর্থক মিথ্যা গাল না দিয়া কি উপন্যাস লেখা যায় না। তুমি হিন্দু তোমার পক্ষে ব্রাহ্ম ও মুসলমান সমাজের সমালোচনা করার অধিকার নাই। কারণ একটী সমাজের সঙ্গে ভাল করিয়া না মিশিলে ঠিক মত বিচার করা যায় না। প্রত্যেক সমাজের লোকই নিজ সমাজের কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা বেশ বুঝিয়াই কাজ করে।

সফিয়া খাতুন বি, এ,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

(মৌলানা আক্‌বর)।

পশ্চিম ছুটে, জড়বাদই লক্ষ্য
পূর্ব্ব সে খুঁতেছে আত্মার মোক্ষ
'আমিই বানর'—বাণী ডারউইন্ লব্ধ
'আনল্ হক্' বলি' মনসূর স্তব্ধ

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

বঙ্গে আফগান পরিবার

ভিন্ন ভিন্ন পরিবার লইয়া এক একটী জাতি গঠিত হয়। যে জাতির ইতিহাস বর্ত্তমান, সে জাতি জীবিত; ইতিহাসবিহীন জাতি চিরমৃত। এজন্য ইতিহাস অভাবে কত শত প্রাচীন জাতির নাম যে মানুষের স্মৃতি-ক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কত জাতি যে বিস্মৃতির আঁধারে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস জাতীয় অস্তিত্ব ও গৌরবের সাক্ষী; জাতীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ, পারিবারিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ইতিহাস তদ্রূপ মুখ্য প্রমাণ। যে পরিবারের ইতিহাস নাই সে পরিবার কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। আজ হউক, কাল হউক একদিন সে পরিবার চির বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইবে। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ নিজ বাহুবলে, কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকৌশলে, কেহ বা অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণে স্বল্প সময়-জগতে যশো-ডঙ্কা বাজাইয়া থাকেন। অতীব দুঃখের বিষয় তাঁহাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত খুঁজিতে গিয়া আমাদিগকে বড়ই নিরাশ হইতে হয়, কারণ লৌকিক জীবনী লিখিতে বা পড়িতে মানুষ সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত কিন্তু পারিবারিক ইতিহাস লিখিতে বা পড়িতে তাহারা তত মনোযোগী নয়। ইহাতে স্পষ্ট মনে হয়, আমরা যেন পরিবারোদ্যানের দুই একটী ফুলের ঘ্রাণ, ফলের রসাস্বাদন ভিন্ন উহার প্রকৃতি-ক্ষেত্র বাগানের মূল তত্ত্ব জানিতে যত্ন করি না; কাজেই কল ফুলের মরসুম ফুরাইলে, সে অনাদৃত বাগান অচিরে আমাদের স্মৃতি-চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এমন কি আমাদিগকে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়। এজন্য পারিবারিক ইতিহাস পৃথিবীতে এত বিরল। বলা বাহুল্য পরিবারোদ্যানের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে, আমাদিগকে উহার ইতিহাস সংরক্ষণে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইতে হইবে।

এই পারিবারিক স্মৃতি রক্ষণে মানুষের কর্ত্তব্য কত গুরুতর! পারিবারিক স্মৃতি রক্ষিত না হইলে জাতীয় ইতিহাস থাকিতে পারে না। এই পারিবারিক ইতিহাস রক্ষার্থে ইংলণ্ড ও জর্ম্মানী প্রভৃতি স্বাধীন দেশে আবহমান কাল হইতে বংশাবলী সংরক্ষণী কার্য্যালয় (Heralds' offices) বর্ত্তমান রহিয়াছে; এশিয়াখণ্ডে আরবগণ তাঁহাদের বার্ষিক মেলাতে স্ব স্ব বংশ-গাথা গাহিয়া পারিবারিক স্মৃতি রক্ষা করেন এবং আফগানিস্থানের পাঠানগণ স্ব স্ব বংশের পুরা কাহিনীর আবৃত্তি করিতে এতই আনন্দ ও গৌরব বোধ করে এবং তদুপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বংশধরগণের মধ্যে এতই প্রতিযোগীতা হয় যে, তজ্জন্য তাহারা অসি সঞ্চালন ও রক্তপাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ তাহারা নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে,—যে বংশের রক্ত তাহাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হয়, সে বংশের প্রাচীন কাহিনী

কীর্ত্তন করিতে তাহারা আনন্দে গদগদ হয়; সে বংশের গৌরব রক্ষণে রক্তদান করিতে তাহারা ক্ষণমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। এত দূরের কথাই বা বলি কেন, ভারতে ভাটের উদ্দীপনাময় কাওলাতে রাজপুতনার প্রত্যেক পরিবারের প্রাচীন কাহিনী গীত হইত বলিয়াই রাজপুতনার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কর্ণেল টড বলিতে সমর্থ হইয়াছেন, "রাজপুতনার প্রতি গৃহ এক একটী দুর্গ বিশেষ, প্রত্যেক পরিবার একটী সেনাদল"। ইউরোপীয়গণ, আরব এবং আফগানগণ তাহাদের পারিবারিক পুরাতত্ত্ব রক্ষণে অতীব যত্নশীল বলিয়াই তাহারা যুগে যুগে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহারা আজও পৃথিবীতে জীবন্ত জাতি বলিয়া গৌরবান্বিত, আর পারিবারিক ইতিহাস রক্ষণে উদাসীন বলিয়া আমরা ভারতবাসী সর্ব্বত্র অনাদৃত ও মৃত। মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে,—যে পরিবারের বংশধর বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে, তৎপ্রতি তাহার যে গুরুতর কর্ত্তব্য সে পরিবারকে জীবিত রাখিতে তাহার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, মানুষ যদি তাহার সেই কর্ত্তব্যের বিন্দুমাত্র সম্পাদন, সে দায়িত্বের কণা মাত্রও পরিশোধ করিত, তবে তাহার সে গৌরবের পরিবার কখনই এরূপে লোক-স্মৃতির বহির্ভূত হইতে পারিত না। পাঠক-পাঠিকে! আমি আজ সেই গুরুতর কর্ত্তব্যের, সেই বিষম দায়িত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া এই "পাঠান পরিবার" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; জানি না, সে পরিবারের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে কতদূর সক্ষম হইব। এই "পাঠান পরিবার" দেখাইবে,—কিরূপে দেশ হইতে দেশান্তরে, মানব জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিরূপে ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতির মধ্যে শত সহস্র মাইল দূরে স্থানান্তরিত হইলেও মানুষ জাতীয় ভাব, জাতীয় ব্যবহার, পারিবারিক রীতিনীতি এবং সর্ব্বোপরি বংশানুক্রমিক গুণাবলী রক্ষা করে; এই "পাঠান পরিবার" আর ও বুঝাইবে মানুষ "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" নীতির অনুবর্ত্তী হইলেও কেন যে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় এক বংশাবলম্বীগণের ধমনীতে একবিধ রক্তপ্রবাহ যুগ যুগান্ত-কাল ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয়, তাহারা একভাবে অনুপ্রাণিত হয়, বিপদ আপদে একতার রক্ষাকবচ ধারণ করে। একই উদ্যানে যেমন গোলাপ, চামেলী, বেলী এবং আম-জামের সঙ্গে সঙ্গে শৈফালী, মাকাল ও কদম বিরাজ করে, বাঁশের ঝাড়ে যেমন "খড়্গের বাঁশ, সাজীর শলা, চালের কয়, ও বীরের লাঠি" জন্মে, এই "পাঠান পরিবারে" ও তদ্রূপ ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের একাধারে সমাবেশ দেখাইবে।

পুরাতত্ত্ব

পৃথিবীর জাতি-বিভাগ-তত্ত্ব পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, এশিয়া ভূভাগের আরব, পারস্য ও আফগানিস্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য জাতির আবাস-ভূমি ছিল। আফগানিস্থানে স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্য জাতীয় ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বিগণ বাস করিতেন। কালক্রমে যখন ইউরোপে পবিত্রাত্মা হজরত ইছা (তাঁহার আত্মায় শান্তি হউক) পয়গম্বরের সত্য সনাতন ধর্ম্ম নরপূজায় পরিণত হয়। আরবে হজরত

ইব্রাহিমের সময়ে স্থাপিত ধর্ম্মমন্দির পবিত্র কাবাগৃহে, ভূতপ্রেতের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, যখন পারসিকগণ একেশ্বরের নাম ভুলিয়া অগ্নি-পূজা আরম্ভ করে, যখন প্রাচীন মিশর দেশে নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা বৃক্ষ ও প্রস্তর পূজাতে পরিণত হয়, যখন ভারতবর্ষে বেদ ও উপনিষদে পরিকীর্ত্তিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরের উপাসনা ভুলিয়া নরনারী পৌত্তলিকতার কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হয়, তখন দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতা যে নব বিধান প্রচার করেন—এস্‌লামের যে বিমল আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত করেন, তখন পুনরায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ধ্বনিত চরাচর প্রতিধ্বনিত হয়, সেই নব বিধান নব স্বর্গীয় আলোকে আফগান ভূমি উদ্ভাসিত হইলে আফগানিস্থানের তাৎকালিক অধিবাসী আর্য্য জাতীয় ইহুদীগণ এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই নব বিধান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ কিরূপে ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করে, তদুপলক্ষে তাহারা কিরূপ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিরূপে পৃথিবীর তৎকাল-পরিচিত দেশের নরনারী এস্‌লামের বিমল বিভায় বিভাসিত হয়, কিরূপে পূর্ব্বে চীন, পশ্চিমে স্পেইন পর্য্যন্ত ভূভাগে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়,—তৎবিবরণ জগতের ইতিহাস চিরকাল ঘোষণা করিবে। বলা বাহুল্য এসলামের এই উন্নতির যুগে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য সংস্থাপিত ও বিস্তৃত হয় এবং আফগান পাঠানগণ পাঁচ শত বৎসর ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালন করেন; বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড হইতে ইংরেজগণ যেরূপ নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিতেছেন তৎকালে আফগানিস্থান হইতে পাঠানগণ কেহ শাসনকার্য্য পরিচালনা, কেহ ব্যবসায় বাণিজ্য, কেহ ধর্ম্ম প্রচার ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে এদেশে আগমন করিতেন। তৎকালে রেল পথের অভাবে এবং স্বদেশে প্রত্যাগমনের সুবিধা না থাকায় তাঁহাদের অধিকাংশ স্বপরিবারে এদেশে আসিতেন এবং অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা এদেশে স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেন এবং এদেশীয় প্রতিবাসীগণের সঙ্গে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইতেন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা এদেশকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন এবং এদেশীয়গণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরম সুখে কাল কাটাইতেন, সুজলা সুফলা স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতে এইরূপে কিছু কাল কাটাইলে তাঁহারা এদেশকেই স্বদেশ মনে করিতেন। ভারতবর্ষের সম্পদে তাঁহারা সুখী হইতেন, বিপদে আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিতেন। এইরূপে ভারতের মঙ্গলের সহিত রক্তমাংসে জড়িত হইয়া এদেশকে চির আবাসভূমি মনে করিতেন। ভারতে পাঠান উপনিবেশের চিত্র জনৈক আফগান কবি এইরূপ আঁকিয়াছেন ;—

চিরসুন্দর ওগো ভারত-কানন !
কি আর তোমায় বলিব এবে।
অনেক সময় আছি গো হেথায়,
তব প্রিয়তম অতিথি ভাবে ॥
অজ্ঞান তিমিরে যদিও জড়িত,
আমরা আজি গো, ভারতভূমি !
তবু প্রাণে জাগে যে অসীম দয়া,
কতই আদর করেছ তুমি।
পরেরে আদর করিলে গো তুমি,
আপন হইতে অধিক করি।

ছিলাম প্রবাসী, স্বদেশী করিলে,
সতত অশেষ অভাব হরি
ভারত উদ্যানে যে সুখ-কুসুম
ফুটিত ; তাহার সৌরভে মজি।
ছাড়িনু দামেস্ক, ছাড়িনু ইস্পাহানী,
ছাড়িনু গজনীর সুষমারাজি॥
ভুলিনু জৈহুন, বঙ্গলা ভুলিনু,
অবাধে ভুলিনু ফেরাতকূল।
যেই গঙ্গা জলে জুড়িল রসনা,
হইল মোদের বিষম ভুল।
ভারত! তোমায় কি যে আকর্ষণে
ঘটিল মোদের বিচ্ছেদ হেন।
সকলি ভুলিনু, ভুলিনু ইরাণ
জোবেদা স্বরণা স্বপনে যেন॥
তব ইক্ষুরস কিসে মধুময়,
মজাইলে প্রাণ তাহাতে হেন,
আঙ্গুরের গোছা রসাই আনার
ক্ষণতরে সব ভুলিনু যেন।
ভারত কাননে ফুটে যে কুসুম,
কতই চম্পক কেতকী বেলী
তার ঘ্রাণে মেতে মার্ভের যেমন
সেরাজী গোলাব গেলাম ভুলি॥
নেহারি তোমার পর্ব্বত শিখর,
শুনি সুমধুর তটিনী-স্বন।
গেলাম-ভুলিয়া রোকনা স্বরণা,
স্বরূপের শোভা প্রাণমোহন॥
অতিথি সেবিতে তোমার কাননে,
রাখিলে গো তুমি বিবিধ ফল।
তব আবাহনে আসিনু ভুলিয়া,
ইরাণী, তুরাণী, আফ্‌গান দল।
হৃদয় ফলকে আছে গো অঙ্কিত,
তোমার আদর কৃতজ্ঞতাখনি।
ভারত! তোমায় ভুলিব না কভু,
স্মরিব দিবা রজনী।

ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে আফগানগণ বনি এসরাইল বংশসম্ভূত। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাঠানগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করেন। তাঁহারা সামাজিকতা ও আদান প্রদান কার্য্যাদি যথাসাধ্য স্ব স্ব শ্রেণীতে আবদ্ধ রাখেন; প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠানগণ স্ব স্ব বংশের কৌলিন্যের অভিমানে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত থাকেন। স্ববংশের বংশগত অবমাননার কথা শুনিলে তরবারি বিনিময় করিতে কুণ্ঠিত হন না। বঙ্গবাসী পাঠান পরিবার ইউছফজায়ী শ্রেণীভুক্ত; আফগানিস্থানের যে অংশে ইউছফজায়ী পাঠানগণ বাস করে তাহা পেশওয়ারের সমতল ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত; ইহা অতি বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য ভূভাগ; একদিকে ভারতভূমির উৎপাদিকা শক্তি, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই ভূভাগ যেমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, তেমনই নাতিশীতোষ্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় ও স্বাস্থ্যকর। এই মনোরম বিস্তীর্ণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে সোলেমান পর্ব্বত, দক্ষিণে খায়বার গিরিশ্রেণী, সোলেমান পর্ব্বত হইতে পূর্ব্ব সীমান্বিত সিন্ধু নদের তীর স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমগ্র আফগানিস্থানের প্রায় এক অষ্টমাংশ এবং ইহার উত্তরাংশের অধিবাসীদের মধ্যে ইউছফজায়ীগণই প্রভুত ক্ষমতাশালী আদর্শ পাঠান জাতি। পেশোয়ারের সমতলখণ্ডের উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া বরফাচ্ছন্ন হিন্দুকুশ পর্ব্বতের

পাদদেশস্থিত ৩০ কিংবা ৪০ বর্গ মাইল-পরিমাণ কতিপয় উপত্যকা খণ্ডকে ইউছফজায়ী প্রদেশ বলে। এই সকল উপত্যকা অতীব স্বাস্থ্যকর; জলবায়ুর গুণে এবং শোভা সৌন্দর্য্যে উহারা যেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। এই উপত্যকাগুলির সীমারেখা হইতে অসংখ্য অপরিণাম ও দুর্গম গিরিবর্ত্ম সমভূমির দিকে চলিয়া গিয়াছে; কোথাও বা এই সকল গিরিবর্ত্ম সমুচ্চ গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া সমভূমিস্থিত সুদৃশ্য অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; এবম্বিধ ভূখণ্ড এক দিকে যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমনে অলঙ্ঘ্য বাধা জন্মায়, তেমনই অন্যদিকে প্রকৃতি-বিনির্ম্মিত সুদৃঢ় অজেয় দুর্গের ন্যায় চিরকাল ঐ উপত্যকাবাসীগণের স্বাধীনতা রক্ষা করে; এই নয়নরঞ্জন বিটপি-সুশোভিত গিরিবর্ত্ম সমাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে বৈদেশিকগণকে পথ বিভ্রমে পড়িয়া সর্ব্বদা বড়ই বিপন্ন হইতে হয়, অথচ উহার প্রত্যেক রসাতলবিলম্বী গিরিগহ্বর, প্রত্যেক দুরারোহ গিরিবর্ত্ম ঐ স্থানের প্রত্যেক সুশীতল প্রস্রবণ এস্থানের অধিবাসীগণের সুপরিচিত হওয়ায় তাহারা অবাধে উহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এই প্রকার প্রকৃতিবিনির্ম্মিত দুর্গ প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত থাকিয়া ইউছফজায়ীগণ চিরকাল স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের এই লীলাভূমির অধিবাসী ইউছফজায়ী পাঠানগণ একদিকে তাহাদের কয়দ ও ভিন্ন জাতিসমূহের উপর প্রভুত্বস্থাপন এবং তজ্জনিত ঐশ্বর্য্য গরিমায় যেমন গৌরবান্বিত, পক্ষান্তরে পার্ব্বত্য জাতির স্বভাব-সুলভ স্বাধীনতাপ্রিয়তা গুণে তেমনই উদ্দণ্ড ছিল।

ইউছফজায়ী পাঠানগণের রাজনীতি সাধারণ তন্ত্র-মূলক, ইউছফজায়ীগণের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের প্রতিনিধি স্বরূপ এক একজন দলপতি (আগা) থাকে; আপন আপন পরিবারবর্গ ও জ্ঞাতিগণের সহিত পরামর্শ করা এবং তাহাদের অভিমত অন্যান্য দলপতিগণের নিকট প্রকাশ করাই পারিবারিক প্রতিনিধিগণের প্রধান কার্য্য; স্বদেশ ও স্বজাতি সংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্নগুলি পারিবারিক প্রতিনিধিগণের মতানুসারে নিষ্পন্ন হয়; প্রতিনিধিগণের মজলিসে যাহা ধার্য্য হয় প্রত্যেক ইউছফজায়ী পাঠান তাহা অম্লান বদনে পালন করে; দেশের আভ্যন্তরিক বিষয় সমূহ গ্রাম্য পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক মীমাংসিত হয়; নির্ব্বাচনপ্রথা অনুসারে বিবাদ বিসম্বাদের বিচার হয়; প্রত্যেক গ্রামের সর্ব্ব সাধারণের সম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থানে (আড্ডায়) গ্রামবাসিগণ অবসর কালে সমবেত হয়, তথায় বয়োবৃদ্ধগণ স্থানীয় বাদ বিসম্বাদের বিচার করেন, যুবকগণ নিশোর আমোদ, কৃত্রিম যুদ্ধ, পাঞ্জা কসা, ডনকুস্তী ইত্যাদিতে দেহ প্রাণ ঢালিয়া দেয় এবং সমাজ সেবকগণ আত্মীয় কুটুম্বগণের সেবা শুশ্রূষায় এবং প্রবাসী পথিকগণের আতিথ্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বিপুল আনন্দ উপভোগ করে। প্রকৃত পক্ষে এই সম্মিলনের স্থানকে পাঠানগণের জাতীয় জীবনের সূতিকা-গৃহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; পাঠান রাজত্ব কালে এক সময়ে বঙ্গদেশেরও পল্লীতে পল্লীতে এই সকল আড্ডা বা বাঙ্গলা ঘর পরিদৃষ্ট হইত, আজও ঢাকা, বর্দ্ধমান ও

পাটনা প্রভৃতি প্রাচীন নগরের প্রতি মহল্লায় সরহরে মাতব্বর বা রইসগণের বহু আড্ডা (বৈঠকখানা) লক্ষিত হয়। দেশের ভূমি, পাঠানগণের চিরন্তন-প্রথানুসারে, অধিবাসিগণের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইত; সময় সময় নবাধিকৃত দেশের ভূমির বিভাগ দ্বারা এই সমতা রক্ষিত হইত। ইউছফজায়ীগণের অধীনস্থ ভারতীয় করদ ও মিত্র জাতি সমূহের প্রতি সৌহার্দ্দ ও সুব্যবহারে তাহাদের স্বাভাবিক সৌজন্য ও ভদ্রতা পরিস্ফুট হইত, জেতাজিতের বৈষম্য তাহাদের প্রাণকে কদাচ বিষাক্ত করিতে পারিত না। বর্ণ-বৈষম্য-জনিত গৌরব তাহাদের বীরপ্রাণে কদাচ স্থান পাইত না। স্থান বিশেষ বা জাতি বিশেষকে হীনচক্ষে দেখাটাকে পাঠানগণ নিতান্ত নীচতা বলিয়া মনে করিত। বরং বিজিত দেশে বাস করিয়া এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে তাহারা বড়ই ভালবাসিত।

উপরে বলিয়াছি ইউছফজায়ীগণ চির স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি, তাহাদের এই স্বাধীনতা-প্রিয়তা ভারতের ইতিহাসেও যথেষ্ট পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোগলগণ জয়যুক্ত হইলে সম্রাট বাবর পাঠানদের বিরুদ্ধে যে বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন, তাহাতে কোন কোন পাঠান জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেও ইউছফজায়ীগণ মোগল সম্রাট বাবরের ভয় বা বন্ধুতার কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া আতার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে ভুবনবিখ্যাত সম্রাটের বাহুবল ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়মূল হইয়াছিল, যাঁহাকে ভারতবাসিগণ "বিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া ঘোষণা করিত, সেই সাহানশাহ জালাল উদ্দিন আকবর বাদশাহ ইউছফজায়ীগণকে দমন করিতে গিয়া কিরূপ অকৃতকার্য্য ও অপদস্থ হইয়াছিলেন তাহা ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরতরে অঙ্কিত থাকিবে। জনৈক ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, "আকবরের রাজত্বকালে বায়েজিদ নামক একব্যক্তি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি নিজকে পয়গম্বর বলিয়া ঘোষণা করেন এবং উপাসনা উপবাস ইত্যাদি ধর্ম্ম ক্রিয়া করিতে নিষেধ করেন; তাঁহার প্রচারিত নূতন ধর্ম্মালোকে আলোকিত লোকদিগকে "রওশানিয়া" (আলোকিত) বলা হইত; বিধর্ম্মীগণের ধনসম্পত্তি হস্তগত করা তাহারা সঙ্গত মনে করিত; অল্পকাল মধ্যে তাহারা সোলেমান এবং খায়বার পর্ব্বতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং আফগানিস্থানের তদানীন্তন রাজশক্তির অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে; বায়োজিদের অভাবে তাহার পুত্র জালাল ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে রওশানিয়াদের দলপতির পদে অভিষিক্ত হয়, এই সময় কাবুলের শাসনকর্ত্তা সাহজাদা হাকিমের মৃত্যু ঘটায় সম্রাট আকবর স্বয়ং কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং রাজা মানসিংহকে কাবুলের নায়েবের (প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার) পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট আকবর আশা করিয়াছিলেন যে রাজা মানসিংহ স্বীয় বুদ্ধিবলে এবং তাহার স্বজাতি রাজপুতগণের সাহায্যে আফগান পাঠানদিগকে দমন করিতে পারিবেন কিন্তু এ

সকল সুবন্দোবস্ত ও সুবিধা ইউছফজায়ীগণের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই ; ইউছফজায়ীগণ রৌশনীয়া মতের সমর্থন করা দূরে থাকুক বরং উহার বিরুদ্ধাচরণ করিত, তথাপি আকবর রৌশনীয়া আফগানগণকে দমন করিতে পুনঃ পুনঃ যে অভিযান প্রেরণ করেন তাহার অধিনায়কগণের প্রতি ইউছফজায়ীগণকে দমন করার উপদেশ থাকে, তজ্জন্য মোগল অভিযানের সহিত ইউছফজায়ীগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সম্রাট আকবর তাঁহার ধাত্রী মাতার পুত্র জায়েন খান এবং তাঁহার প্রিয় সভাপণ্ডিত রাজা বীরবলের অধীনে এক বিপুল অভিযান প্রেরণ করেন ; ইহা কথিত আছে যে সম্রাট আকবর এতই সমারোহের সহিত এই অভিযানের আয়োজন করেন এবং তৎপ্রতি এতই গুরুত্ব স্থাপন করেন যে সুবিখ্যাত আবুল ফজলকে উহার অধিনায়কত্ব লাভের জন্য চিঠি লিখিতে হইয়াছিল এবং তল্লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছিল তাঁহার ভ্রাতা ফায়েজী এই অভিযানের সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই সৈন্যদল সহজেই সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়াছিল বটে, কিন্তু রাজা বীরবল পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যে অগ্রসর হইলে চতুর্দ্দিক হইতে ইউছফজায়ীগণ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইলেন যে তাঁহাকে অচিরে সমভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল, জায়েন খানের সেনাদল পার্ব্বত্য পথের বহুল বিপদসঙ্কুল গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেও তাহারা অমিততেজা দুর্দ্দমনীয় ইউছফজায়ীগণ কর্ত্তৃক এরূপভাবে পরিবেষ্টিত, আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইতেছিল যে তাহারাও ফিরিয়া আসিয়া রাজা বীরবলের সেনানীর সহিত সম্মিলিত হইতে বাধ্য হইল ; ইউছফজায়ীগণ যেরূপ বীরত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছিল তাহাতে সম্রাট আকবর বহু নূতন সেনা না পাঠাইলে উক্ত মিলিত সেনাদলকে অচিরে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইত। সম্রাটের প্রেরিত নূতন সেনা সহ জায়েন খান ও বীরবল পুনরায় ইউছফজায়ীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং ইউছফজায়ীগণের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। বীরবলের সেনাদল অগ্রসর হইয়া গিরিশিখরে উপস্থিত হইলে ইউছফজায়ীগণ তাহাদিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল এবং সমভূমির দিকে তাড়াইয়া দিল, জায়েন খাঁর সেনাদল পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল, ইউছফজায়ীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, জায়েন খাঁ অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল। অনন্তর জায়েন খাঁ ও রাজা বীরবল সমভূমিতে শিবির স্থাপন করিলেন এবং পলায়নপর সেনাগণকে সমবেত করিলেন। জায়েন খান ইউছফজায়ীগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করতঃ সন্ধির প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা বীরবল তাহাতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর ইউছফজায়ীগণ রাত্রিযোগে তাহার সেনাদলকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এইরূপ জনরব চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। এই সংবাদ পাইয়া রাজা বীরবল জায়েন খানের সহিত কোনই পরামর্শ না করিয়া তাহার সেনাদলকে এক গিরিবর্ত্মে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ঐ গিরিবর্ত্ম দিয়া সহজে সমভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে। বোধ হয় ইউছফজায়ীগণ সহজে

রাহাদারী করতঃ সমস্ত শত্রু সেনাদল বিনাশ করার অভিপ্রায়ে উক্ত জনরব রটাইয়াছিল, কারণ রাজা বীরবলের সেনাদল একটী গিরিবর্ত্মে পঁহুছিবা মাত্র ইউছফজায়ীগণ চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং অজস্র তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং অসংখ্য পাঠান হস্তিত মোগল সেনার উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল, অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াও রাজা বীরবল মোগল সেনাগণকে স্থির রাখিতে পারিলেন না ; প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন কালে মানুষ, ঘোড়া ও হাতী ইত্যাদি পরস্পরের সংঘর্ষণে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল। এই পলায়ন কালে স্বয়ং রাজা বীরবল এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা সেনাপতি নিহত হইল। পক্ষান্তরে জায়েন খানের সেনাদল সমভূমিতে পলাইয়া গিয়াও রক্ষা পাইতে পারিল না। পলায়ন পথে ইউছফজায়ীগণের তীর, বন্দুক ও লোষ্ট্রাঘাতে মোগল সৈন্যের অনেকেই নিহত হইয়াছিল। তৎপর সমভূমিতে পৌঁছিয়া মোগল সৈন্যকে পুনরায় সমবেত করিতে সক্ষম হইলে ও তাহার শিবিরে যেই "ঐ ইউছফজায়ীগণ আসিতেছে" জনরব শ্রুত হইল, তেমনই মোগল সৈন্যগণ বিষম বিশৃঙ্খলভাবে প্রাণের ভয়ে পলায়নপর হইল, সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে ধাবমান হাতী ঘোড়া কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া অবশিষ্ট মোগল সৈন্য নিহত হইল ; ইতিহাসে (১) বর্ণিত হইয়াছে এই অভিযানে ৫০০০০ মোগল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার একজনও ফিরিয়া আসে নাই ; (২) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফারিশতা যদিও মোগলাশ্রিত ছিলেন তথাপি তিনি ইউছফজায়ীগণের শৌর্য্য বীর্য্য ও বিক্রম যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পড়িলে ইউছফজায়ীগণের সমকক্ষ অন্য কোন বীরজাতি তৎকালে কোথাও ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। (৩) এই বীরপ্রাণ ইউছফজায়ীগণ কিরূপ শৌর্য্য বীর্য্যসম্পন্ন, তাহারা কিরূপ সমর-কুশল ও স্বাধীনতা প্রিয়, তাহারা কিরূপ আত্মাভিমানী ও জ্ঞানগরিমায় গৌরবান্বিত এবং তাহারা স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে কিরূপে অবাধে প্রাণ দান করিতে পারে তাহার এক বিশদ চিত্র (৪) সুলেখক অসবরণ সাহেব পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত নওশেরার চিরস্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ইউছফজায়ীগণের তুমুল সংগ্রাম বর্ণনা উপলক্ষে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে পাঠান উপনিবেশ সংস্থাপন কালেও তাহাদের শ্রেণীবিশেষ স্থানবিশেষে বাসস্থান মনোনীত করিতেন ; এজন্য রোহিলাখণ্ড মেলার রোহিলা পাঠান, তুপালে বাস বেরেণী ইউছফজায়ী পাঠানগণের অধিবাস-ভূমি হইয়াছিল। আমি যে পাঠান পরিবারের ইতিবৃত্ত লইয়া পাঠকপাঠিকাগণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এই পরিবারের পূর্ব্বর্ত্তিগণ ভারতে

---

(১) নতশাকাৎ তোয়ারিখ (২) ফারিশতা (৩) Elphinstone's History of India p. 519.

(৪) অসবরণ সাহেব ইংরাজীতে নওশেরার যুদ্ধের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মিঃ অসবরণের লিখিত "The Afghan tribes on our Trans Indus Frontier" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে নওশেরার বিখ্যাত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

ইব্রাহিম লোদীর রাজত্ব কালে বাস-ফেরেণীর অন্তর্গত নিমেহারা নামক স্থানের পাঠান সেনানিবাসে বাস করিতেছিলেন। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন তৈমুরলঙ্গের বংশধর মোগল-গণের অভ্যুদয় ঘটে এবং ১৫২৬ খৃঃ অব্দে ভারতের ভাগ্য-পরীক্ষাক্ষেত্র পানিপথের প্রথম যুদ্ধে যখন পাঠানগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহারা মোগল প্রাধান্যের ছায়ায় না থাকিয়া সুদূর বঙ্গদেশে আসিয়া হাজি ইলিয়াস বেহরামখাঁ প্রভৃতি পাঠান দলপতিগণের নেতৃ-ত্বাধীনে মোগল অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য সমবেত হয়; তখন বর্দ্ধমান পাঠান পরিবারের তৎকালীন প্রতিনিধিগণ নিমেহেরা পাঠান-পল্লী পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেন এবং যখন ঢাকাতে স্বনামধন্য ওসমান খানের অধীনে পাঠানগণ মোগলদের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন তখন তাঁহাদের বিজয়-বাসনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়, পাঠানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ের ঐতিহাসিক তত্ত্ব মোগল সমাজের আদর্শ সুলেখক, "সমাজ সংস্কারক" ও "সিবিয়া-বিজয়" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অন্যতম অধ্যাপক স্বর্গীয় মৌলবী রেয়াজ উদ্দিন মাশহাদী উজীর সাহেব* এইরূপ বর্ণনা করিয়া-ছেন, "ঢাকার পার্ব্বত্য প্রদেশে (Kohistani Dacca) সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাপতি সুজায়েত খাঁর সহিত আফগান ওসমান খাঁর শেষ যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে ওসমান খাঁর কপালে এক বন্দুকের গুলি লাগিয়া তিনি আহত হন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাহন-হস্তী সহ শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু সেই রাত্রিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

ওসমানের মৃত্যুর পর তাঁহার অবশিষ্ট ছয় ভ্রাতা ওয়ালী খান তেনি (ওয়ালী) ও মমরেজ খান প্রভৃতি মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ঐ যুদ্ধ স্থানের সন্নিকট অর্থাৎ রণডাঙ্গালের উপকণ্ঠ প্রদেশে কিছু কাল বাস করেন। ঐ সকল পাঠান সামন্তগণ ঘোর জঙ্গলের ভিতরও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া ছিলেন। আটীয়ার উক্ত পাঠানগণ এই সকল ভীষণ স্থানে কিছুকাল থাকিয়া যখন মোগল-দিগের ব্যবহারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তখনই জীবন যাত্রার পক্ষে সুবিধাজনক নিম্নভূমিতে বাসস্থান স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহাদের তীক্ষ্ণ তরবার লাঙ্গলের ফালে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা সমভূমিতে আসিয়া সাধারণ প্রজাদের সহিত কোন প্রকারে মিলিত হইয়া যান নাই, বরং সাধারণ প্রজাদের প্রতি রাজপুরুষগণ যে ব্যবহার করিতেন, তাহা তাঁহাদের সহ্য হইত না। তাঁহারা এক এক পরিবার এক এক গ্রামে একত্র বাস করিয়া আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহাদের পূর্ব্বানুক্রমিক যে পারিবারিক শাসনপ্রথা ছিল, তাহা বাঙ্গালাদেশের নিম্ন ভূমিতেও প্রতিষ্ঠিত হইল। মোগল সম্রাটগণ এই দুর্দ্ধর্ষ আফগানদিগকে কোন রাজকার্য্যে কদাচিৎ নিয়োগ করিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন যাত্রার সুখ স্বচ্ছন্দ-

* তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী "বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকার ২য় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যার ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তার জন্য তাঁহাদিগের অধিকৃত ভূমির অধিকাংশের রাজস্ব মাফ করিয়া দিয়াছিলেন। আটীয়া তখন যে পাঠান সামন্তগণের শাসনাধীন ছিল তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক চাগতাই মোগল বংশের অনুগত থাকিলেও তাঁহাদের জাতিগত অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশে আফগানগণ অপেক্ষাকৃত শান্তির সহিত বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যেক পরিবারের অধিকৃত গ্রাম ক্রমে আটীয়ার পাঠানগণের প্রসিদ্ধ বাইশগ্রাম বলিয়া অদ্যাপি উক্ত হইয়া থাকে। তখন আটীয়ার সীমা বহু বিস্তৃত ছিল।

উক্ত আদিম পাঠানদিগের সমভূমির বাসস্থান (পাঠানদিগের) প্রসিদ্ধ বাইশ গ্রামের মধ্যে (১) চাড়ান অন্যতম। এই গ্রামখানি আটীয়ার পাহাড়ের পশ্চিমে অল্প দূরে অবস্থিত। চারিদিকে জলাভূমিতে পরিবৃত জঙ্গল সমাকীর্ণ এই গ্রাম একটী উপদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইত। ব্রহ্মপুত্র নদ তখনও আটীয়ার পাহাড়ের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। আটীয়ার সমতল ভূমির পশ্চিম দিক দিয়া এক্ষণে যে প্রধান প্রবাহ যমুনা নামে অভিহিত তখন তাহা কেবল সামান্য নির্ঝরের মত ছুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই দুই প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী ভূমিতেই পাঠানদিগের অধ্যুষিত উক্ত বাইশ গ্রাম অবস্থিত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ তখনও উহার বর্ত্তমান গন্তব্য পথে প্রবাহিত হইত। পশ্চিম দিকে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে আটীয়ার পাহাড় ও তাহার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ, এইরূপ স্বাভাবিক দুরাক্রম্য স্থান পাঠানদিগের আত্মরক্ষার জন্য অনুকূল বলিয়া নির্ব্বাচিত হওয়া স্বাভাবিক। ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান প্রবাহ আরও কিছুকাল পরে আটীয়ার সমভূমির পশ্চিম দিক দিয়া আসিয়া জাফরগঞ্জের নিকট মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের বর্ত্তমান প্রবাহ যতদিন প্রবল দুরতিক্রম্য নদীর আকার ধারণ করে নাই, ততদিন বর্ত্তমান বগুড়া ও রংপুর জেলার অধিকাংশ স্থান আটীয়া প্রদেশের অন্তর্গত ও আটীয়ার পাঠান সামন্তের অধীন ছিল। (ক্রমশঃ)

নওশের আলী খান ইউসফজায়ী

---

(১) চাড়ানের ভৌগলিকত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমীর দেহত্যাগ

ইংরাজ ১২৭৩ সনের ১৬ই ডিসেম্বর মহাতপা জালাল উদ্দিন দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বেই জালাল উদ্দিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইতে আর বিলম্ব নাই। তাই স্বীয় বন্ধুবর্গ ও শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর জন্য কেহ ভীত বা বিচলিত না হয় তদুদ্দেশ্যে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। এই নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু ইহার ভিতরে যে সনাতন মানুষটী রহিয়াছে সে চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে। মহর্ষি মনসুর তদীয় মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে তাপসশ্রেষ্ঠ আত্তারের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে আমিও সময় সময় তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব (১)। মহাপুরুষ মহম্মদের শেষ বাণী তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি মৃত্যুকালে শিষ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন—'জীবিত অবস্থায় আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আবার মৃত্যুর পরও তোমাদিগকে এমনি আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিব।' আজ তাঁহারই পবিত্র ভাষায় আমি তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি।" মহর্ষি এই বলিয়া নীরব হইলেন এবং কাফনের বস্ত্রের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলী শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহর্ষির পুণ্যশীলা পত্নী খেরা খাতুন স্বামীশোকে একান্ত অধীর হইয়া অঙ্গের বস্ত্রাভরণ ছিন্নভিন্ন করিতে ও করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জগজ্যোতিঃ, আমাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?" জালাল উদ্দিন মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "প্রিয়তমা, আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি না। বরং এতদিন আমার আসক্তি ছিল দ্বিধাবিভক্ত, অর্দ্ধেক আমার নিজের প্রতি, আর অর্দ্ধেক তোমার প্রতি। এখন হইতে আমি ও তুমি বলিয়া আর কিছু থাকিবে না; আমিত্বের বন্ধন ঘুচিয়া যা-কিছু শুধু তোমার জন্য থাকিবে"। অতঃপর শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার শেষ উপদেশ কয়টী প্রদান করিলেন। তাহা এই—(১) অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা সকল কার্য্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে, (২) আহার, নিদ্রা ও বাক্যালাপে যতদূর সাধ্য সংযমী হইবে। (৩) বিদ্রোহভাব ও পাপকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। (৪) কদাপি নামাজ ও রোজাকে কাজা করিবে না এবং (৫) ইন্দ্রিয়লালসাকে কখনও প্রশ্রয় দিবে না। (৬) সকল মানুষের অত্যাচার অম্লানবদনে

(১) এ অঙ্গীকার তিনি প্রতিপালন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

সঙ্গ করিয়া যাইবে এবং (৭) তরলমতি ও বিলাসীদিগের সংসর্গ ছাড়িয়া সাধু ও গুণীদিগের সহবাস চেষ্টা করিবে। নীতিকারগণ বলিয়াছেন, মানুষের ভিতর তিনিই শ্রেষ্ঠ যাহার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। আর বাক্যের ভিতর তাহাই শ্রেয়ঃ যাহা সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচিত।

ক্রমে জালাল উদ্দিনের সময় আসন্ন হইয়া আসিল। তিনি জনৈক বন্ধুর বক্ষে পৃষ্ঠ বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট হইলেন। অন্য কাহাকেও সে কক্ষে থাকিতে দিলেন না। তখন সহসা কক্ষের ভিতর এক সুদৃশ্য যুবা পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই যুবকের অনুপম সৌন্দর্য্যের ভিতর এমনই একটা ভীষণতা মিশ্রিত ছিল যে জালাল উদ্দিনের বন্ধু তদ্দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু জালাল উদ্দিন তাহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পক্ষান্তরে কিঞ্চিত গাত্রোত্থান করত তাহাকে ইঙ্গিতে অভ্যর্থনা করিলেন, জালালের বন্ধু তখন আগন্তুকের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে যুবক উত্তর করিলেন, "আমি আল্লার প্রেরিত আজ্‌রাইল, এস্থানে প্রভুর অভিপ্রায় জানিতে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া প্রশ্নকারী মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলেন। কিন্তু জালাল উদ্দিন শান্তভাবে কহিলেন, "হে স্বর্গীয়দূত, এস, তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, আমি প্রস্তুত হইয়াই আছি।" অতঃপর জালাল উদ্দিন ওজু করিবার জন্য একপাত্র পানি আনাইলেন এবং ওজু করিতে করিতে বলিলেন, আমার প্রিয়তম আমার জন্য মৃত্যুরূপ হলাহলের পেয়ালা প্রেরণ করিয়াছেন, আজ আমি সানন্দে উহা পান করিব। জালাল উদ্দিনের ওজু সমাধা হইলে সুকণ্ঠ গায়ক ও বাদ্যকারগণকে আহ্বান করা হইল। তাহারা করুণ সুরে একটী মর্ম্মস্পর্শী স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া সকলকে তন্ময় করিয়া ফেলিল। জালালের বন্ধুগণ উদ্বেলিত শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জালাল সকলকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ভাইসব, বৃথা রোদনে কোনই উপকার নাই। দেখ, আমার অন্তরের ভিতর আজ কি ব্যাকুলতা! অথচ সে ব্যাকুলতার ভিতরও কত আনন্দ আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে! কি শান্ত আজ প্রকৃতির ছবিখানি। প্রশান্ত কিরণ-সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলি কেমন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই শান্ত সুষমার ভিতর বসিয়া আমি একদিকে তোমাদের করুণ কাতরধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, আর এক দিক হইতে প্রভু শাম্‌স্ উদ্দিনের আহ্বান শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। প্রভুর আদেশই প্রতিপালিত হউক। যাত্রা অনিবার্য্য। অনন্ত শূন্য হইতে সকল জিনিষের উদ্ভব, আবার শূন্যতার ভিতর স্বাকারাবদ্ধ হইতেই সকল জিনিষ চলিয়া যায়। অনাদিকাল হইতে আল্লার জগতে এই কানুন প্রচলিত হইয়াছে।"

জালাল উদ্দিনের পুত্র সুলতান পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছিল। এই কয়দিবস দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পিতৃ সেবা করায় বালকের শরীর শীর্ণ হইয়া ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। জালাল তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বাবা, আমি এখন বেশ ভাল বোধ করিতেছি; তুমি যাও একটু

বিস্রাম করে গিয়া। সুলতান প্রস্থান করিলে জালাল উদ্দিন তাঁহার জীবনের শেষ গজলটী এই মর্ম্মে গাহিলেন।

"সকলেই চলিয়া গিয়াছে। এখন চৌদিকে কেবলশান্তি আর নীরবতা। হে আমার প্রাণ-প্রিয় নিষ্ঠুর, তুমি এস, এই নিশীথে—নীরবতায় আমার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, আর চতুর্দ্দিকে সকলে আমার ব্যথায় বিক্ষুব্ধ হউক। তোমার রূপমাধুরী এমনই চমৎকার যে তুমি যতই কেন নিষ্ঠুর হও না, আমার নিকট তুমি সব চাইতে প্রিয়, প্রাণের অন্তরতম সখা! আমরা ত অলিবার জন্যই আসিয়াছি, আর তুমি চিরকাল অমরযুক্ত হইয়াই চলিয়াছ। তোমার বিজয়রথের নিষ্পেষণে যদি অন্যের প্রাণহানি হয়, সে হত্যার তোমার কোনও অপরাধ হইবে না। মৃত্যু কঠোর সন্দেহ নাই, কিন্তু মৃত্যুই জীবের অপরিহার্য্য পরিণাম। পাপ যখন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাহার শেষ ফল আসিবেই আসিবে। গত নিশায় আমার মরণের শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি।"

গজল থামিয়া গেল। অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ে সংবৃত হইয়া জালাল উদ্দিন নীরব হইলেন। নীরবেই প্রেমাস্পদের দেশে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে অশ্রু-উছল আঁখিপাতা নিমিলিত হইয়া আসিল।

জালাল উদ্দিন যেখানে চলিয়া গেলেন সেই দেশের জন্যই যেন তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। উহা যেন এ পৃথিবীর কোনও কিছুর সহিতই মিশিত না। এমন যেন কোনও দিনই তাঁহার নিজের দেশ ছিল না। তাঁহার মহাগ্রন্থ 'মসনবী'র প্রথমেই তিনি লিখিয়াছিলেন—

বোশ্‌নো আজনায়, চুন্ হেকায়েত মীকুনাদ
ও আজ্ জুদায়ী হা শেকায়েত মীকুনাদ্।
কাজ্ নায়েস্তান্ তা, ম'রা বোব্ লীদা আন্দ্
আজ্ নফিরাম্ মর্দ জান্ না লীদা আন্দ্।
সীনা খাহম্ শরহে শরহে আজ ফেরাক
তা বোগোইয়াম শরহে দর্দে এশ্তেয়াক্।
হর্ কাছে কু দুর মানাদ্ আজ্ আসলে খিশ
বাজ্ জোইয়াদ্ রোজগারে ওস্‌লে খিশ্।

অর্থাৎ তাঁহার আত্মা ছিল নলবনের একটী নল (যদ্দ্বারা বংশী প্রস্তুত হয়)। সে স্বস্থান হইতে উৎপাটিত হইয়া এই মর্ত্তধামে নিশিদিন কাঁদিয়া ফিরিতেছে ও আপনার বিরহের শোকোচ্ছ্বাস গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই মর্ম্মবেদনায় আজ জগতের যত নরনারী কম্পিত। দিল তাহার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে! সে চায় তাহার এই মর্ম্ম ব্যথা জগতে দ্বারে দ্বারে শুনাইতে; কিন্তু দুঃখভোগী ভিন্ন তাহার এ মর্ম্মবেদনা কে বুঝিবে! স্বগোত্র হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সে যতই চায় তাহার পূর্ব্ব-স্থানে ফিরিয়া যাইতে—আমি আমার স্বস্থানে স্বজনের নিকট কবে ফিরিয়া যাইব!

এতদিনে জালাল উদ্দিন তাঁহার স্বস্থানে যথার্থই ফিরিয়া গেলেন। শুধু তাঁহার নশ্বর দেহখানি ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। শিষ্যগণ এই পবিত্র দেহ সযত্নে বিধৌত ও পরিস্নাত করাইলেন এবং গাত্রনিঃসৃত বারি পবিত্রজ্ঞানে অল্প অল্প করিয়া সকলে পান করিলেন। একব্যক্তি শবের হস্তদুইটী বক্ষের দিকে আনত করিতে গিয়া এমনই শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল যে রোরুদ্যমান অবস্থায় অবশ হইয়া শবের উপর পড়িয়া গেল। তখন সে যেন মূর্চ্ছিত অবস্থায় শুনিতে পাইল—অবোধ, কেন এত

ভয় করছ ? সাধকেরা মরিয়া যান না, শুধু অন্তর্ধ্যান করেন মাত্র।

শব যখন সমাধিক্ষেত্রে নীত হইল তখন দুনিয়ার সকল শ্রেণীর লোকই তাহার অনুগমন করিল। তুর্কী, রোমান, ইহুদী, খৃষ্টান কেহই তাহাতে যোগদান না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। শোক ও শ্রদ্ধার অশ্রুবারি অগণিত অক্ষি বহিয়া মহাত্মা জালাল উদ্দিনের পবিত্র সমাধিস্থল সিঞ্চিত করিল।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

শহীদ্

(১)

সত্যের তরে ধর্ম্মের ঘরে
যুগে যুগে কেগো কহিতেছে ওরে,
'শহীদের খুন চাই কোরবাণী'
ঐ শুন ধ্বনি উঠিয়াছে রণি,
মরণ, মরণ, কিসের মরণ !
মরিয়া বাঁচিতে গড়িয়া তুলিতে
অচল অটল বিভয় চেতন
এ যে মরণহরণ জীবন ধারণ।

(২)

স্রষ্টার দান,— খৃষ্টের প্রাণ
মুক্তি আহবে হল বলিদান,
সত্যের জয় ভূলোকে দ্যুলোকে
ভূধর জলকে অগ্নিত জলকে,
মরেনি মরেনি খৃষ্ট মরেনি !
ওগো কতদূর ! কত সুমধুর !
"আমি খোদা"-বাণী গাহে মনস্থর,
দুধের সলিল অনল অনিল,
নির্ঘোষি তারা আজো কি কহেনি
ভূলের শিখরে সত্য রহেনি।

(৩)

অন্তর ভেদী, প্রান্তর নদী,
গাহে মরসিয়া অহো নিরবধি !
হোসেনের শির, পানি দরিয়ার,
হাকে বার বার হান তলোয়ার,
স্বাধীন স্বাধীন নহ পরাধীন !
সারা দুনিয়ার মুখে শুনিকার
ছাতি ফাটা সেই রব হাহাকার,
সবলের জয় শহীদের জয়
জালেমের ভয় বল কয় দিন,
স্বাধীন, স্বাধীন, নহ পরাধীন !

(৪)

খণ্ডিত শির নন্দিত বীর
রঞ্জিত ভালে, খুন খারাবির
লিখিয়া দিয়েছে যুগে যুগে কত,
নীতি শাশ্বত আজো অবিরত
ঝলসি উঠিছে উঠিছে ঝলসি !
শহীদের গান ওরা আসমান,
শোণিত প্লাবনে যেন স্নানমান,
ত্যাগের মহিমা বিজয় গরিমা,

স্নেহের ছিন্ন বক্ষ পরশি
ঝলসি উঠিছে উঠিছে কলসি !

(৫)

স্বর্গের পথে স্বর্গের রথে
শহীদের প্রাণ ফেরেস্তা সাথে
সাজিয়া শোণিত সূক্ষ্ম বসনে,
ধাইছে পবনে তপনে গগনে,
সাধনা, সাধনা, সকল সাধনা !

খুন মেখে কত হুর পরী যত
বলির চরণে চির প্রণত ;
মুক্তির তরী নিশান তুলি
হরষে আবার কিসের ভাবনা ?
সাধনা, সাধনা, সকল সাধনা !

(৬)

ভক্তের ধেনা,— রক্তের কণা
দুলিছে নিযুত শক্তির ফণা,
নির্জ্জীব প্রাণে গর্জ্জিল কার
জয় জগতের মহা হুঙ্কার,
কাঁপায়ে, কাঁপায়ে, মেদিনী কাঁপায়ে !

বলির শোণিতে ভিজা এ মহীতে
দিল উপহার যুঝিতে মরিতে,
কত মহাবীর উজলিত শির,
মাতৃর কক্ষে পড়িল ঝাপায়ে
কাঁপায়ে, কাঁপায়ে, মেদিনী কাঁপায়ে !

(৭)

যজ্ঞের হোতা, মোক্ষের কথা
গাহিয়া গাহিয়া স্নেহে যথা তথা,
নমিয়া জননী জনম দুঃখিনী
বলির বসন পরেছ আপনি,
বাঁধন, বাঁধন, কিসের বাঁধন !

শত মহারথী বীর দল পতি
ত্যাগের অনলে দিয়েছ আহুতি
কেনরে রোদন আজি হে যোধন,—
পতিত জাতির শুদ্ধি সাধন,
বাঁধন, বাঁধন, কিসের বাঁধন !

(৮)

ভদ্রের পায় শূদ্রের লয়
নিপীড়িত শুধু দুর্ব্বল হায়,
পশু বল নীতি, স্বার্থের নীতি,
জাগাল করুণ আর্ত্তের গীতি,
জুড়িয়া, নিখিল জগত জুড়িয়া !

"সম নীতি আর চাহি সুবিচার
স্বাধীনতা মোর চির অধিকার,"
এ মহা উক্তি অটল যুক্তি
বলির কণ্ঠ উঠুক ভরিয়া
জুড়িয়া, নিখিল জগত জুড়িয়া !

মীর ফজলে আলী বি—এ ।

কৃষকের দুর্দ্দশা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেশের লোকদিগকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত করা যায়—কৃষিজীবি সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত (middle class) সম্প্রদায়। যাকে আমি কৃষকশ্রেণী বলতে চাই, তারা চাষের কাজ করে না। কৃষকশ্রেণীই সংখ্যায় বেশী। চাষার সংখ্যা শতকরা ৭০ এরও বেশী। কৃষকদের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু ছ এক কাঠা জমি ছিল কিন্তু আজ এমন কৃষক দেখা যাচ্ছে যার এক ছটাকও জমি নাই; দিন আনা, দিন শ্রম করা, দিন উপার্জ্জন করাই, তার জীবনধারণের একমাত্র উপায় হয়েছে। আবার জমিহীনদের অনেককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই ভিক্ষাবৃত্তিকে এক সম্প্রদায় ব্যবসায় ও পারিবারের আয়ের উপায় করে নিয়েছে। এই ভিক্ষুক শ্রেণী বৎসর বৎসর সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে। জমি হইতে বিতাড়িত হয়ে ঋণগ্রস্ত চাষা হয় দৈনিক পয়ের ক্ষেতে পেটে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করছে—না হয় সহরে গিয়ে কলে ঢুকছে আর না হয় সহজ সরল ভিক্ষার রাস্তা ধরে সটান সহরের দ্বারে দ্বারে ফিরতে লেগে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের আর উপায় নাই। তার গৃহশিল্প লোপ পেয়েছে। যে অবসর সময়ে তার আচ্ছাদন নিজ হাতে তৈরী করত আজ তাকে পরের দুয়ারে তার জন্য হাত পেতে বেড়াতে হচ্ছে। এ অভিশাপ হইতে কবে তার মুক্তি হবে কে জানে? সামাজিক প্রথা এর ওপর নিদারুণ হয়ে ব্যাপারটীকে আরও সাংঘাতিক করে তুলেছে। এদেশের প্রথা বাল্যকালেই বিবাহ করতেই হবে। জমিহীন চাষা পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে একেবারে পল্লী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে। পুত্রকন্যা আসছে, অকালে বিধায় নিচ্ছে কিন্তু এ দুঃখের মাঝেও এ অবিবাম আসা যাওয়ার শেষ হচ্ছে না। দুঃখ শতগুণ বেড়ে যাচ্ছে। অভাব চতুর্দ্দিকে হুঙ্কার ছাড়ছে! ভীতচকিত হয়ে অবস্থাপন্ন পরিবার ও সংরবাসী দ্বাররুদ্ধ করে দিচ্ছে। কাঙ্গাল এবার পথের পরে মরে থাকছে। কে কারে দেখে? সহরে এ দৃশ্য অহরহ সচরাচর ঘটছে। সভ্যতা ও অর্থ সহরেই জমেছে সেই লোভে পল্লী ছেড়ে জমি ছেড়ে বিপন্ন চাষা সহরের গলি গলি চীৎকার করে ফিরছে তার করুণ ক্রন্দন বড় বড় কোঠা ডিঙ্গিয়ে আকাশে বাতাসে মিশে যাচ্ছে কিন্তু সহরের গৃহ প্রাঙ্গনে ঢুকছে না। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদের শ্রমশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই কিন্তু শ্রম করবে কোথায়? কাজ জুটছে না। যারা অক্ষম তারা ত পথেই পড়ে রয়েছে। এখন দেখা গেল জমি যাদের নেই তারা হয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে আর না হয় পরের ক্ষেতে কি অমানুষিক পরিশ্রম করে জীবিকার সংস্থান করছে। এখন জমি যাদের আছে তাদের মধ্যে কেহ বা জমি অনটনের মধ্যে জমির চাষ করে ফসল তুলছে—

কুড়িয়ে আনতে ফুরিয়ে যাচ্ছে আর অবশিষ্ট সকলে একরূপ অভাবের উৎপীড়নকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু কেহই অভাবের উপরে উঠতে পারছে না।

তারপর অকৃষকশ্রেণীর কথা বলা যাক্। ইহাদিগকে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে সংক্ষেপে বিভক্ত করা হইল। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজসেবা ও চাকুরী সবচেয়ে অধিক স্থান অধিকার করেছে। শিল্পীদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হতে বসেছে। যে ভারতশিল্প এক সময় রোমের রাজ্ঞীকে বিমুগ্ধ করেছিল—যে শিল্প ভারতবাসীকে নানা আনন্দের সামগ্রীতে প্রফুল্ল করত—যে শিল্প ভারতনারীর নিত্যকার্য্যে ও অবসরে বিরাম এনে দিত—যে শিল্প ভারত সভ্যতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীরাষ্ট্র ও গৃহপরিবারকে শান্তিনিবিড় প্রাচুর্য্যের মধ্যে পূর্ণ সার্থক করে তুলেছিল—সে শিল্প আজ কলের হাওয়ায় বিমলিন বিশুষ্ক হয়ে গেল—এবার তারই পরিবর্ত্তে কলের অপরিমীম তৃষ্ণা জীবনকে তীব্র ব্যস্ততায় ঘুরতে বসল—একি ভয়ানক! ব্যবসায়দারদের মধ্যে সকলই ব্যবহার্য্য পদার্থের স্থান পরিবর্ত্তন করেই অর্থ সংগ্রহ করছেন। জমিদার ও মহাজনদের কথা বলে কাজ নাই। এখন দেখা হল যে, এই অকৃষকশ্রেণীর মধ্যে মুষ্টিমেয় শিল্পী ব্যতীত বাকী সকলই অনুৎপাদক। সকলই চাষার ঘাড়ের উপর চেপে বসে রয়েছে। চাকুরে গভর্ণমেণ্টের ঘর হ'তে অর্থ আনছেন আর গভর্ণমেণ্টের আয় অধিকাংশ অবশেষে চাষার ক্ষেত হ'তে আসে। জমিদার ও মহাজন চাষার সঙ্গে কারবার ক'রেই বড় মানুষের বাহাদুরী বজায় করেন। ব্যবসায়ী চাষার উৎপন্নকে কমমূল্যে ক্রয় করে চাষার লাভকে গ্রাস করে; আবার বিদেশ হ'তে সামগ্রী এনে ঐ চাষার নিকটই অধিক মূল্যে বিক্রয় ক'রে তার রক্তে নিজে পুষ্ট হয়—এই করেই ব্যবসায়ী ধনাঢ্য হ'য়ে বসছে। তাহারা কৃপা ক'রেও বেচারা চাষাকে এতটুকু ছাড়তে চায় না।

এখন চাষার দারিদ্র্য কিরূপে দেশের অর্থাৎ গোটা ভারতের দারিদ্র্য ঘোষণা করে এই কথাই বলতে চাই। খাদ্য দ্রব্য হতে আরম্ভ করে কয়েকটী দফা বিচার করলেই প্রতিপন্ন হবে যে, চাষার দারিদ্র্য ভারতের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করছে। আর ভারত দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে।

প্রথমে খাদ্য সামগ্রী ধরা যাক্। জমি খুঁড়ে চাষা খাদ্য দ্রব্যকে বের করছে, তার অধিকাংশ বেচে তাকে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পরিধেয় ইত্যাদি আনতে হচ্ছে, কাজেই তার আহার কমে গেছে। আজকাল ভারতে প্রায় শতকরা ৬৭ জন লোক অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। খুব বেশী হয়ত মোটে শতকরা ৫ জন একটু পেট ভরে খেতে পায়। লোকসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জন্মের সংখ্যাও বেশী এবং মৃত্যুর সংখ্যাও বেশী কিন্তু তাহলে ত লোকসংখ্যা মোটের উপর বেশী হয়েছে বিদেশ হ'তে এসে দিন দিন ভারতের মাটিতে বহু বিদেশী বাসা বাঁধছে। ভারতের আহার্য্য বিদেশীরাও অবলম্বন ক'রছে আবার এই কাঁচা উৎপন্নকে বিদেশে পাঠিয়ে ভারতের শাসনব্যয় ও আমদানীর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং লোক সংখ্যার পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে কম হয়ে

গেছে। এর ওপর আবার জমির শক্তি কমে গেছে বলে জমি দিচ্ছেও কম। এই উভয় টানে চাষা মানুষকে নিরুপায় হয়ে পড়িয়ে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারকেই অদৃষ্টের লেখা বলে ধরে নিয়েছে। কিছু দিন হল আমরা অর্থজ্ঞ মাল্‌থাসের কথা পড়েছি। তিনি বলেন মানুষের জননলিপ্সা চিরসুন্দর ও অতীব প্রবল—একে দমন করা সুকঠিন। আবার প্রকৃতিও অত্যন্ত কৃপণ। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে কিন্তু তদনুপাতে প্রকৃতি আহার যোগাবে অনেক কম। এমবস্থায় অনেক মানুষকেই অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকতে হবে। পরাক্রান্ত যারা তারাই সিংহের অংশ ভোগ করবে আর দুর্বলকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ফলে দুর্ব্বলেরা নিয়তির কবলে ধরা দেবে। মৃত্যু, রোগ জরা, দুর্গতি, দারিদ্র্য, দুরাচার ও পাপ ধীরে ধীরে দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করতে থাকবে। রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্ব্বল তাদের হাতে ধরা পড়বে এই জননলিপ্সাকে যথাসম্ভব সংযত করতে হবে, লোকসংখ্যাকে আহার্য্যের অনুপাতে সমান ক'রে রাখতে হবে। আহার্য্যের আয়োজন না ক'রে কোন মানুষই যেন জননলিপ্সার পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যগ্র না হয়। সে যে ক'রেই হোক। সামাজিক প্রথাকে যদি তার জন্য উল্লঙ্ঘন কিংবা সংস্কার করতে হয় সেও করতে হবে। বেশী বয়সে বিবাহ করতে হবে, উপার্জ্জনের উপায় ক'রে। বাল্য বিবাহকে উড়িয়ে দিতে হবে। এবং বিবাহকে অনিবার্য্য ক'রে তুলতে হবে না। তাহলে সমাজ রোগ ও পাপ, দুরাচার ও দারিদ্র্যের হাত হতে মুক্তি লাভ করবে। সকলেই পেট ভরে খেতে পাবে।' এই কথাটা কি আমাদের পক্ষে খাটে না? বিবাহ দিতেই হবে কিন্তু তবে খাওয়ার আছে কিনা তা দেখে কাজ নেই। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এই মন্ত্রবলে চলে ব্যাপারটা যা হয়েছে তাত দেখাই যাচ্ছে। শত শত জন্মলাভ করছে আবার পরমুহূর্ত্তে শত শত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। রোগ শোক দুর্গতি আমাদের চিরসহচর হ'য়ে র'য়েছে। জাতির শারীরিক শক্তি এতে ক'রে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হচ্ছে বিশেষতঃ নারীজাতি আমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর বেদনার দিন গুজরান কচ্ছে। সেকথা অন্যত্র বলা যাবে। তবে অবস্থাটা কোন দিকে দ্রুত চলেছে তা বুঝা হ'ল। আনাহার অর্দ্ধাহারে যে জাতির অধিকাংশই দিনরাত কাটাচ্ছে সে জাতিকে দরিদ্র বলতে হবে না! আর এইরূপে যদি চলতে থাকে তাহ'লে কি দরিদ্রতর হতে থাকবে না? মাটি যোগাবে কম আর লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, বিদেশে পাঠাতেই হবে। এতে কি ক্রমশঃই প্রতি মানুষের অংশ কমে যাবে না?

দ্বিতীয়তঃ ধরা আবশ্যক গবাদি কৃষি-উপযোগী পশুর কথা। গরুই হচ্ছে আমাদের চাষের একমাত্র বাহন। গরু না হ'লে চাষ বন্ধ থাকবে। এই গরু দিন দিন ধ্বংসের পথে উঠ্‌ছে। বৎসর বৎসর তিন চার লক্ষ গরু, অধিকাংশই গাভী, বিদেশে রপ্তানি হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ সকল গাভীর দুধ জমিয়ে টিনের বাক্সে ক'রে বিদেশীরা আমাদের দেশে পাঠায় আর আমাদের সহরের চাকুরীজীবিরা ঐ জমান দুধ তরল ক'রে সদ্যজাত শিশুর প্রাণ রক্ষা করেন। তীব্রত্ব গাভীর দুধ তাদের জোটে না বা সংগ্রহ করতে তারা শ্রম সাপেক্ষ

মনে করেন। এই জমানি দূর পাওয়ানির অন্য আরও কারণ আছে সেটা না বলাই ভাল।

জাতির সর্ব্বনাশ রোধে সচিত হবে নাতকিসে হবে? আমরা স্থানে স্থানে গোহত্যানিবারণী সভা করতে বহু প্রয়াস পাই কিন্তু কোন দিন এই নির্দ্দয় শোষণ প্রক্রিয়াকে একটীবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রেও দেখাতে চাই না। ক্রোধ বা হিংসাজাত রিজল্যুশনের (সভার প্রস্তাব) তর্জ্জন গর্জ্জনে ধর্ম্মের সংস্কারকে উৎপাটিত করা যায় না। শারীরিক অভাবই এই সংস্কারকে শিথিল করবে ও করতে আরম্ভ করেছে। আজ কাল এ কথা বলতে গেলে বিপদে পড়তে হয় কিন্তু এ কথা বলবার আবশ্যকতা আছে। গোহত্যা চাষার (মুসলমান) দুনিয়া হতে উঠে যাচ্ছে। এ সভার জন্য নয়। নিদারুণ ইকনমিক ধর্ম্ম তাকে পালন করতে হচ্ছে ব'লে তার 'কেতাবের ধর্ম্ম, ধীরে ধীরে আসর গ্রহণ ক'রছে। এ কথা অস্বীকার ক'রলে চলবে না। দু দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে সংখ্যায় গোহত্যা হ'ত আজ সেখানে একেবারে উঠে গেছে না হয় নাম মাত্র হচ্ছে। কিসে এটা হ'ল? তার গো হত্যার ধর্ম্ম বিলাসিতাকে উপভোগ করবার অবস্থা আর নেই। তার ধর্ম্ম তেজ নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেছে। কালক্রমে এইটাই অভ্যাস গত হ'য়ে দাঁড়াবে ও শিক্ষার প্রভাবে কৃষি কার্য্যে গো-জাতির স্থান কত আদরের তা সে বুঝবে—গোহত্যা চাষার ইকনমিক রাজ্যে আর দেখা যাবে না। প্রাণের ধর্ম্মের সঙ্গে এই বিলোপ বিরোধ ব'লে মনে হবে না। এত গেল পল্লীর অবস্থা। সহরের ব্যাপারে কি হবে? হিন্দু মুসলমান ও উভয়ের বিরোধকে মিটিয়ে নিলে। অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নূতন ক'রে ক'রতে হবে। আমার কথা শেষ হয় নি।

গোহত্যায় গো-সংখ্যা কমে যেতে পারে কিন্তু গোজাতির শারীরিক অধঃপতনের কারণ কি? সে জন্যও কি গোহত্যাকারী দায়ী? পাশী মাঠে ধর্ম্মের জন্য বৃষের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে প্রথা উঠে গেছে। এখানেও ইকনমিক ধর্ম্ম এসে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেতাবের ধর্ম্ম বা সংস্কারগত ধর্ম্মকে হিন্দু মুসলমান উভয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়ে ইকনমিক ধর্ম্মকে মাথায় ক'রে তুলেছে। কারণ শারীরিক অভাবই অন্তরের অভাবকে ডিঙ্গিয়ে যায় লক্ষ লক্ষ জনের জীবনে। কাজেই সেটাকে একটা অপরিহার্য্য পরিতাপের বিষয় ব'লে মানতে হবেই। এই শারীরিক অভাবের কঠোরতা যেখানে মাথা উঁচু করেছে সেখানে অন্তরের ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। এটা সাধারণ জ্ঞানে নিত্যই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই শারীরিক অভাবকে নিবারণ করবার সহজ উপায় না হ'লে মানুষ অনন্তের পথ ধরতে পারবে না, —অশান্ত কোলাহলেই বিক্ষুব্ধ কৃষ্ণার জ্বালায় ছট্ ফট্ ক'রেই জীবন সাঙ্গ করবে।

তাই বলছিলাম বিদেশে গাভীর রপ্তানিও গোজাতির অধঃপতন এই দুইটি বিশেষ ক'রে আমাদের কৃষিকে অচল ক'রে তুলবার উপক্রম ক'রেছে। শতবার লাখ লাখ গাভী দেশ ছেড়ে গেল—অবশিষ্ট নির্জ্জীব গাভী ও অপেক্ষাকৃত কৃশ ধর্ম্ম বৃষ হ'তে যে গরুর জন্ম হচ্ছে তার দ্বারা চাষাকে চাষ করতে হচ্ছে। গাভীকে লাঙ্গলে কাঁধ বাঁধাতে হয়েছে আবার অপরিণত বয়স্ক গো শিশুকেও লাঙ্গল টানতে হচ্ছে—এতে ক'রে গোজাতির অধঃপতন হবে না কেন?

এবার বস্ত্র লজ্জা নিবারণের কথা। কলের জন্মের পূর্ব্বে আমাদের কোটী কোটী ভারত-বাসী নিজ হাতে আচ্ছাদন তৈরী করত, বিদেশে পাঠাত, সুখে জমির দানকে ভোগ করত। গাভীর সস্ত দুগ্ধ পুকুরের টাট্‌কা মাছ আর ক্ষেতের ধান এখন স্বপ্ন হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু সময় ছিল, যখন এই জিনিষটা সাধারণের নিত্য জীবনের শান্তি জুটিয়ে দিত। আজ আমরা হাত চালান বন্ধ ক'রেছি। কলের উপর ভরসা ক'রেই আছি। কল যখন যা খুসী তাই ক'রে আমাদের খাটিয়ে নিচ্ছে। আমরা কলের সেবা করতে কুণ্ঠিত না। আচ্ছাদন আমাদের কলের দেশ থেকে আস্‌ছে—আমরা মাটির দানকে দিয়ে সেটা নিয়ে গতর ঢেকে রাখ্‌ছি। তাই কেহ কেহ বলেন, "আমাদের দেশের লোক আগের চেয়ে সহজেই কলের কাপড়ে গা ঢাক্‌তে পারছে। কলের কাপড় এখন যে পরিমাণে আমাদের কোটী কোটী চাষাকে ঢাক্‌তে পারছে কলের পূর্ব্বে তার অর্দ্ধেকও ঢাকা পড়ত না। তিন শ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চাষা এত মূল্যে শস্ত বিক্রী করতে পারত না। আর এত বেশী করে গা ঢাক্‌তেও পারত না। কল এসে বাঁচিয়াছে।" এই অভিমতটীকে খণ্ডন করবার সময় এসেচে। কলভক্ত বেজায় যারা তারা এটা মেনেই নেবেন কিন্তু আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কেন শক্ত তাই বল্‌তে চাই। আমাদের দেশের চাষারা পূর্ব্বরূপে গা ঢাক্‌তে পারছে কি না সে যারা শীতের সময় পল্লীর পাড়ায় ঘুরেছেন তারাই ভাল বল্‌তে পারবেন। চাষারা যুদ্ধের সময় উচ্চমূল্যে শস্ত বেচেছিল কিন্তু তার অধিকাংশই বড় বড় বাঁধা অংশীদার লুটে নিয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। উচ্চমূল্যের যথার্থ লাভ ব্যবসায়ীর পকেটে গেছে। জমিদার মহাজন তার বাড়তি বেশীকরে আদায় ক'রেছে। সকলই জানেন শস্তের মূল্য মহার্ঘ হইলে জমিদার খাজনার হার বৃদ্ধি করেন। কাজেই চাষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিল। উপমূল্যের সুযোগ সে ভোগ করিতে পারেনি। কিন্তু পক্ষান্তরে কিন্‌তে হয়েছে চারগুণ পাঁচগুণ মূল্যে। ধূর্ত্ত গৃহ ব্যবসায়ীত কড়া ক্রান্তিও ও ছাড়েনি। চাষা একগুণ পেয়েছে ত দশগুণ তাকে দিতে হয়েছে। অতএব শস্তের উপমূল্য বাজারে হয়েছিল ব'লে যে চাষা পেয়েছিল একথা বলা নেহাৎ ভুল। চাষা অজ্ঞ মূর্খ, সে সুযোগ নিতে পারে না। শীতের সময় কাঠের আগুনে চাষার পরিবারকে সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি কাটাতে হয়েছে ও হচ্ছে। পুত্র কন্যা পরিবার একখানার বেশী কাপড় পরতে পায় না। শস্তের উপরই তার সব নির্ভর করে। কি ক'রে সে বেশী করে গা ঢাক্‌বে? নিতান্ত আবশ্যকীয় পরিধেয়ই সে সংগ্রহ করতে পাচ্ছে না। কল এসে তাকে পঙ্গু করেছে। সে নিজে কাপড় তৈরি করবার পথ ভুলে গেছে। কাজেই তাকে কলের উপর নির্ভর করতে হয়। আর চাষার এই নিরুপায়কে ব্যবসায়ী যতদূর পারছে ব্যবহার ক'রে নিজের লাভের পিপাসাকে চরিতার্থ করছে। এই নিরুপায়কে বিনাশ করতে হবে। চাষার ঘরে কাপড় তৈরীর কৌশলকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এস্থলে ঘরে ব'সে কাপড় তৈরী করলে যথেষ্ট হবে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। কলকে একেবারে বর্জ্জন ক'রে হাতের শিল্পকে

প্রাধান্য দিলে আমাদের আচ্ছাদন ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে কিনা এই কথাটার মীমাংসার জন্য অনেকেই ব্যস্ত। প্রশ্নের সমাধানকল্পে আমিও দু একটা কথার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

কল ও চরকা।

কল আমাদের মুষ্টিমেয় বাবু শ্রেণীকে ফাইন সাজে সাজাইয়াছে বটে কিন্তু কোটী কোটী নর নারী কোন গতিকে লজ্জা নিবারণ করছে। কল তাদের আচ্ছাদনকৃচ্ছ্র তাকে নিবারণ করতে সমর্থ হয় নি। তার কারণ অনেক। বর্ত্তমানে আমাদের কাপড় আসছে তিন দিক হইতে যথা—সাগরপারের কল, দেশের কল ও হাতের তাঁত। কল এদেও হাতের তাঁত মেরে ফেলতে পারেনি। তাঁতের আবশ্যকতা আছে। তাঁত আমাদের ধাতের জিনিষ। একে তুলে দেওয়ার চেষ্টা আত্মঘাতী হবে। তাঁত আমাদের চাষার 'কাজের কাপড়' গামছা তৈরি করেছে। বহুমূল্য সূক্ষ্ম শিল্পও তাঁতে হচ্ছে। তবে কল এসে চরকাকে মেরে ফেলেছে। সুতা আমরা তৈরি করতে পারছি না। সাগরপারের কল কাপড় পাঠাচ্ছে আর দশ বিশগুণ লাভ ক'রে চাষার শ্রমফলকে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কল সূক্ষ্ম চাল্‌কা জিনিষ পাঠাবে আমাদের ভারী জিনিষ দিয়ে তা কিনতে হবে। আমাদের খরচ বেশী। ক্ষতি আমাদেরই। তা ছাড়া আমাদের দেশের লোক হয় চাকরী করবে না হয় জমি চষবে আর ওপারে কলে উৎপাদন করবে। এই উভয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ইকনমিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। উভয়ই যদি যন্ত্রশিল্প অবলম্বন করে দুইটী বিভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি করত তাহলে উভয় দেশের অবস্থা বিশেষত দ্রব্যবিনিময়ের আদান প্রদানে উভয় দেশই লাভবান হ'ত; কিন্তু একদেশের লোক উৎপন্ন করবে আর একদেশের লোক নিরিবিলি সেটাকে ক্রয় করবে কাঁচা দ্রব্যের বিনিময়ে, সেটা শেষোক্ত দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কাজের বিনিময় কাজ হইলে একে অপরের দ্বারা সাহায্য ও লাভ পেতে পারে। কিন্তু কাজের বিনিময়ে অকাজ; সেখানে লাভ হওয়া ত দূরের কথা, একে অপরকে শুধু শোষণ করতে থাকে। এ অবস্থায় আমাদের দেহের আবরণের জন্য সাগরপারে কল বসিয়ে যদি আমরা হা করে ব'সেই থাকি তা হলে এমন সময় আসবে যখন আমরা লজ্জা নিবারণ করতে পারব না। এছাড়া যদি কোন কারণে কল বন্ধ হয়ে যায় তা হ'লেত সর্ব্বনাশ! সুতরাং যে ক'রে হোক্ আমাদের দেশের মধ্যে কাপড় তৈরির ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তা না হ'লে চাষার রক্ত শুকিয়ে যাবে; সে ম'রবে; সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকলই ঠক্ ঠক্ ক'রে থ'সে মাটির উপর ব'সে প'ড়বে। এ অবাক্ করবার কল্পনা নয়। এখন তাহ'লে কাপড় তৈরি দেশের মধ্যেই হওয়া চাই; এটা বোধ হয় সকলেই মান্‌বেন। তবে তৈরি করতে হবে কলে না হাতে? কলে যদি করা যায় তাহলে পশ্চিমের ধনে ও শ্রমে যে তুলুল দ্বন্দ্ব সমাজের ভিত্তি ভূমিসাৎ করতে বসেছে সেই ধন শ্রমের অভিনয় লোমহর্ষণ কাণ্ড ক'রে শত ছিন্ন ভারতকে দীন বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে। শ্রমার দল বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ী পকেট পূর্ণ করে ধনের

স্পর্দ্ধায় শ্রমীকে অবজ্ঞা ক'রতে থাক্‌বে। এই উৎপন্নের অসমান বণ্টনের অধিকার পুঞ্জীভূত হ'য়ে সমাজের প্রতি শিরা প্রতি রক্তবিন্দুকে বিদ্রোহী ক'রে তুল্‌বে। এ অশান্তির দুঃখ এখনই ভায়ুকে প্রপীড়িত করতে শুরু করছে। পল্লী শূন্য হ'য়ে সহর ভ'রে যাবে। কলের আওতায় শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রমী হ'য়ে নানা নির্য্যাতনের হাতে পড়ে জীবন্মৃত হ'য়ে পড়বে। সংঘের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শত শত শ্রমীর একত্র অবস্থান কি ভয়াবহ তাহা কলিকাতার নেছুয়াবাজার ও টিটাগড়ের মিলক্ষেত্র যারা দেখেছেন তাঁরা কথঞ্চিৎ হৃদয়-ঙ্গম করতে পারেন। এতে নৈতিক পদ্ধতিকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করতে তারা বাধ্য হয়। পাটের কলের শ্রমীদের বাসের আড্ডায় গেলে বুঝা যায় শ্রমীর জীবন ও পশুর জীবনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কাল হ'তে শ্রমীর অভিযোগকে মিটিয়ে দিতে কত না প্রয়াস চল্‌ছে কিন্তু শ্রমীর অভিযোগ ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রমীর দুঃখ বেড়েই চলেছে। নিবৃত্তি হয়নি ও হওয়ার আশাও করা যায় না যদি গতানুগতিক ভাবকে পরিত্যাগ ক'রে কলকে সরল না করা হয়। সুতরাং পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে কলের আখড়া ক'রলে চাষার যেমন আজ অবস্থা তাতে, সে দুই ছেড়ে কলে ঢুক্‌বে, জমি 'আল্লা আল্লা' করবে; তারপর আসে ইউরোপ এসে ভারতে ঢুক্‌বে তখন লেগে যাবে একেবারে যুদ্ধ। আর এক দিক হতে ব্যাপার আরও শোচনীয় হয়ে উঠ্‌বে। ইউরোপে কল শিল্পরাজ্যে বিপ্লব এনেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরাজ্যেও সমভাবে পরিবর্ত্তন সাধন করেছিল। শিল্প ও কৃষি সমাজস্তরেখার যুগপদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কল আসবে শিল্প জাগাতে কিন্তু কৃষি চির-অবহেলার সামগ্রী হ'য়ে উপবাস করবে। এর পরিণাম হবে ভয়ানক। আমেরিকার পূর্ব্বভাগ শিল্পের জন্য বিখ্যাত কিন্তু পশ্চিমভাগ ষোল আনা কৃষির জন্য বাঁধা রয়েছে। উভয় স্থলে কল লেগেছে, কৃষি শিল্পের ইন্ধন যোগাচ্ছে। উভয়ই পুষ্টি লাভ ক'রেছে। বড় বড় ধনী কৃষির উন্নতি কল্পে সময়, অর্থ ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করেছে। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হবে না। শিল্পের ইন্ধন বিদেশে হ'তে আন্‌তে হবে। আবার যে ঋণী—সেই ঋণীই হতে হবে। আমাদের কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সময় সময় কৃষির জন্য পল্লীমাঠে বহুসংখ্যক কৃষি শ্রমীর আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান কৃষিশ্রম মহার্ঘ ও দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে একথা সকলই জান্‌তে পেরেছেন। তাহ'লে কলে যখন দেশ ছেয়ে যাবে তখন বাঁধা বেতনের জন্য জমির শীলতপের হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার লোভে সকলে কলের ছাউনিতে যেতে হাত লাগিয়ে দিবে। কৃষিশ্রম আরও দুর্লভ হ'য়ে উঠ্‌বে। অধিক মূল্য দিয়ে চাষ কার্য্য নির্ব্বাহ করা তখন বিষম ক্ষতিকর ঠেক্‌বে, অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে কল ধ'রবে। আমি বলেছি কৃষির যদি উন্নতি না হয় তাহ'লে এই কলের লোভ দিন দিন বেড়ে যাবে। কিন্তু ধরা গেল কৃষি উন্নত প্রক্রিয়ার সাহায্যে বেশ পুষ্টলাভ ক'রল। তখনও কলের লোভ কম্‌বে না। কলের মধ্যে যে দুরবস্থা ঘট্‌বে তা'ত পূর্ব্বে বলা হ'ল এবং তারই মধ্য হতে যে দুর্ব্বল রুগ্ন বালক

বালিকার জন্ম হবে তারা কর্ম্মী হবে কম। কলের মালিক তাদিগকে বিনায় দিয়ে অতি-প্রমী কৃষক সন্তানকে কলে নিযুক্ত করবে। রুগ্ন, ক্ষীণ, খর্ব্ব সন্তান পথের ভিখারী হ'য়ে সহরের আকাশ পাতালকে করুণ ক্রন্দনে উতালা ক'রে তুলবে। কৃষি অনাদৃত হয়েই থাকবে। আমি কৃষিকে উন্নত ধরে নিয়েও সুফল পেলাম না। যদিও এই কৃষির উন্নতি করতে গেলে কত প্রয়াস ব্যর্থ হবে তার অন্ত নাই। বর্ত্তমানের এহেন অবস্থায় চরকা ও তাঁত আমাদের দুঃখ নিবারণ করতে পারবে সম্পূর্ণরূপে। চাষারা বৎসরের সকল সময়েই জমির উপর ব'সে থাকে না। তাদের অনেক অবসর আছে। এই অবসর সময় তারা চরকা ও তাঁতের সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই চরকা ও তাঁত অতি সামান্য ব্যয়ে গৃহে খাড়া করা যেতে পারে কিন্তু একটা কলে লক্ষ লক্ষ টাকার আবশ্যক। আমাদের দরিদ্র দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে না। কল বসাতে গেলেই বিদেশী ধনী এসে টাকা খাটাবে। চা বাগানের মালীক অনেকেই বিদেশী। বোম্বাই এর সূতা ও কাপিড়ের মিল বিদেশীর হাতে। এদেশে পাটের কল বিদেশীর। বিদেশী মালিক হয়ে আমাদিগকে ক্রীতদাস ক'রে তুলবে আর আমাদেরই পরিশ্রমের ফল বিদেশীর গোলা ভরতি করবে। এঅবস্থা কি সুখের হবে? আজ চাষা বৎসরের অনেক সময় কাজ না পেয়ে আলস্যে সময় কাটাতে বাধ্য হয়। অনাহার জোর করে (Expriced illeness) তাকে পেয়ে বসে। আমাদের চাষার স্ত্রীকন্যা চাষার কর্ম্মক্ষেত্রের নিত্য সহচর। পাঁচ বৎসরের ছেলেটিকেও সে বসিয়ে রাখিতে পারে না। তাকে তার পিতার সাহায্যের জন্য মাঠে যেতে হয়। বিদ্যা-শিক্ষারও সময় তার জোটে না। অর্থের অভাব ত আছেই। সময়ের অভাব আছে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালককে মাঠের কাজে পিতার সঙ্গী হ'তে হচ্ছে। স্ত্রীকন্যাকে ত গৃহের সব কিছুই করতে হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে চাষা গৃহ পরিবারের কেউ ব'সে নেই—অথচ এটা ঘটে বিশেষ ক'রে যখন চাষের কাজ খুব বেগে শুরু হয়। আবার কাঠের কাজ ফুরিয়ে গেলে এদের সকলই একরূপ অবসর পায়। এই অবসর সময়ে চাষা কোন কাজই পায় না। এই অবসর সময় যে চাষ করে ব'সে স্ত্রীকন্যা-পুত্র ও বৃদ্ধ মাতা ও আত্মীয়ার প্রত্যেক শক্তি অনুযায়ী চরকা ও তাঁতে কাজ করতে পারে—বৎসরের প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ অনায়াসে বুনিয়ে তুলতে পারে—এই পরিচ্ছদের জন্য আবশ্যকীয় তুলা ক্ষেতে তৈরী করতে পারে। তাহ'লে ঘরের কাঁচা ফসল ব্যবসায়ীর হাতে নিরুপায় হ'য়ে আর তুলে দিতে হয় না। আর শত শত বিঘায় পাট জন্মাতে ও তাহ'তে অর্থ ক'রতে চাষার জীবনীশক্তি বৎসর বৎসর যে পরিমাণ কমছে—পাট তুলে দিয়ে তুলার পত্তন করলে সে শক্তিটা অপচয় হ'তে পারে না। অবশ্য টাকার জন্য পাট অত অধিক পরিমাণে করবার আবশ্যক কি? ঘর দুয়ার প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় সামান্য কিছু করা যেতে পারে। ইহাতে বৎসর বৎসর নদী বিল খাল খানা ডোবা পুকরিণী কিরূপে পুতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর হয় তাহাও নিবারিত হ'তে পারে। পাট পোয়ার দৌলতে চাষাকে যে নানাব্যাধির হাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সেটাও কমে

যাবে। তাই যদি চরকাও তাঁত প্রবর্ত্তিত হ'লে কল্পের নিরবচ্ছিন্ন শত দুঃখকে দূরে রাখা হবে—চাষার অবসর সময়ে কাজ জেওর হবে—অন্নবস্ত্রে প্রত্যেকেই শান্তির সঙ্গে চরকা ও তাঁত ঘরে ঘরে খাড়া করতে পারবে—আর কলি যুগের যে অনবচ্ছেদ ছবি—অবিরাম স্রোতের মত ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি—ধীরে ধীরে মুছে যাবে—ভিক্ষুকেরা অনেকেই চরকায় কাজ করতে পারে। আজ লাখ লাখ ভিক্ষুকের শত করা ৯০ জন কার্য্যক্ষম দেখতে পাবেন। অন্ততঃ তারা চরকার সহজ কাজ অনায়াসে পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় ব'সে করতে সমর্থ হবে। আর আমাদের এত কোটি নরনারী বালক বালিকা সকলই যদি চরকায় লেগে যায় তবে কত সুতা ও কত কাপড় তৈরী হ'তে পারে। কে বলে যে চরকা ও তাঁত আমাদের দেশকে নগ্নতা হ'তে মুক্তি দিতে পারবে না? যে সময় গেছে তখন কি ভারতের লোক সংখ্যা এতই কম ছিল এবং ভারত কি তখন উলঙ্গ হ'য়ে থাকত—একটা জোর ক'রে বলতে পারা যায় কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করা যায় না। চরকা ও তাঁত পরিচ্ছদ প্রশ্নকে পূর্ণ সুচারুরূপে সমাধান করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে গেছে। এই চরকা ও তাঁত কলের মত গৃহ পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করবে না—গৃহের শান্তিকে নিবিড় ক'রে তুলবে—সহৃদয়তা ও সস্নেহতা মধুর জমে উঠবে; চরকার গানে পল্লীর লতাপাতা ও বনস্পতিশাখা ভ'রে গিয়ে প্রকৃতির সুরভিকে আরও গভীর মনোরম ক'রে তুলবে। মাঠের যুক্ত বক্ষে কাজ ক'রে চাষা গৃহে ফিরে চরকার গানে বিশ্রাম লাভ করবে। কল হ'তে ফিরে শ্রমীকে আঁধার নিরানন্দ কুটীরে রাত্রি প্রভাত করতে হয়—ভাল ক'রে নিঃশ্বাস ফেলবার মত একটুকু খোলা স্থান তার অদৃষ্টে জোটে না। নিরন্তর ব্যস্ততা ও অবিশ্রান্ত কোলাহলে তার জীবনের সকল প্রফুল্লতা ডুবে গেছে। এ দৃশ্য আমাদের ভারতের মুক্ত পল্লীতে নূতন ক'রে পত্তন করতে প্রাণ ভরিয়ে উঠে। কলের শ্রমী আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতা জীবনের তরে চুকিয়ে দিয়ে কলে ঢোকে। জীবন যায় বেরিয়ে গেলে শৃগাল কুকুরের মত তাকে আকাশ বাতাস ও কীট পতঙ্গের খাদ্য হ'তে হয়, এক বিন্দু অশ্রু ফেলবার কেউ থাকে না। রোগ যন্ত্রণায় একটা শান্তি সান্ত্বনার কথাও কেউ তাকে শোনায় না। এমনতর শ্রমীর জীবনে আর এ দেশকে ক্লান্ত ক'রে তুলতে দিতে চাই না। আমাদের চাষা খেতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু গৃহ পরিবারে সে এখনও বাঁধা আছে। পেটের দায়ে হাহাকার চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছে না। এই স্থির গম্ভীর পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করতে চাই না। এর মধ্যে অভাব এসেছে বটে, কিন্তু অভাবকে দূর ক'রে একটু সম্পদ্ আনতে পারিলে পল্লী সুখ শান্তির কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে সন্দেহ নাই। কল এসে এটাকে একেবারে বিনাশ করবে। একবার বিনষ্ট হলে আর ওটা ফিরে আসবে না। ইউরোপ হাড়ে মর্ম্মে তা বুঝতে পারছে। শ্রমী যে একবার ঘর ছেড়ে মালিকের হ'য়ে খাটতে শুরু করেছে সে আর ঘরে ফিরতে পারল না। পশ্চিম কত সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ঘেঁড়ে কেটে লিখছে, মন্থন করছে কিন্তু যা একবার হারিয়ে গেছে সে শান্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র আর গড়ে উঠল না।

এ বড় কম দুঃখের কথা নয়। এ অভিজ্ঞতা হ'তে আমাদের শিক্ষা ক'রবার আছে। সে জন্য এতখানি ঘুরে বলি তাঁত ও চরকাই আমাদের মুক্তির পথ খুলবে—শান্তি আনবে—স্বাধীনতাকে মূর্ত্তিমান্ ক'রে তুলবে। একে উপেক্ষা করলে চলবে না। যারা কাইনের ভক্ত তাদেরও নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। তুলা ও রেশম আমাদের দেশে যে সমস্যার সৃষ্টি করবে তাতে কম বাবুগিরি হবে না! বিদেশকে আমাদের এখনি মুগা মটকা বিমুখিন করবে; আমাদের দুর্ভাগা দেশকে আবার ভয়মুক্ত করবে।

আবুল হোসেন

তৃপ্তি

সুখটিরে কেউ ভৌল করে
  মনের মিঠে কামনায়,
জ্ঞানটিরে কেউ নিজের
  খুশীর মাপে,
বিশ্বাস কেউ ভাঁড়ার ঠাসে,
  কৌশলে কেউ অভিপ্রায়,
শানিত ছুরি রাখচে
  জরির খাপে
আমার মন সে আমার মতন
  তার কথা কে জানবে হায়
শান্তিতে সে তৃপ্তি নিয়েই যাবে

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

সাহিত্যের কথা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য এক অভিনব সামগ্রী। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে যে সত্য কল্পনার হরীন আলো ভেদ করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার রেখাসম্পাতেই বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। জীবন যেমন বিচিত্র সাহিত্যও ঠিক তেমি বিচিত্র। সংস্কার ও সত্য এই দুইটা জিনিষ এক নয়—একটীর কাজ মিথ্যা—অসুন্দরকে লইয়া—এবং অপরটী বাড়িয়া ওঠে সত্য ও সুন্দর জিনিষ লইয়া। তাই আজ যখন মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে এক নূতন কঠোর অনাবৃত সত্যের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তখন সমাজে এক দল লোক অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে বাঁধাধরা গতানুগতিক কোন জিনিষের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারে না, তার প্রাণ স্বতঃই একটু খোলা আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া শত বৎসরের এই আবর্জ্জনার স্তূপ কাঁধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্তি পাইতে চায় এবং এই মুক্তির জন্যে পাগল হওয়াটাই অন্তরের আসল স্বরূপ। জীবনের এই যে সত্যিকার চাওয়া ইহাকে ঘিরিয়াই আনন্দ জন্মলাভ করে, ইহাকে লইয়াই মানুষ দিনের পর দিন তার জীবন পথের পাথেয় পূর্ণ করিয়া চলে। মানুষের, সমাজের, দেশের যা উন্নতি তা নিজকে প্রকাশ ও বিস্তৃত করিয়াই; মিলনের যে বাইরে এবং ভিতরে স্থান আছে তাহা পাঁচিল গাঁথিয়া আমরা কেবল নিজের অহঙ্কার ও স্বাতন্ত্র্যটাকেই বড় করিয়া দেখি—বিশ্বমানবের কিসে যে সত্যিকার হিত হইবে তা চিন্তা করার আমাদের অবসর হয় না। আদিম কালের কথা যদি আলোচনা করি তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই এই ভালবাসা ও প্রীতি প্রথম অতি অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—কিন্তু যখন ইহা ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—তখনই হইল দেশের প্রকৃত উন্নতি। নিজের স্বাতন্ত্র্যকে আমি খাট করি না কিন্তু তাই বলিয়া অন্যের যাহা খাঁটী আছে তাহা সংস্কারের বশে বাদ দেওয়াটাকেও আমি পৌরুষ বলিয়া বিবেচনা করি না। মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে, শিল্পে, আদর্শে এবং সমাজেও যে পরিবর্ত্তন হইবে ইহা তো ধ্রুব সত্য কিন্তু যিনি এই পরিবর্ত্তনকে সহ্য করিতে পারেন না, জাগরণের এই শুভ লক্ষণকে মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ মনে করিয়া গলিত সমাজ-দেহকেই আশ্রয় করিয়া আছেন, তিনি মানবাত্মার প্রকৃত উন্নতি কিসে তাহা বুঝেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না; যাহাকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন পাছে সেই মধুর শাস্ত্রীয় বিধিবিধান না মানার ফলে তাহাকে নরকগামী করে, এই ভয়ে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই বিদ্রোহের সুর আমরা শ্রদ্ধেয় ৺ বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীতেও

পাইয়া থাকি। কিন্তু তখন সমাজে চিন্তাধারা বিভিন্নমুখী ছিল বলিয়াই অথবা তিনি নিজে যে মত পোষণ করিতেন তাহা support করিবার জন্যই হোক একটা চূড়ান্ত শেষ মীমাংসা তাঁহার সাহিত্যে আমরা পাই না। ইহা অবশ্যই কেহ অস্বীকার করিবেন না যে প্রত্যেক যুগের চিন্তার একটা আঁচ আমরা সেই সেই যুগের সাহিত্যে একটু বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে ইহা লইয়াও আজকাল অদ্ভুত লম্ফঝম্প করেন।

তার পর আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি। রবিবাবুর 'ঘরে বাইরে', 'নৌকা ডুবি', 'চোখেরবালি', 'গোরা', এবং শরৎ বাবুর 'শ্রীকান্ত', 'বামুনের মেয়ে' 'চরিত্রহীন', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস্' প্রভৃতি সমাজের এক এক অংশের কদর্য্য নগ্নতা এমন নির্ম্মম ভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে তাহাতে অনেকেই বাস্তবিক শিহরিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের এই গল্প বা উপন্যাস রচনা শুধু Arts for art's sake নয়—যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালীর বাইরে ভিতরে যে অভাব ও অসম্পূর্ণতা জাগিয়া উঠিয়াছে, সত্যকে সংস্কার-হীন অনাবৃত করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বাঙ্গালীর গৃহের সমস্ত সুখ দুঃখ হাসি কান্না মিথ্যা ভিত্তি না পূর্ণ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা যাচাই করিবার জন্য যে বাসনা ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। ফরাসী বিপ্লবের সাথে সাথেই সমগ্র য়ুরোপে যেমন আদর্শে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে এক বিপ্লব বহিয়া গিয়াছিল গত মহাযুদ্ধের পরও এখন সমগ্র বিশ্বে সেই প্রকারের এক তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে পশ্চিমে ইবসেনের সাহিত্যও তার প্রমাণ। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মার মিলনের গোপন দ্বারটি যখন খুলিয়া গেল তখন তাহারা বাহির হইয়া পড়িল একে অপরের সম্মুখে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় তাদের সকল ঘুচিয়া গেল। তাহারা অনুভব করিল মানুষ মানুষ এর মধ্যে বিজাতীয় স্বজাতীয় কোন ভেদ নাই, হিয়ার গোপন বীণার তারটি সব একই সুরে বাঁধা। তাই আজ যখন সত্য আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে তখন ধীরে ধীরে সমাজের অর্থহীন সংস্কারের বাঁধন ক্রমশঃ খসিয়া পড়িতেছে ইহাতে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

অন্যের কিছু অন্ধের মত বিনা বিচারে গ্রহণ করা যেমন জড়তা অন্যের জিনিষ হইতে অন্ধ সংস্কারে দূরে সরিয়া থাকাও তেম্‌নি জড়তা। তাই আজ কাল যখন সাহিত্যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে তখন এক দল লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—'ওহে ও সব বিজাতীয় আদর্শ!' কিন্তু চিন্তার কথা এই যে, সাহিত্যে যে সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা কি নিছক কল্পনা, না ইহার কোনও স্থির ভিত্তি আছে, এবং ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর না অমঙ্গলজনক।

আমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন—তাহার পৃথক কোন সত্তা নাই—স্বামীর কথা ও ইচ্ছানুযায়ী চলা এবং পতিপদ ধ্যান করাই তাহার পরম পূজা। ইহা যে যুগেরই আদর্শ হোক্ না কেন। কিন্তু এই

যুগে যে উহা আদর্শ হইতে পারিবে না এবং হওয়া উচিতও নয় তা যাহারা নিতান্ত চোখ কানের মাথা না খাইয়াছেন তাহারাই স্বীকার করিবেন। আদিম কালের সীতা সাবিত্রী এখন আর ঠাঁই পাইবে না কারণ নারীকে সম্পূর্ণ রূপে না পাইয়া পুরুষের মনে যে অভাব গুমরিয়া উঠিয়াছে তাহার ফলে পুরুষ নারীকে আর পথপ্রান্তে দাসীরূপে পাইতে চায় না, শয্যাপ্রান্তে প্রিয় সখীরূপেই পাইতে চায়। নারীর শিক্ষার পথ যত দিন রুদ্ধ ছিল তত দিন তাহারা পুরাণো মতই বজায় রাখিয়াছে কিন্তু শিক্ষার আলোকে আজ তাহারা নিজেদের চিনিয়াছে, নিজেদের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছে, বিশ্বের সমুদয় শুভ কার্য্যে তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং পুরুষের সাথে চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান নাই বলিয়াই যে পশু হইতে চলিল তাহা বুঝিয়াছে, তাই কুকুরের মত প্রভু ভক্ত হওয়াটাকেই তাহারা নারীত্বের আদর্শ বলিয়া মনে করে না। স্বামীরই যে শুধু তার উপর অধিকার আছে তা নয়, স্বামীর উপরও যে তার তুল্য অধিকার এটাই নারী-আন্দোলনের গোড়ার কথা।

কয়েকদিন হয় এক মাসিকে দেখিলাম একজন লেখক লিখিয়াছেন—নারীকে আমরা শ্রদ্ধা করি ভালবাসি বলিয়াই তাহাকে অন্তঃপুরে রাখিয়াছি; যেন বাহিরের ঝড় ঝাপ্টা চিন্তা ও ক্লান্তি হইতে তাহারা দূরে ও সুখে থাকিতে পারে। কবিত্বের দিক দিয়া কথাটা মূল্যবান্ বটে—কিন্তু বাস্তবজীবনে ইহা কতটুকু সত্য তাহা বিচার করিতে গেলেই গলদ বাহির হইয়া পড়িবে। নারীকে আমরা গৃহের ভিতরে রাখিয়াছি, নারীকে দেবী ইত্যাদি আখ্যা দিই, কিন্তু সমাজে দিবারাত্রি নারীর উপরে কি অত্যাচার অবিচার হইতেছে তাহার খোঁজ রাখি কি? নারী ও যে মানুষ, তাহার ও সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে—বাঁচিতে হইলে মনুষ্যত্বের অধিকার লইয়া যে তাহাকে বাঁচিতে হইবে এই মোটা সত্য কথাটাই যে আমরা ভুলিয়া বসি! এইযে সব বধূনির্য্যাতনের মামলা উঠিতেছে, পুরুষ ৬০।৭০ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ২।৪ মাস যাইতে না যাইতেই শোক দূর করিবার ইচ্ছায় পুনরায় যুবতী স্ত্রী বিবাহ করিতেছে—আমরা যে নারীকে দেবী বলিয়া মানি ও শ্রদ্ধা করি ইহা কি তাহারই প্রমাণ! বয়স ও বুদ্ধির দোষে, অথবা অন্য পুরুষের কুমন্ত্রণায় কোন নারী যদি একবার ভ্রষ্ট হয়—তবে তাহার শত অনুতাপ ও বুকফাটা ক্রন্দন সত্ত্বেও সে সমাজে স্থান পায় না—কিন্তু পুরুষ তাহার শত অমানুষিক জঘন্য অত্যাচার সত্ত্বে ও সমাজে বসিয়া প্রভুত্ব করে—এবং এমন কি কেউ কেউ ইহাকে পুরুষত্বের একটা দাবী বলিয়া বিবেচনা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না! তারপর আবার ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন—কেহ কেহ আবার তাহাতে ও তৃপ্ত না হইয়া নারীকে 'দিনকামোহিনী রাতকাবাঘিনী' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। নারী অশিক্ষিতা হইলে তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকে না—অথচ তাহাদের শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা আমাদের দ্বারা হওয়া দূরে থাক্—মেয়ে মেমসাহেব হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে স্কুলে পাঠাইতেও ভয় হয় কিন্তু বক্তৃতার বেলায় আবার আমরাই

প্রচার করি, 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না।' তারপর অনাথা বিধবাদের কথা। কত বলিব! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এর পরেও গলাবাজি করিতে ও মিথ্যাকে সত্যের নামে চালাইয়া দিতে আমাদের লজ্জাবোধ হয় না!

বিশেষতঃ, পুরুষের জীবন কাটে বাহিরে এবং নারীর জীবন গৃহে নানা সামান্য কার্য্যে অতিবাহিত হয় বলিয়া পুরুষ ও নারীর চিন্তা ও আদর্শে কোন মিলন আজ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিতেছে না; ফলে তাহাদের জীবনে সত্যিকার একটা যোগাযোগ নাই, সুতরাং যৌন সম্বন্ধটাই বিশেষভাবে প্রকট হইয়া দাড়াইয়াছে। পুরুষ তাহার সকল চিন্তার অংশীদার পায় পুরুষকে—তাহার অবসর, উৎসব, আনন্দ সকলই কাটে পুরুষের সংসর্গে, তাই তখন তাহার মনে আর নারীর কথা উদিতই হয় না; অপরদিকে নারীর সময় কাটে নারীর সাহচর্য্যে। তাহার হাসি গল্প ঠাট্টা চাতুরী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কার্য্যেই তাহার সঙ্গী নারী, কাজেই পুরুষ আবার তাহার চিন্তার ঠাঁই পায় না। তাই যখন আমরা সমাজ দেহের এই দুই জীবকে লইয়া সমাজ গঠন করিতে বসি তখন হিতে বিপরীত হয়, একের সঙ্গে অপরের আদর্শের মিলন হয় না, চিন্তার মিলন হয় না, বিবাহের যা আসল উদ্দেশ্য সম্প্রাপ্ত হওয়া তাহাই প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়া উঠে না সুতরাং এইরূপ বিবাহের ফল শুভ হইতেছে কি অশুভ হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাংলার প্রাণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে শুধু সাহিত্যের, তাই আজ বাঙ্গালীর প্রাণে যখন বসন্তের দক্ষিণে হাওয়া বহিতেছে—তখন প্রাচীন সাহিত্যের শুকনো পাতা আপনিই ঝরিয়া পড়িয়া তার স্থানে নূতন কচি কিশলয় দেখা দিয়াছে। রবি বাবুর 'ঘরে বাইরে' শরৎ বাবুর 'শ্রীকান্ত' ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনের 'উত্তা' এবং শৈলবালা ঘোষ জায়ার 'জনমী অপরাধী' প্রভৃতি তাহারই প্রমাণ।

আমাদের দেশে এখন ঢের 'স্বামী' আছেন—যাহারা একমাত্র বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর উপর সকল প্রকার অত্যাচার করিতে কসুর করেন না এবং সত্যযুগের অপার মহিমা এবং কলিযুগের একপাদ ধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আপশোষ করেন—'হায় কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী, যিনি হাস্যবদনে তাহার দুঃগলিত স্বামী-দেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন! কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ!' তাই 'অভয়ার' স্বামী-দেবতা যখন একমাত্র বৈদিক মন্ত্রের বলেই তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল তখন 'অভয়া' 'শ্রীকান্তকে' কহিল—'তিনি তাঁর ধর্ম্মপত্নী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, শ্রীকান্ত বাবু; কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র এক গাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার কোরে দেন, তারপরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, সেই কথাই তো আপনার কাছে জানতে চাইছি। অধিকার ছাড়া ত কর্ত্তব্য থাকে না শ্রীকান্ত বাবু, এটা তো খুব মোটা কথা। তিনিও তো আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু

সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অথহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ বলে আমারি উপরে?.....যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেছে, তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারা জীবন জীবন্মৃত থাকাই তার নারী জন্মের সার্থকতা? একদিন আমাকে নিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল,—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্ত একেবারেই মিথ্যা এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই?—সমাজ, সংসার আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একদিন নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনা-দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পশু হওয়া চাই? এই ভাগ্যেই কি ভগবান্ মেয়ে মানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্ম্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে, আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক্ বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীকান্ত বাবু?—"

তারপর ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "শুভা"। স্বামীর অত্যাচার, নির্য্যাতন যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন এই প্রকার জীবন যাপনে সার্থকতা নাই দেখিয়া 'শুভা' গৃহত্যাগ করিল বটে—কিন্তু পতিতা হইয়া রহিল—হিন্দু সমাজে আর স্থান পাইল না; কিন্তু তাহার স্বামী 'নিবারণ' তাহার পলায়নের পর বহু ভর্ত্সনা 'মেলীকে' লইয়া ঘর করিতে থাকিলেন—সমাজে ইহাতে কোন উচ্চ বাচ্য বা গোলযোগ হইল না। 'শুভা' নানা অবস্থা বিপর্য্যয় ও সংঘাতের ভিতর দিয়া চলিয়া অবশেষে তাহাকে গ্রহণ করিবার মত উদারতা দেখিয়া ক্রীশ্চান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আসামের Sanitorium এ মৃত্যুশয্যায় সুরেশ বাবুর সাথে 'শুভার' যখন দেখা হইল—তখন উভয়ের যৌবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে;—সুরেশ বাবু কহিলেন—শুভা, মনে আছে তোমার সেই একদিনের কথা, যখন আমি তোমায় আমার ভালবাসার কথা জানিয়েছিলাম। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে, বলেছিলে, পুরুষ মানুষ ভালবাসে না কেবল অধিকার চায়। আমি সেই থেকে বরাবর তোমায় ভালবেসেছি। আজ তোমার কাছে একটিবার শুনে যেতে চাই যে, তুমি বিশ্বাস কর যে আমার ভালবাসা সত্য ও নিঃস্বার্থ। বিশ্বাস কর কি শুভা"? "শুভা" কাঁদিয়া ফেলিল—সুরেশ বাবুর এই প্রবল নিষ্পাপ ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়া সতীনাম কেনার চেয়ে তাহাকে গ্রহণ করিয়াই ধন্য হইল।

আমাদের দেশে এই হিন্দু সমাজে এত বড় ভালবাসাটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার সাহস এখনও হয় নাই—বরঞ্চ ইহাকে আমরা আগাগোড়া ঘৃণা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না—কারণ আমাদেরও সমাজের চোখে মনুষ্যত্বের চেয়ে পতিব্রতা ঢের বড় জিনিষ। যে সমাজ, যে ধর্ম্মে এতটুকু উদারতা ও সত্য-সুন্দরকে গ্রহণ করিবার সাহস নাই সে সমাজ,

সে ধর্ম্ম যে ভ্রান্ত এবং মানব জীবনের বেদনা-সার্থকতাকে অস্বীকার করিয়া নিজের মরিবার পথ পরিষ্কার করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। মনুর আমলের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আমাদের দন্তধাবন হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন প্রতি কার্য্য ও চিন্তাকে এরূপ নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে স্বাধীনভাবে কিছু বিনিময় চিন্তা করিতেও আমাদের ভয় হয়—তাই কোন স্বাধীন সবুজ হিয়ার মর্য্যাদাও আমরা বুঝি না। এই প্রসঙ্গে সমাজই লক্ষ্য করিয়া Pulsford এক জায়গায় যা লিখিয়াছেন—তাহাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে—

'If they hear Christ, or a Christ-like man, whom the truth has made free, they stumble, because he speaks not in the words of their tradition, but in the words which the fresh, living spirit of to-day teaches under a truly human, unfettered liberty of speech, they know not their own doctrines. Christ certainly speaks with great force and authority, but then He speaks not as their Scribes and Pharisees speak.

সমাজসংরক্ষণ এবং সর্ব্বোপরি নিজের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বিবাহ দরকার বটে,—কিন্তু তাহা আজকাল যেরূপ ভাবে হইতেছে অর্থাৎ negotiation by a third party,—তাহা যে ব্যক্তির স্ফূর্ত্তি ও বিকাশকে পদে পদে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহার উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে—ইহাই সবচেয়ে ভাবিবার বিষয়। জীবনে যাহার সাথে কখনও পরিচয় হয় নাই—যাহার চিন্তা ও শিক্ষা আমা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী—যাহার সহিত মনের জোরে জীবনটা একসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেল সত্য—কিন্তু ইহাতে দাম্পত্যজীবন সুখী হয় কি অসুখী হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। স্বামী স্ত্রীর মনের মিলন হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহা হয় না—স্বামী, স্ত্রীকে নিজ সম্পত্তি ও আজ্ঞাধীন দাসীজ্ঞানে অবজ্ঞা ও ইচ্ছামত পশুর ন্যায় ব্যবহার করে,—স্ত্রীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারেন না—সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজ জীবন সার্থকতার জন্যে স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার ন্যায়ত ও ধর্ম্মতঃ আছে।

বহির্জগতই শুধু একমাত্র ও শেষ নয়—ইহা ভিন্ন একটী মনোজগতও আছে—সেখানে ভাব ও ভালবাসার আদান প্রদান চলে। এই স্থানে মানুষ যাহাকে নিতান্ত আপনার করিয়া পায়—বাসনার ক্ষণিক মোহে নয়, প্রেমের পবিত্র আলোকে; তাহার সহিত মিলনে যদি বহির্জগতের আইন কানুন বাধা প্রদান করে—তবে তাহাকে অস্বীকার করাই জীবনের একমাত্র শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ কাজ। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে বৈধিকমন্ত্রকেই আর প্রাধান্য দেওয়া, উচিত নয়, এবং দেওয়া চলিবেও না—প্রেমই তাহার স্থানে আধিপত্য করিবে।

প্রথম প্রথম ইহাতে নানা ভুলহইতে পারে, স্বীকার করি,—কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাও ভুলিলে চলিবে না। ভুল করা যাহার অধিকারে—সে-ই একদিন প্রকৃত অনাবৃত সত্যের সন্ধান পাইবে,

বিফলতাই তাহাকে ক্রমে ক্রমে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিতান্ত প্রাণহীন জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিলে জীবনে কোন ত্রুটি সংঘটিত হইবে না সত্য—কিন্তু ইহাই কি মনুষ্যত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায়?

তারপর দ্বিতীয় সমস্যা সাহিত্যের গতি বন্ধনহীন উদার উন্মুক্ত হইবে না, বন্ধনের পর বন্ধনে তাহার স্বাভাবিক সুন্দর গতিকে হ্রাস করিয়া দিয়া ইহাকে বিধিনিষেধের অধীন করিয়া তুলিব, সাহিত্যসৃষ্টি কি শুধু সমাজ-সৃষ্টিরই নিমিত্ত—না ইহার অন্য কোন পৃথক মূল্য আছে? বাবু যতীন্দ্রমোহন সিংহ তো এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া এক পুস্তকই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সাহিত্যকে তিনি শুধু সমাজের standard এ-ই বিচার করিয়াছেন। তাঁহার অন্য কোন সার্থকতা দেখিতে পান নাই—অথবা দেখিলেও তিনি তাহা safely omit করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের স্থান সমাজের অতি নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করি—কিন্তু তাই বলিয়া সমাজই কি সাহিত্যের কষ্টিকপাথর হইবে! বছর দুই পূর্ব্বে 'যমুনায়' বাবু মহীতোষ কুমার রায় চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে পতিত' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—আমি ইহাই শুধু বলিতে চাহি যে, এই সকল রচনার দোষগুণ কেবল মাত্র ইহাদের সমাজনিগর্হিত চিত্রের দিক দিয়া বিচার্য্য নহে। অর্থাৎ বালবিধবার পরপুরুষের প্রতি অনুরাগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া কোন রচনা নিন্দনীয় নহে বা কুলত্যাগিনীর চরিত্র আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সমস্ত রচনা সৌন্দর্য্যহীন নহে এবং ব্রাহ্মণ গৃহের বিধবার শঙ্কিত অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই পুস্তক ও কুৎসিত নহে। প্রত্যেক উপন্যাসের দুইটি দিক্—একটি হইতেছে তাহার Plot বা গল্পাংশ আর একটি এই Plot এর Execution অথবা গল্পাংশের বিবৃতি-কৌশল। সমালোচকের প্রধান দ্রষ্টব্য হইতেছে Execution; Plot বা গল্পাংশে লেখক সামাজিক নীতি ও বিধানকে লঙ্ঘন কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহা দোষের নহে, অথবা যাহারা এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া সমাজে পতিত হইয়াছেন তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না।' যতীন্ বাবু মুখে কবি ও সাহিত্যিককে Moral text book রচনা করিতে বলেন নাই সত্য কিন্তু কার্য্যে তিনি তাহাই করিয়াছেন। সাহিত্যকে বিধি নিষেধের অনুগামী করিয়া তাহার স্বাধীন-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বাধা দিয়াছেন—ভুলেও চিন্তা করেন নাই জল যতই গভীর হোক্ না কেন তাহার স্রোতকে যদি আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তবে একদিন না একদিন সেই জল আর নির্ম্মল থাকে না।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছিলাম—কোথায় নাকি এক বদ্ধ সম্পূর্ণ পাগল থাকিত—সারাদিন আবল তাবল বকিয়া, লোকের সাথে ঝগড়া-ঝাটি ও মারামারি করিয়া সারাদিন কাটিত। একদিন সকালবেলা দেখা গেল পাগলটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া হন্ হন্ করিয়া কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে, লোকে অবাক্ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হারে কোথায় যাচ্ছিস্'? পাগলটি উত্তর করিল—'ও পাড়ার কে নাকি পাগল হয়েছে তাকে ভাল করতে যাচ্ছি।'

যতীন বাবুর অবস্থাও অনেকটা সেই প্রকার অদ্ভুত ও অর্থশূন্য হইয়াছে। তিনি বড় গলায় রবি বাবু ও শরৎ বাবুকে 'বিলাতী প্রেম' প্রচার ও সমাজের হিতাকাঙ্খী হইয়া সমাজের কলঙ্ক বিজ্ঞানের ভাষায় প্রচার না করিয়া কাব্যের সাহায্যে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কলহ করিয়াছেন কিন্তু তিনিও যে তাঁর উপন্যাসে এই উপায় ও এই প্রেম প্রচার করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিবার অবসর তাঁর ঘটে নাই কেন?

মন্দ ও অ-দরকারের মিথ্যা হুজুকে অনেক ভাল জিনিষ হইতে নিজকে জোর করিয়া রক্ষা করা যায় বটে তাতে বাহিরের কাজ কর্ম্ম, আলাপ ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান গোঁজামিল দিয়া সেল করা গেলেও অন্তরের বিরাট রাক্ষসীর ক্ষুধা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেই থাকে তাহা আর কোন প্রকারেই মিটে না। জীবনে যাহা সত্য সুন্দর বলিয়া বুঝিবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ ঘটিয়াছে এবং যখন সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিবার অদম্য ও অপরিমেয় বাসনা জাগিয়া উঠে তখন শত সহস্র অত্যাচার নির্য্যাতন জীবনবেদীর এই পুণ্যমঙ্গল দীপ নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট যিনি তিনি সাম্প্রদায়িকতার আগলবদ্ধ নন, তাঁর জীবনে সহস্র দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়া যে সত্যটি গভীর ও নিবিড় ভাবে ফুটিয়া উঠে তিনি তাহা দ্বারাই ব্যথার পূজা সমাপন করেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। তাঁর চিত্ত হয় কোমল, সজীব, সবুজ; তাঁর প্রাণটা থাকে আনন্দ ও আশার রঙ্গে রঙ্গীন্ আর তাঁর জীবনটা হয় সদ্যফোটা বসরাই গোলাপের মত তাজা, খোসবুর মাদকতায় পূর্ণ তাই কোন সংস্কারই তাঁর হৃদয়ে দাগ কাটিতে পারে না, সত্য ও ন্যায়কে তিনি দেশ, জাতি ও সমাজের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়াও গ্রহণ করিতে পারেন কারণ তিনি জানেন বর্ত্তমান যুগের মানুষের স্বার্থত্যাগ ও যাতনার ভিতর দিয়াই ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি-সৌধ গড়িয়া উঠিবে। প্রত্যেক বস্তু তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি দিয়া বিচার করেন। তাঁর প্রেম অনাবিল সুন্দর তাই সাধারণ চক্ষে আমরা যাহা অসুন্দর বলিয়া ভাবি তাঁহার চক্ষে তাহা পরিপূর্ণ মঙ্গলময়।

সাহিত্যে পরপ্রেমাসক্ত যুবকযুবতীর আলোচনা না হইতে পারে, কিন্তু যখন সমাজের অত্যাচার ও অর্থহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে নর নারায়ণের মনে বিদ্রোহবহ্নি সত্যই জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন সমাজ ইহা হইতে রক্ষা পাইবে না তাহাকে পুড়িয়া খাঁটী হইতেই হইবে মনুষ্যত্ব বিকাশের চেয়ে মিথ্যা মরের দাসনে নিজকে আবদ্ধ রাখাই যে দাম্পত্যজীবনে চরম ও শ্রেয় নয় ইহা যখন নরনারীগণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে তখন সমাজে যে পরিবর্ত্তন আসিবে তাহা বলাই বাহুল্য সুতরাং সাহিত্যে এই প্রকার আলোচনা হইবেই। প্রত্যেক মানবচরিত্র যেন এক একটি চিত্র। শিল্পী সাদা, কালো প্রভৃতি নানা রঙ্গ ফলাইয়া চিত্র আঁকেন শুধু এক রঙ্গে চিত্র যেমন কোনদিন সম্পূর্ণ হইতে পারে না তেমি মানবহৃদয় ও ভাল এবং মন্দ এই দুই পরস্পর চিরবিরোধী অমিল চিত্ত-বৃত্তি ও চিন্তা লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই লইয়াই মানুষ অলক্ষ্যান্ত মানুষ, রক্ত মাংসের শরীর। সুতরাং যিনি প্রকৃত মানুষের চিত্র আঁকিতে যাইবেন তাঁহাকে ইহার একটিও বাদ দিলে চলিবে না। দিন দিন জীবনে

মানবচরিত্রের সৎ ও অসৎ এই উভয় প্রকৃতির চিন্তা ও কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত অতি সুনিপুণ-ভাবে তাহাকে দেখাইতে হইবে নতুবা হয় দেবতা, না হয় শয়তানের, চিত্রই তিনি অঙ্কিত করিবেন। ইহাতে যদি সমাজে পরিবর্ত্তন দেখা দেয় তবে তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।

আজ একটি কথা বিশেষ ভাবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে—সমাজের প্রকৃত উন্নতি সমষ্টিকে অস্বীকার করিয়া যেমন নয় তেমি আবার ব্যষ্টির বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও—নইলে সমাজের সার্থকতা আর কোথাও নয়। সৃষ্টি বিচিত্র ও সজীব এই নিমিত্তই কারণ সে ব্যষ্টির বিচিত্রতা দ্বারাই প্রতি পলে পলে নিত্য নূতন রূপে নিজকে নিজকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করিতেছে। তাই, সমাজ যখন এই কথা ভুলিয়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া ভাবেন তখন তাঁরা অজ্ঞাতকেই শুধু প্রশ্রয় দেয় এমন নয় নিজের পায়েও কুঠারাঘাত করেন।

শ্রীসুধীর কুমার সেন

আরবী ছন্দের কবিতা

আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ তেমনি তড়িৎচঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চম্‌কে-ওঠা-ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রকমের নয়,—তা একটু বেশ মন দিয়ে দেখ্‌লে বা পড়্‌লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।

আরবী ছন্দ-সূত্রের যেখানে যেখানে × বা + চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।

(১) হজজ্‌।

সূত্র :— "মকা আয়্‌লুন্ মকা আয়্‌লুন্
মকা আয়্‌লুন্ মকা আয়্‌লুন্।"

কটির কিঙ্কিণ্
চুড়ীর শিঞ্জিন্
বাজায় রিণ্ ঝিন্
ঝিনিক্ রিণ্ রিণ্।
কাঁকণ্-কঙ্কন্
আকুল কন্‌কন্
নাচায় মোর মন,
অধীর দিন দিন।

(২) রমল্‌।

সূত্র :— "মস্‌তক্ আলুন্ মস্‌তক্ আলুন্
মস্‌তক্ আলুন্ মস্‌তক্ আলুন্।"

বিল্‌কুল্ নদীর
মন্ আজ অধীর,
ছল্‌ছল্ দু তীর
চঞ্চল্ অথির।
বর্ষার মাতন
প্রাণ্ উন্মাদন,
ঝড়ার কাঁদন
শন্‌শন্ গতির।

(৩) রমল্‌।

সূত্র :— "ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্
ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্।"

খাম্‌খা হাসফাস্
দীর্ঘ নিশ্বাস,
নাই রে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।
হাস্‌তে প্রাণ চায়,
অম্‌নি হায় হায়
বাজ্‌লো বেদনার
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস।

(৪) মোতা কারেব্‌।

সূত্র :— "ফাউলুন্ ফাউলুন্
ফাউলুন্ ফাউলুন্।"

কলস-জল!
আবার মন্—
ছলাৎ ছল্
ছলাৎ ছল্!

রিণিক্ ঝিণ্
রিণিক্ ঝিণ্
বলুক ঝিন্
কাঁকণ মল।

(৫) মুতাএ।

সূত্র :—"মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্
মফ্ উলাতুন।"

লোকজন বেবাক্
একদম অবাক্
এম্নি গান গায়!
কণ্ঠের গমক্
চম্কায় চমক্
বিজ্লি ঝলক।

(৬) খফীফ্।

সূত্র :—"ফা এলাতুন্ মোস্তাফ্ আলুন্
ফাএলাতুন্।"

আস্লো কাম্বন আস্মান জমীন
হাস্লো বিল্কুল্।
গাইল বুল্বুল্ শোন্ ওই অলস ওঠ্ রে খিল খুল।

(৭) মস্তস্।

সূত্র :—"মস্তফ্ আলুন্—কাএলাতুন্
মস্তফ্ আলুন্—কাএলাতুন্।"

সই তুই শুধাস্—কেমন কই হায়,
প্রাণ্ মন্ উদাস কোন্ সে বেদনায়!
উন্মন্ হিয়ার ক্লান্ত ক্রন্দন্
কোন্ মোর পিয়ার বক্ষ-পুট চায়।

(৮) মোজারা-ই।

সূত্র :—"মফা আয়লুন্—ফাএলাতুন্
মফা আয়লুন্—ফাএলাতুন্।"

ডাগর চোখ তোর বিজলী চঞ্চল
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্ছল্?
হিঙুল-লাল্ গাল পাংশু পাণ্ডুর,
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

(৯) কামেল্।

সূত্র :—"মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্
মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্"

কুহুতান মদির
করে প্রাণ অধীর,
জেগে ওঠ অলস
চেয়ে দ্যাখ্ বধির!
মন্-আঙণ ঘিরণ
এ যে সেই ফাল্গুন,
এ যে সেই বাসর
মদন আর রতির!

(১০) ওয়াফের্।

সূত্র :—"মোফাআলতুন্ মোফাআলতুন্
মোফাআলতুন্ মোফাআলতুন্"

কানের তার দুল্ ঘোদুল্ দুল্ দুল্
কোথায় তার তুল্ কোথায় তার তুল্?
দুপুর বাল্চায় গালের লাল ছায়
শরম পায় গাল নথর তুলতুল্।

(১১) মোতদারিক্।

সূত্র :—"ফাএলুন্ ফাএলুন্
ফাএলুন্ ফাএলুন্।"

তোর অথই
মন যতই
জিন্তে চাই
সই ততই

পাইনে খই
পাইনে খই !
মন শুধায়
কই সে কই ?

(১২) তবীল।

সূত্র :— "ফউলুন্ মোফাআয়লুন্
ফউলুন্ মোফাআয়লুন্।"

চোখের জল !
আমার আর ভাই,
হিয়ার মোর
সোহাগ তোর চাই।
তুহার তুল্
দরদ্ বুঝ্বার
আপন জন
এমন কেউ নাই।

(১৩) মদীদ।

সূত্র :— "ফাএলাতুন্ ফাএলুন্
ফাএলাতুন্ ফাএলুন্।"

হায় এ কারার
নাইক শেষ,
কই মা শান্তির
কোন্ সে দেশ ?
কোন্ সে দূর পথ
জান্তে হায়
পান্থ-বাস যা'র
নাই মা ক্লেশ।

(১৪) বসীত্।

সূত্র :— "মোস্তাফ্ আলুন্ ফাএলুন্
মোস্তাফ্ আলুন্ ফাএলুন্।"

কোন্ বন্ এমন
শ্যাম-শোভায়
প্রাণ্ মন্ জুড়ায়,
চোখ ভুবায় ?
বুল্বুল্ তোমর
মন-বিহগ
চঞ্চল এমন
আর কোথায় ?

(১৫) মন্সরহ্।

সূত্র :— "মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন্
মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন্।"

বাদ্লা-থম্থম্
তার ঘোর নিশীথ,
মেঘ্লা বাদ্ মাস
হায়-হায় কি শীত !
শূন্য ঘর্ মোর
নাই কেউ মোসর—
ঝুর্ছে বায় হায়—
অন্তর তৃষিত !

(১৬) করীব।

সূত্র :— "মফা আলুন্ম ফায়লুন্ ফাএলাতুন্।"

জীবন-সাধন,
প্রাণের বাঁধন—
হায় সে কারাই।
পেলেম আদর
পেলেম সোহাগ,
মনটি পাই নাই।

(১৭) রমাদ্।

সূত্র :— "ফাএলাতুন্ ফাএলাতুন্ মফাআয়লুন্।"

রক্ত-লাল্ বুক,
সিক্ত চোখ মুখ
হাসায় লোক ভাই।
ছিন্ন-কণ্ঠের
কান্না শুন্‌বার
ধরায় কেউ নাই।

সূত্র :—"কাএলাতুন্ মকা আর্‌লুন্ মকা আর্‌লুন।"
আজ্‌কে শেষ গান,
বিদায় তারপর
বিদায় চাই ভাই !
বেদনা সইতেই
জনম যার, নাই
শান্তি তার নাই !

(১৮) মশাকেন্।

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩২৯।

কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

দোদুল দুল

["মোতাকারিব্" ছন্দ]

দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !
বেণীর বাঁধ
আল্‌গা-চাঁদ,
আল্‌গা ছাঁদ
খোঁপার ফুল,
কানের দুল
খোঁপার ফুল
দোদুল দুল্
দোদুল্ দুল্ !

অলক-ছায়
কপোল ছায়,
পরশ চায়
অলস চুল,
বিছুন্-বিন্
কেশের উল
দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্ !

অসংযত
কাঁকের ভিত,
অসংযত
পিঠের চুল,

লোহিত পীত
নোলক দুল
দোদুল্ দুল্ !
দোদুল্ দুল্ !
সোহাগ্-ঘায়
দোলন্-গায়
কাঁপন থায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথায় চুল
দোদুল্ দুল্
দোদুল্ দুল্ !

পরাগ-কাগ
ছড়ায় আজ
শিরাজ-বাঁশি
ইরাণ-গুল,
দোলন্-দোল
সে বুল্-বুল্
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

কাঁকন্ চায়
নাচন্ কিন্

রিমিক্ ঝিম
ঝিমিক্ ঝিম !
আঁচল্-বীণ
চাবির রিং
বুলায় নিঁধ
দুলায় দুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

নিশাস-রেশ
কাঁপায় বেশ
মোতির হার
হিয়ায় দেশ,
কাঁপায় শেষ
প্রাণের কূল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

বুকের কোল
আঁচর যায়
দোলায় দোল্
দোলায় দোল্,
শরম-লোল
মরম মূল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

কলস্-কাঁখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধূল,
ঘুঘিন্ হাত
ঝুলন্-ঝুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল-গ্রীব
দুলায় জড়,—
দুলায় জীব,
গমন্-দোল্
অতুল্ দুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

হাসির ভাস,
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর-ফুল
রাতুল্ তুল
রাতুল্ তুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

মৃণাল-হাত,
নয়ন-পাত,
গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল ?
কোথায় তুল
কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার
অতুল তুল,
রাতুল তুল,
কোথায় তুল ?
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !!

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩২৮।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব

কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে মূল বিশেষত্বটী সহজেই চোখের সামনে ধরা দেয় তা হচ্ছে তাঁর অখণ্ড বিশ্বাত্ম-বোধ। জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের, অগণিত রূপভঙ্গীর মাঝ খান দিয়ে কবি বিশ্বমানবের মূল স্বরূপটী যে তুলি, রঙ্ আর রেখা দিয়ে তাঁর প্রতি কবিতায় নানা ছন্দে নানারূপে ব্যক্ত করিতেছেন—আমরা বিশ্ব-আত্মার একটা অখণ্ড গোটা প্রকাশই তার মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে পাই। তাঁর সেই কৈশোর জীবন হতে আর এই ইদানীন্তন প্রৌঢ় জীবন পর্য্যন্ত—কবিরের ভাবতন্ময়তার মধ্য দিয়ে বাস্তবের যে ইঙ্গিত তাঁর কাব্যগুলির প্রতি পৃষ্ঠায় রেখায় রেখায় আমরা অঙ্কিত দেখ্‌তে পাই, মানব জীবনের স্নেহের, প্রাণের, মনের বুদ্ধির মধ্য দিয়ে শাশ্বত অবিনশ্বর আত্মার একটা অখণ্ড নিবিড় গোপন কথার অবলেপ যেন ঐ সকল কাব্য গুলির মধ্যে সূত্রে মনিগণের মত গ্রথিত রয়েছে বলে' মনে হয়।

সেই জন্যই, কৈশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বের মাঝে কল্পনাজগতের অনন্ত অবকাশের মধ্যে একটা সত্যের ছায়া দেখ্‌তে পেলেন—কবির বুকের মাঝে যেন কি একটা রঙীন্ আনন্দ ফল্গু প্রবাহের মত প্রবাহিত হ'য়ে চারিদিকটা ভাসিয়ে দিয়ে গেল—কবি বিশ্বজগতের সে আলোক মালার দিকে গভীর স্বপ্নাবেশ জড়িত নিদ্রার পরে ফিরে তাকালেন—অন্ধকার হৃদয়গুহায় একটী উজ্জ্বল কিরণ রেখার আবির্ভাবে মন তাঁর উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।

"বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক রেখা!
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
খর পর করি কাঁপিছে বারি,
টল মল জল করে খল খল
কল কল করি ধরেছে তান!

কবিবর প্রাণের আবেগ রাখ্‌তে পারছেন না—এম্‌নি তখনকার সৌন্দর্য্য অনুভূতি! এই ফল্গু জগতের রঙীন্ অনুভূতির স্পর্শ—মানব-জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের, অসংখ্য ভঙ্গীর একটী বিচিত্র খেলা, বিচিত্র ভঙ্গী আমরা এইখান থেকেই কবির জীবনে একটানা গতিতে প্রবাহিত দেখ্‌তে পাই। ধীরে ধীরে এই সৌন্দর্য্য অনুভূতি দেহে প্রাণে মনে ছাপ খেয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে—ভিন্ন ভিন্ন রকমে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির রেশ তাঁর হৃদয়ে সেতারার ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে—কী চঞ্চল বিভিন্নগামী তার গতি! তাই কোথাও বা আমরা দেখ্‌তে পাই কবি নিরাশায়, দুঃখে মুহ্যমান হ'য়ে জীবনের মধ্যে এ সৌন্দর্য্যের স্থান কোথায় দেখ্‌তে পাচ্ছে না—বিরহে তাঁর হৃদয় বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে আবার কোথাও বা বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত ঘটনা-বৈচিত্র্যের মাঝে একটী তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কবি সে সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা

হচ্ছেন। "সন্ধ্যা সঙ্গীতে" তাঁর এই অবরুদ্ধ হৃদয়ের গোপন মর্ম্মব্যথাটি অতি সজোরেই নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছে—

"বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিবে ছার খার!

আবার অন্যদিকে—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি!
এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখাচোখী
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি!
• •
যে দিকে আঁখি যায় সে দিকে চেয়ে থাকে
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে!

কৈশোর জীবনে কল্পনার অনুভূতির মধ্যে যে সত্য জন্ম লাভ করেছিল, সেই সত্যের ক্রম বর্দ্ধমান বিকাশ আমরা তাঁর পর পর কাব্য গুলিতে দেখে থাকি। এই যে শত শত মানুষ গলাগলি করে' হাস্‌ছে—সখা সখী যে চোখা চোখী হ'য়ে বসে রয়েছে—ঐ যে শিশু গুলি মুখো মুখী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—স্বভাবের এই যে বিচিত্রতাময় নানা লীলা খেলা কবি এর মাঝে এক অখণ্ড অনন্ত আনন্দ সূত্রের অবিচ্ছিন্ন ধারা দেখ্‌তে পেতেন মায়া জীবনেও মিথ্যা, মায়া বলে যাকে তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন নি। জগৎ জুড়ে উদার সুরে যে আনন্দ গান নিশি দিন বিরাম নেই বিশ্রাম নেই একটানা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বেজে আস্‌ছে কবি সে গানের মধ্যে নিজকে হারিয়ে ফেল্‌তেন—

"বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সখা ছুটিয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।"

কবি তার অন্ত আত্মহারা! বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের এই চরম অভিব্যক্তিটী তাঁর কাব্যে যতই অনন্ত রূপে অনন্ত ধারায় প্রকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই জীবনের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে এই গভীর একাত্ম বোধের পরম ছন্দটী ততই নব নব রূপে আমাদের প্রাণে এসে ধরা দেয়। তাই কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধে" যখন বৈরাগ্য জীবনকে আক্রমণ কর্‌লে ত, তখনও তার মধ্য হতে আমরা এই একই বাণী শুন্‌তে পাই—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরার প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়,
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে জাগি যেন বাঁই।
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বেলায়
নব নব সঙ্গীতের কুসুম কুটাই।"

একটা সীমার মাঝে অসীমের স্পর্শ, সান্তের মধ্যে অনন্তের ডাক, বন্ধনের মধ্যে একটা নিবিড় মুক্তির আস্বাদই কবিকে যেন ব্যস্ত করে' তুলেছিল—কবি তাই তার সন্ধান দিয়েছেন। এই সময়ে তাঁর সমস্ত লেখার মধ্য থেকে তাই আমরা কেবল এক সুরই দেখ্‌তে পাই। কবি জিজ্ঞাসুর স্বরে প্রশ্ন কর্‌ছেন—এই আকাশ, এই আলো, এই রূপ রস গন্ধ জগতের এই নানা বৈচিত্র্য একি সব

মিথ্যা—সব অসুন্দর ? প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য ময়ী নানার খেলাকে মানুষ যে কোন নামই দিক্ না কেন—কিন্তু সকল নাম রূপের পশ্চাতে এক অনাম অক্ষয় শাশ্বত সত্যের স্পর্শ রয়েছে যাকে কেউই কোন দিন অবহেলা কর্‌তে পারবে না। কবি তাই দরিদ্রা ধরিত্রীকে আহ্বান করে' বল্‌ছেন—

"দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশী ভালবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বড় লাগে
তেমনি কান্নার মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্ম্ম মাঝে বড় ব্যথা জাগে !"

এই ব্যথার নিবিড় টান—এ হচ্ছে বিশ্ব জগতের সঙ্গে জীবের প্রতি শিরায় শিরায় যে মিলন সূত্র রয়েছে—তার গোপন টান। মানুষ সব কিছুকে এড়াতে পারে, ছেড়ে উঠতে পারে কিন্তু এই ব্যথার টান সে কিছুতেই ছেড়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না ; যে দিন এই দুঃসাহসিক কাজ সে কর্‌তে সমর্থ হবে—সেই দিন থেকে তাহলে জগতেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। কবি তাই বল্‌ছেন,—এই ব্যথার টান—এই আমার সত্য টান। যেখানে ব্যথার টান আছে—সেখানেই আমার সত্য প্রেম—কবি এই জন্য স্বর্গে তাঁর আবাস কর্‌তে চান্ নি—স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেখানে কেবল মাত্র সুখের, আনন্দের হিল্লোল—দুঃখের, কষ্টের, ব্যথার ছায়াটী পর্য্যন্ত যেখানে নেই—কবি বল্‌ছেন, সে স্থান আমার নয়।—

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্তো থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরস্নান করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ড গুলি।"

মর্ত্তের এই যে সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা এই সবেরই পশ্চাতে এই সবগুলিকে নিয়ে ও অতিক্রম করে। একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ধারার সন্ধান কবি পেয়েছেন। এই যে স্নেহ, প্রেম—মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে নানা সম্বন্ধের নানা ধারা—বাইরে থেকে এর ক্ষণ-স্থায়িত্ব যতই দেখ্‌তে পাওয়া যাক্ না কেন—একটা নিবিড় রহস্যের গোপন যবনিকার অন্তরালে ইহাদের এক সত্য জগৎ আছে—যেখানে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আনন্দ কিছু মাত্র লোপ পায় না—যাহা চির-অমর, সনাতন, শাশ্বত। কৈশোর বয়সের এই রঙীন সত্য থেকে কবি যখন আরও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সত্যের পথ অতিক্রম কর্‌ছিলেন—যখন কল্পনা আকাশের দুই দিক থেকে দু'খানি মেঘ ভেসে এসে সহসা পরস্পরের দেখা শোনা করুণ মিলিলেও মিল্‌তে পারছিল না—উভয়ে উভয়কে 'চিনি চিনি' করেও চিনতে পারছিল না—

—তারপর হঠাৎ দুজনে দোঁহার পরশ নিয়ে সেই একটুক্ষণের ব্যবধানের মাঝ থেকে কোন কথা না কয়ে ভেসে গেল—যার মধ্য থেকে সন্ধ্যার কাহিনী আর উষার বারতা সেই অব্যক্ত ভাব থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হবার ইঙ্গিত পেল—তখনকার সেই রহস্যের রহস্য-ময়ীকে কবি যখন বাস্তবে তার কিছু কিছু পরিচয় পেতে লাগলেন—কবির তখন যৌবন অবস্থা। যৌবনের কল্পনার রঙীন আভার আলোকে শরীরের কান্তি ফেটে পড়েছে,—কবিতার কি একটা গন্ধে যেন অধীর হয়ে উঠ-ছেন—বাসনার, কামনার একটা প্রতীব্র বেগই কবির শিরায় শিরায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে—

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন সাধে দেহের মিলন

হৃদয়ে আজিও স্নেহ হৃদয়ের তরে
ঘুরিয়া পড়িতে চায় তব স্নেহ পরে !"

আবার—

আমার এ স্নেহ মম চির রাত্রিদিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে ধায়ে হইয়া বিলীন।

* * *

এই অনুরাগি তব বক্ষতলে রাখি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

তাই আমরা দেখি কখনও কখনও "কড়ি ও-কোমলে"—এই অবস্থায় কবির ভোগের দিকে রূপের দিকে বেশী টলে পড়তে যাচ্ছেন আবার কখনও কখনও সীমার মাঝে অসীমকে, রূপের মাঝে অরূপকে সম্পূর্ণ না দেখতে পেয়ে সরে সরে দাঁড়াচ্ছেন—

"ঘুমোনা ঘুমোনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
মান করিওনা আর মলিন পরশে।
ওই দেহ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া
বাসনা নিঃশ্বাস তব গরল বরষে !"

কিম্বা এই সৌন্দর্য্য সাধনায় ভোগ পাচ্ছে একান্ত হ'য়ে যায় এই ভয়ে কারাগার থেকে বাইরে যেতে চাইছেন—

"দুঃখের কারাগার রুদ্ধ এ বাতাস
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বন্ধ এ পরাণ।"

কবির জীবনে কৈশোরে কল্পনারঙীন তরঙ্গ-হিল্লোলের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতি দেবীর অনন্ত সৌন্দর্য্য ভোগের একটা আস্বাদ পাই। ঠিক এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ইউরোপে রোমান্টিক যুগ এসেছিল—কবির ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যার অগ্রদূত। বিশ্ব আত্মার চরম স্বরূপটী আমরা তার সে যুগে উন্মুক্ত দেখতে পাই ;—কবি বলতেন—"Poetry has given me the habit of wishing the beautiful to discover the good and the beautiful in all that meets and surrounds me"—এ কবিরই উপযুক্ত কথা। সেই রোমান্টিক যুগের আর এক দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর রুশ ভাবুক জুকবসকির (Jukvosky) কবিতা—

"Everywhere we hear the familiar voice,
Everywhere we see the unforgotten face ;
O, the sweetness of the sacred thought,
That there, far off in the distant dale,
Thy angel, queen of beauty.
Alone with her grief,
Mourns and weeps her lover.
Even thither does the soul bear
The love and image of the dear one,
Of these, friends, death can never rob us,
For there is life and love beyond the
grave."

আমরা একই তত্ত্ব নব নব রূপে নতুন ভঙ্গীতে বিচিত্র ভাষায় অভিব্যক্ত দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয়েছে—সারা জীবনের কবিত্ব আস্বাদের বিচিত্র রসভোগের মধ্যে কবির জীবনে যে ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে—আমাদের মনে হয়, এই প্রথম কৈশোর জীবনের কল্পনারঙীন কাব্যগুলি সেই জীবন ইতিহাসের প্রথম ভূমিকা স্বরূপ। ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি পরিবর্ত্তিত হয়েছেন বটে, কিন্তু তার মধ্য থেকে মূলগত রসবোধের আমরা কোন অনৈক্য দেখতে পাই না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন শরীরজ ভোগের মধ্যে কেবল গুটা নামা করছিলেন, তখনকার একটা সত্য, একটা সৌন্দর্য্য আমরা খুবই তার ভেতরে মূর্ত্ত দেখতে পাই।

কবির জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের অনন্ত কোটী কামনা বাসনার সঙ্গে একটা বিরহ সূত্র একটানা চলে গেছে। কবি সেই দিক থেকে সার্থক এবং তাঁর কাব্যও সেইদিক থেকে সার্থক। কবির জীবনের এই সার্ব্বাঙ্গীন বিকাশের ফলেই কাব্য সাহিত্যে তাঁর বিশেষত্ব নানান্ ধারায় ফুটে উঠেছে। কবি প্রকৃতিকে যেমন অতিমাত্রায় প্রশ্রয়ও দিতে চান্‌নি—তেম্‌নি প্রকৃতিকে নিরাহ করে' তার ওপারের চরম নামাতীতের সন্ধান করেন নি। কবি এই দিক থেকে স্বভাব সিদ্ধ;—কবির ধর্ম্ম তাই মানুষের ধর্ম্ম আবার দেবতার ধর্ম্মও;—যেখানে মানুষে আর দেবতায় সত্যের দিক হতে মিলন হয়েছে, মানুষ সেখানে নিছক দেবতা হয়ে যায় নি আবার দেবতাও সেখানে নিছক মানুষ হয়ে ওঠে নি। কবির শ্রেষ্ঠ শিল্পটী সর্ব্বদাই এই সত্য মেনে মেনে চলেছে।

ভোগের এই শরীরধর্ম্ম রূপের একটা দিক আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যার প্রবর্ত্তক। আমরা কবির পূর্ব্বোক্ত লেখার সঙ্গে বিদ্যাপতির—

"পিয়া আলিঙ্গনে কত সুখ পাব
পানিক পিয়াস দূর কিয়ে যাব"

—এর সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব যে মূলগত কিছুই তফাৎ নেই। বস্তুতঃ সকল কবির মধ্যেই আমরা এই একটা ভোগের স্থূল স্পর্শ দেখি এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঠিক সেই স্পর্শটী কিরূপ সূক্ষ্ম ভাবে অন্তর দিয়ে সূক্ষ্ম রস পেয়েছে তাও পর্য্যবেক্ষণ করি। কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যে এই বিশেষত্বটুকু আমরা দেখ্‌তে পাই যে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন রূপকের পশ্চাতে তত্ত্বের 'অনুসন্ধান করে রূপকেই আবদ্ধ থেকে গেছেন—রবীন্দ্রনাথের অন্তর প্রতিভা কিন্তু সেই রকম কোন বেড়াজালে ঠক্ খেয়ে যায় নি। দেহ আর প্রাণের রস ছাড়িয়ে করি ভগবানের মনোময় রূপেরও একটা সন্ধান ধীরে ধীরে পেয়েছেন—আমরা তাঁর "জীবন দেবতার" কবিতাতে তা বিশেষ করে দেখতে পাই। প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিগণ যেমন তরে এক সত্যের শৃঙ্গ থেকে আর এক সত্যের শৃঙ্গে অধিরোহণ করতেন—সালুম্ সালুম্ আরোহৎ তুরি স্পষ্ট করুম্—সে বিরাট আকাঙ্ক্ষার অগ্নির দিব্য তপঃশক্তি আমরা কবির মধ্যে সদা-জাগরূক দেখতে পাই। তিনি কিছুতেই তৃপ্ত নন। অগাধ ধনসম্পত্তি বিপুল সংসার সবই তো আছে কিন্তু যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাং—তাই বার বার অন্তর দেবতাকে এই এক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতে শুনি—

"ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?"

এই চির নূতন অন্তরঙ্গ পিপাসা তাঁর সারা জীবন ভরে'। তাই কবি এক নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। সে তত্ত্ব হচ্ছে, সাধনার ক্ষেত্র আমার অন্তরে যে জীবন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁর অন্তরতম বাণীটী ত্যাগ নয়, ভোগ; সে বাণী বর্জ্জনের নয় কিন্তু গ্রহণের। আমার বেঁচে থাকার মধ্যে, শত সহস্র কর্ম্ম-বন্ধনের মধ্যে যে বিশ্বরূপ জীবন দেবতা অন্তর মধ্যে আসীন রয়েছেন—সে দেবতার ইঙ্গিত তো কিছুমাত্রও ত্যাগের দিকে দৌড়য়

না—সে দেবতা যে আমাকে জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে আকাশ, আলো, জল, বায়ু সকলের সঙ্গে একটা গভীর নিবিড় প্রেমেই আবদ্ধ থাকতে ইসারা করছেন—আনন্দই তাঁর চরম স্বরূপটী—আনন্দেই যাঁর স্থিতি, আনন্দ মধ্যেই যাঁর গতি, বিকাশ আবার আনন্দ মধ্যেই যাঁর পরিণতি হ'তে হ'তে চলেছে। এই যে আনন্দ —যা থেকে খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আর্টের এই-ই তো মূল কথা—জীবনের ক্ষেত্রে, জগতের ক্ষেত্রে মানুষের তো এই একই আদর্শ—একই উদ্দেশ্য। আমার এই যে সনাতন স্বভাব, দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি যার এক একটী বিকাশ তাকে ঠেকিয়ে রাখলে জীবন কেবল সংকীর্ণতা পেতেই চলবে—পরম স্বরূপের শ্রেষ্ঠতম দ্যোতনাকে আর জানা হবে না। এই যে সনাতন স্বভাব একে ঠেকিয়ে রাখার পরিণাম ফল হচ্ছে মৃত্যু। যে স্বভাব কর্ম্মে উদ্দীপ্ত, জ্ঞানের অভিব্যক্ত প্রেমে অনির্ব্বচনীয় ;—এই কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেমের ত্রিধা বিকাশ স্বরূপ যে জীবন,—জীবন দেবতা হচ্ছেন সেই রসাধার, যাঁর মধ্য থেকে এ সকলেরই বিকাশ হবে—প্রকাশ হবে। আমরা এইখানেই দেখতে পাই কবি কেন জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে বৈরাগ্যকে আক্রমণ করে আসছেন। "নৈবেদ্যে" তাই লিখছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়—
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্র খানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। এ দীপের মম
সমস্ত সংসার মোর জ্বালি বর্ত্তিকায়
আলায়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন—সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রসে তার মাঝ খানে
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে ফলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে কলিয়া।"

জীবন দেবতার এই চরম রসটীর সন্ধান কবি পেয়েছেন। এই সন্ধানের মধ্যে তিনি দেখেছেন—জীবনের প্রতিদিনকার তুচ্ছ খুটিনাটী ঘটনাটীর সঙ্গে এই জীবন দেবতা সংশ্লিষ্ট—সংযুক্ত। আমরা কাব্য জগতে রবীন্দ্র নাথের এই বিশেষত্বটী সর্ব্বাগ্রে দেখতে পাই,—দেহের স্তরে তিনি তাঁর কাব্য একটা বিশ্বদেহেরই উন্মুক্ত স্বরূপ উন্মোচন করে' দিয়েছেন,—আমার দেহ বিশ্বদেহেরই একটী বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট ভঙ্গী—ঠিক সেই রূপ আমার মন, আমার প্রাণ—সে বিশ্ব মন বিশ্ব প্রাণেরই এক একটী বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট ভঙ্গী, —আত্মারই স্বতন্ত্র বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই যে গাছ পালা, পশু পক্ষী, নর বানর—জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণু—এদের সঙ্গে আমার যে চির সম্বন্ধ পাতা রয়েছে —আমার প্রতি বিচিত্র অনুভূতির স্তরে স্তরে যে ওদের অনুভূতির সূক্ষ্ম রেশটী লেগে রয়েছে —যার দরুণ জগতের কোন জীবই একলা নেই—একায় একলা নয়—তার সমস্ত আত্মীয় স্বজন সকলে ছেড়ে গেলেও সে জগতেই রয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ এ চরম তত্ত্বটী পেয়েছেন এবং এ তত্ত্বের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ দেশ কাল পাত্রাতীত যে শিল্প তার অনুসন্ধান করেছেন। এই যার

থেকে তাই আমরা কবির যে যে কাব্যগুলি দেখি তার মধ্যে কবির অন্তরে একটা বিপুল পরিবর্ত্তনেরই আভাষ পাই। কবি যেন সীমার বন্ধন পেরিয়ে উঠেছেন—একটা অসীমের অনন্তের উদ্দেশ্যে তিনি যেন পাড়ি দিতে চেয়েছেন। বৈদিক ঋষির কথার প্রতিধ্বনি করে' আমরা বল্‌তে পারি, কবি চিৎ-স্বরূপ থেকে ধীরে ধীরে আনন্দ স্বরূপের কাছে ধরা দিয়েছেন—যে স্বরূপের চরম পরিণতি হচ্ছে বিজ্ঞান। এই আনন্দ লোকের একটা ছায়া স্বরূপ তাই আমরা এই সময় থেকে তাঁর কাব্যে ধারাবাহিকরূপে দেখ্‌তে পাই।

এই যে আনন্দ-স্বরূপ আত্মা—বৈদিক ঋষিগণ এই আত্মাকেই "রস" নামে অভিহিত করেছেন—তাঁই বিজ্ঞান জগতের চরম শিখরে অধিষ্ঠান করে' তাঁরা আবাঙ্‌মনসোগোচরম্ যিনি-তাঁকে "আনন্দরূপমমৃতং" এবং "রসো বৈ সঃ" বলে উল্লেখ করে গেছেন। এই আনন্দ-রূপ অমৃত এবং রস—ভগবানের এই স্বরূপকে আমাদের মনে হয়, কবি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অধিগত কর্‌তে পারেননি। কবির কাব্য-পিপাসা অনন্ত—তার শেষ নাই—ছেদ নেই—আজও তা অবিরাম গতিতে চলেছে। অতীন্দ্রিয়ের, অনন্তের একটা নিবিড় স্পর্শের মধ্যেই তিনি জগতকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছেন। অন্ধকারে পরপারের এই দিব্যধাম কবিবরের নয়ন মুগ্ধ করেছে। আধুনিক কালে সমগ্র তাই তাঁকে "মিস্টিক" নামে অভিহিত করেছে। ভাবজগতে সে গভীর তত্ত্ব আমাদের মনে হয়, আর তাঁর কাছে অস্পষ্ট কুহেলিকাবৃত নয়। তিনি তা দর্শন করেছেন। সে দর্শন বুদ্ধির বাদবিবাদের উপর নির্ভর করে না, সে দর্শন—কুয়াশাবৃত আবছায়ার একটা কল্পনা-বোধ মাত্রই নয়, সে দর্শন রোমান্টিক কবিগণের মত মর্ম্ম হতে উদ্ভূত একটা কল্পনা-রঙীন কিছুই নয়—সে দর্শন এই সকলের ওপরে—এই সকলকে মিলে'ও মেশে একেবারে চক্ষের দেখা—অন্তশ্চক্ষুর এই সজাগ, নিবিড় অনুভূতি বোধ আমরা "গীতাঞ্জলির" পৃষ্ঠায় নানা আকারে দেখ্‌তে পাই—জীবন দেবতা অনন্তের পথে তাঁকে হাত ধরে আজও নিয়ে চলেছেন—তিনিও কি এক মুগ্ধ আবেশ-রঞ্জিত নয়নে তাঁরে রূপ দেখে তাঁর কার্য্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছেন—

"আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র একবাণী
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমারি প্রীতি
আমারে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে খনিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।"

শ্রীবরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

ব্যথার দান। (ছোট গল্প) কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক যোগেশ পালধিপিং হাউস, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ছোট গল্পগুলি এতদিন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় ছড়ানো ছিল। আমরা তাঁহার গল্প সংগ্রহ "ব্যথার দান" পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। এই সংগ্রহ পুস্তকে কাজী সাহেবের ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে যথা (১) ব্যথার দান, (২) হেনা (৩) মুক্তির ফেরে (৪) অতৃপ্ত কামনা (৫) বাদলবরিষণে এবং (৬) রাজবন্দীর চিঠি। গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক গল্পেই করুণরস নিবিড় ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। নিরাশ প্রেমের মর্ম্মন্তুদ গভীর বেদনা এই বহির প্রত্যেক পাতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পগুলিতে আখ্যানবস্তুর কারিগরী না থাকিলেও ভাব বৈচিত্র্যে ও কথা সম্পদে উহা মনোরম হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্র বাথার ও মানস মন্থনে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লেখকের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পগুলি পরস্পরের সহিত বিজড়িত হইলেও উহাদের অন্তরের যোগ আছে। একটি বিপুল ব্যথার নিবিড় ক্রন্দন মণিগণের মধ্যগ্রথিত সূত্রখণ্ডের ন্যায় সমস্ত গল্প কয়টিকে ধারণা করিয়া আছে। কবি নজরুল ইসলামের শব্দ নির্ব্বাচনের যে অসামান্য কৃতিত্ব তাহার কবিতা সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে, "ব্যথার দানের" গল্পগুলিতেও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার লিখন-ভঙ্গী অঙ্কিত গতিতে সহজেই পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে যাইয়া স্পর্শ করে এবং মন্থর মাদকতার আবেশে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। এই মাদকতার বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে অবসাদ জন্মায় না, আবেশ ঘোর তীব্র ভেঙ্গে বদন করে না, রক্ততালে শিরায় শিরায় রক্তকণা নাচাইয়া তোলে। লেখকের তুলিকা এক এক জায়গায় বর্ণবিভঙ্গীতে অনির্ব্বাচ্যসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একটু বসুনা দিতেছি :—

"সে, এল যখন ঘুমঘোরে সেই উদ্ভাসিত লতা-বিতানে, তার বক্ষ করে ছিল চম্পিত ফুলের ঝাঁপি। কবরীভ্রষ্ট আবেশ বন্ধনী শিথিল হ'য়ে তারই বুকে প'ড়ে প'ড়ে পড়ছিল, ঠিক পুষ্প-পালড়ি ঝরে পড়িবার মত। কপোল চুম্বিত তার চূর্ণ কুন্তল হ'তে বিকিপ্ত কেশের রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোঁপ পরে চারিদিকে ছড়িয়ে এল,—"ওগো, উঠ, দেখ ঘুমের দেশ পারিয়ে স্বপ্নসখা এসেছে! উদাস হিল্লোলে খোঁপা হ'তে ফুল ফুল ঝোল খেয়ে উঠল।...আমার কপাল ঘামে ভরে উঠল, বক্ষ দুরু দুরু করে কাঁপিয়ে খেল সে কোন বিরাট খেলা। ঘন ঘন শ্বাস প'ড়ে আমার হাতের কাঁকনী ফুলগুলি খ'সে খ'সে প'ড়তে লাগল। আমার ঘোর হ'ল এ কোন্ ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস প্রতিমার পূর্ণ পরিণতিরূপে এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে? তবে তবে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা দুটোই বেশতে পেলুম, বেতস লতার মত সে আমার সামনে অবনত মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চলে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত জড়িত স্বরে কইলুম,—"কে তুমি? পরী?" তার আঁচল খাঁপির এক অনিমিষ চাউনী দিয়ে আমার পানে চেয়েই সে থমকে দাঁড়াল। দুরু জোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার দুটী কাল বড় চোখে চোখ-ভরা জল।..... এক পলকে পরীর নূপুরের রুনু ঝুনু সিঞ্জিনী চমকে যেন কি বলে উঠল। আনন্দ ছন্দের হিল্লোলা দোল আর দুলল না। সমুত্তাসিত লুণ্ঠিত চঞ্চল থমকে নিস্তব্ধ হ'ল। শিথিল বাসনার কুসুমকপোলে লাল শোণিমা বিস্তীর্ণ প্রান্ত বাড়িয়ের মত হিজুল হয়ে ফুটল। সমীরের পায়ের সাথে সাথে যেন উদাসি

সরলা মল্লিকের কলকণ্ঠোল বিধর হ'য়ে যাবে, আর তারই বুকে এক রাশ গোলাপ বেলো দুটি রক্ত পদ্ম ফুটে উঠবে। ব্রহ্মাকুমারীর মত তাঁরি তার নবীন নয়নে কল্পনার সঞ্চার করবে।"

এইরূপ কবিত্বপূর্ণ কাহিনী বইখানির যে স্থানে যেটা আছে কোন কোন গল্পে মূল কেন্দ্রের যেরূপ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যে নূতন, তেমনই সৌন্দর্যপূর্ণ। কবি নজরুল সাহিত্য ক্ষেত্রে নবীন হইলেও প্রবীণের ন্যায় কার্য করিয়াছেন—বিষয়বস্তু, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ঘরেবাইরে" কাব্যে নিখিলেশ ইস্‌লামের নামে উৎসর্গ করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। কাজী সাহেব যে গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী তার "ব্যথার দান" ও "রিক্তের বেদন" প্রভৃতি লেখা তাহার প্রমাণ।

বই খানির ছাপাও বাঁধাই অতি সুন্দর। লেখকের একখানি ছবিও পুস্তকের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

ছেঁড়া চিঠি। শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। প্রকাশক—আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

"ছেঁড়া চিঠি"র লিপিগুলি পূর্ব্বে যখন "সবুজ পত্রে" ছাপা হইত তখনই আমরা এইগুলি আগ্রহের সহিত পড়িতাম কারণ এই চিঠির লেখক যে ভাবলালিত্য লিপিকুশলতা লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা এই গদ্যপদ্যছন্দোবিকৃতির যুগে সচরাচর দুষ্ট হয় না। নরেশ বাবুর লিখিবার ভঙ্গী ঠিক রবীন্দ্রনাথের ধরণের। তিনি যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় অবলম্বনে চিঠিগুলি লিখিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, নরেশ বাবুর লেখনী অক্ষয় হউক। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকের নিকট তাঁহার বইয়ের যথেষ্ট আদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

স্বপ্নের মোহ। (উপন্যাস), আবদুল মতিন চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ এক টাকা চারো আনা। প্রকাশক—ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই উপন্যাসখানিতে খাসিয়াদের সামাজিক জীবনের একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সাহিত্যজগতে যদিও লেখক নূতন তথাপি এই প্রথম রচনাতেই তাঁহার গুণপনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একটি নিরাশ প্রেমের করুণ কাহিনী এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। প্রসঙ্গ ক্রমে খাসিয়া সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসের নায়ক বাঙ্গালী মুসলমান যুবক। আর নায়িকা খাসিয়া যুবতী। আখ্যানবস্তুর ঘটনাগ্রন্থনে যদিও লেখক মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই তথাপি খাসিয়াদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। এই পার্বত্য জাতির রীতি নীতি উৎসব আমোদ প্রমোদ নাচ ও সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে সমস্ত পরিচয় পাইতে হইলে এই উপন্যাসখানি পাঠ করিতেই হইবে। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর উপন্যাস আর কাই সুতরাং ইহা যে পাঠক সমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

দুনিয়ার সেরা সুন্দরী

(তুর্কী উপকথা)

একদা ছিলেন এক বাদশা, আর তাঁর ছিল একটী মাত্র ছেলে। কাজেই বাদশা তাকে যত্ন করতেন যেন চোখের মণি, আর যখন সে যা চাইত, তখনই তা এনে তার সামনে হাজির করা হ'ত।

একদা শাহজাদা স্বপ্ন দেখলো এক দরবেশ, তার গায় সাদা ধবধবে আলখিল্লা, সাদা দাড়ি বুক ছেড়ে নাভিতে পড়েছে, হাতে এক "আসা" (১); সেই দরবেশ আর তার সঙ্গে এক বালিকা—পরীর চেয়েও বেশী সুন্দরী, সে শাহজাদার কাছে এল, বালিকার হাতে এক পেয়ালা—বোধ হল শরবতের; দরবেশ বল্লেন, শাহজাদা, এই পেয়ালা পান কর; শাহজাদা এক চুমুকে পেয়ালাটা নিঃশেষ ক'রলেন, তখন দরবেশ বল্লেন "বাছা" এই বালিকা শাহজাদী, দুনিয়ার সেরা সুন্দরী, আর এই পেয়ালা মহব্বতের পেয়ালা, এই বলে দরবেশ ও বালিকা উভয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল; শাহজাদারও স্বপন টুটল।

স্বপন টুটল বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে সবই টুটল; কারণ এর পর শাহজাদা আর খায় না, আলাপ সালাপ করে না, কুস্তী লড়াই কিছুতেই মন দেয় না, পুথি পুস্তক আর স্পর্শ করে না, নিদ্রা যায়ত স্বপ্ন দেখে—কিন্তু সে স্বপ্নেও সুখ নাই। দেশ বিদেশের ডাক্তার, কবিরাজ, নৈষ্ঠ, হেকিম, ওঝা, মান্ত্রিক, দলে দলে এসে ঔষধ দিল; কিন্তু কোন ফল না দেখে বিরস বদনে ফিরে গেল।

তখন শাহজাদা একদিন বাদশাকে ডেকে বল্ল, "শাহবশা, কেবলাগাহ, নৈষ্ঠ, হেকিম আমার এ রোগের কি করবে? এ রোগের মূল দুনিয়ার সেরা সুন্দরী; সে হয় আমায় জীবন দিবে, না হয় আমার জীবন নিবে।

বাদশা ত শুনেই হতবাক। ভাবলেন, "এই মেয়েটাকে যাতে ও ভুলে যায় এই করতে হবে, তার পর বল্লেন; "এমন মেয়ের কথা ভাবাও বিপজ্জনক, তার চিন্তা যদি কর তবে তোমার জান যাবে।" কিন্তু শাহজাদা দিন দিন শুকাইতে লাগল, জীবনে আর শান্তি সুখ নাই। কতবার পিতা এসে জিজ্ঞাসা করছেন, "বাবা, তুমি কি চাও? বল, এখনই তা হাজির করছি; কিন্তু পুত্র বরাবর সেই একই জবাব দিয়েছে, আমায় অনুমতি দিউন বাবা, আমি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী খুঁজে নিয়ে আসি। তখন বাদশা ভাবলেন, "আচ্ছা যদি ওকে যেতে না দেই, ও বিছানায় শুয়ে মরবে; আর যদি যেতে দেই, তবে এর চেয়ে বড় বিপদ ত আর হবে না" সুতরাং তিনি বল্লেন, "বাও, বাছা, দুনিয়ার সেরা সুন্দরীকে খুঁজে আন, হকের (২) দোস্ত আল্লাহ যেন তোমায় রহম (৩) করেন।"

পরদিন শাহজাদা যাত্রা করল; কত পাহাড় পর্ব্বত, নদী নালা, কত মরুময়দান, বন জঙ্গল, পাড়ি দিয়ে গেল, কিন্তু পথের ত শেষ নাই! আবার শাহজাদা পথ চলে—অশ্রান্ত, অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের

(১) আসা—যষ্টি। (২) হক—সত্য। (৩) রহম—কৃপা।

পর সপ্তাহ পথ চলে ; অবশেষে দেখে সামনে অকূল দরিয়া, আর সেই দরিয়ার পারে বালীর উপর পড়ে একটা ছোট মাছ ধরফর করছে। শাহজাদাকে দেখে, মাছ বল্লে, "শাহজাদা, শাহজাদা, আমায় দরিয়ায় ফেলে দেও ত বাঁচি।" শাহজাদার দয়া হল, এবং সে মাছটা ধরে দরিয়ায় ফেলে দিল। তখন মাছ শাহজাদাকে তিনটা আঁশ দিয়ে বল্লে, যদি কোন দিন কোন বিপদে পড়, এই আঁশ কয়টা আগুনে দিও।"

আবার শাহজাদা চলতে-চলতে এক মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত ; সেখানে দেখে সামনে একটা দাঁড়া পিপড়া। পিপড়া বল্লে, 'শাহজাদা, আমি এক বিয়ের বরযাত্রী হয়ে চলেছি, কিন্তু এই পায়ের অসুখে আমার সঙ্গীও হলার পাত্রীর সঙ্গে যেতে পারছি না ; যদি আমাকে একটু সাহায্য ক'রে তাদের কাছে নিয়ে দেও, বড় উপকৃত হই।" শাহজাদা পিপড়াটাকে ধরে নিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দিল। বিদায় কালে পিপড়া শাহজাদাকে একটু পাথার টুকরা দিয়ে বল্লে, "যদি কোন বিপদে পড়, এই পাথার টুকরা আগুনে ফেলে দিও।"

আবার শাহজাদা যেতে—যেতে এক জঙ্গলের কাছে গিয়ে দেখে, একটা সাপ একটা ছোট পাখী ধরে গিলছে ; পাখী বল্লে, "শাহজাদা, শাহজাদা, একটু যদি বাঁচাও" শাহজাদা তলোয়ার খুলে সাপটাকে দুই টুকরা করে ফেল্লে। পাখী উড়ে যাবার কালে তিনটা পালক দিয়ে বল্ল, "যদি কোন দিন কোন বিপদে পড়, এই পালক তিনটা আগুনে দিও।"

আবার শাহজাদা পথ চল্ল—শরীরে কুধায় না, পা কবুল করে না—মন উঠে না, তবু বহু কষ্টে যেতে—যেতে, পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, সাগর পারি দিয়ে, উপস্থিত হ'ল শেষে এক সহরে সেই দুনিয়ার সেরা সুন্দরীর বাপের বাড়ী যেখানে সেই বাগিচায়। সে বরাবর বাদশাহী মহলে গিয়ে শাহজাদীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করল। বাদশাহ বল্লেন, না, "তোমার আগে তিনটী কাজ করতে হবে, যদি তা পার, তবে শাহজাদীকে তোমার প্রস্তাবের কথা শুনা'তে পারি।

এই ব'লে বাদশা একটা আংটী নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেল্লেন এবং শাহজাদাকে বল্লেন, যদি তিন দিনের মধ্যে এই আংটী না তু'লে এনে দিতে পার, তবে তোমার গর্দ্দান যাবে। তখন শাহজাদা ভাবছে কি করে, এমন সময় মনে হ'ল সেই মাছের আঁইশের কথা, তখনই আঁইশ তিনটা আগুনে ফেলে দিল, আর সেই ছোট্ট মাছটী এসে বল্লো—"সুলতান, সুলতান, কি হুকুম করছেন ?" শাহজাদা বল্লেন, "শাহজাদীর আংটী দরিয়ায় পড়েছে, আমি সেটা চাই। তখন ছোট্ট মাছ আংটীর খোঁজে ডুব দিল, এক ডুবে আংটীর খোঁজ হ'ল না, আরও এক ডুব—তবু আংটীর খোঁজ নাই—আরও এক ডুব, কৈ তবুত আংটীর পাত্তা মিলে না ! তার পর মাছ দিল ডুব সাত তলা দরিয়ার একদম নীচে—সেখান হতে একটা মাছ ধরে নিয়ে এল ; সেই মাছের পেট কেটে তবে পাওয়া গেল শাহজাদীর আংটী।

(ক্রমশঃ)

খাজা।